# ইসলামী রাষ্ট্র

শায়খ তাকীউদ্দিন আন্-নাবাহানী

## ভূমিকাঃ

বর্তমান প্রজন্ম সেই ইসলামী রাষ্ট্রের স্মরণ থেকে বিস্মৃত হয়েছে, যা সত্যিকার ভাবে ইসলাম কায়েম করেছিল। আর ইসলামী রাষ্ট্রের (উসমানী খিলাফত) সমাপনী বছর গুলোতে যারা এখানে বসবাস করেছে, যখন পশ্চিমা বিশ্ব এ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষনা করে, তারা মূলতঃ একটি ক্ষয়ে যাওয়া ধ্বংসোম্মুখ রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাক্ষী যেখানে ইসলামী বিধিবিধানের খুব ক্ষুদ্র একটি অংশই কার্যকর ছিল। তাই আজ অধিকাংশ মুসলিমদের পক্ষেই ইসলামী শাসন-ব্যবস্থার সত্যিকারের স্বরূপ নির্নয় করা খুবই কঠিন। সমস্ত মুসলিম জাতির মনমগজ আজ বর্তমানে বিরাজমান পরিস্থিতির বেড়াজালে বন্দী। আর তাই, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা বলতে কেবলই তাদের মানসপটে ভেসে উঠে নীতি বিবর্জিত হীন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বরূপ, যা মূলতঃ মুসলিমদের উপর জোরপূর্বক চাপানো হয়েছিল।

বস্তুতঃ মুসলিম জাতির এই দূর্ভাগ্যজনক অধ্যায়ের এটিই একমাত্র সমস্যাযুক্ত দিক নয়। বরং এর চাইতেও কঠিনতম সমস্যা হলো সেইসব মুসলিমদের মন-মানসিকতার আমূল পরিবর্তন ঘটানো, যা পশ্চিমা সংস্কৃতির মোহে আবিষ্ট। আর পশ্চিমা সংস্কৃতি হচ্ছে পশ্চিমা বিশ্ব কর্তৃক প্রয়োগকৃত এমন এক অস্ত্র, যা দ্বারা তারা ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে করেছে ভয়ংকর ভাবে রক্তাক্ত আর ক্ষতবিক্ষত। তারপর সেই রক্তাক্ত খঞ্জর হাতে গর্বিত ভঙ্গিমায় এ রাষ্ট্রের সন্তানদের ডেকে বলেছে, "আমি তোমাদের রুগ্ন জননীকে হত্যা করেছি। যার ব্যবস্থাপনা আর অভিভাবকত্ব অতিশয় দূর্বল, তারতো নিহত হওয়াই উচিত। এছাড়া আমি তোমাদের জন্য সংরক্ষিত করেছি এমন এক জীবন ধারা, যেখানে তোমরা পাবে সুখ আর সমৃদ্ধির নাগাল।" তারপর তারা সেই দূর্ভাগা জননীর সন্তানদের উদ্বুদ্ধ করেছে সেইসব খুনীদের সাথে হাত মিলাতে যাদের খঞ্জর তখনও ছিল তাদের জননীর রক্তে রঞ্জিত। এ যেন হিংস্র হায়েনার ইপ্সিত শিকারের সাথে আচরন সদৃশ। শিকার যেখানে নিশ্চল, হতবিহবল আর কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এক প্রচন্ড রক্তক্ষয়ী আঘাত কিংবা ভোজের জন্য কোন উপত্যকার পাদপ্রান্তে টেনে হিচঁড়ে নিয়ে যাবার পূব পর্যন্ত সে যেন চেতনায় ফিরে আসে না।

সুতরাং কিভাবে এইসব মোহাবিষ্ট হতবিহবল মানুষেরা অনুভব করবে, যে বিষাক্ত খঞ্জর তাদের জননীকে হত্যা করেছে, সেই একই মারনাস্ত্রের মুখে আজ তাদের অস্তিত্বও বিপন্ন। এই একই অস্ত্র তাদের জীবনও নাশ করবে যদি না তারা এর থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারে। জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা (ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করা) সহ আরো অনেক ইসলাম বিরোধী ধ্যান ধারনা যা আজ মুসলিমরা বয়ে বেড়াচ্ছে, এসবই হচ্ছে বিষাক্ত গরল যা পশ্চিমা সংস্কৃতি মুসলিমদের ধমনীতে প্রবাহিত করেছে। এই বইয়ের মিশনারীদের আগ্রাসন সম্পর্কে আলোচিত অধ্যায়ে উপযুক্ত তথ্য প্রমান সহ এ সকল হত্যাকারীদের প্রকৃত উদ্দেশ্য, তাদের অপরাধের পেছনের কারন এবং উদ্দেশ্য সাধনে গৃহীত পদ্ধতি ও উপায় উপকরন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বস্তুতঃ তাদের সকল কার্যক্রমের এক এবং একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ইসলামকে এই পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা। আর এ লক্ষ্যে তাদের সবচাইতে কার্যকরী অস্ত্র ছিল পশ্চিমা বিশ্বের সংস্কৃতি, যা তারা ঢালাও ভাবে প্রচার করেছিল এবং এর ফলে মুসলিমরা ক্রমশঃ পরিণত হয়েছিল তাদের স্বেচ্ছা প্রনোদিত শিকারে।

মুসলিম জনগোষ্ঠি ভিন্নধর্মী এ সংস্কৃতির সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ন অজ্ঞ। তাই যদিও তারা একদিকে পশ্চিমাদের সামরিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ গড়ে তুলেছিল, কিন্তু অপরদিকে তাদের সংস্কৃতিকেই সাদরে বরণ করে নিয়েছিল, যা ছিল পশ্চিমাদের দখলদারিত্ব শেকড় গেড়ে বসার মূল কারন। নির্মম বাস্তবতা হলো, মুসলিমরা কোনও গভীর পর্যালোচনা বা যুক্তি প্রমান ছাড়াই বিদেশীদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল ও তাদের দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাচ্ছিল এবং একই সাথে তাদের আলিঙ্গন করতেই নিজ বাহু উন্মুক্ত করে দিয়েছিল, পান করছিল তাদেরই এগিয়ে দেয়া বিষের পেয়ালা থেকে যে পর্যন্ত না তারা প্রাণহীন, নির্জীব আর ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে। কেউ কেউ হয়তো ভেবে থাকবে, এসবই হচ্ছে যুদ্ধের স্বভাব সুলভ ধ্বংসাত্মক ফলাফল, কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে মুসলিমরা ছিল অজ্ঞানতা আর ভ্রান্ত নির্দেশনার অসহায় শিকার।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, আসলে মুসলিমরা কি চেয়েছিল? তারা কি চেয়েছিল এমন একটি রাষ্ট্র যার ভিত্তি হবে ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু? নাকি তারা চেয়েছিল মুসলিম ভূখন্ডে বহু সংখ্যক রাষ্ট্রের উপস্থিতি? পশ্চিমা বিশ্ব মুসলিম ভূখন্ডে শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী হবার পর, ইতিমধ্যেই মুসলিমদের উপহার দিয়েছে অনেক গুলি রাষ্ট্র। তারপর এ রাষ্ট্রগুলোর সরকারকে প্রকৃত ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে, মুসলিম ভূখন্ড গুলোকে খন্ডে খন্ডে বিভক্ত করে এবং সর্বোপরি ইসলামী শাসনকে প্রয়োজনহীনতায় পর্যবসিত করে তারা তাদের পরিকল্পনার চূড়ান্ত বাস্তব রূপ দান করেছে। এভাবে যতই সময় যেতে থাকে, তারা মুসলিম বিশ্বে তৈরী করতে থাকে নতুন নতুন রাষ্ট্র। এবং এ প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে যতদিন পর্যন্ত মুসলিমরা তাদের প্রস্তাবিত নীতি এবং ধ্যান-ধারনার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

বস্তুতঃ এখানে মূল বিষয় বহু সংখ্যক রাষ্ট্র নয় বরং সমস্ত মুসলিম বিশ্বে একটি একক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। আবার শুধুমাত্র একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাও নয়, এবং নয় প্রতিষ্ঠা করা একটি নাম সর্বস্ব ইসলামী রাষ্ট্র - যার শাসন ব্যবস্থা আল্লাহতায়ালার নাজিলকৃত বিধান অনুযায়ী পরিচালিত নয়। কিংবা এমন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাও নয়, যা ইসলামী বিধিবিধান বাস্তবায়ন করে কিন্তু একটি বুদ্ধিবৃত্তিক বলিষ্ঠ ইসলামী নেতৃত্ব ছাড়াই যা সমস্ত বিশ্বে ইসলামের বার্তা পৌঁছে দেবে। বরং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে, এমন একটি একক রাষ্ট্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যা ইসলামী আকীদার (বিশ্বাস)

ভিত্তিতে পুনরায় ফিরিয়ে নিয়ে আসবে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা, মানুষের হৃদয় এবং মানষিকতার গভীরে ইসলাম প্রোথিত করে সমাজের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত করবে ইসলাম, এ বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে দেবে ইসলামের আহবান।

ইসলামী রাষ্ট্র কোনও স্বপ্ন নয়, নয় এটা কারও মগজ প্রসূত আকাশ কুসুম কল্পনা। বরং এটা এমন এক রাষ্ট-ব্যবস্থা, যা পৃথিবী শাসন করেছে দাপটের সাথে আর দীর্ঘ তেরশত বছর ধরে প্রভাবিত করেছে এ বিশ্বের ইতিহাস। এটা এমন এক বাস্তবতা, যা সব সময় ছিল এবং থাকবে। ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব প্রমানের অপরিহার্য উপাদানগুলো কোনও ব্যক্তি বা অন্য কোনকিছুর উপেক্ষা অথবা আক্রমনের বহু উর্ধ্বে। আলোকিত মানুষেরা এটাকে তাদের জীবনে বাস্তবায়িত করেছে এবং সমস্ত মুসলিম উম্মাহ্ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে সেদিনের, যেদিন ফিরে আসবে ইসলামের সেই হারানো গৌরবমন্ডিত অধ্যায়। ইসলামী রাষ্ট্র কোনও ব্যক্তির আপন খেয়ালের অভিলাষ নয় বরং এটা আল্লাহতায়ালার পক্ষ হতে মুসলিমদের উপর অর্পিত দায়িত্ব, যা পালনে তারা অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ দায়িত্ব পালনে অবহেলাকারীদের জন্য অপেক্ষা করছে শাস্তি। আর যারা নিষ্ঠার সাথে পালন করবে এ দায়িত্ব, তাদের জন্য রয়েছে প্রতিশ্রুত উত্তম পুরস্কার।

কিভাবে এই মুসলিম উম্মাহ্ তাদের রবের সন্তুষ্টি অর্জন করবে, যদি না তাদের রাষ্ট্রে সম্মান ও মর্যাদা না আল্লাহতায়ালা, না তাঁর রাসুল(সাঃ), না ঈমানদারদের জন্য নির্দিষ্ট হয়? কিভাবে তারা তাঁর শাস্তি থেকে নিজেদের রক্ষা করবে যদি না তারা এমন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে, যা প্রস্তুত করবে এর সামরিক শক্তি, রক্ষা করবে এর সীমানা, বাস্তবায়িত করবে আল্লাহ্ প্রদত্ত আইন কানুন এবং শাসন করবে আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান অনুযায়ী? সুতরাং, মুসলিমদের অবশ্যই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে, কারন ইসলামী রাষ্ট্র ব্যতীত দ্বীন ইসলাম প্রভাবশালী অস্তিত্ব হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে না এবং তাদের ভূখন্ড কখনোই `vi-Dj-Bmjvg হিসাবে বিবেচিত হবে না, যদি না তা শাসিত হয় আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান অনুযায়ী।

ইসলামী রাষ্ট্র কোনও অবস্থাতেই একটি সহজলব্ধ প্রচেষ্টা নয়। তাই এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি সুবিধাবাদীদের মনে জ্বালায় না মিথ্যা আশার আলো (রাষ্ট্র ক্ষমতায় আরোহন করাই যাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য)। প্রচেষ্টার এ পথে বিছানো রয়েছে কন্টক, অপেক্ষা করছে ভয়াবহ বিপদ, রয়েছে শত বাঁধা এবং কঠিন কষ্ট। এছাড়া ইসলাম বর্হিভূত সংস্কৃতি, অগভীর চিন্তাধারা এবং পশ্চিমা বিশ্বের তাঁবেদার শাসন-ব্যবস্থা যা তৈরী করেছে লক্ষ্য অর্জনে ভয়ংকর বাঁধা, এগুলোর কথা বলাই বাহুল্য। ইসলামী রাষ্ট্র পূর্নগঠনে যারা সত্যিকার ভাবে এ আহবানের পথে পা বাড়িয়েছে, তাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত এমন এক শাসন ব্যবস্থা যা মুসলিম ভূখন্ড গুলোতে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসবে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা এবং ইসলামের বার্তা পৌঁছে দেবে সমস্ত বিশ্বে। আর এজন্যই তারা শত প্রলোভনের পরও প্রত্যাখান করবে অন্য কারও সাথে ক্ষমতার অংশীদারিত্ব । ততক্ষন পর্যন্ত তারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় আরোহনও করবে না, যতক্ষন পর্যন্ত না তারা ইসলামকে মৌলিক, তাৎক্ষনিক এবং সর্বতো ভাবে প্রয়োগ করতে পারে।

পরিশেষে এটা বলা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্র সর্ম্পকিত এই বইটির উদ্দেশ্য নয় এ রাষ্ট্রের অতীত ইতিহাস বর্ণনা করা। বরং, আল্লাহর রাসুল(সাঃ) কিভাবে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং অবিশ্বাসী সাম্রাজ্যবাদীরা কিভাবে এটাকে ধ্বংস করেছিল,তা ব্যাখ্যা করাই এর মূল উদ্দেশ্য। এই বইটি পরিস্কার ভাবে বর্ণনা করেছে মুসলিম জনগোষ্ঠি কিভাবে তাদের রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে, যেন যে আলো গভীরতম অন্ধকারে একসময় তাবৎ বিশ্বকে পথপ্রর্দশন করেছিল, সেই একই আলো যেন প্রত্যাবর্তিত হয় আবারও সমগ্র মানবতাকে আলোকিত করতে।

## শুরুর কথাঃ

রাসুল হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হবার পর মুহাম্মদ(সাঃ) সর্বপ্রথম আহবান জানালেন তার সহধর্মিনী খাদিজা(রাঃ)কে এবং তিনি তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করলেন। তারপর তিনি তাঁর চাচাতো ভাই আলী(রাঃ) কে ইসলামের দাওয়াত দেন এবং তিনিও তাঁর উপর বিশ্বাস আনেন। এরপর তিনি তাঁর ক্রীতদাস যায়েদ(রাঃ) কে আহবান করলে যায়েদ(রাঃ)ও তাঁর উপর ঈমান আনেন। তারপর তিনি তাঁর বন্ধু আবু বকর(রাঃ)কে আহবান জানান এবং তিনিও বিশ্বাস স্থাপন করেন। এরপর তিনি জনসাধারনকে ইসলামের দিকে আহবান করতে থাকেন, এদের মধ্যে কিছু মানুষ ঈমান আনে আর বাকীরা তা গ্রহন করতে অস্বীকার করে।

আবু বকর(রাঃ) ইসলাম গ্রহন করার পর তার কাছের মানুষদেরকে তার বিশ্বাসের কথা জানান এবং তাদের আল্লাহতায়ালা ও তাঁর রাসুলের(সাঃ) দিকে আহবান করেন। আবু বকর ছিলেন তার আপন লোকদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন। লোকেরা তার সাহচার্য উপভোগ করত এবং বিভিন্ন বিষয়ে তার সাথে পরামর্শ করত। সমাজে তার এ সমস্ত প্রভাব কাজে লাগিয়ে তিনি উসমান ইবনে 'আফফান(রাঃ)কে ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসেন। এভাবে পরবর্তীতে যুবাইর ইবন আল-'আওওয়াম(রাঃ), 'আবদ আল রহমান ইবন 'আওফ(রাঃ), সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস(রাঃ), তালহা ইবন 'উবাইদুল্লাহ ইসলাম গ্রহন করেন। এদের সকলকে তিনি মুহাম্মদ(সাঃ) এর কাছে নিয়ে আসেন, তারা সকলে তাদের ঈমান আনার ঘোষনা দেন এবং নামাজ আদায় করেন। এরপর, 'আমির ইবন আল-যাররাহ্ (আবু উবাইদাহ নামে পরিচিত) ইসলাম গ্রহন করেন এবং 'আব্দুল্লাহ্ ইবন 'আবদ আল-আসাদ (আবু সালামাহ্ নামে পরিচিত) ও তার সাথে আল-আরকাম ইবন আবি আল-আরকাম, 'উসমান ইবন

মাজ'য়ুন এবং আরও অনেকে ইসলাম গ্রহন করেন। এভাবে একের পর এক বহুসংখ্যক মানুষ ইসলামের ছায়াতলে চলে আসে যে পর্যন্ত না এ বিষয়টি কুরাইশ সম্প্রদায়ের মাঝে আলোচনার বস্তুতে পরিণত হয়।

প্রথম দিকে মুহাম্মদ(সাঃ) বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। তাদের বলতেন যে, আল্লাহতায়ালা তাদের তাঁর ইবাদত করতে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করার জন্য আদেশ দিয়েছেন। এরপর তিনি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে মক্কার মানুষকে প্রকাশ্যে ইসলামের দিকে আহবান করতে শুরু করেন, যেখানে আল্লাহ আদেশ করছেন,

*Òtn e¯vZ! D‡Vv Ges mZK K‡iv|Ó* [সুরা আল-মুদ্দাছিরঃ ১-২]

পরবর্তীতে আল্লাহর রাসুল(সাঃ) দ্বীন ইসলামের দলভুক্ত মানুষেদের নিয়ে গোপনে একত্রিত হতেন এবং তাদের দ্বীন শিক্ষা দিতেন। প্রথমদিকে রাসুল(সাঃ) এর সাহাবীরা কুরাইশদের আড়ালে মক্কার প্রান্তসীমায় অবস্থিত পাহাড়ে নামাজ আদায় করতেন। যখনই নতুন কেউ ইসলাম গ্রহন করতো, আল্লাহর রাসুল(সাঃ) তাকে কুরআন শেখানোর জন্য পূর্বে ইসলাম গ্রহনকারী একজনকে পাঠাতেন। তিনি(সাঃ) ফাতিমা বিনত আল-খাত্তাব ও তার স্বামী সা'ঈদ কে কুরআন শেখানোর কাজে খাব্বাব ইবনে আল-আররতকে নিযুক্ত করেছিলেন। একদিন যখন তারা দু'জন এভাবে খাব্বাব(রাঃ) এর কাছে কুরআন শিখছিলেন, তখন সেখানে ওমর ইবন আল-খাত্তাব আকস্মিক ভাবে উপস্থিত হন এবং সাথে সাথে ইসলাম গ্রহন করেন। পরবর্তীতে আল্লাহর রাসুল(সাঃ) অনুভব করেন এভাবে শিক্ষা দান যথেষ্ঠ নয়, তাই তিনি আরকাম ইবনে আল আরকামের বাসগৃহকে তাঁর দাওয়াতের কেন্দ্র হিসাবে মনোনীত করেন এবং এখান থেকেই তিনি মুসলিমদের কুরআন শিক্ষা দিতেন, ইসলাম সম্মন্ধে আলোচনা করতেন, তাদেরকে কুরআন তিলওয়াত ও কুরআন নিয়ে চিন্তা করার জন্য উৎসাহ দিতেন। যখন কেউ ইসলাম গ্রহন করতো, আল্লাহর রাসুল(সাঃ) তার সাথে দার-উল-আরকামে সাক্ষাৎ করতেন। তিন বছর পর্যন্ত তিনি এভাবে মুসলিমদের শিক্ষা দেন, নামাজে ইমামতি করেন, শেষ রাত্রে তাদের সাথে তাহাজ্জুদ আদায় করেন, তাদের চিন্তা চেতনাকে উদ্দীপ্ত করেন, নামাজ এবং কুরআন তিলওয়াতের মাধ্যমে তাদের ঈমানকে আরও মজবুত করেন। কুরআনের আয়াত ও আল্লাহর সৃষ্টিকে গভীর ভাবে পর্যালোচনার মাধ্যমে নও মুসলিমদের চিন্তাধারাকে আলোকিত করেন। এছাড়াও তিনি তাদেরকে আল্লাহর কাছে নিজেকে পরিপূর্ণ ভাবে সর্মপনের মাধ্যমে সকল কষ্ট ও বাধাঁ অতিক্রমের উপায় শেখান।

মুহাম্মদ(সাঃ) তাঁর দলভুক্ত মুসলিমদের সাথে এভাবে দার-উল-আরকামে সময় অতিবাহিত করতে থাকেন যে পর্যন্ত না আল্লাহ সুবহানুওয়াতায়ালা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন,

*ÒAZGe †Zvgv‡K †h wel‡q Av‡`k Kiv n‡q‡Q, Zv cKv‡k¨ †Nvlbv Ki Ges gkwiK‡`i †_‡K gL wdwi‡q bvI|Ó* [সুরা হিজরঃ ৯৪]

## সাহাবাদের গঠন পর্যায়ঃ

দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে রাসুল(সাঃ) যাদের মাঝেই ইসলাম গ্রহন করার মতো মনমানষিকতা লক্ষ্য করতেন, জাতি, বর্ণ, বয়স, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি ভেদাভেদে তাদের কাছেই তাঁর এ আহবান পৌঁছে দিতেন। তিনি কখনো তাঁর নির্বাচিত কিছু সংখ্যক মানুষের কাছে দ্বীনের আহবান পৌঁছে দেননি বরং সকল শ্রেনীর মানুষকে তিনি সমান ভাবে ইসলামের দিকে আহবান করেছেন এবং তারপর ইসলাম গ্রহনে তাদের মনমানষিকতা বিচারে সমর্থ হয়েছেন। এভাবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ ঈমান আনে এবং ইসলাম গ্রহন করে।

নও মুসলিমদের পরিপূর্ণ ভাবে দ্বীন এবং কুরআন শিক্ষা দেবার ব্যাপারে তিনি খুবই উদ্বিগ্ন থাকতেন। তিনি তাঁর সাহাবীদের মধ্য হতে একটি দল তৈরী করেন যারা পরবর্তীতে দাওয়াতের কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। এ দলে নারী-পুরূষ সহ মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চল্লিশ জনে উন্নীত হয়। যদিও এরা ছিল বিভিন্ন বয়সের কিন্তু এদের মধ্যে তরুনদের সংখ্যাই ছিল বেশী। এদের মধ্যে ছিল ধনী, গরীব, সবল এবং দূর্বল সবধরনের মানুষ।

মুসলিমদের এদলটি আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ ভাবে ঈমান এনেছিল এবং এরাই মূলতঃ দাওয়াতের কার্য পরিচালনা করেছিল। এরা হলোঃ

১. 'আলী ইবন আবু তালিব ( ৮ বছর )
২. যুবাইর ইবন আল 'আওওয়াম ( ৮ বছর )
৩. তালহাহ্ ইবন আল 'উবাইদুল্লাহ্ (১১ বছর )
৪. আল আরকাম ইবন আবি আল আরকাম (১২ বছর )
৫. 'আব্দুল্লাহ্ ইবন মাস'উদ (১৪ বছর )

৬. সাঈদ ইবন যায়িদ ( বিশ বছরের নীচে )
৭. সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস (১৭ বছর )
৮. সা'উদ ইবন রবি'য়াহ্ (১৭ বছর)
৯. জা'ফর ইবন আবি তালিব (১৮ বছর )
১০. শুহাইব আল রুমি (বিশ বছরের নীচে )
১১. যায়িদ ইবন হারিছা ( প্রায় বিশ )
১২. 'উছমান ইবন 'আফফান ( প্রায় বিশ )
১৩. তুলাইব ইবন 'উমায়ির ( প্রায় বিশ )
১৪. খাব্বাব ইবন আল আররত ( প্রায় বিশ )
১৫. 'আমির ইবন ফুহাইরাহ (২৩ বছর )
১৬. মুসা'ব ইবন উমায়ির ( ২৪ বছর )
১৭. আল মিকদাদ ইবন আল আসওয়াদ (২৪ বছর )
১৮. 'আব্দুল্লাহ ইবন জাহস (২৫ বছর )
১৯. 'উমর ইবন আল খাত্তাব (২৬ বছর )
২০. আবু উবাইদাহ ইবন আল জাররাহ ( ২৭ বছর)
২১. 'উতবাহ ইবন গাজওয়ান (২৭ বছর )
২২. আবু হুদাইফাহ ইবন 'উতবাহ (৩০ বছর )
২৩. বিলাল ইবন রাবাহ (প্রায় ৩০ বছর )
২৪. 'আইইয়াস ইবন রাবি'আহ (প্রায় ৩০ বছর )
২৫. 'আমির ইবন রাবি'আহ ( প্রায় ৩০ বছর )
২৬. না'ইম ইবন 'আব্দুল্লাহ ( প্রায় ৩০ বছর )
২৭. 'উছমান ( ৩০ বছর ) এবং
২৮. 'আব্দুল্লাহ (১৭ বছর ) এবং
২৯. কুদামাহ্ (১৯ বছর ) এবং
৩০. আল সাইব (প্রায় ২০, এরা সবাই মাজ'য়ুন ইবন হাবিব এর চার ছেলে )
৩১. আবু সালামাহ 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আবদ আল আসাদ আল মাখযুমি ( প্রায় ৩০ বছর )
৩২. 'আবদ আর রাহমান ইবন 'আওফ (প্রায় ৩০ বছর )
৩৩. 'আম্মার ইবন ইয়াসির ( ৩০ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে )
৩৪. আবু বকর আল সিদ্দিক ( ৩৭ বছর )
৩৫. হামজাহ্ ইবন 'আবদ আল মুত্তালিব (৪২ বছর )
৩৬. 'উবাইদাহ ইবন আল হারিছ ( ৫০বছর )

কিছু সংখ্যক মহিলাও এদের সাথে ইসলাম গ্রহন করে ।

তিন বছর পর এ সকল সাহাবাদের হৃদয় এবং অন্তর যখন পুরোপুরি ইসলামের আদর্শ এবং ধ্যান-ধারনার ভিত্তিতে পরিপূর্ণতা লাভ করে তখন মুহাম্মদ (সাঃ) আশ্বস্ত বোধ করেন । তিনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হন যে, তাদের হৃদয়ে ইসলাম গভীর ভাবে প্রোথিত হয়েছে এবং ইসলামি আকীদার ভিত্তিতে তারা উচ্চমান সম্পন্ন ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে । এছাড়া, এই দলের অর্ন্তভূক্ত মুসলিমরা যখন সমাজের মানুষকে মুকাবিলা করার জন্য যথাযথ যোগ্যতা এবং দৃঢ়তা অর্জন করে তখন আল্লাহর রাসুল(সাঃ) দুশ্চিন্তা মুক্ত হন এবং আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী কুরাইশদের মুকাবিলায় মুসলিমদের নেতৃত্ব দেন ।

## দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনাঃ

আল্লাহর রাসুলের(সাঃ) নিকট ওহী নাযিলের শুরুতেই ইসলামের দাওয়াত মানুষের কাছে পরিচিত ছিল । মক্কার মানুষ প্রথম থেকেই জানতো যে, মুহাম্মদ(সাঃ) মানুষকে এক নতুন দ্বীনের দিকে আহবান জানাচ্ছেন এবং বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ ইসলামকে দ্বীন হিসাবে গ্রহন করেছে । তারা আরও জানতো যে, তিনি এসব মুসলিমদের সাথে একত্রে মিলিত হন, তাদের দেখাশোনা করেন এবং মুসলিমরা যে কুরাইশ সমাজের লোকচক্ষুর আড়ালে একত্রিত হয়ে নতুন দ্বীন শিক্ষা করে এটাও তারা জানতো ।

মক্কার লোকেরা ইসলামি দাওয়াতের ব্যাপারে এবং যারা ইসলাম গ্রহন করছে তাদের ব্যাপারে সচেতন ছিল, কিন্তু তারা কখনো জানতে পারেনি কোথায় তারা মিলিত হয় এবং কারা মিলিত হয়। এজন্যই মুহাম্মদ(সাঃ) যখন প্রকাশ্যে মক্কার মানুষকে নতুন এ দ্বীনের দিকে তাদের আহবান জানালেন তখন এটা তাদের কাছে আশ্চর্যজনক কোনও বিষয় ছিল না। মূলতঃ যেটা তাদেরকে বিস্মিত করেছিল সেটা হল মুসলিমদের নতুন একটি দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করা । মুসলিমদের এ নতুন দলটি আরও শক্তিশালী হয় যখন হামযাহ্ ইবন 'আবদ আল মুত্তালিব এবং এর ধারাবাহিকতায় 'উমর ইবন আল খাত্তাব ইসলাম ধর্ম গ্রহন করে। এরপর আল্লাহ্ কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করলেন,

***ÒAZGe †Zvgv‡K †h wel‡q Av‡`k Kiv n‡q‡Q, Zv cKv‡k¨ †NvlYv Ki Ges gkwiK‡`i †_‡K gL wdwi‡q bvI| we`ªcKvix‡`i wei"‡× AwgB †Zvgvi Rb¨ h‡_ó|*** *Those who adopt, with Allah, another god: but soon will They come to know.*Ó [সুরা হিজরঃ ৯৪-৯৬]

আল্লাহর রাসুল(সাঃ) আল্লাহর এ আদেশ যথাযথ ভাবে পালন করেন এবং তার দলকে সমস্ত মক্কারবাসীদের সাথে পরিচিত করান। তিনি তাঁর সাহাবীদের দুটি লাইনে সজ্জিত করেন, একদিকের নেতৃত্বে থাকেন 'উমর ইবন আল খাত্তাব আর একদিকের নেতৃত্বে থাকেন হামযাহ্ ইবন 'আবদ আল মুত্তালিব । এবং এ দলটি নিয়ে তিনি এমন ভাবে পথ চলতে থাকেন যা মক্কাবাসীদেরকে বিস্মিত করে। এভাবে তিনি তাঁর সাহাবীদের সঙ্গে করে কাবাঘর পরিভ্রমন করেন।

এটা ছিল এমন এক পর্যায় যখন মুহাম্মদ(সাঃ) তাঁর সাহাবীদের সাথে গোপনীয়তা থেকে প্রকাশ্য দাওয়াতের দিকে অগ্রসর হন এবং ইসলাম গ্রহন করার মতো মনমানষিকতা সম্পন্ন লোকদের আহবানের পরিবর্তে সাধারন ভাবে সমাজের সমস্ত মানুষকে ইসলামের দিকে আহবান করেন। এ পর্যায়ে ইসলামি দাওয়াত এক নতুন দিকে মোড় নেয়, শুরু হয় সমাজে ঈমান আর কুফরের মধ্যে দ্বন্দ, ভ্রান্ত আর ঘুণে ধরা আদর্শ গুলোর সাথে সংঘর্ষ হতে থাকে সত্য আদর্শের। বস্তুতঃ এই সময় থেকেই শুরু হয় মুহাম্মদ(সাঃ) এর দাওয়াতের দ্বিতীয় পর্যায়, যাকে বলা যায় প্রকাশ্য দাওয়াত আর সংঘাতের পর্যায়।

ইসলামের এ আহবানকে বাঁধাগ্রস্থ করার জন্য অবিশ্বাসী মুশরিকরা রাসুল(সাঃ) এবং তাঁর সাহাবাদের উপর সর্বপ্রকার নির্যাতন এবং অত্যাচার শুরু করে। বস্তুতঃ এটা ছিল চরমতম কঠিন একটা সময়। রাসুল(সাঃ) এর বাসগৃহে পাথর নিক্ষেপ করা হয় এবং আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মু জামিল মুহাম্মদ(সাঃ) এর গৃহের সামনে নানা নোংরা আর্বজনা নিক্ষেপ করে তাকে উক্ত্যক্ত করতে থাকে। তিনি(সাঃ) এ সব কিছু নীরবে উপেক্ষা করেন এবং নিজহাতে সেগুলো পরিষ্কার করেন। একবার আবু জাহল তাঁর দিকে কাবার মূর্তিদের উদ্দেশ্যে বলিকৃত ছাগলের নাড়িভুড়ি নিক্ষেপ করে। মুহাম্মদ(সাঃ) এসব সহ তাঁর কন্যা ফাতিমার বাড়ীতে উপস্থিত হলে তাঁর কন্যা সেগুলো নিজহাতে পরিষ্কার করে দেন। এ সমস্ত অত্যাচার ও নির্যাতন মুহাম্মদ(সাঃ)কে প্রতিনিয়ত আরও শক্তিশালী করে তুলে এবং তিনি আরও দৃঢ় ভাবে দাওয়াতী কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকেন।

ইসলাম গ্রহনকারী মুসলিমরাও হতে থাকে হুমকী আর নির্যাতনের সম্মুখীন। প্রতিটি গোত্রের লোকেরা তাদের স্বগোত্রীয় মুসলিমদের উপর অত্যাচার আর নির্যাতন শুরু করে। ইসলাম গ্রহন করার অপরাধে মক্কার এক মুশরিক তার দাস বিলাল(রাঃ)কে উত্তপ্ত বালির উপর শুইয়ে তার বুকের উপর পাথর চাপা দিয়ে রাখে। এতো নির্মম অত্যাচার সত্ত্বেও তিনি নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে বলতে থাকেন, "আহাদ! আহাদ!"। বিলাল(রাঃ) শুধু তার রবের জন্য অবলীলায় এ সমস্ত নির্মম অত্যাচার সহ্য করেন। আর একজন মহিলা ইসলাম ত্যাগ করে তার পূর্ব পুরুষের ধর্মে ফিরে যেতে অস্বীকার করায় তাকে নির্মম ভাবে অত্যাচার করে হত্যা করা হয়।

মুসলিমরা তাদের রবের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অত্যাচার, নির্যাতন, উপহাস আর বঞ্চনার এ পর্যায় ধৈর্য আর সহিঞ্চুষতার সাথে অতিক্রম করে।

## দাওয়াতী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে সহিংসতাঃ

মুহাম্মদ(সাঃ)কে যখন আল্লাহতায়ালা প্রথম রসুল হিসাবে মনোনিত করেন, তখন মক্কার মুশরিকরা তাকে এবং তাঁর প্রচারিত বানীকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। দাওয়াতী কাজের প্রাথমিক দিকে কুরাইশরা তাঁর আহবানকে সাধু-সন্ন্যাসীদের সমগোত্রীয় ভেবে উপেক্ষা করতে থাকে এবং ভাবতে থাকে যে, ইসলাম গ্রহনকারী মুসলিমরা হয়তো ধীরে ধীরে আবার তাদের পূর্বপুরুষের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করবে।

মূলতঃ এই কারনেই কুরাইশরা প্রথমদিকে তাঁর(সাঃ) কাজে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়নি। মুহাম্মদ(সাঃ) যখনই কুরাইশদের সম্মুখীন হতেন তারা বলতো, "এই হচ্ছে আবদ্ আল মুত্তালিবের পুত্র যার উপর কিনা আসমান থেকে ওহী অবতীর্ন হয়।" কিন্তু অল্প কিছুদিন পরই তারা তাঁর প্রচারিত আদর্শের শক্তিতে শঙ্কিত বোধ করতে শুরু করে এবং তাঁর সঙ্গে প্রকাশ্য সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। প্রথমদিকে তারা মুহাম্মদ(সাঃ) এর নবুয়তের দাবীকে মিথ্যা বলে উপহাস করে। পরবর্তীতে তারা নবুয়তের প্রমান হিসাবে নবী(সাঃ) অলৌকিক নিদর্শন সমূহ উপস্থাপন করতে বলে। তারা বলতে থাকে, মুহাম্মদ যদি সত্য সত্যই আল্লাহর নবী হয়ে থাকে তবে সে কেন সাফা ও মারওয়াকে সোনার পাহাড়ে পরিনত করছে না? কেন তাঁর কাছে

আসমান থেকে লিখিত কিতাব নাযিল হচ্ছে না? কেন জিবরাইল মুহাম্মদের সাথে কথা বলে কিন্তু তাদের সামনে উপস্থিত হয় না? কেন সে মৃতকে জীবিত করতে পারে না? কেন সে মক্কাকে পরিবেষ্টনকারী পাহাড়গুলোকে অন্যত্র সরিয়ে দিচ্ছে না? কেন তার সমাজের মানুষের পানির এতো কষ্ট থাকা সত্ত্বেও সে তাদের জন্য জমজম এর চাইতে ভাল কোন কুপ খনন করে দিচ্ছে না? কেন তাঁর রব তাঁকে দ্রব্যসমূহের মূল্য আগে থেকেই অবহিত করছে না যেন তারা সে অনুযায়ী দরদাম হাঁকতে পারে?

বেশ কিছুকাল যাবত চলতে থাকে আল্লাহর রাসুলের(সাঃ) বিরুদ্ধে উদ্দেশ্য মূলক এসব অপপ্রচার । কুরাইশরা নবী(সাঃ)কে জর্জরিত করতে থাকে তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, তিরস্কার আর অত্যাচারে । তা সত্ত্বেও তিনি(সাঃ) অবদমিত কিংবা সত্য পথ থেকে বিচ্যুত না হয়ে একাগ্রতার সাথে মানুষকে ইসলামের দিকে আহবান করতে থাকেন এবং সেই সাথে যারা মূর্তিপূজা করে ও মূর্তির কাছে প্রার্থনা করে তাদের নির্বুদ্ধিতা আর চিন্তার অসারতা সমাজের মানুষের সামনে তুলে ধরে মূর্তিপূজাকে অযৌক্তিক এবং হাস্যকর প্রমান করেন ।

তাদের উপাস্য মুর্তির বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ এ প্রচারনা কুরাইশদের সহ্য ক্ষমতার বাইরে চলে যায়, ফলে তারা যে কোনও হীন উপায়ে মুহাম্মদ(সাঃ) এর কার্যকলাপ বন্ধের জন্য সর্বাত্মক শক্তি নিয়োগ করে, কিন্তু দাওয়াতী কার্যকলাপ বন্ধের তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় । ইসলামী দাওয়াতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য কুরাইশরা প্রধানত তিনটি উপায় গ্রহন করেঃ

১. অত্যাচার
২. সমাজের ভিতরে এবং বাইরে মিথ্যা প্রচারনা
৩. বয়কট(সমাজচ্যুত করন)

পারিবারিক নিরাপত্তা পাবার পরও মুহাম্মদ(সাঃ) অত্যাচারের শিকার হন, অত্যাচারিত হন তাঁর(সাঃ) সঙ্গী-সাথীরাও । কুরাইশরা তাদের নির্যাতন করার জন্য ঘৃন্য সকল পদ্ধতি গ্রহন করে এবং এ সকল ঘৃনিত কাজে তারা ব্যাপক পারদর্শিতা অর্জন করে । সত্যদ্বীন থেকে বিচ্যুত করার জন্য আল-ইয়াসির(রাঃ) এর পরিবারকে নির্মম অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়, কিন্তু এ সমস্ত অত্যাচার শুধুমাত্রই তাদের দৃঢ়তা ও মনোবল বৃদ্ধি করে । কুরাইশরা যখন ইয়াসির(রাঃ) এর পরিবারকে অত্যাচার করছিল, তখন আল্লাহর রাসুল(সাঃ) তাদের অতিক্রম করছিলেন এবং তিনি(সাঃ) তাদের উদ্দেশ্যে বলছিলেন,"ধৈর্য ধর আল-ইয়াসির! তোমাদের পুরস্কার তো জান্নাত । তোমাদের গন্তব্য তো আল্লাহর কাছে।" এর জবাবে ইয়াসির(রাঃ) এর স্ত্রী সুমাইয়া(রাঃ) বলেছিলেন," ইয়া আল্লাহর রাসুল, আমি তা দেখতে পাচ্ছি। "

ততদিন পর্যন্ত রাসুল(সাঃ) এবং তাঁর সাহাবী(রাঃ)দের উপর কুরাইশদের এ ভয়ংকর অত্যাচার পূর্ণ শক্তিতে চলতে থাকে যতদিন পর্যন্ত না তারা বুঝতে পারে, তাদের সকল প্রচেষ্টা আসলে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে । এরপর তারা ইসলামী দাওয়াতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য অন্য পদ্ধতি গ্রহন করে, যা ছিল মূলতঃ ইসলাম এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারনা যা তারা মক্কা এবং মক্কার বাইরে যেমন, আবিসিনিয়ায় প্রচার করে । এ পদ্ধতি সফল করতে তারা যুক্তি, তর্ক, বিদ্রুপ, মিথ্যা অপবাদ-অভিযোগ সহ সকল রকম পদ্ধতি গ্রহন করে । তাদের অপপ্রচার ছিল ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস(*AvKv`vn*) এবং রাসুল(সাঃ) এর বিরুদ্ধে । কুরাইশরা মুহাম্মদ(সাঃ)কে নানারকম মিথ্যা অপবাদ এবং অভিযোগে অভিযুক্ত করে । তাঁকে(সাঃ) সমাজের মানুষের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তারা নানারকম পরিকল্পনা এবং কুটকৌশলের আশ্রয় নেয় ।

বিশেষ করে হজ্জের মৌসুমে কুরাইশরা ইসলামকে হীন প্রতিপন্ন করার জন্য খুবই সর্তকতার সাথে প্রস্তুতি নেয় । তারা ওয়ালিদ ইবন মুগীরার সাথে পরামর্শ করে মুহাম্মদ(সাঃ) এর বিরুদ্ধে ব্যঙ্গাত্মক শ্লোক রচনা করে । এরপর তারা মক্কায় হজ্জের উদ্দেশ্যে আগত আরবদের মুহাম্মদ(সাঃ) সম্পর্কে কি বলা যায় এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে । কেউ কেউ প্রস্তাবনা করে, তারা আগত আরবদের মাঝে প্রচার করবে যে মুহাম্মদ(সাঃ) একজন কাহিন (গনক) । কিন্তু ওয়ালিদ ইবন মুগীরা এ প্রস্তাব নাকচ করে দেয় এ যুক্তিতে যে, মুহাম্মদের বাণী একজন নির্বোধ কাহিনের অসাড় প্রলাপ কিংবা ছন্দময় আবৃত্তির বহু উর্ধ্বে । কেউ কেউ প্রস্তাব করে যে, তারা বলবে মুহাম্মদ একজন কবি । কিন্তু তারা পদ্য রচনার সকল প্রকার এবং রূপ সম্পর্কে খুব ভালই অবহিত ছিল বলে শেষ পর্যন্ত এ প্রস্তাবটিও বাতিল করে । অন্যেরা প্রস্তাব করে, তারা প্রচার করবে মুহাম্মদ জিনের আছরগ্রস্থ । কিন্তু, ওয়ালিদ ইবন মুগীরা এ প্রস্তাবও নাকচ করে দেয় কারণ, মুহাম্মদ(সাঃ) এর আচরন জিনের আছরগ্রস্থ মানুষের মতো নয় । অনেকে আবার মুহাম্মদ(সাঃ)কে যাদুকর হিসাবে অভিযুক্ত করার প্রস্তাব দেয়, কিন্তু আল-ওয়ালিদ এ প্রস্তাবও নাকচ করে দেয় কারন মুহাম্মদ(সাঃ) যাদুকরদের মতো গুপ্তবিদ্যার চর্চাও করে না, such as the well known ritual of blowing on knots.

দীর্ঘ আলোচনার পর তারা একমত হয় যে, তারা প্রচার করবে মুহাম্মদ(সাঃ) কথার মাধ্যমে মানুষকে যাদুগ্রস্থ করে (*wkni Avj-evqvb*) । এরপর তারা আরবদের মুহাম্মদের ব্যাপারে সর্তক করার জন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে হজ্জ কাফেলাদের মধ্যে ঢুকে পরে । আল্লাহর রাসুল(সাঃ)কে তারা কথার যাদুকর হিসাবে মানুষের কাছে উপস্থাপিত করে এবং হজ্জ যাত্রীদের তাঁর(সাঃ) প্রচারিত বাণী শ্রবন করা থেকে বিরত থাকতে আহবান করে । তারা প্রচার করে, মুহাম্মদের প্রচারিত বাণী মানুষকে তার আপন ভাই, বাবা, মা এমনকি তার নিজ পরিবার থেকে পৃথক করে ফেলে । বস্তুতঃ তাদের এ মিথ্যা অপপ্রচার তাদের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়, এবং ইসলামী দাওয়াত ক্রমশ মানুষের অন্তর জয় করতে থাকে । এরপর কুরাইশরা আল নাদির ইবন আল-হারিছকে মুহাম্মদ(সাঃ) এর বিরুদ্ধে নিয়োজিত করে । যখনই তিনি(সাঃ) জনগনকে দাওয়াত দিয়ে তাদের আল্লাহর কথা

স্মরন করিয়ে দিতেন কিংবা পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহর সতর্কবাণীর কথা বলতেন, তখনই নাদির ইবন হারিছ সেখানে উপস্থিত হয়ে পারস্যের বাদশাহ্ ও তাদের ধর্মের গল্প বলতে শুরু করতো। সে দাবী করতো, "কোন দিক থেকে মুহাম্মদ গল্প বলায় আমার থেকে বেশী পারদর্শী? সে কি আমার মতোই পূর্ববর্তীদের কাহিনী বর্ণনা করে না?" এভাবে কুরাইশরা বিভিন্ন ধরনের গল্পকাহিনী জনগনের মাঝে ছড়িয়ে দিতে থাকে। তারা মক্কাবাসীদের বলে, আসলে মুহাম্মদ যা বলে এগুলো আল্লাহর বাণী নয়, বরং এগুলো জাবির নামে একজন খ্রীষ্টান তরুণের শেখানো কথা। এই অপপ্রচার চলতে থাকে যতক্ষন পর্যন্ত না আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন,

***ÒAvgiv †Zv Rwb Zviv e‡j †h, Zv‡K wk¶v t`q GKRb gvbl; Zviv hvi K_v e‡j Zvi fvlv †Zv Aviex bq; wKš †KviAv‡bi fvlv †Zv weï× Aviex|Ó*** [সুরা নাহলঃ ১০৩]

এভাবে সমগ্র আরব উপদ্বীপ জুড়ে চলতে থাকে ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার এবং মুসলিমদের উপর অত্যাচার। যখন কুরাইশরা শুনতে পেল কিছু মুসলিম জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত হবার ভয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছে, সাথে সাথে তারা আবিসিনিয়াতে তাদের পক্ষ থেকে দু'জন চৌকষ দূত পাঠিয়ে দিল মুসলিমদের হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য। তাদের আশা ছিল আবিসিনিয়ার শাসক নাজ্জাসী হয়ত মুসলিমদের তার দেশ থেকে বের করে দিয়ে মুসলিমদের মক্কায় ফিরে আসতে বাধ্য করবে। কুরাইশরা তাদের পক্ষ থেকে দূত হিসাবে 'আমর ইবন আল 'আস ইবন ওয়া'ইল এবং আব্দুল্লাহ্ ইবন রবি'আহ্কে প্রেরন করে। তারা আবিসিনিয়া গমনের পর বাদশাহ নাজ্জাসীর সভাসদবৃন্দকে উপঢৌকন প্রদানের মাধ্যমে মুসলিম শরণার্থীদের তাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করার ব্যাপারে তাদের সহায়তা কামনা করে। তারা সভাসদবৃন্দকে বলে, "আমাদের জনগনের মধ্য হতে কিছু নির্বোধ লোক আপনাদের বাদশাহর আশ্রয়ে আছে। তারা আমাদের ধর্ম ত্যাগ করেছে আবার আপনাদের ধর্মও গ্রহন করেনি, উপরন্তু তারা এমন এক ধর্মের দিকে মানুষকে আহবান জানাচ্ছে যে ধর্মের ব্যাপারে না আমরা কিছু জানি, না আপনারা জানেন। আমাদের সম্মানিত নেতারা তাদের ফিরিয়ে নেবার জন্য আমাদেরকে আপনাদের কাছে পাঠিয়েছেন। সুতরাং, তাদের আমাদের হাতে তুলে দিন কারন, নিজ সম্প্রদায়ের লোক হিসাবে তাদের ভুল-ভ্রান্তির ব্যাপারে আমাদেরই পরিপূর্ণ এবং স্বচ্ছ ধারনা রয়েছে।" মুসলিমরা অনাকাঙ্খিত কিছু বলে ফেলবে এই ভয়ে কুরাইশদের প্রেরিত দূতেরা বার বার এটা নিশ্চিত করতে চাচ্ছিল যেন, মুসলিম শরনার্থীরা কোনভাবেই বাদশাহর সাথে সাক্ষাৎ না করে। সভাসদবৃন্দ নাজ্জাসীর সাথে সাক্ষাৎ করে এবং আশ্রয়প্রার্থী মুসলিমদের তাদের নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে ফিরিয়ে দেবার আবেদন করে।

সভাসদবৃন্দের আবেদন শোনার পর নাজ্জাসী আশ্রয়প্রার্থী মুসলিমদের তাঁর দরবারে হাজির হবার নির্দেশ দেন এবং তাদের নিকট হতে তাদের প্রচারিত আদর্শ শুনবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মুসলিমরা তাঁর দরবারে উপস্থিত হলে তিনি বলেন,"আমার দ্বীন কিংবা অন্য কোন দ্বীন গ্রহন না করে তোমরা কোন দ্বীনের দিকে মানুষকে আহবান করছো?" এমতাবস্থায় জা'ফর ইবন আবি তালিব তাদের ইসলাম পূর্ববর্তী অজ্ঞতা এবং তাদের বর্তমান অবস্থার সাথে পূর্বের অবস্থার একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে নাজ্জাসীর প্রশ্নের উত্তর দেন। তিনি বাদশাহকে বলেন,"আমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাদের অত্যাচার করত। আমাদের উপর ক্ষমতাশীন থাকা অবস্থায় তারা তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে এবং শেষ পর্যন্ত তারা আমাদের ও আমাদের দ্বীনের মাঝে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। We came to your country having chosen you above all others, but we hope that we shall not be treated unjustly while we are with you." নাজ্জাশী বললেন,"তোমাদের রাসুল আল্লাহর নাযিলকৃত যে বাণী প্রচার করছে তার কিছু অংশ কি তোমরা আমাকে শোনাতে পারো?" জবাবে জা'ফর(রাঃ) বললেন, হ্যাঁ, শোনাতে পারি। অতঃপর তিনি সুরা মারিয়মের প্রথম থেকে নিম্নোক্ত আয়াত পর্যন্ত তিলওয়াত করলেন যেখানে আল্লাহ বলেছেন,

***ÒAZtci gwiqg Cw½‡Z Zvi mšÍvb‡K t`Lv‡jv| Zviv ej‡jv th, †Kv‡ji wkïi mv‡_ Avgiv wKfv‡e K_v ej‡ev? †m [wkïwU] ej‡jv,*** *আমি তো আল্লাহর দাস, তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন, আমাকে নবী করেছেন। যেখানেই আমি থাকি না কেন, তিনি আমাকে তাঁর* ***AbMnfvRb K‡i‡Qb| hZw`b RwneZ _wK Avgv‡K bvgvR I hvKvZ Av`vq Kivi wb‡`k w`‡q‡Qb|*** **(He) hath made me kind to My mother, and not arrogant, unblessed; so peace is on me the Day I was born, the Day that I die, and the Day that I shall be raised up to life (again)!"** [সুরা মারিয়মঃ ২৯-৩৩]

কুরআন তিলওয়াত শুনে সভায় উপস্থিত পাদ্রীরা একযোগে বলে উঠলো, "এ তো সেই একই উৎস থেকে আগত যেখান থেকে এসেছে আমাদের প্রভু ঈসা মসীহ্র বাণী।" নাজ্জাশী বললেন,"সত্যিই, মুহাম্মদের বাণী এবং মুসার প্রচারিত বাণী একই উৎস থেকে আগত। তারপর, কুরাইশদের প্রেরিত দূতদ্বয়ের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা এখন যেতে পার। আর আল্লাহর কসম আমি কখনই এদেরকে তোমাদের হাতে তুলে দেবো না, আর না আমি তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবো।" একথা শোনার পর মক্কা থেকে আগত দুতেরা রাজসভা থেকে বেরিয়ে আসল এবং তাদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ভিন্ন পথ খুঁজে বেড়াতে লাগল। পরদিন 'আমর ইবন আল'আস পুনরায় নাজ্জাসীর কাছে গেল এবং বলল,"মুসলিমরা মারিয়ম পুত্র ঈসার নামে জঘন্য কথা বলে, আপনি তাদেরকে ডেকে পাঠান আর জিজ্ঞেস করুন।" তিনি মুসলিমদের ডেকে জিজ্ঞেস করায় জা'ফর বললেন,"আমরা মারিয়ম পুত্র সম্পর্কে তাই বলি যা আমাদের রাসুল(সাঃ) আমাদের শিখিয়েছেন, তিনি(সাঃ) বলেছেন, ঈসা মসীহতো আল্লাহর একজন বান্দা এবং তাঁর প্রেরিত রাসুল, তাঁর রুহ্ এবং তাঁরই কালিমা, যা তিনি(সুবহানুওয়াতায়ালা) ফুঁকে দিয়েছেন তাঁর সম্মানিত বান্দা

কুমারী মারিয়মের মধ্যে ।" নিগাস নীচু হয়ে একটি লাঠি তুলে নিয়ে মাটির উপর একটি সোজা দাগ দিয়ে বললেন,"তোমাদের দ্বীন আমাদের দ্বীনের মাঝে এই একটি রেখার পার্থক্য ছাড়া আর কিছুই নেই ।" অতঃপর তিনি কুরাইশ দুতদের খালি হাতে ফিরিয়ে দিলেন ।

শেষ পর্যন্ত ইসলামী দাওয়াতী কার্যক্রম বন্ধ করার লক্ষ্যে কুরাইশদের সকল ষড়যন্ত্র, মিথ্যা অপপ্রচার সবই ব্যর্থ হয় এবং সকল মিথ্যা, অপবাদ, অপপ্রচার আর ষড়যন্ত্রকে পরাভূত করে রাসুল(সাঃ) প্রচারিত আল্লাহর মহান বাণী তার আপন আলোয় উদ্ভাসিত হয়। এরপর কুরাইশরা মুসলিমদের পরাভূত করতে তাদের সর্বশেষ অস্ত্র প্রয়োগ করে, যেটা ছিল 'বয়কট' । তারা সকল গোত্র প্রধানরা একত্রিত হয়ে মুহাম্মদ(সাঃ) এবং তাঁর পরিবারকে সামাজিক ভাবে বয়কট করার সিদ্ধান্তে উপনীত হয় । এ লক্ষ্যে তারা একটি চুক্তিপত্র প্রণয়ন করে যে, বনু হাশিম এবং বনু আবদ আল মুত্তালিব-এর সাথে কেউ কোনও ধরনের লেন-দেন করবে না, তাদের গোত্রের মেয়েদের না কেউ বিয়ে করবে, না তাদের গোত্রে কেউ নিজের মেয়ে বিয়ে দেবে, না তাদের কাছে কেউ কোনও দ্রব্য বিক্রি করবে, না তাদের কাছ থেকে কেউ কিছু ক্রয় করবে। এ চুক্তির ব্যাপারে একমত হবার পর তারা চুক্তির শর্ত গুলো লিখে চুক্তিপত্রটি কাবার অভ্যন্তরে ঝুলিয়ে রাখে যেন কেউ চুক্তি ভঙ্গ না করার সাহস করে । তারা ধারনা করে যে, তাদের লক্ষ্য অর্জনে এ পদ্ধতি অপপ্রচার বা নির্যাতনের চাইতে বেশী কার্যকরী হবে এবং এভাবেই তাদের উদ্দেশ্য সাধিত হবে ।

তিন বছর পর্যন্ত চলে কুরাইশদের এই বয়কট । পুরোটা সময় জুড়ে কুরাইশরা আশায় থাকে এবার হয়তো বনু হাশিম আর বনু আবদ আল মুত্তালিব মুহাম্মদকে ত্যাগ করে স্বধর্মে প্রত্যাবর্তন করবে । ফলশ্রুতিতে সঙ্গী-সাথীহীন মুহাম্মদ পরিণত হবে তাদেরই করুনার পাত্রে । তারা আরও ভাবতে থাকে, হয় তাদের আরোপিত এই বয়কট মুহাম্মদকে দাওয়াতী কার্যক্রম বন্ধ করতে বাধ্য করবে, না হয় মুহাম্মদের আহবানে তাদের দ্বীনের অস্তিত্ব যে হুমকীর সম্মুখীন হয়েছে সেটা বন্ধ হবে । কিন্তু তাদের গৃহীত এ সমস্ত কৌশল মুহাম্মদ(সাঃ)কে করে তোলে আরও দৃঢ়প্রত্যয়ী আর দাওয়াতী কাজ চালিয়ে নেবার জন্য সাহাবীদেরও করে পূর্ণ উদ্যমী । মক্কার ভিতরে বাইরে সর্বত্রই ইসলামের আহবান প্রচার এবং প্রসারে কুরাইশদের বয়কট সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থ হয় । বরং মুহাম্মদ(সাঃ) এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের বয়কট করার সংবাদ মক্কার বাইরে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে যায় আর এভাবে বিভিন্ন গোত্রের কাছে পৌঁছে যায় ইসলামের আহবান । এবং সমস্ত আরব উপদ্বীপে ইসলাম একটি আলোচনার বিষয় বস্তুতে পরিণত হয় ।

যাই হোক, মুসলিমদের উপর কোনও রকম দয়া প্রদর্শন ছাড়াই নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে চলতে থাকে এই বয়কট এবং কুরাইশরা চুক্তিবদ্ধ গোত্রের মানুষকে প্রতিটি শর্ত মানতে বাধ্য করে । ফলে, রাসুল(সাঃ) এর পরিবার এবং সাহাবীরা ক্ষুধা তৃষ্ণায় অবর্ণনীয় কষ্টের শিকার হয় এবং গুটি কয়েক সহানুভুতিশীল ব্যক্তির দেয়া নূন্যতম খাদ্যে দিন পার করতে থাকে । এই নির্মম কষ্টকর সময়ের মধ্যে শুধুমাত্র পবিত্র মাস গুলোই ছিল তাদের জন্য তুলনামূলক ভাবে স্বস্তির সময়, যখন মুহাম্মদ(সাঃ) কাবায় যেতেন, সেখানে মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের পথে আহবান করতেন, তাদের দিতেন জান্নাতের সুসংবাদ আর সতর্ক করতেন জাহান্নামের ভয়াবহতা সম্পর্কে, তারপর ফিরে আসতেন পার্বত্য উপত্যকায় । এই সমস্ত ঘটনা প্রবাহ ধীরে ধীরে মুহাম্মদ(সাঃ), তাঁর পরিবার এবং সাহাবীদের প্রতি মক্কাবাসীদের অন্তরকে বিগলিত করে । এদের কেউ কেউ মুহাম্মদ(সাঃ) এর আহবানে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহন করে, আবার কেউ কেউ তাদের গোপনে খাবার সরবরাহ করতে থাকে । হিশাম ইবন 'আমর নামক এক মক্কাবাসী রাতের অন্ধকারে উট বোঝাই করে খাবার নিয়ে যেত মুসলিমদের জন্য, তারপর পার্বত্য উপত্যকার অভ্যন্তরে যেখানে মুসলিমরা থাকতো সেখানে ঢুকিয়ে দিত তার উট । এভাবে মুসলিমরা তার সরবরাহ করা খাবার খেতো এবং উটটিও জবাই করে খেয়ে ফেলতো ।

বয়কট কার্যকর থাকাকালীন কষ্টকর এই তিনটি বছর মুসলিমরা অসম্ভব ধৈর্য্যের সাথে অতিবাহিত করে । মূলতঃ এই সময় তারা পার করে রুক্ষ, প্রস্তরময় একটি পথ, যে পর্যন্ত না আল্লাহতায়ালা তাদের পরীক্ষা হতে অব্যহতি দেন এবং শেষ পর্যন্ত কুরাইশরা বয়কট প্রত্যাহার করে । কুরাইশদের মধ্য হতে জুহাইর ইবন আবি উমাইয়াহ, হিশাম ইবন 'আমর, আল মুত'য়িম ইবন 'আদি, আবু আল বাখতারি ইবন হিশাম এবং জামা'য়াহ ইবন আল আসওয়াদ নামে পাঁচজন তরুণ একত্রিত হয় । ঐ সময়ের অন্য অনেক কুরাইশদের মতো তারাও বয়কট এবং চুক্তিপত্রের ব্যাপারে তাদের বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করে । শেষ পর্যন্ত তারা অনৈতিক ভাবে মুহাম্মদ(সাঃ) এবং তার সঙ্গী-সাথীদের বয়কটের চুক্তিপত্রটি বাতিলের ব্যাপারে একমত হয় ।

পরদিন জুহাইর কাবাগৃহকে সাতবার প্রদক্ষিন করার পর উপস্থিত জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলে,"হে মক্কাবাসী, আমরা কি ভালো খাবো, ভালো কাপড় পরবো আর কোনও রকম ক্রয়-বিক্রয় না করতে পেরে বনু হাশিম গোত্রের লোকেরা কি ধ্বংস হয়ে যাবে ? আল্লাহর কসম এই অন্যায় বয়কট বাতিল আর চুক্তিপত্র ছিঁড়ে ফেলা না পর্যন্ত আমি বিশ্রাম নেবো না ।" খুব নিকটেই ছিল আবু জাহল, সে ক্রোধান্বিত হয়ে বলল,"তুমি মিথ্যাবাদী, আল্লাহর কসম, এই চুক্তিপত্র আমি কখনোই ছিড়ঁবো না ।" এই পর্যায়ে মক্কাবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা বাকী চারজন জুমা'য়াহ, আবু আল বাখতারি, আল মুত'য়িম এবং হিশাম জুহাইরের সমর্থনে চিৎকার করে উঠে । আবু জাহল তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারে পুরো ব্যাপারটিই আসলে পূর্ব পরিকল্পিত এবং আরও খারাপ কিছু ঘটার আশংকায় পিছু হটে যায় । যখন আল মুত'য়িম চুক্তিপত্রটি ছিঁড়ে ফেলার জন্য কাবার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তখন তারা দেখে "তোমার নামে, হে আল্লাহ" এ বাক্যটি ছাড়া বাকী সবটুকু ইতিমধ্যেই পোকার আক্রমনে নষ্ট হয়ে গেছে।

শেষ পর্যন্ত আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর রাসুল(সাঃ) ও তাঁর সাহাবীরা পুনরায় মক্কায় ফিরে আসে এবং ইসলামী দাওয়াতের পথ রোধ করার কুরাইশদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে মক্কায় মুসলিমদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। কুরাইশরা সব রকম উপায়ে ক্রমাগত চেষ্টা করেছিলো মুসলিম এবং তাদের দ্বীনের মাঝে বাঁধা হয়ে দাড়াঁতে। তারা চেষ্টা করেছিলো মুহাম্মদ(সাঃ) কে দ্বীন প্রচার থেকে বিরত রাখার, কিন্তু সব রকম বাঁধা বিপত্তি সত্ত্বেও আল্লাহর সাহায্যে চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল ইসলামী দাওয়াতের আহবান।

## ইসলামী দাওয়াতের জনসংযোগ পর্যায়ঃ

আল্লাহর রাসুল(সাঃ) দাওয়াতী জীবনে আপোসের পরিবর্তে সংগ্রামের পথই বেছে নিয়েছিলেন এবং তাঁর দলকে কুরাইশদের সামনে সরাসরি এবং দৃঢ় ভাবে উপস্থাপন করে তাদের দিকে এক কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। ফলে, কুরাইশদের উপর এর প্রভাব যা হবার কথা তাই হয়েছিল। ইসলামের এ দৃঢ় আহবানকে অস্বীকার করায় তাদের এর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না। এছাড়া ইসলামের আহ্বানের যে প্রকৃতি ছিল তা স্বভাবতই একে কুরাইশ এবং তৎকালীন সমাজের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত করেছিল। কারণ, এ আহবান ছিল আল্লাহর একত্ববাদকে স্বীকৃতি দেবার, এ আহবান ছিল মূর্তি পূজা ত্যাগ করে শুধুই মাত্র তাঁকে ইবাদত করার আর ক্ষয়ে যাওয়া যে কলুষিত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে কুরাইশরা বাস করছিল তা পুরোপুরি বদলে ফেলার। মূলতঃ রাসুল(সাঃ) যখন কুরাইশদের চিন্তা-ভাবনার অসারতা প্রমান করেন, তাদের উপাস্য দেব-দেবীকে সমাজে হাস্যকর ভাবে উপস্থাপন করেন, তাদের ক্ষয়ে যাওয়া জীবন ব্যবস্থাকে ছুঁড়ে ফেলে দেন এবং সর্বোপরি তাদের নিপীড়ন মূলক সমাজ ব্যবস্থার মুখোশ উম্মোচন করেন তখন স্বভাবতই ইসলাম দাঁড়িয়ে যায় তৎকালীন সমাজের সাথে সাংঘর্ষিক এক অবস্থানে।

আল্লাহতায়ালার নাযিলকৃত আয়াত দিয়ে তিনি প্রকাশ্যে কুরাইশদের জীবন-ব্যবস্থাকে আক্রমন করতেন । তিনি তাদের শুনাতেন সেই আয়াত যেখানে আল্লাহতায়ালা বলছেন,

***ÒwbwðZ fv‡e †Zvgiv(Awekvmxiv)Ges †Zvgiv Avল্লাহকে ছাড়া যাদের উপাসনা K‡iv Zviv †Zv Rvnvbv‡gi BÜb|Ó*** [সুরা আল-আম্বিয়াঃ ৯৮]

তিনি কঠিন ভাবে সমাজের প্রচলিত শোষনমূলক সুদী ব্যবস্থাকে আক্রমন করতেন।

*"এবং তোমরা সুদ হিসাবে (অন্যদের) যা দিয়ে থাকো, এ আশায় যে তা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে, আল্লাহর দৃষ্টিতে এতে কোন বৃদ্ধি* ***dbB|Ó*** (সুরা আর-রুমঃ ৩৯)

তিনি আক্রমন করতেন তাদের যারা মাপে কম দেয়,

***ÒaŸsm Zv‡`i Rb¨ hviv gv‡c Kg †`q, hLb Zviv A‡b¨i KvQ †_‡K †g‡c †bq c‡ivcwi †bq, wKš hLb Ab¨‡K †`q ZLb cv‡c¨i PvB‡Z Kg †`q|Ó*** (সুরা আল-মুতফফিফিনঃ ১-৩)

এর ফলশ্রুতিতে কুরাইশরা স্বাভাবিক ভাবেই রাসুল(সাঃ)কে প্রতিহত করার চেষ্টা করে এবং তাঁর ও তাঁর সাহাবীদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এ সংঘর্ষের ফলে তারা ব্যক্তি মুহাম্মদ(সাঃ) ও তাঁর প্রচারিত দ্বীনকে অপপ্রচার, নির্যাতন, বয়কট সহ বিভিন্ন উপায়ে আক্রমন করার আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। তাদের এহেন কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে রাসুল(সাঃ) কোন রকম নমনীয়তা প্রদর্শন না করে তাদের ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রাম চালিয়ে যান এবং আল্লাহর আদেশ অনুসারে তাদের ঘুঁণে ধরা কলুষিত আদর্শকে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করে মানুষকে ইসলামের দিকে আহবান করতে থাকেন। কুরাইশদের শত অত্যাচার আর নির্যাতন সত্ত্বেও তিনি(সাঃ) কোন রকম আপোষ বা সমঝোতা ছাড়াই সব মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দেন, যদিও তাঁর না ছিল নিজেকে রক্ষা করার মতো কোন ব্যবস্থা, না পেয়েছিলেন বাস্তবিক ভাবে কোন সাহায্য, না ছিল তাঁর পক্ষে কোন জোট আর না তাঁর কাছে ছিল কোন অস্ত্র। সমাজের দৃষ্টি আকর্ষন করে এবং প্রতিদ্বন্দ্বি মনোভাব নিয়েই তিনি(সাঃ) নিজেকে উপস্থাপন করেছিলেন। সকল দূর্গম বাঁধা অতিক্রম করে তিনি দৃঢ়তা ও বিশ্বাসের সাথে মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহবান করেছিলেন, তিনি(সাঃ) কখনও ক্ষমতাশীন কাউকে দলে ভিড়ানোর জন্য এতোটুকু দূর্বলতাকে প্রশ্রয় দেননি এবং আল্লাহর বাণী প্রচারের জন্য সবসময় যন্ত্রনাদায়ক দূর্গম গিরিপথ অতিক্রম করতে প্রস্তুত ছিলেন। বস্তুতঃ এ কারনেই কুরাইশরা তাঁর এবং তাঁর অনুসারীদের পথে যে কঠিনতম প্রতিবন্ধকতা তৈরী করেছিলো তা তিনি অবলীলায় অতিক্রম করতে পেরেছিলেন।

আল্লাহর রাসুল(সাঃ) দক্ষতা ও সফলতার সাথে সত্যের আহবান মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার পর মানুষ দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আসতে থাকে আর সত্য তার আপন শক্তিতে পরাজিত করে মিথ্যাকে। এভাবেই ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়তে থাকে আরববাসীদের মধ্যে, বহু

মূর্তিপূজারী, খ্রীশ্চিয়ান ধর্মের অনুসারী ইসলামের আলোয় হয় আলোকিত, উপরন্তু কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় লোকেরাও গভীর আগ্রহে শুনতে থাকে কুরআনের সুললিত বাণী ।

রাসুল(সাঃ) মক্কায় থাকাকালীন সময়েই আল-তুফাইল ইবন 'আমর আল-দাউসী একবার সেখানে আসেন। তিনি ছিলেন আরবদের মধ্যে সম্মানিত, তীক্ষ্ম ধীশক্তির অধিকারী আর উচুঁ দরের একজন কবি। মক্কার পা রাখার সাথে সাথেই কুরাইশরা তাকে মুহাম্মদ সম্পর্কে সতর্ক করে দেয় এবং বলে, মুহাম্মদ হচ্ছে একজন ভয়ঙ্কর যাদুকর, তার কথা মানুষকে তার পরিবার থেকে পৃথক করে ফেলে। তারা খুবই উদ্বিগ্ন ভাবে তাকে বলে যেন সে কোন ভাবেই মুহাম্মদের সাথে কথা না বলে কিংবা তার কথাও না শুনে। এরপর একদিন তুফাইল কাবাগৃহে যান, ঘটনাক্রমে মুহাম্মদ(সাঃ)ও সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তুফাইল তাঁর কিছু কথা শুনলেন এবং আবিষ্কার করলেন এগুলো খুবই চমৎকার। তারপর তিনি নিজেই নিজেকে বলেন,"আল্লাহর শপথ, আমি একজন বুদ্ধিমান মানুষ, একজন কবি, খুব ভালো ভাবেই জানি ভালো আর মন্দের পার্থক্য, তাহলে এই মানুষটি যা বলছে তা শুনতে আমাকে কিসে বাঁধা দিচ্ছে ? যদি তা ভালো হয় তবে আমি অবশ্যই তা গ্রহন করবো আর যদি খারাপ হয় তবে তা ছুঁড়ে ফেলে দেবো।" তারপর তিনি মুহাম্মদ(সাঃ) কে তাঁর গৃহ পর্যন্ত অনুসরন করেন এবং তাকে তার নিজের সবকথা খুলে বলেন। মুহাম্মদ(সাঃ) তাকে কুরআন তিলওয়াত করে শোনান এবং দ্বীন ইসলামের দিকে আহবান করেন। তুফাইল দ্বিধাহীন চিত্তে সত্যকে আলিঙ্গন করেন এবং মুসলিমদের অর্ন্তভূক্ত হয়ে যান। এরপর তিনি নিজ গোত্রের লোকদের মাঝে ফিরে যান এবং সেখানে ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করেন।

নতুন নবী আর্বিভাবের খবর শুনে বিশজন খ্রীশ্চিয়ানের একটি দল মক্কায় আসে মুহাম্মদ(সাঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করতে। রাসুল(সাঃ)এর আহবান শুনবার পর তাকে সত্য নবী বলে স্বীকৃতি দেয় এবং তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। এই ঘটনা শুনে কুরাইশরা ক্রোধে উম্মত্ত হয়ে পড়ে এবং মক্কা ত্যাগ করার সময় এ দলটির পথ রোধ করে দাঁড়ায়, তারপর ছুঁড়ে দেয় তাদের দিকে তীর্যক আর অপমানজনক মন্তব্য, বলে,"আল্লাহ তোমাদের ধ্বংস করুন! কি জঘন্য খারাপ লোকই না তোমরা। তোমাদের স্বজাতি তোমাদের এখানে পাঠিয়েছে এই মানুষটির ব্যাপারে খোঁজ খবর নেবার জন্য। আর যেই মাত্র না তোমরা তার সাথে সাক্ষাৎ করলে ওমনি নিজ ধর্ম ত্যাগ করে তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করলে!" কিন্তু এ ঘটনা তাদের অবস্থানকে এতোটুকু টলায়মান না করে বরং আল্লাহর উপর তাদের বিশ্বাসকে করে আরও দৃঢ় আর মজবুত করে। এভাবে, সমাজে রাসুল(সাঃ) এর প্রভাব যতোই বাড়তে থাকে, মানুষের কুরআনের বাণী শুনবার আগ্রহও ততো গভীর হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা হয় যে, কুরাইশদের মধ্য হতে মুহাম্মদ(সাঃ) এর ঘোরতর শত্রুও কুরআনের বাণী শুনে চমৎকৃত হয়ে ভাবতে থাকে মুহাম্মদ আসলে যা বলে তা সবই সত্য। এবং এ ভাবনা তাদের এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যায় যে, তারা লোক চক্ষুর অগোচরে লুকিয়ে লুকিয়ে কুরআন শুনতে শুরু করে।

মুহাম্মদ(সাঃ) যখন তাঁর গৃহে নামাজ আদায় করতেন তখন আবু সুফিয়ান ইবন হারব, আবু জাহল 'আমর ইবন হিশাম এবং আল-আকনাস ইবন সুরাইক এরা প্রত্যেকেই কুরআন শুনবার আকাঙ্খায় একে অন্যেকে লুকিয়ে সেখানে উপস্থিত হতো। প্রত্যেকেই ছদ্মবেশ ধারন করে এমন এক জায়গায় বসতো যেখান থেকে তারা তিলওয়াত শুনতে পারে। কেউই টের পেতো না অপরজনের উপস্থিতি। আল্লাহর রাসুল(সাঃ) প্রতিদিনই রাতের ইবাদতের জন্য উঠতেন এবং কুরআন তিলওয়াত করতেন।প্রতি রাতেই তারা খুব মনোযোগের সাথে মন্ত্রমুগ্ধের মতো কুরআন শুনতো যে পর্যন্ত না ভোরের আলো ফুটে উঠে, তারপর তাড়াতাড়ি ছত্রভঙ্গ হয়ে স্থান ত্যাগ করতো। এভাবে একদিন বাড়ি ফিরবার পথে হঠাৎ করেই তাদের একে অন্যের সাথে সাক্ষাৎ হয়ে যায়, ফলে অপ্রস্তুত হয়ে একজন আরেকজনকে অভিযুক্ত করে বলতে থাকে, "খবরদার এমন কাজ যেন আর না হয়, যদি আমাদের মধ্য হতে কোন দূর্বল চিত্তের নির্বোধ লোক তোমাদের দেখে ফেলে তবে কিন্তু সমাজে তোমাদের অবস্থান হয়ে যাবে নড়বড়ে আর পাল্লা মুহাম্মদের দিকেই ঝুঁকে যাবে।" পরদিন তারা প্রত্যেকেই অনুভব করতে থাকে তাদের পা যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাদের চুম্বকের মতো সেদিকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে যেখানে তারা কাটিয়েছে গতরাত । তারা তিনজন সেদিন আবারও মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনে মুহাম্মদ(সাঃ) এর কণ্ঠে কুরআনের সুমধুর বাণী। ভোরবেলা বাড়ি ফেরার পথে আবারও দেখা হয় তাদের, একইভাবে অভিযুক্ত করে তারা একে অন্যেকে, কিন্তু, এসব কোন কিছুই তাদের তৃতীয় রাতে সেখানে উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত রাখতে পারে না। শেষ পর্যন্ত তারা যখন বুঝতে পারে মুহাম্মদের প্রচারিত বাণীর প্রতি তাদের অপ্রতিরোধ্য দূর্বলতা তখন তারা দৃঢ়চিত্তে শপথ করে যে সেখানে তারা আর কখনই যাবে না। এ ঘটনাটির ফলে মূলতঃ মুহাম্মদ(সাঃ) এর ব্যাপারে তাদের অন্তরে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর জন্ম হয়। কিন্তু, এ ঘটনায় মূলতঃ তাদের নিজেদের দূর্বলতা নিজেদের কাছে যেভাবে উম্মোচিত হয়ে পড়ে, গোত্রীয় প্রধান হিসাবে তা মেনে নেয়া তাদের জন্য হয়ে যায় খুবই কষ্টকর। তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, এটা অন্যদেরকে মুহাম্মদের দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করবে ।

বস্তুতঃ কুরাইশদের তৈরী সবরকম প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ইসলামের আলো মক্কার সীমানা ভেদ করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের আশঙ্কাকে সত্যে পরিণত করে ইসলামের আহবান আরব উপদ্বীপের সমস্ত গোত্র গুলোর মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। এ পর্যায়ে তারা মুহাম্মদ(সাঃ) এবং তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে প্রচন্ড আক্রমনাত্মক ভূমিকা গ্রহন করে। ক্রমবর্ধমান নির্যাতন আর আক্রমন যখন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যেতে থাকে তখন রাসুল(সাঃ) তায়িফ গোত্রের কাছে নুসরাহ (সাহায্য) আর বনু ছাকিফ গোত্রের কাছে নিরাপত্তা চান এই আশায় যে তারা হয়তো ইসলাম গ্রহন করবে। তিনি নিজে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করেন, কিন্তু বিনিময়ে তারা মুহাম্মদ(সাঃ) এর সাথে করে প্রচন্ড রূঢ় আর নির্মম আচরন। তাদের লেলিয়ে দেয়া দাস আর বখাটে ছেলেরা মুহাম্মদ(সাঃ)কে নানা রকম কটুক্তি করেই ক্ষান্ত হয় না সেইসাথে

অবিরাম ভাবে পাথর নিক্ষেপ করে তাঁর পা থেকে মাথা পর্যন্ত করে ফেলে রক্তাক্ত। এদের নির্মম অত্যাচার থেকে রেহাই পেতে তিনি(সাঃ) রবি'য়াহর পুত্র শাবিব ও শায়বার খেজুর বাগানে আশ্রয় নেন এবং সেখানে বসে বিষন্ন হৃদয়ে ভাবতে থাকেন ইসলামের দাওয়াত ও তাঁর বর্তমান পরিস্থিতির কথা। He knew that he could not enter Makkah without one of the leaders' protection, neither could he go back to Ta'if after the way he had been treated there, and he could not stay in the orchard for it belonged to two disbelievers. প্রচন্ড অসহায় ভাবে তিনি মর্মাহত আর ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে আকাশের দিকে দু'হাত উচুঁ করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন। ব্যথিত হৃদয়ে প্রচন্ড দৃঢ়তার সাথে বলেন,"প্রভু আমার! আমি দূর্বল, অসহায়, সহায় সম্বলহীন, নগন্য। তাই মানুষের উপেক্ষার পাত্র। আমার সকল ব্যর্থতা কাঁধে নিয়ে আমি আজ তোমারই কাছে আবেদন করছি। পরম করুণাময় আমার! তুমিই তো দূর্বল আর অসহায়ের আশ্রয়দাতা। তুমি কি এই সব মানুষের নিষ্ঠুরতার উপরই আমাকে ছেড়ে দিচ্ছো প্রভু? যারা আমার অসহায়ত্বের সুযোগ নেয় কিংবা আমার সাথে শত্রুতা করে তুমি কি তাদের দয়ার উপরই কি আমাকে ছেড়ে দিলে? তুমি যদি আমার উপর নারাজ না হয়ে থাকো তবে আমার আর কিছুর পরোয়া নেই। তুমি যদি আমাকে দাও নিরাপত্তা তবে এটুকুই আমার জন্য যথেষ্ট। তুমি আমাকে এমন নিরাপত্তা দাও যেন সকল আধাঁর কেটে গিয়ে আমার চারিদিক হয় আলোকিত। আলোকিত হয় আমার ইহকাল আর পরকাল। তোমার ক্রোধ নয়, আমার উপর করুণা বর্ষিত করো দয়াময়। নিশ্চয়ই তুমিই সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান, নিশ্চয়ই তোমার হাতেই সর্বময় কর্তৃত্ব।" (dua translation needs recheck)

পরবর্তীতে রাসুল(সাঃ) আল-মুত'য়িম ইবন 'আদির নিরাপত্তায় মক্কায় ফিরে আসেন। এদিকে কুরাইশদের কানে তায়িফের ঘটনা পৌঁছানোর সাথে সাথে তারা তাদের অত্যাচার আর দূর্ব্যবহারের মাত্রা বৃদ্ধি করে এবং তারা মক্কাবাসীদের মুহাম্মদ(সাঃ) আহবানে সাড়া দিতে নিষেধ করে। এ নিষেধাজ্ঞার ফলে মক্কাবাসীরা তাঁর সাহচার্য পরিত্যাগ করে এবং তাঁর আহবান শোনা থেকে বিরত থাকে। এতো কিছুর পরও মুহাম্মদ(সাঃ) বিন্দুমাত্র ভেঙ্গে না পড়ে উৎসবের মাস গুলোতে আগত গোত্রের মানুষদের আল্লাহর দ্বীনের পথে আহবান করতে থাকেন, তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন এবং নিজেকে আল্লাহর প্রেরিত রাসুল হিসাবে তাদের কাছে উপস্থাপন করে তাঁর উপর ঈমান আনতে বলেন। কিন্তু তিনি(সাঃ) প্রতি পদক্ষেপেই হন তাঁর অবিশ্বাসী এবং কুটিল মানসিকতার চাচা আবু লাহাবের নজরদারীর শিকার। সে আগত গোত্রের লোকদের আহবান করে রাসুল(সাঃ)কে উপেক্ষা করতে, তাঁর কথা না শুনতে কিংবা তাঁর প্রতি মনোযোগ প্রদর্শন না করতে।

এরপর দাওয়াতী কাজ পরিচালনার জন্য মুহাম্মদ(সাঃ) ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেন। তিনি(সাঃ) বিভিন্ন গোত্রের আবাসস্থলে যান এবং তাদের কাছে নিজেকে উপস্থাপন করেন। তিনি কিন্দা, কালব, বনু হানিফাহ, এবং বনু 'আমির ইবন সা'সাহ গোত্র গুলোকে আহবান করেন সত্য দ্বীনের পথে। কিন্তু, এরা সকলেই রাসুল(সাঃ) এর আহবানে সাড়া না দিয়ে তিক্ততার সাথে তাঁর বিরোধিতা করে বিশেষ করে বনু হানিফাহ । বনু 'আমির ইবন সা'সাহ তাঁর (সাঃ) মৃত্যুর পর কাঙ্খিত কর্তৃত্বের দাবী করে। তিনি(সাঃ) বলেন,"শাসন-কর্তৃত্ব তো শুধুই আল্লাহর হাতে এবং তিনি যাকে খুশী তাকে তা দান করেন।" একথা শোনার পর বনু 'আমির কোন রকম সহযোগিতা করতে অস্বীকার করে।

এভাবে মক্কা ও তায়িফবাসী সহ সকল গোত্রের লোকেরা ইসলাম প্রত্যাখান করে। মক্কায় ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আগত অন্য সকল গোত্রের লোকেরা ক্রমশঃ এইসব ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হয় এবং খুব স্বাভাবিক ভাবেই তারা সরে যায় মুহাম্মদ(সাঃ) থেকে অনেক অনেক দূরে। সমস্ত জায়গা থেকে প্রত্যাখাত মুহাম্মদ(সাঃ) হয়ে পড়েন সম্পূর্ণ একাকী । মক্কাবাসীদের চরম প্রত্যাখান, অবিশ্বাস আর প্রচন্ড বিরোধিতার মুখে তাঁর মক্কায় দ্বীন প্রচারকে ক্রমশঃ কঠিনতর করে তুলে আর মক্কাবাসীদের ইসলাম গ্রহন করার সম্ভাবনাও ধীরে ধীরে কমে আসতে থাকে।

## ইসলামী দাওয়াতের দুটি পর্যায়ঃ

মক্কায় মুহাম্মদ(সাঃ) এর দাওয়াতী কার্যক্রমের মূলত দুটি পর্যায় রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে রাসুল(সাঃ) সাহবীদের দ্বীন শিক্ষা দেন এবং তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও আত্মিক উন্নতি ঘটান। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে দ্বীন ইসলামের প্রচার করেন এবং সেই সাথে শুরু হয় সংগ্রাম। প্রথম পর্যায়ের মূল লক্ষ্য ছিল দ্বীনের এই সম্পূর্ণ নতুন ধ্যান-ধারণা তাদের অন্তরে দৃঢ় ভাবে প্রোথিত করে সেই আলোকে তাদের চরিত্রকে গড়ে তোলা এবং তাদের সংগঠিত করা । আর পরবর্তী পর্যায়ের লক্ষ্য ছিল এই আদর্শ ভিত্তিক ধ্যান-ধারণা গুলোকে এমন এক চালিকা শক্তিতে পরিণত করা যা সমাজের প্রতিটি স্তরে এগুলোকে বাস্তবায়ন করে সমাজকে একেবারে নতুন করে ঢেলে সাজানো। আসলে বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত যে কোন আদর্শ বা ধ্যান-ধারনাই হলো প্রাণহীন কতগুলো তত্ত্ব কথার সমষ্টি, জীবনে যার কোন বাস্তব প্রভাব নেই। নির্জীব এই সব তত্ত্ব কথাগুলোতে প্রাণের সঞ্চার করতে এবং এগুলো সমাজের প্রতিটি স্তরে কার্যকরী করতে প্রথমে প্রয়োজন এই ধ্যান–ধারণা গুলোকে প্রচন্ড এক চালিকা শক্তিতে পরিণত করা। যা সমাজের মানুষ স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে গ্রহন করবে, এগুলোর গভীরতা অনুভব করবে, প্রচার করবে এবং সর্বোপরি এগুলোর বাস্তবায়নের জন্য সংগ্রাম করতে প্রস্তুত থাকবে। এরকম একটা পরিস্থিতেই কেবল সমাজে নতুন এই আদর্শকে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে ।

মুহাম্মদ(সাঃ) ঠিক এ পদ্ধতিতেই মক্কায় তাঁর দ্বীন প্রচার করেছিলেন। প্রথম পর্যায়ে তিনি মানুষকে ইসলামের দিকে আহবান করেন, ইসলামী ধ্যান-ধারণার আলোকে তাদের চরিত্রকে গড়ে তোলেন এবং তাদেরকে ইসলামের নিয়ম নীতি গুলো শিক্ষা দেন। এ পর্যায়ে তিনি মানুষকে

ইসলামী আকীদাহর(বিশ্বাস) ভিত্তিতে একত্রিত করতেন এবং গোপনে তাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিতেন। আল্লাহর রাসুল(সাঃ) বিরতিহীন ভাবে মানুষকে ইসলামের দিকে আহবান করেন এবং প্রচন্ড নিষ্ঠার সাথে ইসলামের আলোকে তাঁর অনুসারীদের চরিত্র গড়ে তোলেন। তিনি তাদেরকে আল আরকাম(রা) এর বাড়িতে একত্রিত করতেন অথবা নওমুসলিমের নিজ বাড়িতে বা উপত্যকায় কাউকে পাঠাতেন, যেখানে তারা গোপনে কয়েকজন একত্রিত হয়ে দ্বীন শিক্ষা করতেন। এভাবে তাদের মধ্যে ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক গভীর হয় এবং সর্বোপরি নতুন এই দ্বীনকে তারা এমন ভাবে অনুধাবন করে যে, দ্বীন প্রচারের জন্য জন্য তারা সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। ইসলামের আদর্শ তাদের হৃদয়ে ও অন্তরে এমন ভাবে প্রোথিত হয়ে যায় যে, তাদের রক্তের প্রতিটি অনু পরমানুর মধ্যে মিশে যায় ইসলামী চিন্তা চেতনা এবং তারা প্রত্যেকে হয়ে যায় দ্বীন ইসলামের জীবন্ত উদাহারন। তাদের প্রতিটি কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রকাশ পেতে থাকে ইসলামের সৌন্দর্য এবং তারা শত চেষ্টার পরও কুরাইশদের কাছ থেকে তাদের ইসলাম গ্রহনের সংবাদ গোপন করতে ব্যর্থ হয়।

তারা বিশ্বস্ত এবং ইসলাম গ্রহন করার মতো মন-মানষিকতা সম্পন্ন লোকদের সাথে কথা বলতে শুরু করেন। এভাবে, মক্কাবাসীরা তাদের আহবান সম্পর্কে জানতে শুরু করে এবং সমাজে তাদের অস্তিত্ব অনুভব করতে শুরু করে। এটা ছিল মূলতঃ দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায় এবং এরপর প্রয়োজন হয় ইসলামী আহবানকে সমাজের মাঝে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে দেয়ার। পরবর্তীতে যখন শুরু হয় ব্যাপক গণসংযোগ এবং ইসলামের আহবান লিপ্ত হয় সমাজের প্রচলিত ধ্যান-ধারনার সাথে প্রকাশ্য সংঘর্ষে, মূলতঃ তখন থেকেই ইসলামী দাওয়াত নওমুসলিমদের একত্রিত করে তাদের দ্বীন শিক্ষা দেবার পর্যায় অতিক্রম করে দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করে। এ পর্যায়ে মানুষ ইসলামী আদর্শ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে শুরু করে। ফলে, কিছু মানুষ ইসলামের আহবানে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহন করে আর বাকীরা তা প্রত্যাখ্যান করে এবং এর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। বস্তুত, কুফর ও বাতিলশক্তির উপর এবং ঈমান এবং ন্যায়পরায়নতা জয়লাভের পূর্বে এ ধরনের সংঘাত অনিবার্য। এছাড়া সত্যকে গ্রহন না করতে মানুষ যতই দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে, তাদের অন্তর সত্যের অর্নিবান শিখাকে পাশ কাটিয়ে যেতেও পারে না, আবার আলোকিত আদর্শ দিয়ে প্রভাবিত না হয়েও পারে না। না পারে তারা তাদের বিদ্বেষী মনোভাব দিয়ে সত্য বিকাশের পথকে চিরকালের জন্য রুখে দিতে।

এভাবেই কুফর আর ইসলামের প্রচন্ড রকম পরস্পর বিরোধী ধ্যান-ধারনার মাঝে সংঘাত ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে ইসলামী দাওয়াতের গণসংযোগ পর্যায়। এ পর্যায় শুরু হয় সেই সময় থেকে যখন আল্লাহর রাসুল(সা.) তাঁর সাহাবীদের সঙ্গে করে এমন ভাবে কাবাঘর প্রদক্ষিন করেন যা মক্কাবাসীদের কাছে ছিল একেবারেই অপ্রত্যাশিত। মূলতঃ এই সময় থেকেই রাসুল(সা.) কাফিরদের প্রচলিত জীবন-ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করে প্রকাশ্যে সমাজের মানুষকে ইসলামের দিকে আহবান করেন।

এ সময় রাসুল(সা.) এর উপর অবতীর্ণ ওহী দ্বারা আল্লাহ সুবহানুওয়াতায়ালা তাঁর একত্ববাদের ঘোষনা দেন এবং একই সাথে কোরআনের আয়াতের মাধ্যমেই কুফর জীবন-ব্যবস্থা ও মুর্তিপূজাকে বাতিল বলে ঘোষনা করেন। এছাড়া, এ সময়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন সব আয়াত নাজিল হয় যেখানে কাফিরদের অন্ধভাবে তাদের পূর্বপুরুষদের জীবনধারাকে অনুকরন করাকে তীব্র ভাবে সমালোচনা করা হয়। আয়াত নাজিল হয় সমাজের প্রতারনাপূর্ণ লেন-দেনের প্রকৃত চেহারা উন্মোচন করে, যে সকল আয়াতে সুদভিত্তিক লেন-দেন এবং ওজনে কম দেয়ার মতো ক্ষয়ে যাওয়া মূল্যবোধকে প্রচন্ড ভাবে আক্রমণ করা হয়। সমাজের মানুষকে ইসলামের দিকে আহবান করার জন্য মুহাম্মদ(সা.) তাদের একত্রিত করে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। এ লক্ষ্যে তিনি তাঁর গোত্রের লোকদের একত্রিত করতেন, তাদের খাবারের জন্য আমন্ত্রণ জানাতেন, তারপর তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন এবং তাদের সহযোগিতা চাইতেন। কিন্তু গোত্রের লোকেরা তাকে প্রত্যাখ্যান করত। তিনি(সা.) সাফা পাহাড়ের পাদদেশে মক্কাবাসীদের একত্রিত করে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করেছিলেন, কিন্তু তাঁর এ আহবান শুধুইমাত্র কুরাইশ নেতাবৃন্দের বিশেষ করে আবু লাহাবের ক্রোধের কারণ হয়েছিলো। ফলে, আল্লাহর রাসুলের সাথে কুরাইশ সম্প্রদায় ও অন্যান্য আরবের মধ্যকার সম্পর্কের তীক্ষতা আরও গভীর হয়েছিলো। এভাবে সাহাবীদের দার-উল-আরকাম এবং উপত্যকায় গোপনে বিশেষ ভাবে শিক্ষা দেবার সাথে সাথে গণসংযোগের পর্যায়ও দাওয়াতী কার্যক্রমের অর্ন্তভূক্ত হলো।

এভাবে, ইসলামের আহবান শুধুমাত্র যোগ্য এবং সম্ভাবনাময় ব্যক্তিদের পরিবর্তে সাধারন ভাবে সমাজের সমস্ত মানুষের কাছে পৌঁছে গেল। বস্তুতঃ ইসলামের আহবানের শক্তিতে শঙ্কিত হয়ে কুরাইশরা যখন রাসুল(সা.) ও তাঁর সাহাবীদের দিকে পুঞ্জিভূত ক্ষোভ আর ঘৃণার বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলো, তখনই ইসলামের প্রকাশ্য এ আহবান এবং ইসলামী চেতনাদৃপ্ত ব্যক্তি তৈরীর প্রভাব সমাজে প্রকাশিত হতে লাগলো। ইসলামী আদর্শ বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে যত বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠলো, তা ততবেশী কাফিরদের ক্রোধ আর ঘৃণার কারণ হয়ে উঠলো। কাফিররা যখন অনুভব করলো তারা কোনভাবেই মুহাম্মদ(সা.) এবং তাঁর প্রচারিত আদর্শকে পাশ কাটাতে পারবে না, তখন তারা ইসলামের আহবান চিরতরে বন্ধ করে দেবার লক্ষ্যে উঠে পড়ে লাগলো। আর সেইসাথে মুহাম্মদ(সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের প্রতি কাফিরদের অত্যাচার নির্যাতনের মাত্রা চুড়ান্ত আকার ধারণ করলো।

বস্তুতঃ মুসলিমদের প্রকাশ্য জনসম্মুখে আহবান সমাজকে ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত করেছিলো। যা দাওয়াতী কার্যক্রমকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সমাজে তৈরী করেছিলো প্রয়োজনীয় জনমত এবং এর সাহায্যেই পরবর্তীতে দাওয়াতের এই কার্যক্রম সমস্ত মক্কাব্যাপী দ্রুত ছড়িয়ে

পড়েছিলো। এভাবে যতই দিন যেতে লাগলো মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলো। ইসলামের ছায়াতলে যেভাবে আসতে লাগলো বঞ্চিত, নির্যাতিত আর নিপীড়িত জনগোষ্ঠি, একই ভাবে সমাজের সম্মানিত ও নেতৃস্থানীয় মানুষ সহ ধনী ব্যবসায়ী শ্রেনীর মানুষও আলোকিত হলো সত্যের আলোয়। বস্তুতঃ তাদের ধনসম্পদ বা ব্যবসা-বাণিজ্য তাদেরকে রাসুল(সা.) এর সত্য আহবানে সাড়া দেবার কর্তব্য থেকে বিরত রাখতে পারেনি। বস্তুতঃ যারা ইসলাম গ্রহন করেছিলো তারা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলো পবিত্রতা, প্রজ্ঞা ও সত্যের সৌন্দর্যকে। যা তাদের মুক্ত করেছিলো মানবচরিত্রের অন্ধ গোয়ার্তুমি এবং মিথ্যা অহমিকার কলুষতা থেকে। ইসলাম গ্রহন করার মূহুর্তেই তারা বুঝতে পেরেছিলো এ আহবানের ন্যায়সঙ্গত ভিত্তি ও আহবানকারীর সত্যনিষ্ঠতা। এভাবে মক্কার প্রতিটি প্রান্তে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে গেল এবং মক্কার নারী-পুরুষ ইসলাম গ্রহন করতে লাগলো। যদিও মক্কাবাসীদের প্রকাশ্যে এবং সমষ্টিগত ভাবে আহবান করার ফলে মুসলিমদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতনের মাত্রা তীব্র হয়েছিলো, তবুও মূলতঃ এ প্রকাশ্য আহবানই ইসলামের আহবানকে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভে সহায়তা করেছিলো। ইসলামী দাওয়াতের সাফল্য নেতৃস্থানীয় কুরাইশদের শুধু ক্রোধের কারনই হয়নি, বরং এ সাফল্য তাদের অন্তরে তীব্র প্রতিহিংসার আগুন প্রজ্জ্বলিত করেছিলো। কারণ, আল্লাহর রাসুল(সা.) মক্কার সমাজে শক্তিশালী ভাবে প্রতিষ্ঠিত জুলুম-নির্যাতন ও শোষন-বঞ্চনার মতো অসুস্থ, অনৈতিক ও বিকৃত ধ্যান-ধারনাগুলোকে প্রচন্ড ভাবে আঘাত করেছিলেন এবং এর বিরুদ্ধে অনমনীয় ভাবে আদর্শিক সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন।

প্রকাশ্য ভাবে আহবানের এই পর্যায়টি ছিলো মূলতঃ একটি চুড়ান্ত ভাবে পার্থক্যকারী পর্যায়। এর একদিকে ছিলেন আল্লাহর রাসুল(সা.) ও তাঁর সাহাবীবৃন্দ এবং অপরদিকে ছিলো কাফির নেতৃবৃন্দ ও কুরাইশ সম্প্রদায়। যদিও এর মধ্যবর্তী সময় অর্থাৎ, ইসলামী ব্যক্তিত্ব গঠন এবং প্রকাশ্যে গণসংযোগের মধ্যকার সময়টিকেও বিবেচনা করা হয় খুবই নাজুক এবং স্পর্শকাতর হিসাবে, কারণ এই সময় ইসলামের দাওয়াতকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য প্রয়োজন ছিলো প্রচন্ড পরিমাণ প্রজ্ঞা, অর্ন্তদৃষ্টি, ধৈয্য এবং সর্বোপরি সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার নিপুন ক্ষমতার। কিন্তু, তারপরও প্রকাশ্য গণসংযোগ পর্যায়কেই সবচাইতে কঠিন সময় বলে বিবেচনা করা হয়। কারণ, এ জন্য মুসলিমদের সত্যকে নির্ভয়ে প্রচার করা এবং বাতিল শক্তি ও শাসন-ব্যবস্থাকে সরাসরি অস্বীকার করার মতো প্রচন্ড পরিমাণ সাহস ও পরিণতিতে যে কোন ধরনের পরিণাম মেনে নেবার জন্য মানসিক দৃঢ়তার প্রয়োজন ছিলো। এটা এ কারনেই যে, মুসলিমদের জন্য দ্বীন এবং ঈমানের পরীক্ষা ছিলো অবধারিত।

আল্লাহর রাসুল(সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা পর্বতসম অত্যাচার, নিপীড়ন, নির্যাতন ও আক্রমন সহ্য করে ঈমানের এ পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে উর্ত্তীর্ণ হন।

প্রচন্ড আক্রমনাত্মক ও নিপীড়নমূলক এ অত্যাচারের সম্মুখীন হয়ে মুসলিমদের একটি দল মক্কা ত্যাগ করে আবিসিনিয়ায় চলে যায়, কেউ কেউ নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে শাহাদাত বরণ করে আর কিছু সংখ্যক মুসলিম নির্যাতন সহ্য করে মক্কায়ই থেকে যায়। মুসলিমরা ততক্ষন পর্যন্ত একাগ্রচিত্তে দৃঢ়তা এবং একানিষ্ঠতার সাথে বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে তাদের আন্দোলন ও সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে যতক্ষন পর্যন্ত না ইসলামের আলোকিত আহবান কুফর ধ্যান-ধারনার নিকষ কালো অন্ধকারে ডুবে থাকা মক্কার সমাজকে প্রচন্ড ভাবে আঘাত করে। যদিও মুহাম্মদ(সা.) এর দাওয়াতী কার্যক্রমের প্রথম তিনবছর মূলতঃ আল-আরকাম(রা.) এর গৃহেই সীমাবদ্ধ ছিলো এবং এ সময়টাই ছিলো দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়, কিন্তু তারপরও পরবর্তী আটবছর আল্লাহর রাসুল(সা.)কে করতে হয়েছিলো কঠিন সংগ্রাম। বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে নবুওতের সুস্পষ্ট প্রমাণ দেবার পরও পরবর্তী বছরগুলোতে তাকে লিপ্ত হতে হয়েছিলো বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে ভয়াবহ সংগ্রামে । বস্তুতঃ এ সময়টা স্মরণীয় হয়ে আছে এজন্য যে, এ দীর্ঘ আটবছরে কুরাইশরা মুসলিমদের একমুহুর্তের জন্য অত্যাচার ও নির্যাতন করা থেকে বিরত হয়নি, না তারা দেখিয়েছিলো মুসলিম ও ইসলামের প্রতি কোনরকমের কোন সহানুভূতি। মুসলিম ও কুরাইশদের মধ্যকার এই সাংঘর্ষিক এবং বিপরীতমুখী অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতেই ইসলামের আহবান সমস্ত আরব উপদ্বীপ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং সমস্ত মানুষের কাছে ইসলাম একটি আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়। এছাড়া, হজ্জ্ব করতে আগত আরবদের মাধ্যমেও এ আহবান আরব গোত্রগুলোর মাঝে বিস্তৃতি লাভ করে। কিন্তু, এ আরব গোত্রগুলো কুরাইশদের সাথে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবার আশঙ্কায় ঈমান আনার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহ না দেখিয়ে মূলতঃ দর্শকের ভূমিকা পালন করে এবং মুহাম্মদ(সা.) এবং তাঁর প্রচারিত আদর্শকে সম্পূর্ন ভাবে পাশ কাটিয়ে যায়। বস্তুতঃ মুহাম্মদ(সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের এই ভয়ঙ্কর অবস্থাই দাওয়াতের তৃতীয় পর্যায় অর্থাৎ যে পর্যায় ইসলামকে সম্পূর্ন ভাবে প্রয়োগ করবে তার অপরিহার্যতাকে প্রমাণ করে।

মক্কাবাসীর ইসলামী দাওয়াতের প্রতি এরূপ বিদ্বেষ ও সহিংসতা ধীরে ধীরে মক্কায় ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার সমস্ত সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেয়। উপরন্তু, মুসলিমদের উপর কাফিরদের ক্রমবর্ধমান অত্যাচার ও নির্যাতন দাওয়াতী কার্যক্রমের পথে বিরাট বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। এ অবস্থা আরও জটিল আকার ধারন করে যখন মক্কাবাসী সম্পূর্ণ ভাবে ইসলামকে প্রত্যাখান করে।

## দাওয়াতী কার্যক্রমের সম্প্রসারনঃ

মুহাম্মদ(সা.) বনু সাকিফ এবং তায়েফ গোত্র কর্তৃক নির্মম আঘাতে ক্ষতবিক্ষত এবং হজ্জের মৌসুমে কিন্দা, কালব, বনু 'আ-মির ও বনু হানিফা কর্তৃক সম্পূর্ণ ভাবে প্রত্যাখ্যাত হবার পর থেকেই মূলতঃ আল্লাহর রাসুল(সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের প্রতি কুরাইশদের সহিংসতা চুড়ান্ত আকার

ধারন করে। এ অবস্থা কুরাইশদের মুহাম্মদ(সা.) এবং তাঁর দলকে সমাজ ও বর্হিজগৎ থেকে আরো বিচ্ছিন্ন করার সুযোগ তৈরী করে দেয়। কিন্তু, এ সমস্ত ঘটনা আল্লাহর রাসুল(সা.) ও তাঁর সাহাবীদের দৃঢ় ঈমানে না কোন ফাটল ধরাতে পারে, না তারা আল্লাহর প্রতিশ্রুত বিজয়ের ব্যাপারে কখনো সন্দেহ প্রকাশ করেন । বরং, তারা শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত সত্য পথের উপর অবিচল ভাবে দন্ডায়মান থাকে।

এভাবে, মুহাম্মদ(সা.) তাঁর দাওয়াতী কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকেন এবং পরিণাম নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তিত না হয়ে যখনই সম্ভব বিভিন্ন গোত্রের কাছে নিজেকে উপস্থাপন করতে থাকেন। কুরাইশ সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে কেউ কেউ চেষ্টা করেছে তাঁর আনিত দ্বীনের ভবিষ্যত নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ও ঠাট্টা তামাশা করতে, কিন্তু তিনি এসব কটুক্তি বা হীন মন্তব্যে কখনো কান দেননি বা ইসলামের বিজয়ের ব্যাপারে এতোটুকু সন্দেহ প্রকাশ করেননি। তিনি জানতেন আল্লাহতায়ালা তাকে তাঁর রাসুল হিসাবে পাঠিয়েছেন। তাই, তাঁকে(সা.) সবরকম ক্ষতি থেকে রক্ষা করা এবং তাঁর মনোনীত দ্বীনকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা করা তাঁরই দায়িত্ব। তাই তিনি দাওয়াতী কার্যক্রমের ভয়ঙ্কর সঙ্কটপূর্ণ অবস্থাতেও অবিচল থেকেছেন এবং সন্তুষ্ট চিত্তে আল্লাহর সাহায্যের অপেক্ষা করেছেন।

সৌভাগ্যবশত ইসলামের বিজয়ের জন্য মুহাম্মদ(সা.)কে খুব বেশীদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। হজ্জের মৌসুমে ইয়াসরিব (মদীনা) থেকে আগত আল-খাযরাজ গোত্রের একদল মানুষ যখন আল্লাহর রাসুল(সা.) এর আহবানে ইসলাম গ্রহন করলো তখনই তাঁর আনিত দ্বীনের বিজয়ের লক্ষন গুলো সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হতে থাকলো।

আল্লাহর রাসুলের আহবান শোনার পর তারা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে বলে,"আল্লাহর কসম, এই হচ্ছে সেই নবী যার কথা আমরা ইহুদীদের কাছে শুনেছি এবং আমরা তাঁকে(আল্লাহর রাসুলকে) কোন অবস্থাতেই আমাদের পূর্বে তাদের স্বীকৃতি দেবার সুযোগ দেবো না।" এরপর তারা রাসুল(সা.) এর আহবানে সাড়া দেয় এবং ইসলাম গ্রহন করে। They said to him, "we have left our people (Aws & Khazraj), for no tribes are so divided by hatred and rancour as they. Perhaps Allah will unite them through you, if so, then no man will be mightier than you."

ইয়াসরিবে ফিরে যাবার পর তারা নিজ গোত্রের লোকদের মুহাম্মদ(সা.) এর কথা জানায় এবং ইসলাম এর দিকে আহবান করে। তারা সেখানকার মানুষের হৃদয় ও অন্তরকে সত্য দ্বীন গ্রহন করার জন্য প্রস্তুত করতে সক্ষম হয় এবং আউস ও খাযরাজ গোত্রের প্রতিটি ঘরে ঘরে মুহাম্মদ(সা.) আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়।

## আকাবার প্রথম শপথঃ

পরের বছর মদীনা থেকে বারো জনের একটি দল হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করে এবং আকাবার উপত্যকায় মুহাম্মদ(সা.) এর সাথে সাক্ষাৎ করে। এখানেই তারা মুহাম্মদ(সা.) এর সাথে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়, যা আকাবার প্রথম শপথ নামে পরিচিত । তারা আল্লাহর রাসুল(সা.)কে এ মর্মে অঙ্গীকার দেয় যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন (zinah) করবে না, তাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, প্রতিবেশীর সাথে দূর্ব্যবহার করবে না এবং সর্বাবস্থায় মুহাম্মদ(সা.) এর নের্তৃত্ব মেনে নেবে। যদি তারা তাদের শপথ রক্ষা করে তবে পুরস্কার স্বরূপ রয়েছে জান্নাত। কিন্তু, যদি তারা ওয়াদা ভঙ্গ করে তবে আল্লাহ চাইলে তাদের শাস্তি দেবেন অথবা ক্ষমা করবেন। রাসুল(সা.) এর সাথে এ চুক্তিতে আবদ্ধ হবার পর তারা হজ্জের মৌসুম শেষে মদীনায় ফিরে যায়।

## মদীনায় দাওয়াতী কার্যক্রমঃ

আনসারদের যে দলটি রাসুল(সা.) এর সাথে আকাবায় চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলো, তারা মদীনায় ফিরে যাবার পর সেখানকার প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে যায় ইসলামের আহবান। পরবর্তীতে তারা আল্লাহর রাসুল(সা.) এর কাছে দ্বীন ও কুরআন শিক্ষার জন্য মদীনায় একজনকে পাঠানোর অনুরোধ জানিয়ে চিঠি প্রেরণ করে। রাসুল(সা.) সাধারনত যারা ইসলাম গ্রহন করতো তাদেরকে পরিপূর্ণ ভাবে ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত করতেন এবং তাদেরকে ব্যক্তিত্বেকে ইসলামের আলোকে গঠন করতেন, যেন তারা পুরোপুরি ভাবেই ইসলামের আদর্শকে উপলব্ধি করতে পারে। বস্তুতঃ ইসলামের আলোকে চরিত্র গঠন করা প্রতিটি মুসলিমের অন্যতম দায়িত্ব, কারণ এর উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠে চেতনাদৃপ্ত দৃঢ় ঈমান ও মানুষ বুঝতে পারে ইসলামের অর্ন্তনিহিত আদর্শ এবং ইসলামের আদর্শকে পরিপূর্ণ ভাবে বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা প্রদান করে। মদীনার যে দলটি ইসলাম গ্রহন করেছিলো তারা এটা বুঝতে পেরেছিলো বলেই রাসুল(সা.)কে দ্বীন শিক্ষার জন্য একজন সাহায্যকারী পাঠানোর দাবী করেছিলো। চিঠি পাবার পর, মুহাম্মদ(সা.) মদীনায় মুসা'ব ইবন উমায়েরকে নও মুসলিমদের দ্বীন শিক্ষার জন্য পাঠান।

মদীনায় আগমনের পর মুসা'ব ইবন উমায়ের আসা'দ ইবন জুরারাহর সাথে জুটিবদ্ধ হয়ে পূর্ণ উদ্যমে দাওয়াতী কার্যক্রম শুরু করেন। তারা ইসলামের আহবান পৌঁছে দেন মদীনার বিভিন্ন গৃহ থেকে শুরু করে বেদুঈনদের ছাউনীগুলোতে পর্যন্ত। মদীনাবাসীকে কুরআন পাঠ করে শোনান। এভাবে ধীরে ধীরে একজন দু'জন মানুষ ইসলাম গ্রহন করতে শুরু করে। এ অবস্থা চলতে থাকে ততক্ষন পর্যন্ত যতক্ষন পর্যন্ত না আউস-আল্লাহ জাতিভুক্ত খাতমাহ্, ওয়া'লী এবং ওয়াকিফ গোত্র ছাড়া আনসারদের প্রতিটি গৃহে ইসলামের আহবান ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর তিনি রাসুল(সা.) এর কাছে নও মুসলিমদের একত্রিত করার অনুমতি চেয়ে পত্র লিখেন। রাসুল(সা.) তাকে অনুমতি প্রদান করেন এবং বলেন,"ইহুদীরা সাববাথের ঘোষনা দেয়া পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা করবে। তারপর, বিকেলবেলায় আল্লাহর উদ্দেশ্যে সম্মিলিত ভাবে দু'রাকাত নামাজ আদায় করবে এবং নামাজ শেষে তোমার বক্তব্য(খুতবা) প্রদান করবে।" রাসুল(সা.) এর আদেশক্রমে, মুসা'ব ইবন উমায়ের নও মুসলিমদের সা'দ ইবন খায়সামার গৃহে একত্রিত করেন। প্রায় বারোজন মদীনাবাসী এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি একটি ছাগল জবাই করে তাদের আপ্যায়ন করেন। ইতিহাস অনুযায়ী মুসা'ব ইবন উমায়েরই হচ্ছে প্রথম মুসলিম যিনি জুমার নামাজ প্রতিষ্ঠিত করেন।

মুসা'ব ইবন উমায়ের এভাবে মদীনায় তার দাওয়াতী কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন এবং মদীনাবাসীকে দ্বীন শিক্ষা দিতে থাকেন। একদিন আসা'দ ইবন জুরারাহ মুসা'ব ইবন উমায়েরকে সঙ্গে করে বনু আল-আসহাল এবং বনু জা'ফর এর এলাকায় প্রবেশ করে (ঘটনাক্রমে সা'দ ইবন মুয়াজ ছিলো আসা'দ ইবন জুরারার মায়ের সম্পর্কের ভাই)। তারা দু'জন এবং মদীনার আরও কিছু নও মুসলিম বনু জা'ফর গোত্রের এলাকাভুক্ত মারক্ব নামের একটি কুপের পাশে একত্রিত হয়। এ সময়ে সা'দ ইবন মুয়াজ এবং উসাইদ ইবন হুদায়ের ছিলো তাদের নিজ নিজ গোত্রের প্রধান। বনু 'আবদ আল-আসহাল এবং অন্যান্য গোত্রগুলোও তাদের অনুসরনকারী মুর্তিপূজারী ছিলো। যখন সা'দ ইবন মুয়াজ শুনলো যে, মুসা'ব ইবন উমায়ের তাদের এলাকায় প্রবেশ করেছে, তখন সাথে সাথে সে উসাইদ ইবন হুদায়েরকে সেখানে পাঠিয়ে দিয়ে বললো,"যারা আমাদের এলাকায় প্রবেশ করে আমাদের গোত্রের লোকদের বোকা বানাচ্ছে তাদের কাছে যাও। তাদের আমাদের সীমানা থেকে বের করে দিয়ে বলো যেন তারা আর কখনো আমাদের এলাকায় প্রবেশ না করে।"

সা'দ ইবন মুয়াজ আরও বলে যে, আসা'দ ইবন জুরারার সাথে যদি আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক না থাকতো তবে আমি তোমাকে এ ঝামেলার মধ্যে ঠেলে দিতাম না। কিন্তু, সে আমার সম্পর্কে খালাতো ভাই, তাই আমার পক্ষে তার বিরুদ্ধে কোনকিছু করা সম্ভব নয়। একথা বলার পর, উসাইদ তার বর্শা তুলে নিলেন এবং মুসা'ব ইবন উমায়ের এর দলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। আসা'দ উসাইদকে দেখার সাথে সাথে মুসা'বকে বললেন,"এই যে লোকটি তোমার দিকে আসছে সে হলো এ গোত্রের প্রধান। তুমি তাকে আল্লাহ ওয়াস্তে সত্য কথা পরিস্কার ভাবে জানিয়ে দাও।" মুসা'ব বললো,"যদি সে আমাদের সাথে বসতে রাজী হয়, তবে আমি তার সাথে কথা বলবো।" উসাইদ ক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে তাদের সামনে এসে দাঁড়ালো এবং বললো,"কেন তোমরা আমাদের মধ্যকার দূর্বল লোকদের বিভ্রান্ত করছো? তোমাদের উদ্দেশ্য কি? আমাদেরকে আমাদের বিশ্বাসের উপর ছেড়ে দাও।" মুসা'ব বললেন,"আপনি কি আমাদের সাথে বসে একটু আমাদের কথা শুনবেন? যদি আমাদের কথা আপনার ভালো লাগে তাহলে গ্রহন করবেন। আর যদি না ভালো লাগে তাহলে প্রত্যাখান করবেন।" উসাইদ মুসা'ব ইবনে উমায়ের এর এ যৌক্তিক প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন। তারপর তার বর্শা মাটিতে গেঁথে মুসা'বের সামনে বসলেন। মুসা'ব(রা) তাকে ইসলামের আদর্শ ও জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করলেন এবং কুরআন তিলওয়াত করে শোনালেন। উপস্থিত মুসলিমদের বর্ণনা অনুযায়ী,"আল্লাহর কসম, সে কিছু বলবার আগেই আমরা ইসলামের দীপ্তি তার চোখেমুখে লক্ষ্য করছিলাম।" উসাইদ বললো,"কি চমৎকার কথাই না তোমরা বলছো! তো তোমাদের দ্বীন গ্রহন করতে হলে আমাকে কি করতে হবে?" তারা বললো,"তোমাকে অবশ্যই প্রথমে গোসলের করে পবিত্র হতে হবে, তোমার পোশাক পবিত্র করতে হবে, তারপর সত্যকে সাক্ষী দিয়ে শাহাদাহ পাঠ করার পর দু'রাকাত নামাজ আদায় করতে হবে।" উসাইদ সাথে সাথে তাই করলেন এবং বললেন,"আমার পেছনে আমি এক ব্যক্তিকে রেখে এসেছি, সে যদি তোমাদের দ্বীন গ্রহন করে তবে তার গোত্রের লোকেরাও তাকে অনুসরন করবে। আমি এখনই তাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তার নাম হচ্ছে সা'দ ইবন মুয়াজ।"

উসাইদ তার বর্শা হাতে দ্রুত পায়ে সা'দ ইবন মুয়াজের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন। সা'দ তখন তার গোত্রের লোকদের সাথে বসে আলোচনা করছিলো। যখন সা'দ উসাইদকে আসতে দেখলেন সে বললো,"আল্লাহর কসম, যে উসাইদ এখান থেকে গিয়েছে আর যে ফিরে এসেছে তারা দু'জন এক নয়।" অতঃপর উসাইদ আসার পর তার কাছে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন, বললেন,"আমি দু'ব্যক্তির সাথে কথা বলেছি এবং তাদের মধ্যে কোনরকম খারাপ কোনকিছু দেখতে পাইনি। আমি তাদের কাজে আর অগ্রসর হতে নিষেধ করার পর তারা বলেছে, তুমি যেটা বলবে আমরা সেটাই করবো; তারপর তারা বললো, আসা'দ ইবনে জুরারাহ তোমার খালাতো ভাই হয় এটা জানার পরও বনু হারিছাহ গোত্র তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিলো যেন তুমি সমাজের কাছে আত্মীয়ের মর্যাদা ও নিরাপত্তা রক্ষায় ব্যর্থ এবং বিশ্বাসঘাতক হিসাবে প্রমাণিত হও।

বনু হারিছাহ গোত্র সম্পর্কে একথা শোনার সাথে সাথে সা'দ ইবন মুয়াজ ক্রোধান্বিত হয়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর তার বর্শা হাতে নিয়ে বললো,"আল্লাহর কসম, আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি আসলে তোমার কাজে ব্যর্থ হয়েছো।" তারপর সে মুসা'ব এবং আসা'দ এর উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেলো। সেখানে গিয়ে সা'দ দেখলো তারা খুব আয়েশের সাথে দলবল নিয়ে সেখানে বসে আছে। সা'দ ইবন মুয়াজ বুঝলো আসলে উসাইদের ইচ্ছা ছিলো সে যেন তাদের কথা শোনে। অত্যন্ত রাগান্বিত আর আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে সে তাদের পাশে গিয়ে দাড়াঁলো এবং আসা'দকে উদ্দেশ্য করে বললো,"শোন আবু উমামা, আমাদের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে সে সম্পর্কের ভিত্তিতেই কি তোমার আমার প্রতি আচরন

করা উচিত নয়? তুমি কি আমার বাসভূমিতে এসে এমন কিছু করতে চাও যা আমরা ঘৃণা করি?" ইতিমধ্যে সা'দকে দেখার সাথে সাথে আসা'দ মুসা'বকে বলেছিলো, "হে মুসা'ব, আল্লাহর কসম, এই গোত্রগুলো যাকে অনুসরন করে সে নিজেই এখন তোমার সামনে উপস্থিত। সে যদি তোমার অনুসরনকারী হয়, তবে তার গোত্রের কোন লোকই আর পিছে পরে থাকবে না।" মুসা'ব তাকে আগের মতোই বললেন,"আপনি কি বসে একটু আমাদের কথা শুনবেন না? যদি আপনার আমাদের কথা ভালো লাগে তাহলে গ্রহন করবেন আর না ভালো লাগলে প্রত্যাখান করবেন।" মুসা'ব ইবন উমায়ের এর এ যৌক্তিক প্রস্তাবে সা'দ রাজী হয়ে গেলো এবং তার বর্শা মাটিতে গেঁথে তাদের সামনে বসলো। মুসা'ব তাকে ইসলামের আদর্শ ব্যাখ্যা করলেন এবং কুরআন তিলওয়াত করে শোনালেন।

উপস্থিত মুসলিমদের বর্ণনা অনুযায়ী,"আল্লাহর কসম, সে কিছু বলবার আগেই আমরা ইসলামের দীপ্তি তার চোখে মুখে দেখতে পাচ্ছিলাম।" উসাইদের মতো একই ভাবে সা'দ বললো,"কি চমৎকার কথাই না তোমরা বলছো! তো তোমাদের দ্বীনে প্রবেশ করতে হলে আমাকে কি করতে হবে?" মুসলিমরা বললো এজন্য তোমার নিজেকে এবং তোমার পোশাক-পরিচ্ছদকে পবিত্র করতে হবে। তারপর সত্যের সাক্ষ্য হিসাবে শাহাদাহ পাঠ করে আল্লাহর উদ্দেশ্যে নামাজ আদায় করতে হবে। একথা শোনার পর সা'দ ইবন মুয়াজ তৎক্ষনাৎ তাই করলো এবং বর্শা হাতে তার গোত্রের লোকদের কাছে ফিরে গেলো। সেখানে উসাইদ ইবন হুদায়ের তার গোত্রের লোকদের সাথে আলোচনা করছিলেন। তারা সা'দকে আসতে দেখে বললো,"আল্লাহর কসম, যে সা'দ আমাদের এখান থেকে গিয়েছে আর যে ফিরে এসেছে তারা দু'জন এক নয়।" গোত্রের লোকেরা তার পথ রোধ করে দাড়াঁলে সা'দ ইবন মুয়াজ তাদের জিজ্ঞেস করলো,"হে বনু আবদ আল-আসহাল, তোমরা তোমাদের উপর আমার কর্তৃত্বকে কিভাবে পরিমাপ করো?" তারা বললো,"আপনি আমাদের গোত্র প্রধান, আমাদের সুবিধা-অসুবিধার ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা বেশী সজাগ, সবচাইতে ন্যায়বিচারক এবং নেতা হিসাবে সবচেয়ে বেশী সৌভাগ্যবান।" একথা শোনার পর সা'দ বললো,"আমি ততক্ষন পর্যন্ত তোমাদের সাথে কথা বলবো না যতক্ষন পর্যন্ত না তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উপর ঈমান আনো।" এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আবদ আল-আসহাল গোত্রের সকলে ঈমান আনলো। মুসা'ব ইবন উমায়ের তারপর আসা'দ ইবন জুরারাহর গৃহে ফিরে আসলেন এবং তার গৃহেই অতিথি হিসাবে বাস করতে লাগলেন। এর সাথে তিনি তার দাওয়াতী কার্যক্রমও অব্যহত রাখলেন যে পর্যন্ত না আনসারদের প্রতিটি গৃহে অন্তত একজন মুসলিম নারী ও পুরুষ ইসলাম গ্রহন করলো। এভাবে মুসা'ব ইবন উমায়ের একবছর মদীনাতে অবস্থান করলেন, আউস ও খাযরাজ গোত্রকে দ্বীন শিক্ষা দিলেন এবং বুক ভরা আনন্দ নিয়ে প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন আল্লাহর শাসন-কর্তৃত্ব ও সত্য দ্বীনের সাহায্যকারীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা।

মুসা'ব(রা.) সাধারনত মদীনার প্রতিটি গৃহে যেতেন, তাদের সাথে কথা বলতেন এবং তাদের কাছে আল্লাহর রাসুল(সা.) এর আহবান পৌঁছে দিতেন। তিনি মদীনার ক্ষেত-ক্ষামারে গিয়ে কৃষকদের সাথে কথা বলতেন এবং তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করতেন। তিনি মদীনার নেতৃস্থানীয় মানুষদের সাথেও বিতর্ক করতেন এবং তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিতেন। দাওয়াতের বিস্তৃতির ব্যাপারে তিনি প্রায়ই কিছু কৌশল অবলম্বন করতেন, যেমনটি তিনি করেছিলেন আসা'দ ইবন জুরারাহর ক্ষেত্রে, যেন সত্য দ্বীনের আহবান সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। এ রকম বিভিন্ন কৌশলপূর্ন দাওয়াতী কার্যক্রমের মাধ্যমে তিনি একবছরের মধ্যে সে সমাজের মানুষের মুর্তিপূজার মতো বিকৃত ও ক্ষয়ে যাওয়া ধ্যান-ধারনা ও ভ্রান্ত আবেগ-অনুভূতিগুলোকে পরিবর্তন করে তাদের মধ্যে তাওহীদ, ঈমান ও ইসলামী চিন্তা-চেতনার বীজ বপন করেছিলেন। যা তাদের অন্তর থেকে শিরক এর সকল শাখা-প্রশাখাকে সমূলে উৎপাটিত করেছিলো এবং তাদের প্রতারনা, ঠকবাজি সহ সকল পাপের পথ থেকে বিরত রেখেছিলো। মুসা'ব ইবন উমায়ের এবং ইসলাম গ্রহনকারী মুসলিমদের নিরলস প্রচেষ্টা ও বিভিন্ন কার্যক্রম মাত্র একবছরের মধ্যে মদীনাবাসীকে শিরকের নিকষ কালো অন্ধকারে নিমজ্জিত জনগোষ্ঠি থেকে পরিণত করে ইসলাম গ্রহনকারী জনগোষ্ঠিতে।

## আকাবার দ্বিতীয় শপথঃ

আকাবার প্রথম শপথ ছিলো মুসলিমদের জন্য আল্লাহর বিশেষ রহমত ও সাহায্য। কারণ, যদিও এ শপথের সময় মাত্র অল্পকিছু মদীনাবাসী ইসলাম গ্রহন করেছিলো, তারপরও মুসা'ব(রা.) এর একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার ফলে মাত্র একবছরের মধ্যে মদীনাবাসীর মধ্যে প্রচলিত ভ্রান্ত ও ঘুঁণেধরা ধ্যান-ধারনা ও আবেগ-অনুভূতিগুলো পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিলো। যা কিনা মক্কায় এর থেকে অনেক বেশী সংখ্যক মানুষ ইসলাম গ্রহন করার পরও সম্ভব হয়নি। মক্কার জনগোষ্ঠির একটা বিরাট অংশ নিজেদের ইসলামের আহবান থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলো এবং ইসলামকে সম্পূর্ন ভাবে প্রত্যাখান করেছিলো, ফলে, সে সমাজকে ইসলামের প্রচারিত আদর্শের সৌন্দর্য তেমন ভাবে নাড়া দিতে পারেনি। অপরদিকে, মদীনার বেশীর ভাগ মানুষই ইসলাম গ্রহন করেছিলো এবং ইসলামী চিন্তা-চেতনা ও আদর্শ সামগ্রিক ভাবে মদীনাবাসীদের হৃদয়কে প্রচন্ড ভাবে নাড়া দিয়েছিলো, যা পরিবর্তন করেছিলো তাদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে লালিত ক্ষয়ে যাওয়া ধ্যান-ধারনা ও চিন্তাকে। এ ঘটনা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণ করে যে, যখন ব্যক্তিগত ভাবে কিছু সংখ্যক মানুষ ইসলাম গ্রহন করে এবং তারা সমাজ ও গণমানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে, তাদের বিশ্বাস বা ঈমান যত দৃঢ়ই হোক না কেন তা সামগ্রিক ভাবে সমাজকে প্রভাবিত করতে পারে না, আর না ইসলামী চিন্তা-চেতনা সমাজের মানুষের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। এ ঘটনা আরও প্রমাণ করে যে, দাওয়াতী কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ ভাবে অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা যত কমই হোক না কেন, মানুষে মানুষে বিদ্যমান সম্পর্কগুলোকে যদি সঠিক চিন্তা-চেতনা ও আবেগ-অনুভূতির মাধ্যমে প্রচন্ড ভাবে প্রভাবিত করা সম্ভব হয়, তবে এটাই সমাজকে প্রত্যাশিত পরিবর্তনের দিকে ধাবিত করে। এ ঘটনাগুলো থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, যখন কোন সমাজ কুফর ধ্যান-ধারনা ও আদর্শকে শক্ত

ভাবে আকঁড়ে থাকে (যেমন ছিলো মক্কার সমাজ), এ ধরনের সমাজে দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত এ সব চিন্তা-চেতনাকে পরিবর্তন করে সামগ্রিক ভাবে সমাজ পরিবর্তন করা খুবই কঠিন। আবার অপরদিকে, যে সমাজে এ কুফর চিন্তা-চেতনার শেকড়গুলো অপেক্ষাকৃত দূর্বল (যেমনটা ছিলো মদীনার সমাজ), সে সমাজে সামগ্রিক ভাবে সমাজের মানুষের ধ্যান-ধারনার পরিবর্তন ঘটানো সহজ যদিও সে সমাজে কুফর বা ভ্রান্ত ধ্যান-ধারনাগুলো উপস্থিত থাকে।

মূলতঃ এ কারনেই ইসলামের আহবান মক্কাবাসীর তুলনায় মদীনাবাসীকে অনেক বেশী প্রভাবিত করেছিলো। মদীনার জনগণ এটা বুঝতে পেরেছিলো যে, তাদের মাঝে প্রচলিত ধ্যান-ধারনা ও চিন্তা-চেতনাগুলো অসাড় ও ভ্রান্ত এবং তারা জীবন সম্পর্কে এর বিকল্প কোন আদর্শ বা ধ্যান-ধারনার সন্ধান করছিলো। ঠিক বিপরীত ভাবে, মক্কার সমাজের মানুষেরা তাদের মাঝে প্রচলিত ব্যবস্থা বা প্রতিষ্ঠিত আদর্শ নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলো এবং এ ভ্রান্ত ধ্যান-ধারনাগুলো পরিবর্তিত হয়ে যাবার আশঙ্কায় খুবই ব্যতিব্যস্ত ছিলো। বিশেষ করে, মক্কার নেতৃস্থানীয় কিছু ব্যক্তি যেমন, আবু লাহাব, আবু জাহল এবং আবু সুফিয়ান এর মতো লোকেরা এ ব্যাপারে খুবই সোচ্চার ছিলো। মূলতঃ এ কারনেই মুসা'ব ইবন উমায়ের মদীনাতে খুব অল্প সময়ের মধ্যে সে সমাজের মানুষের কাছ থেকে ব্যাপক ভাবে সাড়া পেয়েছিলেন, তিনি গণমানুষকে ইসলামের দিকে আহবান করেছিলেন এবং তাদেরকে সত্য দ্বীনের শিক্ষা ও আইন-কানুনে শিক্ষিত করেছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন মদীনার জনগণের ইসলামের আলোকিত আহবানে দ্রুত সাড়া দেবার ও ইসলাম গ্রহন করার মতো মনমানষিকতা। শুধু তাই নয়, মদীনাবাসীর ছিলো ইসলামী আদর্শকে পরিপূর্ণ জানার ও আল্লাহ্ প্রদত্ত আইন-কানুনগুলো শেখার একান্ত প্রচেষ্টা, যা মুসা'ব(রা.) এর অন্তরকে করেছিলো আনন্দে উদ্ভাসিত। এভাবে, তার চোখের সামনেই মদীনায় মুসলিমদের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে লাগলো এবং মুসা'ব ইবন উমায়ের দ্বিগুন উৎসাহের সাথে তার দাওয়াতী কার্যক্রম চালিয়ে যেতে লাগলেন।

এরপর যখন হজ্জের মৌসুম আসলো, মুসা'ব(রা.) মক্কায় ফিরে আসলেন এবং মুহাম্মদ(সা.) এর কাছে মদীনায় মুসলিমদের সংখ্যা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি এবং সেখানে ইসলামের দ্রুত প্রসারের কথা জানালেন। তিনি জানালেন কিভাবে শুধুমাত্র আল্লাহর রাসুল(সা.) মদীনার ঘরে ঘরে আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে এবং ইসলাম এ আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে। তিনি আরও জানালেন মদীনার সমাজে মুসলিমদের শক্তি-সামর্থ্য ও প্রতিরোধ ক্ষমতার কথা, যা ইসলামকে সে সমাজে প্রভাবশালী অস্তিত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তিনি বললেন, মদীনার কিছু কিছু মুসলিমদের ঈমান এতো দৃঢ় এবং তারা দাওয়াতী কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও আল্লাহর দ্বীন রক্ষার ব্যাপারে এতো দৃঢ়-সংকল্পবদ্ধ যে, তারা এ বছরই মক্কায় আসতে চায়।

আল্লাহর রাসুল(সা.) মুসা'ব ইবন উমায়ের এর কাছ থেকে এ সব সংবাদ শুনে খুবই আনন্দিত হলেন এবং মক্কার সমাজের সাথে মদীনার সমাজের তুলনা করে গভীর ভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন, একনাগারে গত বারোটি বছর ধরে তিনি মক্কার মানুষকে ইসলামের দিকে আহবান করছেন, সম্ভাব্য সকল উপায়ে চেষ্টা করেছেন, তার প্রতিদিনের প্রতিটি মূহুর্ত তিনি দাওয়াতী কাজে ব্যয় করেছেন, প্রতিটি সুযোগকে কাজে লাগিয়েছেন, এ সবকিছু করতে গিয়ে সবধরনের জুলুম, অত্যাচার ও নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। কিন্তু, এতো কিছুর পরও মক্কাবাসী এখনও নিমজ্জিত রয়েছে মিথ্যা অহমিকা আর অন্ধ গোয়ার্তুমির নিকষ কালো অন্ধকারে। মক্কাবাসীর প্রচন্ড নিষ্ঠুর, বরফ কঠিন ও অনুশোচনাবিহীন হৃদয়ে তার প্রাণান্তকর এ প্রচেষ্টা বিন্দুমাত্র আচঁড় কাটতে পারেনি, বরং তাদের দূর্ভেদ্য অন্তর পূর্বেই মতোই পূর্বপুরুষদের ভ্রান্ত ধ্যান-ধারনায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। মক্কার জনসাধারন ছিলো খুবই রূঢ় প্রকৃতির এবং তাদের অন্তরে মুর্তিপূজার মতো বিকৃত ধ্যান-ধারনার শেকড় ছিলো গভীর ভাবে প্রোথিত। মূলতঃ এ কারনেই তারা ইসলামের আলোকিত আদর্শে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়েছিলো এবং নিমজ্জিত ছিলো শিরকের মতো ভয়ঙ্কর পাপে। অপরদিকে, মদীনার চিত্র ছিলো একেবারেই অন্যরকম। খাযরাজ গোত্রের একদল মানুষ ইসলাম গ্রহন করার পর একবছর পার হতে না হতেই অনুষ্ঠিত হয়েছিলো আকাবার প্রথম শপথ। পরবর্তীতে মুসা'ব ইবন উমায়েরের মাত্র একবছরের প্রচেষ্টায় সমস্ত মদীনা ইসলামী ধ্যান-ধারনার আলোকে এমন ভাবে উদ্দীপ্ত হলো যে, এটাই পরবর্তীতে অল্প সময়ের মধ্যে অবিশ্বাস্য সংখ্যক মানুষের ইসলাম গ্রহনের ভিত্তি তৈরী করেছিলো। অন্যদিকে, মক্কায় যারা ইসলাম গ্রহন করেছিলো তাদের মধ্যেই ইসলামের আদর্শ ও চিন্তা-চেতনা সীমাবদ্ধ ছিলো। উপরন্তু, তারা হয়েছিলো কুরাইশদের নির্মম অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকার। কিন্তু, মদীনাতে ইসলামী আদর্শ বিস্তৃতি লাভ করেছিলো দ্রুত গতিতে আর ইসলাম গ্রহন করায় সেখানকার মুসলিমরা ইহুদী বা কাফিরদের কোনরকম অত্যাচার বা নির্যাতনেরও শিকার হয়নি। মূলতঃ এ অবস্থা মদীনাবাসীর অন্তরে ইসলামকে দৃঢ় ভাবে প্রোথিত করতে সাহায্য করেছিলো এবং মুসলিমদের জন্য উম্মোচিত করেছিলো ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করার নতুন দ্বার।

মুহাম্মদ(সা.) এর কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিলো যে, মদীনাই হতে পারে সেই উজ্জ্বল বর্তিকা যেখান থেকে ইসলামের আদর্শ, ঈমান ও জীবন-ব্যবস্থার আলো বিচ্ছুরিত হতে পারে বিশ্বময়। অতঃপর তিনি(সা.) মদীনায় হিজরতের সিদ্ধান্ত নিলেন, যা তাঁর সাহাবীদের তাদের মুসলিম ভাইদের সঙ্গী হবার সুযোগ করে দিলো, তারা মুক্ত হলেন তাদের উপর আপতিত কুরাইশদের নির্মম অত্যাচার ও নির্যাতন থেকে এবং খুঁজে পেলেন একটি পবিত্র ও নিরাপদ আশ্রয়। রাসুল(সা.)এর এ পদক্ষেপ তাদের দাওয়াতী কার্যক্রমে সম্পূর্ন ভাবে মনোনিবেশ করার সুযোগ করে দিলো এবং তারা খুব স্বাভাবিক ভাবেই পরবর্তী পর্যায়ের দিকে অগ্রসর হলেন, যেটা ছিলো মূলতঃ ইসলামকে বাস্তব জীবনে কার্যকরী ভাবে প্রয়োগ করা এবং ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সহায়তায় ইসলামের আহবানকে বলিষ্ঠ ভাবে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া।

এখানে এটা বলে রাখা দরকার যে, মুহাম্মদ(সা.) দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে যে প্রচন্ড পরিমাণ বাঁধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছিলেন, তা অতিক্রম করার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা কিংবা এ ব্যাপারে চুড়ান্ত ধৈর্য্য ও একনিষ্ঠতার পরিচয় না দিয়েই শুধুমাত্র অত্যাচার-নির্যাতন থেকে রক্ষা পাবার জন্য মদীনায় হিজরতের সিদ্ধান্ত গ্রহন করেননি। তিনি মক্কায় দীর্ঘ দশটি বছর প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছেন, দাওয়াতী কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য গভীর ভাবে চিন্তা করেছেন। তিনি(সা.) এবং তাঁর সাহাবীগণ এজন্য সবরকমের ভয়ঙ্কর অত্যাচার ও নির্যাতনকে হাসিমুখে বরণ করেছেন। কুরাইশদের নিষ্ঠুর অত্যাচার ও প্রবল প্রতিরোধ আল্লাহর রাসুল(সা.)কে এক মূহুর্তের জন্য লক্ষ্যচ্যুত করতে তো পারেইনি, উপরন্তু এ প্রবল প্রতিরোধ তাঁর ঈমানী শক্তি ও আল্লাহর বাণীর প্রতি তাঁর বিশ্বাসকে প্রতিনিয়ত নিয়ে গিয়েছে নতুন এক উচ্চতায়। তিনি(সা.) নিশ্চিত ভাবেই জানতেন আল্লাহর সাহায্য আসবে এবং এ নিশ্চিত বিশ্বাসই তাকে করেছিলো আরও দৃঢ়প্রত্যয়ী ও আশাবাদী। শুধু তাই নয়, তাঁর কাছে এটাও পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিলো যে মক্কাবাসীর হৃদয় আসলে কতো কঠিন ভাবে অন্ধ গোয়ার্তুমির মধ্যে নিমজ্জিত, তাদের অন্তর কতো সংকীর্ন এবং সর্বোপরি তারা কতো নিষ্ঠুর ও পথভ্রান্ত। এ বাস্তবতা থেকে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন মক্কায় ইসলামের বিজয়ের সম্ভাবনা খুবই ক্ষীন এবং তাঁর সকল প্রচেষ্টা হবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত। মূলতঃ এ কারনেই মক্কা ত্যাগ করা ও এর বিকল্প কোন স্থানের সন্ধান করা ছিলো খুবই জরুরী। আর তাই, এ বাস্তবতার প্রেক্ষাপটেই তিনি(সা.) মদীনায় হিজরতের সিদ্ধান্ত নেন। সুতরাং, অত্যাচার বা নির্যাতন নয়, এ কারণগুলোই ছিলো তাঁর ও সাহাবীদের মক্কা থেকে হিজরত করার এক ও একমাত্র কারণ।

এছাড়া, একই সাথে এটাও সত্য যে, রাসুল(সা.) তাঁর সাহাবীদেরকে কুরাইশদের নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর অত্যাচার রক্ষার জন্য তাদের আবিসিনিয়া হিজরত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কারণ, যদিও নির্মম নির্যাতন ও অত্যাচার মুসলিমদের ঈমানী শক্তি ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসকে দৃঢ় করে, বাতিল শক্তির প্রবল প্রতিরোধ মুসলিমদের আরো প্রত্যয়ী করে তোলে, তারপরও জীবন রক্ষার তাগিদে নির্যাতনস্থল ত্যাগ করার অনুমতিও ইসলাম দিয়েছে। বস্তুতঃ এ দৃঢ় ঈমানী শক্তি থেকেই মুসলিমরা অবলীলায় আল্লাহর জন্য সকল দুঃখ-কষ্টকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে পারে। নির্দিধায় তারা উৎসর্গ করতে পারে নিজ জীবন সহ তাদের ধনসম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, মানসিক স্বস্তি সহ সবকিছু। কিন্তু, তারপরও কোন কোন সময় বিরতিহীন অসহনীয় অত্যাচার ঈমানদারদের হাঁপিয়ে তোলে। তখন সঙ্গত কারনেই তাদের সকল প্রচেষ্টা দাওয়াতী কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কিংবা সত্যদ্বীনকে গভীর ভাবে উপলব্ধি করার থেকে, নিজেকে ক্রমাগত অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে টিকিয়ে রাখাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। এ কারনেই মুসলিমদের এই জুলুম আর অত্যাচারের রাজত্ব থেকে হিজরত করে পাড়ি জমাতে হয়েছিলো আবিসিনিয়ায়।

যাই হোক, তাদের দ্বিতীয়বার হিজরত করতে হয়েছিলো সম্পূর্ন ভিন্ন কারণে। বস্তুতঃ দ্বিতীয়বার মুসলিমরা তাদের দ্বীনকে প্রাত্যহিক জীবনে ও সমাজে কার্যকর ভাবে প্রয়োগ করার জন্যই রাসুল(সা.) সহ হিজরত করেছিলো। তারা তৈরী করতে চেয়েছিলো একটি পরিপূর্ণ ইসলামী সমাজ, যেখান থেকে তারা ইসলামের আহবানকে ছড়িয়ে দেবে সারা বিশ্বে। মূলতঃ এ রকম একটি প্রেক্ষাপটেই আল্লাহর রাসুল(সা.) সাহাবীদের মদীনায় হিজরত করার বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু, এ সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বে তাঁর প্রয়োজন ছিলো হজ্জ করতে আগত মদীনার মুসলিমদের সাথে সাক্ষাৎ করা, দ্বীন ইসলামকে রক্ষা করার জন্য তাদের স্বতঃস্ফুর্ততাকে পরীক্ষা করা এবং সর্বোপরি ইসলামের জন্য তারা কতোটুকু ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত তা পর্যালোচনা করা। তাঁর এটাও নিশ্চিত করার প্রয়োজন ছিলো যে, মদীনার মুসলিমরা তাঁর সঙ্গে আনুগত্যের শপথে আবদ্ধ হবে এবং প্রয়োজনে তাঁর জন্য যুদ্ধ করতে প্রস্তুত থাকবে, যা মূলতঃ তৈরী করবে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তিভূমি।

এ অবস্থায় রাসুল(সা.) হজ্জযাত্রীদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। এটা ছিলো ৬২২ খ্রীষ্টাব্দ, দাওয়াতী কার্যক্রমের বারোতম বছর। আগত বিপুল সংখ্যক হজ্জযাত্রীর মধ্যে ৭৫ জন ছিলো মুসলিম (যার মধ্যে ৭২ জন ছিলো পুরুষ এবং ২ জন ছিলো নারী)। এদের মধ্যে একজন নারী ছিলো বনু মাযিন ইবন আল-নাজ্জার গোত্র থেকে আগত নুসাইবা বিনত কা'ব উম্ম 'আমারাহ্ এবং অন্যজন ছিলো বনু সালামাহ গোত্র থেকে আগত আসমা' বিনত 'আমর ইবন 'আদি।

আল্লাহর রাসুল(সা.) মুসলিম হজ্জযাত্রীদের এ দলটির সাথে গোপনে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাদেরকে দ্বিতীয় আনুগত্যের শপথের কথা জানালেন। বস্তুতঃ এবারের অঙ্গীকার শুধুমাত্র দাওয়াতী কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও জুলুম-নির্যাতন থেকে নিরাপত্তা প্রদানের ব্যাপার সম্পর্কিত ছিলো না। বরং, এ অঙ্গীকারের সীমানা ছিলো বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এটা ছিলো মুসলিমদের সম্ভাব্য সকল আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে প্রয়োজনে সামরিক শক্তি তৈরী করার অঙ্গীকার। এটা ছিলো ইসলামের এমন এক কেন্দ্রবিন্দু প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার, যা তৈরী করবে ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ভিত্তিভূমি। যে রাষ্ট্রের থাকবে নিজেকে রক্ষা করার মতো প্রয়োজনীয় সামরিক শক্তি এবং সে শক্তি দূর করবে দ্বীন ইসলাম প্রচার ও প্রয়োগের পথে ছড়িয়ে থাকা সকল বাঁধা।

আল্লাহর রাসুল(সা.) তাদের সাথে অঙ্গীকারের ব্যাপারে কথা বললেন, তাদের স্বতঃস্ফুর্ততাকে অনুভব করলেন। আবার, আগত মুসলিমরাও আইয়্যামে তাশরিকের দিনগুলোতে তাঁর সাথে আকাবার উপত্যকায় সাক্ষাৎ করতে সম্মত হলো। তিনি তাদের বললেন,"তোমরা কেউ কাউকে জাগাবে না, না কেউ অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য অপেক্ষা করবে।" তৃতীয় রাত্রি পার হবার পর তারা গোপনে আকাবা উপত্যকায় রাসুল(সা.)এর সাথে সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হলো, যাদের মধ্যে আগত দু'জন মুসলিম নারীও ছিলো। আল্লাহর রাসুল(সা.) সেখানে তাঁর চাচা আল-আব্বাসকে

নিয়ে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত মুসলিমরা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলো। রাসুল(সা.)এর চাচা তখন পর্যন্ত ঈমান না আনলেও তিনি চেয়েছিলেন তার ভাতিজার পূর্ণ নিরাপত্তা। বস্তুতঃ তিনিই প্রথম সংলাপ শুরু করেন এবং বলেন,"হে খাযরাজ সম্প্রদায়ের লোকেরা, তোমরা জানো যে মুহাম্মদের অবস্থান আমাদের কাছে কোথায়। আমরা তাকে এতোদিন পর্যন্ত নিজ সম্প্রদায়ের মানুষ হতে রক্ষা করে এসেছি। তিনি আমাদের মধ্যে পরিপূর্ণ সম্মান ও নিরাপত্তার সাথেই বসবাস করছেন। কিন্তু, এখন তিনি তোমাদের সাথে বসবাস করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যদি তোমরা মনে করে থাকো যে, তোমরা তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারবে এবং তাঁর প্রতি কৃত অঙ্গীকার পালন করে তাকে শত্রু থেকে নিরাপত্তা দিতে পারবে, তাহলে তোমরা এ দায়িত্ব গ্রহন করো। আর যদি তোমরা মনে করে থাকো যে, তোমরা তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং বিপদে তাঁকে পরিত্যাগ করবে, তবে তা এখনই জানিয়ে দাও।" প্রত্তুতরে তারা বললো,"আমরা শুনেছি আপনি কি বলেছেন। হে আল্লাহর রাসুল, এখন আমরা আপনার কথা শুনতে চাই। আপনি আপনার ও আপনার রবের জন্য যা ইচ্ছা পছন্দ করুন।" রাসুলুল্লাহ(সা.) কুরআন তিলওয়াত করার পর তাদের বললেন,"আমি তোমাদের কাছে এই অঙ্গীকার চাই যে, তোমরা আমাকে রক্ষা করবে সেভাবে, যেভাবে তোমরা তোমাদের নারী ও সন্তানদের রক্ষা করো।" আল-বারা'(রা.) শপথ গ্রহনের জন্য তার হাত উঠালেন এবং বললেন,"হে আল্লাহর রাসুল, আমরা আপনার পূর্ণ আনুগত্যের শপথ করছি। আল্লাহর কসম, আমরা হচ্ছি যোদ্ধাজাতি। যুদ্ধ ও অস্ত্রের ঝনঝনানি বংশ পরম্পরায় আমাদের ধমনীতে প্রবাহিত হয়েছে।"

আল-বারা'(রা.) কথার মাঝেই আবু আল-হাইছাম ইবন আল-ছাইহান প্রবেশ করলেন এবং বললেন,"হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের অন্য সম্প্রদায়ের (ইহুদী) সাথে মৈত্রী চুক্তি রয়েছে, আমরা যদি সে চুক্তি ছিন্ন করে আপনার পক্ষ অবলম্বন করি এবং তারপর যদি আল্লাহ আপনাকে বিজয় দান করেন, তবে কি আপনি আমাদের ছেড়ে আপনার নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে আসবেন?" এ কথার উত্তরে আল্লাহর রাসুল(সা.) হেসে বললেন,"না, এখন থেকে তোমাদের রক্তই আমার রক্ত এবং তোমাদের কাছে যা পবিত্র আমার কাছেও তা পবিত্র। আমি তোমাদের একজন এবং তোমরা আমাদের। আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং তাদের সাথে শান্তিচুক্তি করবো যারা তোমাদের সাথে সন্ধি করবে।" অতঃপর আল-'আব্বাস ইবন 'উবাদাহ(রা.) বললেন,"হে খাযরাজ গোত্রের লোকেরা, তোমরা কি বুঝতে পারছো তোমরা কোন বিষয়ে সহায়তা দেবার জন্য এ ব্যক্তির সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হচ্ছো? এর অর্থ হচ্ছে যে কোন মূল্যে তাঁর জন্য লড়াই করা। তোমরা যদি সম্পদ হারানোর ভয় করে থাকো, তোমাদের মধ্যে সম্মানিত ব্যক্তিদের নিহত হবার আশঙ্কা করে থাকো, তাহলে এখনই পিছু হটে যাও। আল্লাহর কসম, যদি তোমরা তা করো, তবে এ দুনিয়া ও আখেরাতে তোমরা হবে চরম ভাবে লাঞ্ছিত। কিন্তু, যদি তোমরা আনুগত্যের শপথ পূর্ণ করো, তবে তোমাদের সম্পদের ক্ষতি বা সম্মানিত ব্যক্তিরা নিহত হলেও এটাই তোমাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে বয়ে নিয়ে আসবে সাফল্য।" মদীনার মুসলিমদের দলটি এ সকল শর্তেই আল্লাহর রাসুল(সা.) এর আনুগত্য মেনে নিলো এবং জিজ্ঞেস করলো,"হে আল্লাহর রাসুল, আপনার আনুগত্য করার বিনিময়ে আমরা কি পাবো?" রাসুলুল্লাহ(সা.) দৃঢ় ভাবে উত্তর দিলেন,"জান্নাত।"

তারা তাদের হাত বাড়ালেন এবং রাসুলুল্লাহ(সা.)ও তাঁর হাত বাড়ালেন, অতঃপর তারা এ বলে আল্লাহর রাসুল(সা.)এর সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন যে,"আমরা এই বলে শপথ গ্রহন করছি যে, আমরা সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ সর্বাবস্থায়ই আপনার আনুগত্য করবো। সর্বদা সত্য কথার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবো এবং আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করতে কারো সামনেই মাথা নত করবো না।" শপথ গ্রহন শেষে আল্লাহর রাসুল(সা.) বললেন,"তোমাদের মধ্যে সমাজে নেতৃস্থানীয় যে বারোজন আছে, তাদের আমার কাছে নিয়ে আসো।" তারা খাযরাজ গোত্র থেকে নয়জন এবং আউস গোত্র থেকো তিনজনকে নিয়ে আসলেন। রাসুল(সা.) এ সকল গোত্র প্রধানদের বললেন,"তোমরা তোমাদের জনগণের উপর দায়িত্বশীল, যেভাবে ঈসা(আ) ছিলেন তাঁর অনুসারীদের উপর দায়িত্বশীল। আর আমি আমার লোকদের উপর দায়িত্বশীল।" একথা শোনার পর তারা যে যার শয্যায় ফিরে গেলেন, অতঃপর নিজ নিজ ক্যারাভানে পৌঁছে মদীনায় ফিরে আসলেন।

তারপর, আল্লাহর রাসুল(সা.) মুসলিমদের ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দিলেন এবং মুসলিমরাও এ নির্দেশ অনুযায়ী একাকী কিংবা ছোট ছোট দল গঠন করে মক্কা ত্যাগ করতে শুরু করলো। ইতিমধ্যে কুরাইশদের কাছে শপথ গ্রহনের খবর পৌঁছে গেলে তারা মুসলিমদের হিজরতে বাঁধা দিতে লাগলো। তারা স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের মাঝে এসে দাঁড়ালো যেন তারা মক্কা ত্যাগ না করতে পারে। কিন্তু, তা সত্ত্বেও মুসলিমদের মক্কা থেকে মদীনা যাত্রা অব্যাহত থাকলো। আল্লাহর রাসুল(সা.) মক্কায় রয়ে গেলেন এবং তিনি আদৌ মদীনায় যাবেন কিনা এ ধরনের কোন ইঙ্গিতও কাউকে দিলেন না। কিন্তু, বিভিন্ন ঘটনা থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে, তিনিও মক্কা ত্যাগ করবেন। মুহাম্মদ(সা.) কিছু না বলা পর্যন্ত আবু বকর(রা.) তাঁর কাছে হিজরতের অনুমতি চাইতে থাকলেন। এক পর্যায়ে, আল্লাহর রাসুল(সা.) বললেন,"এতো তাড়াহুড়ো করো না, এমনও হতে পারে যে আল্লাহ তোমার জন্য একজন সফরসঙ্গী নির্ধারন করে দেবেন।" আবু বকর(রা.) তখন বুঝতে পারলেন যে, রাসুলুল্লাহ(সা.) হিজরত করতে চাচ্ছেন।

আল্লাহর রাসুল(সা.) মদীনায় হিজরত করবেন এটা বুঝতে পেরে কুরাইশরা খুবই চিন্তিত হয়ে গেলো। কারণ, তারা জানতো যে মদীনায় মুসলিমদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নিঃসন্দেহে সেখানে মুসলিমরা এখন অনেক বেশী শক্তিশালী। তার উপর যদি মক্কার মুসলিমরাও মদীনায় হিজরত করে তবে মুসলিমদের প্রভাব-প্রতিপত্তি স্বভাবতই আরও বৃদ্ধি পাবে। তারা এটাও আশঙ্কা করছিলো যে, রাসুল(সা.) যদি কোনভাবে মদীনায় গিয়ে পৌঁছাতে পারে তাহলে তাদের অস্তিত্ব হবে বিপন্ন। এজন্য তারা রাসুলুল্লাহ(সা.) এর মদীনা গমন কিভাবে ঠেকানো যায়

তা নিয়ে দিনরাত চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলো। আবার চিন্তা করে দেখলো যে, রাসুলুল্লাহ(সা.) যদি মক্কায়ও থেকে যায় তাহলেও মদীনার মুসলিমরা তাদের নবীর সম্মান রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ হবে কুরাইশদের বিরুদ্ধে। তখন তাদের সংঘবদ্ধ এ শক্তির বিরুদ্ধে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করা হয়ে যাবে আরেক সমস্যা। সবদিক ভেবেচিন্তে তারা মদীনার মুসলিম, ইসলাম এবং মুহাম্মদের সাথে সম্ভাব্য সকল সংঘর্ষ এড়ানোর লক্ষ্যে আল্লাহর রাসুল(সা.)কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিলো এবং সেইসাথে নবী(সা.)কে মদীনায় হিজরতে বাঁধা দেবার কৌশল অবলম্বন করলো।

সীরাতের গ্রন্থগুলোতে 'আয়িশা(রা.) এবং আবু উমামাহ ইবন শাম কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, আকাবার উপত্যকায় ৭৩ জন মুসলিম উপস্থিত হয়ে যখন মুহাম্মদ(সা.)কে নিরাপত্তা ও সবরকম সহায়তা দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলো, তখন থেকেই হিজরত করতে চাওয়ায় মক্কার মুসলিমদের উপর কাফিরদের অত্যাচার ও নির্যাতনের মাত্রা প্রচন্ড আকার ধারণ করলো। কুরাইশরা তাদের যেখানে সেখানে অপমান ও বিভিন্ন ভাবে আক্রমণ করতে লাগলো। তারা এ ব্যাপারে মুহাম্মদ(সা.)এর কাছে অভিযোগ করলে তিনি উত্তরে বললেন, "আমাকে তোমাদের হিজরতের জন্য বাসভূমি নির্ধারন করে দেয়া হবে।"

এর কিছুদিন পরেই তিনি অত্যন্ত আনন্দের সাথে বললেন,"আমাকে বলা হয়েছে যেন তোমরা ইয়াসরিবে (মদীনায়) হিজরত করো। যে ব্যক্তি সেখানে যেতে চায় সে যেন নিশ্চিন্তে তার যাত্রা শুরু করে।" এ নির্দেশের পরপরই মুসলিমরা শহর ত্যাগ করার প্রস্তুতি নিতে শুরু করলো ।তারা গোপনে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে মক্কা ত্যাগ করতে লাগলো। কিন্তু, আল্লাহর রাসুল(সা.) তখনও তাঁর নিজের ব্যাপারে আল্লাহর অনুমতির অপেক্ষা করছিলেন। আবু বকর(রা.) তাকে বারবার এ ব্যাপারে প্রশ্ন করায় তিনি প্রত্যুত্তরে বললেন,"এতো তাড়াহুড়ো করো না, এমনও হতে পারে আল্লাহতায়ালা তোমার জন্য একজন সফরসঙ্গী নির্বাচন করে দেবেন।" আবু বকর(রা.) মনে মনে প্রত্যাশা করতে লাগলেন যে, আল্লাহতায়ালা হয়তো স্বয়ং রাসুলুল্লাহ(সা.)কেই তাঁর সফরসঙ্গী হিসাবে নির্বাচন করবেন।

কুরাইশরা মুসলিমদের দলে দলে মক্কা ত্যাগের কথা জানার সাথে সাথেই বুঝতে পারলো যে, খুব শীঘ্রই লড়াই এর ময়দানে তাদের রাসুল(সা.)কে মুকাবিলা করতে হবে। তারা কুরাইশদের দারুল নাদওয়ার পরামর্শে কক্ষে একত্রিত হয়ে কিছুক্ষন তর্কবির্তকের পর মুহাম্মদ(সা.)কে হত্যার সিদ্ধান্তে উপনীত হলো। জিবরাইল(আ) মুহাম্মদ(সা.)কে এ ঘটনা অবহিত করলেন এবং তাকে নিজ শয্যায় না ঘুমানোর নির্দেশ দিলেন। সে রাত্রে তিনি(সা) তাঁর শয্যায় ঘুমানো থেকে বিরত থাকলেন এবং এ সময়েই আল্লাহর পক্ষ থেকে হিজরতের অনুমতি আসলো।

মদীনায় ইসলামের শক্তিশালী অস্তিত্ব হিসাবে আত্মপ্রকাশ, সেখানকার মানুষের মধ্যে আল্লাহর রাসুল(সা.)কে গ্রহন করার মতো স্বতঃস্ফুর্ততা এবং সর্বোপরি সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাই মুহাম্মদ(সা.)কে মদীনায় হিজরত করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। যে কারও এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বা এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করা একেবারেই অনুচিত হবে যে, কুরাইশরা তাকে হত্যা করে ফেলতে পারে এই ভয়ে তিনি(সা.) মক্কা ত্যাগ করেছিলেন। তিনি(সা.) তাঁর উপর আপতিত বিপদ-আপদ বা অত্যাচার-নির্যাতন নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তিত ছিলেন না, বরং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য সবসময়ই তাঁর জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলেন। বস্তুতঃ তাঁর হিজরতের মূল উদ্দেশ্যই ছিলো দাওয়াতী কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং সেই সাথে সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য অর্জনে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করা। এছাড়া এটাও পরিষ্কার যে, কুরাইশরা মুহাম্মদ(সা.)কে হত্যা করতে চেয়েছিলো এই ভয়ে যে, তিনি মদীনায় পৌঁছে গেলে পূর্ণ নিরাপত্তা ও সামরিক শক্তির অধিকারী হবেন। কিন্তু, সর্বাত্মক প্রচেষ্টার পরও কুরাইশরা তাদের ষড়যন্ত্র সফল করতে ব্যর্থ হলো। রাসুল(সা.) মদীনায় হিজরত করলেন এবং তাদের আশঙ্কাকে সত্য প্রমাণিত করে, তাঁর এ হিজরতের ঘটনাই ইসলামের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলো। এটা মূলতঃ মানুষকে সত্য দ্বীনের পথে আহবানের অধ্যায় থেকে আল্লাহর দ্বীনের আলোকে একটি ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার অধ্যায়ে প্রবেশ করলো। প্রতিষ্ঠিত হলো ইসলামী রাষ্ট্র যেখানে শাসন-কর্তৃত্ব হলো শুধুই আল্লাহর। এছাড়া ইসলামী রাষ্ট্র আল্লাহর দ্বীনকে প্রাত্যহিক জীবনে বাস্তব ভাবে প্রয়োগ করে, যৌক্তিক প্রমাণের মাধ্যমে মানুষকে দ্বীনের পথে আহবান করলো এবং এর সামরিক শক্তি মুসলিমদের রক্ষা করলো সকল প্রকার বিপদ-আপদ এবং শত্রুদের জুলুম-নিপীড়ন ও অত্যাচার থেকে।

## ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাঃ

আল্লাহর রাসুল(সা.) অবশেষে মদীনায় এসে পৌঁছালেন এবং বিপুল সংখ্যক মদীনাবাসী তাঁকে সানন্দে বরণ করে নিলো। এদের মধ্যে মুসলিম, ইহুদী ও মূর্তিপূজারী সবধরনের মানুষই ছিলো। মদীনাবাসী অধীর আগ্রহে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলো এবং সকলেই সাক্ষী হতে চেয়েছিলো সেই আনন্দঘন মূহুর্তের, যখন আল্লাহর রাসুল(সা.) উপস্থিত হবেন তাঁর নতুন আবাসভূমিতে। সেখানে উপস্থিত হওয়া মাত্রই মুসলিমরা তাকে ঘিরে ধরলো এবং আন্তরিক আথিতেয়তার মাধ্যমে তাঁর সেবাশ্রুষশার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লো। বস্তুতঃ ইসলামের আহবানকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তারা তাদের জীবন বাজি রাখতেও প্রস্তুত ছিলো।

আনসারদের মধ্যে সবাই চাচ্ছিলো যেন নবী(সা.) তার গৃহেই অবস্থান করে। কিন্তু রাসুল(সা.) তাঁর উটনীর রশি ছেড়ে দিলেন। উটনী নিজের ইচ্ছা মতো পথ চলতে চলতে একসময় 'আমর গোত্রের সন্তান সাহল ও সুহাইলের গুদামঘরের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। পরবর্তীতে রাসুল(সা.) এই দুই ইয়াতীম শিশুর কাছ থেকে এ জায়গাটি ক্রয় করে নেন এবং এখানেই তাঁর মসজিদ ও এর চারপাশ ঘিরে তাঁর বাসগৃহ নির্মাণ করেন। মসজিদ ও বাসগৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে রাসুল(সা.) খুবই সহজলভ্য ও সাধারন উপকরণ ব্যবহার করায় নির্মাণ কাজ খুব তাড়াতাড়িই শেষ হয়ে যায়। মূলতঃ মসজিদটি ছিলো একটি বড় হলঘর, যার চারপাশ ইটের তৈরী দেয়াল দিয়ে ঘেরা ছিলো। এর ছাদের কিছু অংশ ছিলো খেজুর শাখা দিয়ে আবৃত, আর বাকীটা ছিলো খোলা। মসজিদের কিছু অংশ ব্যবহার করা হতো দরিদ্র ও গৃহহীন মানুষের আশ্রয়স্থল হিসাবে। এশার নামাজের সময় ছাড়া আর কখনোই মসজিদে আলো জ্বালানো হতো না। সাধারনত খড়ের তৈরী মশাল দিয়েই করা হতো এ আলোর ব্যবস্থা।

রাসুল(সা.) এর জন্য তৈরী ঘরগুলোও মসজিদের মতোই সাধারন ছিলো, শুধুমাত্র মসজিদ থেকে একটু বেশী আলোকিত ছিলো। আল্লাহর রাসুল(সা.) মসজিদ ও তাঁর গৃহ নির্মাণ এর সময়টুকুতে আবি আইয়ুব খালিদ ইবন যায়িদ আল-আনসারির গৃহে অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হবার সাথে সাথেই নিজগৃহে চলে আসলেন। এখানে আসার পর, রাসুল(সা.) ভাবতে লাগলেন তাঁর নতুন জীবন সর্ম্পকে, কিভাবে ইসলামী দাওয়াত এক অধ্যায় থেকে অন্য অধ্যায়ে প্রবেশ করলো, একেবারে ইসলামী ব্যক্তিত্ব তৈরীর পর্যায় থেকে একটি কুফর সমাজের সাথে ইসলামী আদর্শের সাংঘর্ষিক পর্যায় এবং সবশেষে একটি ইসলামী সমাজ যেখানে মানুষের উপর কার্যকরী হবে ইসলামের বিধিবিধান। তিনি ভাবতে লাগলেন এ নতুন যুগের সূচনা সম্পর্কে, যা তাকে মানুষকে ইসলামের দিকে আহবান করার পর্যায় ও অসহনীয় অত্যাচার-নির্যাতন থেকে নিয়ে এসেছে শাসন-কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা অর্জনের পর্যায়ে এবং প্রাপ্য এ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বই এখন ইসলামকে রক্ষা করবে, নিরাপত্তা দেবে এবং ইসলামের আহবানকে ছড়িয়ে দেবে পৃথিবীব্যাপী। মদীনায় আসার পর পরই রাসুল(সা.) মসজিদ নির্মাণের আদেশ দিয়েছিলেন এবং এ মসজিদেই তিনি নামাজ পড়াতেন, সাহাবীদের সাথে আলোচনা ও পরামর্শ করতেন। এখানেই তিনি মদীনার জনসাধারনের বিভিন্ন সমস্যা করতেন ও তাদের মধ্যে বিচার-ফায়সালা করতেন। তিনি(সা.) এ সকল কাজে আবু বকর(রা.) ও 'ওমর(রা.)কে তাঁর দুই সহকারী হিসাবে নিযুক্ত করলেন, বললেন,"এ পৃথিবীতে আবু বকর ও 'ওমর হচ্ছে আমার দুই সহকারী।"

মুসলিমরা সাধারনত সকল বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে উপদেশ গ্রহন এবং জীবনসম্পর্কে সঠিক দিকনির্দেশনা নেবার জন্য রাসুল(সা.) এর চারপাশে সমবেত হতো। এভাবে, তিনি সদ্যগঠিত এ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান, বিচারক এবং সেনাপতির ভূমিকা গ্রহন করলেন। তিনি(সা.) মুসলিমদের সব বিষয় সম্পর্কে খোঁজখবর রাখতেন, তাদের মধ্যকার বিভিন্ন ঝগড়া-বিবাদেরও ফয়সালা করতেন, নিযুক্ত করতেন মুসলিম সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন অংশের প্রধান এবং সেনাবাহিনীকে মদীনার বাইরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মিশনে পাঠাতেন।

আল্লাহর রাসুল(সা.) মদীনার উপস্থিত হবার দিন থেকেই ইসলামী রাষ্ট্রের সূচনা করেছিলেন এবং পুরো সমাজকে পরিবর্তন করে এ রাষ্ট্রকে একটি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর উদ্যেগ নিয়েছিলেন। একই সাথে এ রাষ্ট্র রক্ষা করা ও দ্বীন ইসলামের আহবান সর্বত্র ছড়িয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন প্রয়োজনীয় সৈন্যবাহিনী। বস্তুতঃ এ সবকিছুর মাধ্যমেই তিনি আল্লাহর দ্বীনকে পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত করতে সকল বস্তুগত বাঁধা সফলতার সাথে দূর করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

## ইসলামী সমাজ গঠনঃ

আল্লাহতায়ালা প্রতিটি মানুষকে দিয়েছেন বেঁচে থাকার প্রবৃত্তি। এ প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ীই মানুষ সবসময় একত্রিত হয়ে দলবদ্ধ ভাবে বসবাস করতে চায়। আর দলবদ্ধ মানুষের পরস্পরের উপর নির্ভরশীলতা এবং একে অন্যের সাথে মেলামেশা একটি স্বাভাবিক প্রকৃতিগত ব্যাপার। কিন্তু, শুধুমাত্র কিছু মানুষের দলবদ্ধ ভাবে বসবাসের ব্যাপারটি একটি সমাজ তৈরী করে না। মূলতঃ ততক্ষন পর্যন্ত এই দলবদ্ধ মানুষগুলো একটি সমাজ তৈরী করতে পারে না, যতক্ষন পর্যন্ত না তারা সকলের মাঝে বিদ্যমান একই ধরনের কিছু চিন্তা-ভাবনা দ্বারা পরস্পর আবদ্ধ হয়। একই ধরনের কিছু কারণকে নিজেদের অস্তিত্বের জন্য বিপদজনক বা হুমকী মনে করে থাকে এবং তা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে চায়। দলবদ্ধ কিছু মানুষের মধ্যে যদি এ ধরনের একটি সম্পর্ক তৈরী হয়, শুধুমাত্র তখনই সত্যিকার অর্থে একটি সমাজ তৈরী হয়। আবার, নিম্নলিখিত শর্তগুলো পূরণ না হলে সত্যিকারের একটি সুষম সমাজও তৈরী হয় না।

বস্তুতঃ সুষম সমাজ তৈরীতে সমাজের মানুষের মধ্যে নিম্নলিখিত উপাদানগুলো বিদ্যমান থাকা প্রয়োজনঃ

১. সমাজের মানুষের মধ্যে চিন্তার একতা।
২. মানুষে মানুষে বিদ্যমান সম্পর্কগুলোকে সর্বসম্মত ভাবে গ্রহন করা না করার জন্য প্রয়োজন আবেগ-অনুভূতির মধ্যে একতা।
৩. সমাজে বিদ্যমান সমস্যাগুলোকে সমাধান করার জন্যও প্রয়োজন একটি নির্ধারিত সমাজ-ব্যবস্থা।

তাই, কোন সমাজ সম্পর্কে কোন মতামত বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পূর্বে প্রয়োজন সমাজে প্রচলিত ধ্যান-ধারনা, বিদ্যমান আবেগ-অনুভূতি এবং সমাজে প্রচলিত ব্যবস্থা সম্পর্কে গভীর ভাবে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষনা করে সমাজের প্রকৃত চরিত্র অনুধাবনের চেষ্টা করা। মূলতঃ উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যগুলোই নির্ধারন করে দেয় একটি সমাজ থেকে আরেকটি সমাজের পার্থক্য । ব্যাপারটি বোঝার জন্য আমরা রাসুল(সা.) হিজরত করার পর মদীনার তৎকালীন সমাজব্যবস্থার উপর আলোকপাত করবো ।

সে সময়ে মদীনার সমাজ তিনটি দলে বিভক্ত ছিলো। একটি হলো আনসার ও মুহাজির নিয়ে গঠিত মুসলিমদের দল, যেটি ছিলো সর্ববৃহৎ। আরেকটি দলে ছিলো আউস ও খাযরাজ গোত্রের মূর্তিপূজারীরা (যারা ইসলাম গ্রহন করেনি) এবং তৃতীয় দলটি ছিলো ইহুদীদের, যারা আবার চারটি উপদলে বিভক্ত ছিলো। এদের মধ্যে একটি দল মদীনায় বসবাস করতো, যারা বনু কায়নুকা গোত্র নামে পরিচিত ছিলো। আর মদীনার বাইরের ইহুদীদের দলগুলো বনু নাদির, খায়বার এবং বনু কুরাইজা নামে পরিচিত ছিলো। প্রকৃতপক্ষে, মদীনায় ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবার আগেও সেখানে ইহুদীদের আলাদা সমাজ ছিলো, যা মদীনার তৎকালীন সমাজ থেকে ছিলো একেবারেই ভিন্ন। জীবন সম্পর্কে মদীনার মুশরিক গোত্রগুলো থেকে ইহুদীদের সম্পূর্ন ভিন্ন ধরনের চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান-ধারনাই ছিলো এর মূল কারণ। মূলতঃ তারা তাদের নিজস্ব এসব ধ্যান-ধারনার ভিত্তিতেই পরিচালনা করতো তাদের বিভিন্ন কর্মকান্ড। ফলে, ইহুদীরা মদীনার ভেতরে ও এর চারপাশে বসবাস করা সত্ত্বেও কখনই মদীনার সমাজের অংশ হতে পারেনি। আর মুশরিকরা ছিলো সংখ্যালঘু এবং তারা মদীনার প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে যাওয়া ইসলামের আদর্শ দিয়ে ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত ছিলো। এজন্য, ইসলাম গ্রহন না করলেও ইসলামী ধ্যান-ধারনা, আদর্শ এবং ইসলামের শাসন-কর্তৃত্বের কাছে নতি স্বীকার করা ছিলো তাদের জন্য স্বাভাবিক ব্যাপার। আবার ইসলামী আকীদার ভিত্তিতে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো ঐক্য। ইসলামই তাদের কর্মকান্ডকে একসুরে বেঁধেছিলো এবং ইসলামের আলোকিত আদর্শই তৈরী করেছিলো তাদের মধ্যে জীবন সম্পর্কে একই ধরনের ধ্যান-ধারনা ও আবেগ-অনুভূতি। তাই এ আদর্শের ভিত্তিতেই তাদের জীবনের প্রতিটি কাজ পরিচালিত হওয়া ও তাদের মধ্যকার সম্পর্কগুলো তৈরী হওয়াও ছিলো স্বাভাবিক ব্যাপার ।

আল্লাহর রাসুল(সা.) ইসলামী আকীদার ভিত্তিতে মুসলিমদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরী করতে শুরু করলেন। তিনি মুসলিমদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সবাইকে আহবান করলেন, যাতে তাদের মধ্যকার সম্পর্ক, ব্যবসায়িক লেন-দেন এবং জীবনের অন্যান্য কর্মকান্ডের উপরও এর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিদ্যমান থাকে। এ চিন্তা মাথায় রেখেই তিনি(সা.) 'আলী ইবন আবি তালিব, তাঁর চাচা হামযা(রা.) এবং তাঁর ক্রীতদাস যায়িদ(রা.) এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করলেন। একই ভাবে আবু বকর(রা.) এবং খারিযাহ ইবন যায়েদও পরস্পরের ভাই হলেন। তারপর তিনি(সা.) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যেও একই ভাবে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করলেন। এভাবে, 'উমর ইবন আল-খাত্তাব(রা.) ও 'উতবাহ ইবন মালিক আল-খাযরাজি পরস্পরের ভাই হলেন। আবার, তালহাহ ইবন 'উবাইদুল্লাহ ও আবু আইয়ুব আল আনসারী এবং 'আবদ আল-রাহমান ইবন 'আওফ ও সা'দ ইবন আল-রাবি'য়াও পরস্পরের ভাই হয়ে গেলেন ।

মদীনার সমাজে এই ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠার ফলাফল বাস্তবিক ভাবে প্রতিফলিত হয়েছিলো। এই ভ্রাতৃত্ববোধের কারণেই মদীনার আনসাররা তাদের মুসলিম মুহাজির ভাইদের প্রতি প্রদর্শন করেছিলো অকল্পনীয় উদারতা, যা আনসার ও মুহাজিরদের সম্পর্ককে করেছিলো সুদৃঢ় ও মজবুত। ভ্রাতৃত্বের দাবী অনুযায়ী তারা মুহাজিরদের অর্থ-সম্পদ থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুতে অংশীদার করেছিলো। এমনকি তারা একসাথে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কৃষিকাজও করতো। মুহাজিরদের মধ্যে যাদের ব্যবসা করার মতো মনমানষিকতা ছিলো তারা আস্তে আস্তে ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশগ্রহন করতে লাগলো। যেমনঃ 'আবদ আর রহমান ইবন 'আউফ বাজারে মাখন বিক্রি করতেন। আর যারা ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে গেল না, তারা কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে লাগলো। যেমনঃ আবু বকর ও 'আলী (রা.) আনসারদের জমিতে চাষাবাদ করতেন। রাসুল(সা.) বললেন,"যার একখন্ড জমি আছে সে যেন তা চাষ করে, অথবা তার ভাইকে চাষ করার জন্য দেয় ।" এভাবেই মুসলিমরা জীবিকা অর্জনের জন্য বিভিন্ন কাজ করতে লাগলো। কিন্তু, তারপরেও মুসলিমদের মধ্যে ছোট একটি দল রয়ে গেলো, যাদের না ছিলো কোন অর্থ, না পেল তারা কোন কাজ আর না ছিলো তাদের কোন থাকার জায়গা। তারা ছিলো খুবই অভাবী, তারা মুহাজির-আনসার কোন দলেরই অর্ন্তভূক্ত ছিলো না। এরা ছিলো মূলতঃ বেদুইন যারা ইসলাম গ্রহন করার পর মদিনায় এসেছিলো। রাসুল(সা.) নিজে এদের দায়িত্ব নিলেন, মসজিদের এক অংশে তাদের থাকার বন্দোবস্ত করে দিলেন এবং ক্রমে এরা আহল আস সুফ্ফাহ নামে পরিচিতি লাভ করলো। মুসলিমদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহতায়ালা স্বচ্ছলতা দিয়েছিলেন সে সব মহানুভব হৃদয়ের মানুষেরাই এদের প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করতো। এভাবেই আল্লাহর রাসুল(সা.) মদীনার মুসলিমদের জীবনযাত্রাকে স্থিতিশীল করেছিলেন এবং তাদের পরস্পরের সাথে পরস্পরের সম্পর্ককে একটি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। চারিদিকে কুফর পরিবেষ্টিত অবস্থায় মদীনার ইসলামী সমাজ এরকম একটি মজবুত ও দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো বলেই তা মুনাফিক ও ইহুদীদের সকল হীন চক্রান্তকে নস্যাৎ করতে সমর্থ হয়েছিলো। মদীনার ইসলামী সমাজ সবসময়ই ঐকবদ্ধ ছিলো এবং রাসুল(সা.) মুসলিমদের মধ্যকার এই একতাকে নিশ্চিত করেছিলেন ।

মদীনায় ইসলামী সমাজ গঠনে সেখানকার মুশরিকরা কখনোই কার্যকরী কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। প্রথমদিকে, তারা ইসলামী হুকুম-আহকামের কাছে সম্পূর্ন ভাবে নতি স্বীকার করেছিলো, তারপর আস্তে আস্তে সমাজে তাদের প্রভাব কমতে কমতে একসময় তা সম্পূর্ন ভাবে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো ।

আর, ইহুদীদের সমাজ সবসময়ই মদীনার সমাজ থেকে সম্পূর্ন আলাদা ছিলো, এমনকি ইসলাম আসার পূর্বেও। তারপর মদীনায় যখন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলো, ইহুদীদের সাথে মদীনার সমাজের এই পার্থক্য আরও ঘনীভূত হলো। তাই, কিছু নির্ধারিত ভিত্তির উপর ইহুদী ও মুসলিমদের মধ্যে একটি পারস্পারিক সম্পর্ক নির্ধারন করা জরুরী হয়ে পড়লো। সুতরাং, সমাজের অন্যান্য সদস্যদের ব্যাপারে মুসলিমদের অবস্থান কি হবে তা রাসুল(সা.) নির্ধারন করলেন। এই প্রেক্ষাপটে, রাসুল(সা.) মুহাজির ও আনসারদের ব্যাপারে একটি সনদ তৈরী করলেন, যাতে তিনি(সা.) ইহুদীদেরকে ধর্মীয় ও সম্পদে অধিকার দিয়ে তাদের সাথে একটি চুক্তি করলেন এবং বিনিময়ে ইহুদী সম্প্রদায়ের জন্য কিছু দায়িত্ব নির্ধারন করে দিলেন। তিনি(সা.) চুক্তিপত্রটি এভাবে শুরু করেছিলেন,"এটি হচ্ছে আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে সনদ, যিনি কুরাইশ ও ইয়াসরিবের(মদীনা) বিশ্বাসী মুসলিমদের উপর কর্তৃত্বশীল এবং তাদের উপরও যারা তাদেরকে অনুসরন করবে, তাদের সাথে যোগ দেবে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। সমস্ত পৃথিবীর মানুষের বিপরীতে তারা হবে একটি জাতি।" তারপর, তিনি(সা.) বিশ্বাসীদের মধ্যে কিভাবে সম্পর্ক গঠিত হবে তা উল্লেখ করেন। এছাড়া, তিনি(সা.) উক্ত সনদে ইহুদীদের সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক কেমন হবে তাও উল্লেখ করে বলেন,"একজন মুসলিম কখনোই কোন অমুসলিমের খাতিরে কোন মুসলিমকে হত্যা করবে না। এমনকি, একজন অবিশ্বাসীকে কোন মুসলিম একজন মুসলিমের বিরুদ্ধে কখনো সাহায্যও করবে না। আল্লাহর সাথে তাদের কৃত চুক্তি এক এবং চুক্তি ভঙ্গকারী দায়ভার গ্রহন করবে। মু'মিনরা হচ্ছে সমস্ত বহিরাগতদের বিরুদ্ধে একে অপরের সাহায্যকারী। ইহুদীদের মধ্য হতে যারা আমাদের অনুসরন করবে তারা সাহায্য ও সমান অধিকার প্রাপ্ত হবে। তাদের ব্যাপারে কোন অন্যায় করা হবে না, না তাদের শত্রুকে কোনরকম সাহায্য করা হবে। মু'মিনদের মধ্যকার শান্তি থাকবে অবিচ্ছেদ্য। মু'মিনরা যখন আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করবে তখন কোনরকম পৃথক শান্তিচুক্তি করা যাবে না। চুক্তির শর্ত অবশ্যই সবার জন্য সমান ভাবে যুক্তিযুক্ত হতে হবে।" এ চুক্তিতে যে সকল ইহুদী গোত্র মদীনার সীমানার বাইরে বাস করতো তাদের কথা বলা হয়নি, বরং যে সব ইহুদী ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হতে চেয়েছিলো শুধু তাদের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রদত্ত চুক্তি অনুযায়ী, মদীনায় বসবাসকারী যে কোন ইহুদী ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে মুসলিমদের সমান অধিকার পেয়েছিলো এবং তাদের সাথে মুসলিমদের মতোই ব্যবহার করা হতো। ইসলামী রাষ্ট্রে তাদেরকে জিম্মি (শর্তসাপেক্ষে নাগরিক) হিসাবে বিবেচনা করা হতো। চুক্তিপত্রের পরের দিকে যে সব ইহুদী গোত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাদের মধ্যে ছিলো বনু 'আউফ এবং বনু নাজ্জার এবং আরও অনেকে।

উল্লেখিত ইহুদী গোত্রগুলোর সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের সম্পর্ক কেমন হবে তা এ সনদে উল্লেখ করা ছিলো। এখানে পরিষ্কার ভাবে লিখিত ছিলো যে, ইহুদী ও মুসলিমদের মধ্যকার এ সম্পর্ক হবে শুধুমাত্র ইসলামী হুকুম-আহকাম, ইসলামের শাসন-কর্তৃত্ব এবং ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও স্বার্থ রক্ষার উপর ভিত্তি করে। চুক্তির কিছু কিছু শর্ত ছিলো নিম্নরূপঃ

১. The close friends of the Jews are as themselves. মুহাম্মদ(সা.) এর অনুমতি ছাড়া কেউ মদীনার বাইরে যেতে পারবে না।

২. চুক্তিপত্রে উল্লেখিত সকলের জন্য ইয়াসরিব পূণ্যভূমি হিসাবে বিবেচিত হবে।

৩. যদি কোন ব্যাপারে কোন মতভেদ বা বিবাদের সৃষ্টি হয়, যা কিনা সমাজে কোন ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে, তবে তা অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

৪. কুরাইশ এবং তাদের সাহায্যকারীদের কোনরকম নিরাপত্তা দেয়া হবে না।

আল্লাহর রাসুলের তৈরী এ সনদ মদীনার প্রান্তসীমায় বসবাসরত ইহুদী গোত্রগুলোর অবস্থান নির্ধারন করেছিলো। এ সনদ তাদের উপর এ শর্তও আরোপ করেছিলো যে, আল্লাহর রাসুল(সা.) অর্থাৎ, ইসলামী রাষ্ট্রের অনুমতি ব্যতীত তারা মদীনার বাইরে যেতে পারবে না। এ চুক্তির মাধ্যমে ইহুদী গোত্রগুলোকে যুদ্ধ বা অন্য কোন গোত্রকে যুদ্ধে সহযোগিতার মাধ্যমে মদীনার পবিত্রতা বা শান্তি নষ্ট করা নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো। এছাড়া, ইহুদী গোত্রগুলোর উপর কুরাইশ গোত্র বা কুরাইশদের মিত্রদেরকেও কোনরকম সাহায্য করার ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিলো। চুক্তি অনুযায়ী, সনদের কোন ব্যাপারে বিবাদের সৃষ্টি হলে তারা তা আল্লাহর রাসুল(সা.) এর দিকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য ছিলো। ইহুদীরা এ চুক্তির সকল শর্ত মেনে নিয়েছিলো এবং উল্লেখিত গোত্রগুলোও শর্ত মেনে নিয়ে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলো। এ গোত্রগুলোর মধ্যে ছিলো বুনু 'আউফ, বনু আল-নাজ্জার, বনু আল-হারিছাহ, বনু সায়ি'দাহ, বনু জুশাম, বনু আল-আউস এবং বনু ছালাবাহ। বনু কুরাইজা, বনু আল-নাজির এবং বনু কাইনুকা' এ সময় এ চুক্তিতে স্বাক্ষর না করলেও পরবর্তীতে তারা স্বেচ্ছায় চুক্তির সকল শর্ত মেনে নিয়েই এতে স্বাক্ষর করেছিলো।

এ চুক্তির মাধ্যমে রাসুল(সা.) নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যকার সম্পর্কগুলো শক্ত ভাবে নিরুপণ করেছিলেন। এছাড়া, ইসলামী রাষ্ট্র এবং প্রতিবেশী ইহুদী গোত্রগুলোর মধ্যকার সম্পর্কও দৃঢ় ও সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণিত শর্তের ভিত্তিতে রচিত হয়েছিলো। উভয় ক্ষেত্রেই ইসলামী হুকুম আহকামকেই সব বিচার-ফায়সালার মাপকাঠি হিসাবে ধরা হতো। মূলতঃ এ পর্যায়ে আল্লাহর রাসুল(সা.) মোটামুটি ভাবে নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, ইসলামী রাষ্ট্র একটি শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ইহুদীদের অর্তকিত আক্রমণ ও বিশ্বাসঘাতকতা থেকে নবগঠিত এ রাষ্ট্র কিছুটা

নিরাপত্তা লাভ করেছে। সুতরাং, এরপর তিনি(সা.) ইসলামী দাওয়াতের পথে অবস্থিত বস্তুগত বাঁধা অপসারনে মনোনিবেশ করলেন এবং জিহাদের প্রস্তুতি নিতে থাকলেন।

## জিহাদের প্রস্তুতিঃ

মদীনার প্রান্তসীমায় অবস্থিত ইহুদী গোত্রগুলোর সাথে চুক্তি সম্পন্ন হবার পর রাসুল(সা.) যখন বুঝলেন যে, মদীনার নবগঠিত ইসলামী সমাজ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন তিনি জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন। কারণ, দ্বীন ইসলামের আহবানকে সমস্ত পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে দিয়ে কুফর নিয়ন্ত্রিত ভূমিকে ইসলামের পতাকাতলে নিয়ে আসা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। আর ইসলামের আহবানকে ছড়িয়ে দেবার এ কাজটি কোন ভাবেই মিশনারীদের কাজের সাথে তুলনীয় নয়। বরং, ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো মানুষকে ইসলামের দিকে আহবান করা, তাদেরকে ইসলামী ধ্যান-ধারণা ও হুকুম-আহকাম শিক্ষা দেয়া ও সমাজের মানুষকে এ আলোকে গড়ে তোলা এবং সর্বোপরি সমাজ ও রাষ্ট্রে দ্বীন ইসলাম বাস্তবায়নের পথে যে কোন ধরনের বস্তুগত বাঁধা অপসারণ করতে প্রয়োজনীয় বস্তুগত পদক্ষেপ গ্রহন করা।

বস্তুতঃ মক্কার কুরাইশরা সবসময়ই দ্বীন ইসলাম প্রচারের পথে সর্বাত্মক বস্তুগত বাঁধা তৈরী করেছে, যে কারণে এ বাঁধা অপসারনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা এমনিতেই জরুরী ছিলো। এ চিন্তা মাথায় রেখে এবং একই সাথে মদীনায় সীমানা অতিক্রম করে ইসলামের আহবানকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে রাসুল(সা.) তাঁর সৈনাবাহিনী প্রস্তুত করতে শুরু করলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি(সা.) কুরাইশদেরকে চ্যালেঞ্জ করে বিশেষ উদ্দেশ্যে কিছু বাহিনী প্রেরণ করেন যা একই সাথে মদীনার মুনাফিক, ইহুদী ও মদীনার বাইরের ইহুদী গোত্রগুলোকেও সর্তক সংকেত প্রদান করেছিলো। তিনি চারমাসে মদীনার বাইরে তিনটি সৈন্যদল পাঠান।

তিনি(সা.) হামযাহ(রা.) এর নেতৃত্বে মুহাজিরদের মধ্য হতে ত্রিশজনের একটি দলকে আল-'ইশয়ের নিকটবর্তী অঞ্চলে পাঠান, এ অভিযানে আনসারদের মধ্য থেকে কেউ অংশগ্রহন করেনি। হামযাহ(রা.) তাঁর দলবলসহ সমুদ্র তীরে আবুজাহল ইবন হিশাম ও তার তিনশত সহযাত্রীর মুখোমুখি হলে যুদ্ধাবস্থার সৃষ্টি হয়, কিন্তু মাযদি ইবন 'আমর আল-জুহানি উভয় পক্ষকে যুদ্ধ ব্যতীতই আলাদা করে দেন। এরপর রাসুল(সা.) মুহাজিরদের মধ্য হতে ষাট জন অশ্বারোহীকে মুহাম্মদ ইবন 'উবাইদা ইবন আল-হারিছাহর নেতৃত্বে অভিযানে পাঠান। এ অভিযানেও আনসারদের মধ্য হতে কেউ ছিলো না। মুহাম্মদ ইবন 'উবাইদা(রা.) রাবিগাহর উপত্যকায় আবু সুফিয়ানের মুখোমুখি হন। আবু সুফিয়ান এ সময় দুশোরও বেশী অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিল। এ অভিযানও শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ পর্যন্ত গড়ায়নি, শুধুমাত্র সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস ঐদিন শত্রুপক্ষকে উদ্দেশ্য করে একটি তীর নিক্ষেপ করেছিলেন। এছাড়া, আল্লাহর রাসুল(সা.) সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে বিশজন অশ্বারোহীকে মক্কার দিকে প্রেরণ করেছিলেন, কিন্তু তারাও কোনরকম যুদ্ধ ব্যাতীতই ফিরে আসেন।

এ অভিযানগুলো মূলতঃ মদীনায় যুদ্ধের একটি আবহ তৈরী করেছিলো এবং রাসুল(সা.) এর পরিকল্পিত একের পর এক এই অভিযানগুলো মক্কার কুরাইশদেরকেও যথেষ্ট পরিমাণে শঙ্কিত করেছিলো। কিন্তু, রাসুল(সা.) শুধু তাঁর দলবলকে অভিযানে প্রেরণ করেই থেমে থাকেননি বরং, পরবর্তীতে তিনি(সা.) নিজেও কুরাইশদের বিরুদ্ধে অভিযানে অংশগ্রহন করেন। মদীনাতে রাসুল(সা.) এর হিজরতের এক বছর পর তিনি(সা.) কুরাইশ এবং বনু দামরাহ গোত্রকে অতর্কিত আক্রমণের উদ্দেশ্যে ওয়াদ্দান পর্যন্ত পৌঁছে যান। এ অভিযানে তিনি(সা.) কুরাইশদের মুখোমুখি না হলেও বনু দামরাহ গোত্র আল্লাহর রাসুলের সাথে শান্তিচুক্তি করে। এরপর আল্লাহর রাসুল(সা.) মদীনার আনসার ও মুহাজিরদের সমন্বয়ে গঠিত দুইশত যোদ্ধা সহ অভিযানে বের হন এবং রাদওয়ার নিকটবর্তী বুয়াত নামক স্থানে পৌঁছান। এ অভিযানের উদ্দেশ্য ছিলো উমাইয়া ইবনে খালফের নেতৃত্বে প্রায় আড়াই হাজার উট এবং একশত যোদ্ধার সম্বন্বয়ে গঠিত পৌত্তলিকদের বাণিজ্য কাফেলাকে ধাওয়া করা। কিন্তু, এ বাণিজ্য কাফেলাটি প্রচলিত পথ না ধরে অন্য পথ ধরে যাত্রা করায় আল্লাহর রাসুল(সা.) পৌত্তলিকদের এ দলটিকে ধরতে ব্যর্থ হন। বুয়াত অভিযানের তিন মাস পর রাসুল(সা.) আবু সালামাহ ইবন 'আবদ আল-আসাদকে মদীনার দায়িত্বে রেখে দু'শোর বেশি মুসলিম সহ আবারও অভিযানে বের হন। তিনি(সা.) তাঁর দলবল সহ ইয়ানবু উপত্যকার আল-'উশাইরাহ নামক স্থানে পৌঁছান। এ স্থানে তিনি(সা.) জমাদিউল আউয়াল মাসে পৌঁছান এবং জমাদিউস সানির কিছুদিন পর্যন্ত এখানে অবস্থান করেন। এ স্থানে তিনি কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলাকে ধাওয়া করার জন্য অবস্থান গ্রহন করেন। কিন্তু, এবারও তিনি(সা.) তাঁর লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হন। কিন্তু, এ অভিযান একেবারে ব্যর্থ হয়নি, কারণ এই অভিযানে তিনি(সা.) বনু মুদলাজ এবং তাদের মিত্র বনু দামরাহর সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন।

এরপর আল্লাহর রাসুল(সা.) মদীনায় ফিরে আসার মাত্র দশদিনের মধ্যে কারজ ইবন জাবির আল ফাহরি নামে এক পৌত্তলিক মদীনার চারনভূমি আক্রমণ করে। আল্লাহর রাসুল(সা.) সাহাবীদের সঙ্গে নিয়ে তার খোঁজে বের হন। কারজ ইবন জাবির ছিলো কুরাইশদের মিত্র পক্ষের লোক। আল্লাহর রাসুল(সা.) বদরের নিকটবর্তী সাফওয়ান উপত্যকা পর্যন্ত কারজ ইবন জাবিরকে ধাওয়া করেন। কিন্তু, কারজ ইবন জাবির পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এটা ছিলো বদর প্রান্তরে মুসলিমদের প্রথম আক্রমণ।

এভাবেই আল্লাহর রাসুল(সা.) তাঁর গঠিত সৈন্যবাহিনীকে সমস্ত আরব ব-দ্বীপ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে অভিযানে পাঠিয়ে কুরাইশদের প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ করতে শুরু করেন। যদিও এ সকল অভিযানে প্রকৃতপক্ষে কোন যুদ্ধ সংগঠিত হয়নি কিন্তু, তারপরেও এ সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিযান থেকে অর্জিত প্রাপ্তি পরবর্তী সময়ের বড় বড় যুদ্ধের পথকে মসৃণ করেছিলো। কারণ, এ সমস্ত অভিযানে মুসলিমদের যে সামরিক প্রশিক্ষণ হয় তা মূলতঃ তাদের যুদ্ধের ময়দানের জন্যই প্রস্তুত করে। এছাড়া, মুসলিমদের ছোট ছোট এ সমস্ত অভিযান মদীনার মুনাফিক ও ইহুদী গোত্রগুলোর মেরুদন্ডে আতঙ্কের স্রোত প্রবাহিত করে, যা তাদের মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোন ধরনের ঝামেলা তৈরী করার চিন্তা থেকে বিরত রাখে। কুরাইশদের উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাসুল(সা.) এর এ প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ যেমন একদিকে পৌত্তলিকদের মনোবল ভেঙ্গে দিয়েছিলো আবার অন্যদিকে মুসলিমরা মানসিক ভাবে প্রচন্ড ভাবে আত্মবিশ্বাসের সাথে উজ্জীবিত হয়েছিলো। এছাড়া, রাসুল(সা.) মদীনা এবং লোহিত সাগর তীরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসবাসকৃত বিভিন্ন গোত্র যেমন, বনু দামরাহ, বনু মুদলাজ এবং আরও অনেক গোত্রের সাথে মিত্রতার চুক্তি করে কুরাইশদের সিরিয়াগামী বাণিজ্য কাফেলার পথে অনেক বাঁধাবিপত্তিরও সৃষ্টি করেন।

## জিহাদের সূচনাঃ

মদীনা নামক যে ভূমিকে রাসুল(সা.) বসবাস করবার জন্য বেছে নিয়েছিলেন, সেখানে তিনি(সা.) ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই ইসলামী হুকুম-আহকামও বাস্তবায়ন করেছিলেন। বস্তুতঃ মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরই আল্লাহর তরফ থেকে হুকুম-আহকামের আয়াত নাযিল হতে থাকে। রাসুল(সা.) ইসলামী রাষ্ট্রের মূলভিত্তি এবং মদীনার সমাজকে ইসলামী আকীদাহ ও আইন-কানুনের ভিত্তিতেই শক্তিশালী করেছিলেন এবং মদীনার মুসলিমদের (মুহাজির ও আনসার) মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এরপর শরীয়াহর মাধ্যমে ইসলামী শাসনব্যবস্থা মদীনার মুসলিমদের জীবনে বাস্তবিক ভাবে অনুপ্রবেশ করে এবং পরবর্তীতে ইসলামী শাসনব্যবস্থার আলোকে গঠিত এই সমাজই সমস্ত পৃথিবীতে ইসলামের বার্তা বহনের গুরুদায়িত্ব পালন করে। The number of Muslims substantially increased and they became a force to be reckoned with , individuals and groups alike embraced Islam every other day, amongst them Jews and others.

রাসুল(সা.) মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের শক্তিসামর্থ্যের ব্যাপারে নিশ্চিত হবার সাথে সাথে সমস্ত আরব ব-দ্বীপে ইসলামের বার্তা পৌঁছে দেবার ব্যাপারে মনোযোগী হলেন। একই সাথে তিনি(সা.) এটাও বুঝতে পারছিলেন যে, মক্কার কুরাইশরা ইসলামের দাওয়াতী কার্যক্রমের পথে যে কঠিন বাঁধা সৃষ্টি করে রেখেছে সে কঠিনতম বাঁধা অতিক্রম করতে শক্তিপ্রয়োগ অপরিহার্য। কারণ, কুরাইশদের এই প্রবল প্রতিরোধের মুখে শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিক পন্থায় দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করা আর অরণ্যে রোদন করা ছিলো আসলে একই কথা।

রাসুল(সা.) যখন মক্কায় তাঁর দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করছিলেন তখন তাঁর পক্ষে এ কঠিনতম বাঁধা অতিক্রম করা ছিলো অসম্ভব। কারণ, তখন না ছিলো ইসলাম রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আর না ছিলো বাঁধা অপসারণে প্রয়োজনীয় বস্তুগত শক্তি অর্জনের কোন সুযোগ। কিন্তু, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার সাথে সাথেই রাসুল(সা.) বস্তুগত এ শক্তি অর্জনের সুযোগ ও ক্ষমতার অধিকারী হন। বাঁধা অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করার সুযোগও তাঁর হাতে এসে যায়। এরপর তিনি(সা.) যা করেন, তা হলো মূলতঃ তাঁর সৈন্যবাহিনীকে মুখোমুখি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা এবং দাওয়াতী কার্যক্রম প্রচার প্রসারে নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরী করা। এ কারণেই তিনি(সা.) তাঁর দলবলকে বিভিন্ন আরব ভূ-খন্ডের বিভিন্ন স্থানে অতর্কিত অভিযানে পাঠান, যার মধ্যে কোন কোন তিনি নিজেও অংশগ্রহন করেছিলেন। এ সমস্ত অভিযানের উদ্দেশ্যই ছিলো পৌত্তলিকদের মুসলিমদের শক্তিসামর্থ প্রদর্শন করার মাধ্যমে পৌত্তলিকদের সরাসরি চ্যালেঞ্জ করা। এ অভিযানগুলোর মধ্যে সর্বশেষ অভিযান ছিলো 'আব্দুল্লাহ ইবন জাহশের অভিযান, মূলতঃ এটা ছিলো বদরের যুদ্ধের সূচনা পর্ব।

হিজরী দ্বিতীয় সালের রজব মাসে মুহাম্মদ(সা.) 'আব্দুল্লাহ ইবন জাহশের নেতৃত্বে মুহাজিরদের একটি দলকে অভিযানে পাঠান। তিনি(সা.) 'আব্দুল্লাহ ইবন জাহশকে তাঁর লিখিত একটি চিঠি দেন এবং আদেশ দেন যেন দুই দিনের পথ অতিক্রম করার পূর্বে এটি খোলা না হয়। চিঠি খোলার পর তিনি(সা.) 'আব্দুল্লাহ ইবন জাহশকে তাঁর লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করার আদেশ দেন এবং এ আদেশ পালনে তার দলের অন্যান্যদের জোর জবরদস্তি করতে নিষেধ করেন। দুইদিন যাত্রার পর 'আব্দুল্লাহ ইবন জাহশ চিঠি খুলে দেখলেন সেখানে লেখা আছে,"আমার এই চিঠি পড়ার পর তোমরা মক্কা ও তা'য়িফের মধ্যবর্তী স্থান নাখলাহ পর্যন্ত যাত্রা করবে এবং কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলার জন্য ওৎ থাকবে এবং তারা যা যা কিছু বহন করছে সে সম্পর্কে আমাদের অবহিত করবে।" চিঠি পড়ার পর তিনি চিঠির বিষয়বস্তু ও রাসুল(সা.) এর নির্দেশ সম্পর্কে তার সঙ্গীদের অবহিত করেন এবং একই সাথে এটাও জানিয়ে দেন যে, আল্লাহর রাসুল(সা.) এ দায়িত্ব পালনে কাউকে জোর জবরদস্তি করতে নিষেধ করেছেন।

দলের সকলেই অর্পিত দায়িত্ব পালনে সম্মতি প্রকাশ করে এবং গন্তব্যের দিকে দলবদ্ধ ভাবে এগিয়ে যেতে থাকে। একপর্যায়ে সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস আল জুহরি এবং 'উতবাহ ইবন গাজওয়ান তাদের হারানো উট খুঁজতে গিয়ে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে, তারা দু'জন

কুরাইশদের হাতে বন্দী হয়। এদিকে, 'আব্দুল্লাহ ইবন জাহশ নাখলাহ নামক স্থানে পৌঁছে রাসুল(সা.) এর নির্দেশ অনুসারে কুরাইশদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে এবং একপর্যায়ে বাণিজ্য সামগ্রী ভর্তি কুরাইশদের একটি ক্যারাভান তার নজরে আসে। 'আব্দুল্লাহ ইবন জাহশ কি করবে সেটা নির্ধারণ করার জন্য তার সঙ্গী সাথীদের সাথে পরামর্শ করতে থাকে। কারণ, সেদিন ছিলো রজব মাসের শেষ দিন আর রজব মাস ছিলো যুদ্ধ করার জন্য নিষিদ্ধ মাস। তারা ভাবতে থাকে, যদি তারা কাফেলাকে আক্রমণ করে তবে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা হবে অথচ আল্লাহর রাসুল(সা.) তাদের এ ব্যাপারে কোন নির্দেশ দেননি। তারা একে অপরকে বলতে থাকে,"আল্লাহর কসম, তোমরা যদি আজ রাতে তাদের ছেড়ে দাও তবে তারা পবিত্র এলাকায় প্রবেশ করবে এবং তোমাদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে। আর, যদি তোমরা তাদের হত্যা করো তবে, তোমরা তাদের নিষিদ্ধ মাসে হত্যা করবে।" প্রথমদিকে তারা আক্রমণ করার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্থ এবং ভীত থাকলেও পরবর্তীতে তারা শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করার জন্য এক অন্যকে উৎসাহিত করে এবং আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। মুসলিমদের মধ্য হতে একজন বাণিজ্য কাফেলার নেতা 'আমর ইবন হাদরামিকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করে এবং তাকে হত্যা করে। শেষ পর্যন্ত তারা কাফেলার দু'জনকে বন্দী করে এবং সমস্ত বাণিজ্য সামগ্রী নিয়ে তারা মদীনায় ফিরে আসে।

মদীনায় প্রত্যাবর্তন করার পর রাসুল(সা.) তাদের বলেন,"আমি তো তোমাদের নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করার কোন নির্দেশ দেইনি।" অতঃপর, তিনি(সা.) বন্দী দুজনের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহন বা যুদ্ধলব্ধ মালামাল থেকে কোনকিছু নিতে অস্বীকার করেন। এটাই ছিলো 'আব্দুল্লাহ ইবন জাহশের নেতৃত্বে অভিযানের সর্বশেষ ফলাফল। যদিও, আল্লাহর রাসুল(সা.) এ দলটিকে কুরাইশদের উপর নজরদারি করার জন্য পাঠিয়েছিলেন কিন্তু, শেষ পর্যন্ত এ ঘটনা নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ, হত্যাকান্ড, শত্রুপক্ষকে যুদ্ধবন্দী হিসাবে মদীনায় নিয়ে আসা এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ গণীমতের মাল হিসাবে নিয়ে আসা পর্যন্ত গড়ায়। সুতরাং, এ বিষয়ে ইসলামী শরীয়াহ্‌র হুকুম কি হতে পারে?

বস্তুতঃ এ বিষয়ে আল্লাহর সিদ্ধান্তের জন্যই রাসুল(সা.) অপেক্ষা করতে থাকেন এবং এ কারণেই তিনি(সা.) যুদ্ধবন্দী ও প্রাপ্ত মালামালের ব্যাপারে কোনরকম সিদ্ধান্ত গ্রহনে বিরত থাকেন। অপরদিকে, কুরাইশরা এ ঘটনাকে ইসলাম ও মুহাম্মদ(সা.) সম্পর্কে অপপ্রচার করার মোক্ষম সুযোগ হিসাবে লুফে নেয়। তারা সমস্ত আরব গোত্রগুলোর মধ্যে প্রচার করতে থাকে যে, মুহাম্মদ(সা.) ও সঙ্গীরা নিষিদ্ধ মাসের পবিত্রতা নষ্ট করেছে, তারা পবিত্র মাসে রক্তপাত করেছে, সম্পদ লুট করেছে এবং কুরাইশদের বন্দী করেছে। এ বিষয়কে কেন্দ্র করে মক্কায় অবস্থিত মুসলিম ও পৌত্তলিক কুরাইশদের মধ্যে বাকবিতন্ডা শুরু হয়। মক্কার মুসলিমরা তাদের মদীনার মুসলিম ভাইদের এ বলে রক্ষা করার চেষ্টা করে যে, মুসলিমরা রজব মাসে নয় বরং শাবান মাসে কাফেলা আক্রমণ করেছে। কিন্তু, ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের ব্যাপক নেতিবাচক প্রচারনা দমনে তাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অপরদিকে, ইহুদীরাও এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে থাকে এবং তারা 'আব্দুল্লাহ ইবন জাহশের কাজের ব্যাপক সমালোচনা ও তাকে সমাজে হেয় প্রতিপন্ন করতে শুরু করে। পৌত্তলিক ও ইহুদীদের মিলিত এ অপপ্রচারে মুসলিমরা মারাত্মক ভাবে আক্রান্ত হয়। আর আল্লাহর রাসুল(সা.) নীরব থেকে এ ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। অবশেষে, আল্লাহ সুবহানুওয়াতায়ালা এ বিষয়কে কেন্দ্র করে সুরা বাকারার কয়েকটি আয়াত নাজিল করেন,

*Òm¤§wbZ gvm m¤ú‡K †Zvgv‡i Kv‡Q (Zviv) wR‡Ám K‡i †h, Zv‡Z h× Kiv †Kgb? e‡j `vI, G‡Z h× Kiv fxlY eo cvc| Avi আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরী করা, মসজিদে হারামের পথে বাঁধা দেয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদের বহিস্কার করা, আল্লাহর wbKU Zvi †_‡K I eo cvc| Avi wdZbv mwó Kiv binZ¨v A‡c¶vI gnvcvc| e¯Zt Zviv †Zv me`vB †Zvgv‡`i mv‡_ h× Ki‡Z _vK‡e, hv‡Z K‡i †Zvgv‡`i‡K Øxb †_‡K wdwi‡q w`‡Z cv‡i, hw` Zv m¤e nq|Ó* [সুরা বাকারাহঃ ২১৭]

এই আয়াতটি নাজিল হবার পর মুসলিমরা আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠে এবং রাসুল(সা.) তারপর যুদ্ধলব্ধ মালামাল মুসলিমদের মাঝে বিতরণ করে দেন এবং সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস আল জুহরী এবং 'উতবাহ ইবন গাজওয়ান এর মুক্তির বিনিময়ে কুরাইশ যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করে দেন। বস্তুতঃ কুরআনের এই আয়াতটি কুরাইশদের ইসলামের বিরুদ্ধে সমস্ত অপপ্রচারকে একনিমিষে স্তব্ধ করে দেয়। পবিত্র মাসে যুদ্ধের ব্যাপারে এ আয়াতটি কুরাইশদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে এবং একই সাথে এটাও ঘোষণা করে যে, পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা পাপ কিন্তু,আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষকে মসজিদুল হারাম থেকে ফিরিয়ে দেয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদের বহিস্কার করা, পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা ও হত্যা করা হতেও গুরুতর পাপ।

দ্বীন ইসলাম গ্রহন করার কারণে মুসলিমদের উপর কুরাইশদের নির্মম অত্যাচার ও চরম নির্যাতনমূলক আচরন আল্লাহর দৃষ্টিতে ছিলো পবিত্র মাস কিংবা অন্য কোন মাসে যুদ্ধ ও হত্যা অপেক্ষাও গুরুতর ব্যাপার । বস্তুতঃ মক্কায় অবস্থান কালে কুরাইশরা মুসলিমদেরকে দ্বীন ইসলাম থেকে ফেরানোর জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়েছিলো এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক ভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলো। এ অবস্থায় মুসলিমদের কুরাইশদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া ব্যতীত আর কোন পথই খোলা ছিলো না। যদি তা হারাম মাসে হয় তবুও। কুরাইশরাই বস্তুতঃ ইসলামী দাওয়াতের পথে চূড়ান্ত রকমের বাঁধা সৃষ্টি করেছিলো, তারা আরবের জনসাধারনকে ইসলাম গ্রহন করা থেকে বিরত রেখেছিলো, নিজেরা জেনেশুনে আল্লাহকে অস্বীকার করেছিলো, মসজিদুল হারামের পবিত্র এলাকা থেকে সেখানকার অধিবাসীদের বহিস্কার করেছিলো এবং সর্বোপরি ইসলাম গ্রহনের জন্য মুসলিমের উপর প্রচন্ড নির্যাতন চালিয়েছিলো। নিষিদ্ধ মাস কিংবা অন্য যে কোন মাসে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করাই

ছিলো তাদের কর্মফলের উপযুক্ত প্রতিদান। সুতরাং, 'আব্দুল্লাহ ইবন জাহশ পবিত্র মাসে কুরাইশদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধের সূচনা করেছিলেন, তা তাকে বা কোন মুসলিমকেই আসলে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারেনি।

আর এভাবেই, 'আব্দুল্লাহ ইবন জাহশের নেতৃত্বে মুসলিমদের এ অভিযান হয়ে গেল ইসলামের ইতিহাসের একটি মাইল ফলক। এ ঘটনাই মূলতঃ ইসলামী দাওয়াতী কার্যক্রম প্রচার-প্রসারে গৃহীত পদ্ধতির ব্যাপক পরিবর্তনের জন্য একটি দিকনির্দেশনা হয়ে থাকলো। এ অভিযানে ওয়াকিদ ইবন 'আব্দুল্লাহ আল-তামিমি তীর ছুঁড়ে কুরাইশ কাফেলার সর্দারকে হত্যা করে এবং এটাই ছিলো আল্লাহর পথে কোন মুসলিমের হাতে প্রথম রক্তপাত। জিহাদের আয়াত নাজিলের পূর্ব পর্যন্ত পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধই থাকে। যদিও এ ঘটনার পর এ ব্যাপারে হুকুমটি পরিবর্তিত হয়ে যায়। বস্তুতঃ উপরোক্ত আয়াতটির মাধ্যমে আল্লাহতায়ালা পবিত্র মাসে যুদ্ধ করার উপর থেকে পূর্ববর্তী নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন।

## মদীনার জীবনঃ

ইসলামের রয়েছে একটি নির্দিষ্ট জীবনব্যবস্থা যেটা মূলতঃ রূপ লাভ করছে জীবন সম্পর্কে কিছু বিশেষ ধ্যানধারনার থেকে। এগুলোই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতির মূল উপাদান, যেটা অন্য যে কোন সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ন ভাবে আলাদা। ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে তিনটি মূল বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়ঃ

১. ইসলামী জীবনব্যবস্থা ইসলামী আকীদাহ বা বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত।

২. ইসলামী জীবনব্যবস্থায় মানুষের সকল কর্মকান্ড পরিচালিত হয় আল্লাহ নির্ধারিত হালাল-হারামের উপর ভিত্তি করে।

৩. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করাই এ জীবনব্যবস্থায় সুখের প্রকৃত অর্থ।

এটাই হচ্ছে ইসলামী জীবনব্যবস্থা এবং এ রকম একটি জীবনই মুসলিমদের এক এবং একমাত্র কাম্য। কিন্তু, এ রকম একটি জীবনব্যবস্থা পেতে হলে মুসলিমদের অবশ্যই দরকার একটি ইসলামী রাষ্ট্র, যা ইসলামকে পরিপূর্ণ ভাবে বাস্তবায়ন করবে এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম-আহকামকে সমাজে সর্বতোভাবে বাস্তবায়ন করবে।

মুসলিমরা মদীনায় হিজরতের পর ইসলামী আকীদাহর ভিত্তিতে রচিত একটি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী জীবন পরিচালনা করেছিলো। আর, এই সময়ই সমাজ জীবন, বিভিন্ন অপরাধের শাস্তি সম্পর্কিত আয়াত এবং ইবাদত সম্পর্কিত আয়াত নাজিল হয়। হিজরী দ্বিতীয় সালে মুসলিমদের উপর যাকাত ও সিয়াম ফরজ করা হয়। এরপর আজান ফরজ করা হয় এবং মদীনাবাসী বিলাল ইবন রাবি'য়াহ সুললিত কণ্ঠে দিনে পাঁচবার আজান শুনতে থাকে। আল্লাহর রাসুল(সা.) মদীনায় আসার ১৭ মাস পর কিবলার দিক পরিবর্তন করে কাবাকে কিবলা হিসাবে নির্ধারন করা হয়। এরপর একে একে ইবাদত, খাদ্য, মূল্যবোধ, মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক এবং আল্লাহর হুকুম অমান্য করা সম্পর্কিত কুরআনের বিভিন্ন আয়াত নাজিল হতে থাকে। মদ এবং শুকরের মাংস নিষিদ্ধ করা হয় এবং বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকান্ড ও অপরাধীর শাস্তি বিষয়ক আয়াতও এ সময়ে নাজিল হয়। আয়াত নাজিল করা হয় ব্যাবসায়িক লেনদেন বিষয়ে, সব ধরনের সুদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। মদীনায় যখনই মুসলিমদের দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কিত কোন আয়াত নাজিল হতো আল্লাহর রাসুল(সা.) আয়াতটিকে মুসলিমদের জন্য ব্যাখ্যা করতেন যেন তারা সে অনুযায়ী তাদের জীবন পরিচালনা করতে পারে। তিনি(সা.) মদীনার মুসলিমদের সকল বিষয় দেখাশুনা করতেন, তিনি তাঁর কথা, কাজ ও তাঁর সম্মুখে ঘটিত কাজের ব্যাপারে নীরব থেকে মুসলিমের মধ্যকার ঝগড়া-বিবাদ মিটমাট ও সমস্যার সমাধান করতেন। এজন্যই রাসুল(সা.) এর কথা, কাজ ও বিশেষ বিষয়ে তাঁর নীরবতা সবই শরীয়াহর উৎস। কারণ, আল্লাহ সুবহানুওয়াতায়ালা সুরা নাজমে বলেছেন,

*ÒGes (wZwb) cewËi Zvobvq K_v e‡jb bv| (GB) KiAvb n‡jv Inx, hv cZ¨v‡`k nq|Ó* [সুরা নাজমঃ ৩-৪]

এভাবেই মদীনায় মুসলিমদের জীবন সম্পূর্ন ব্যতিক্রমধর্মী একটি দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পরিচালিত হতে থাকে, আর এই দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো পুরোপুরি ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি। আর ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করেই একটি ব্যতিক্রমধর্মী সমাজ ধীরে ধীরে জীবন্ত হয়ে উঠে। ইসলামী ধ্যান-ধারণা ও আবেগ অনুভূতি ক্রমশ বিস্তৃতি লাভ করতে শুরু করে এবং সমাজের সর্বস্তরে ইসলামের হুকুম-আহকামগুলোও পরিপূর্ণ ভাবে বাস্তবায়িত হয়। দ্বীন ইসলাম সমাজের মানুষকে দেয় জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান এবং দেয় জীবনের সমস্ত বিষয়ে দিকনির্দেশনা। ইসলামী দাওয়াতের এ পর্যায়টি, যে পর্যায়ে মুসলিমরা ইসলামের উপর পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিলো তা রাসুল(সা.)কে সত্যিকার ভাবে আনন্দিত করেছিলো। কারণ, এ পর্যায়ে মুসলিমরা নির্ভয়ে এবং কোনরূপ অত্যাচার নির্যাতন ব্যতীতই ব্যক্তিগত ও দলবদ্ধ ভাবে ইসলামের সমস্ত হুকুম-আহকাম মেনে চলতে পারছিলো এবং ইসলাম একটি শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিলো। তারা তাদের জীবনের সমস্ত সমস্যা আল্লাহতায়ালার হুকুম

অনুযায়ী সমাধান করতো, নতুন কোন বিষয়ের অবতারণা হলে তা সবসময়ই তা আল্লাহর রাসুলের দিকে ফিরিয়ে দিতো এবং তারা কখনোই আল্লাহর নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করতো না। শুধু তাই নয়, তারা তাদের প্রতিটি কর্মকান্ডও আল্লাহর হুকুমের ভিত্তিতে পরিচালিত করতো আর এতেই তারা সত্যিকারের মানসিক শান্তি ও সুখ লাভ করতো। মুসলিমদের মধ্য হতে অনেকে দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহন, কুরআন মুখস্ত করা কিংবা জ্ঞানার্জনের আশায় মুহাম্মদ(সা.)কে ছায়ার মতো অনুসরণ করতো। এভাবে ধীরে ধীরে ইসলাম বিস্তৃতি লাভ করে এবং মুসলিমরাও দিনে দিনে শক্তিশালী হতে থাকে।

## ইহুদী এবং খ্রীষ্টানদের সাথে বির্তকঃ

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই অমুসলিমরা মুসলিমদের শক্তিসার্মথ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে যায়। তারা বুঝতে পারে যে, মুসলিমদের শক্তিসার্মথ্য আসলে তাদের হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত। আর, তারা এটাও বুঝতে পারে যে, যে হৃদয় ইসলামের জন্য সকল প্রকার অত্যাচার নির্যাতনের পথ পাড়ি দিয়েছে সে হৃদয় কখনো দ্বীন ইসলাম রক্ষায় অকাতরে প্রাণ উৎসর্গ করতে পিছপা হবে না। বরং এ হৃদয় সবসময়ই ইসলাম রক্ষায় অবলীলায় জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। এছাড়া, মুসলিমরা এ সময় মদীনায় তাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করছিলো, ইসলামের সমস্ত হুকুম-আহকামকে বাস্তবায়িত করেছিলো এবং প্রতিদিনই দ্বীন ইসলাম নতুন এক উচ্চতায় উঠছিলো যা মুসলিমদের ক্রমশঃ করছিলো আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান ও সত্যিকার অর্থে পরিতৃপ্ত।

কিন্তু, ইসলামের শত্রুরা কোনভাবেই দ্বীন ইসলাম ও মুসলিমদের ক্রমবর্ধিত এ প্রভাব-প্রতিপত্তিকে সহ্য করতে পারছিলো না, বিশেষ করে মদীনার প্রতিবেশী ইহুদী গোত্রগুলোর মাঝে মুসলিমদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ তীব্র ভাবে প্রকাশিত হল। মুসলিমদের ব্যাপারে তাদের ভয়ও ক্রমশ বাড়তে থাকলো। যখন তারা দেখলো যে, মুসলিমরা ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে এবং অসংখ্য মানুষ ইসলামের আহবানে সাড়া দিচ্ছে তখন তারা নতুন করে মুহাম্মদ(সা.) এবং তাঁর সাহাবাদের বিপরীতে তাদের অবস্থানকে পূণঃ বিবেচনা করলো। যখন তাদের নিজেদের মধ্য হতেও বেশকিছু মানুষ ইসলাম গ্রহণ করলো তখন তারা সত্যিকার ভাবে চিন্তিত ও ক্রোধান্বিত হয়ে পড়লো। তারা ভীত হলো এই ভেবে যে, দ্বীন ইসলাম একসময় তাদের মাঝেও প্রবেশ করবে এবং ইহুদী গোত্রগুলোর মধ্যেও ইসলাম বিস্তৃতি লাভ করবে। এ আশঙ্কায় তারা ইসলাম, ইসলামী আকীদাহ ও ইসলামের হুকুম-আহকামের প্রতি তীব্র আক্রমণের তীর নিক্ষেপ করলো। পরিণতিতে ইহুদী ও মুসলিমদের মাঝে তীব্র বাক-বিতন্ডা ও স্নায়ু যুদ্ধের মাধ্যমে নতুন সংঘাতের সৃষ্টি হলো। বস্তুতঃ ইহুদী ও মুসলিমদের মধ্যকার এই বিবাদ ও সংঘাত মক্কার কুরাইশদের সাথে মুসলিমদের তীব্র সংঘাতের চাইতেও ব্যাপক ও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিলো।

আল্লাহর রাসুল(সা.) ও তাঁর সাহাবীদের সাথে লিপ্ত বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রামে ইহুদীদের মূল অস্ত্র ছিলো ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা ও পূর্ববর্তী নবীদের সম্পর্কে তাদের গুপ্ত জ্ঞান। তাদের মধ্যে এমন কিছু ধর্মগুরু ছিলো যারা বাহ্যিক ভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেছিলো। তারা মুসলিমদের সাথে উঠা-বসা করতো এবং পরহেজগারীতার ভান করতো। কিন্তু, অল্পকিছুদিনের মধ্যেই দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে তাদের সন্দেহ, অবিশ্বাস ও দ্বিধা-দ্বন্দ প্রকাশিত হয়ে গেলো। তারা মুহাম্মদ(সা.)কে এমন সব প্রশ্ন করতো, যাতে ইসলামের মূল বিশ্বাস এবং ওহীর সত্যতা নিয়ে মুসলিমদের মাঝেও বিভ্রান্তি ও সন্দেহের সৃষ্টি হয় এবং তাদের দৃঢ় বিশ্বাসের ভীত নড়ে যায়।

আউস ও খাযরাজ গোত্রের মাঝে যারা শুধুমাত্র মুসলিমদের মাঝে শত্রুতা ও সন্দেহ সৃষ্টি করার জন্য ইসলাম গ্রহন করেছিলো, ইহুদীরা তাদের সাথেই দলবদ্ধ হলো। শেষ পর্যন্ত মুসলিম ও ইহুদীদের মধ্যকার এই সংঘাত এমন পর্যায়ে পৌঁছালো যে, শান্তিচুক্তি থাকা সত্ত্বেও প্রায় যুদ্ধ বাঁধার উপক্রম হলো।

একবার আবু বকর (রা.) ইহুদীদের আক্রমণাত্মক কথাবার্তায় প্রচন্ড রাগান্বিত হন এবং তাঁর ক্রোধ দমনে ব্যর্থ হন। এখানে মনে রাখা দরকার যে, আবু বকর (রা.) তাঁর অসাধারন প্রজ্ঞা, অসীম ধৈর্য্য ও ঠান্ডা মেজাজের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। এ ঘটনাটি মুসলিমদের প্রতি ইহুদীদের উদ্ধত্য ও তীব্র ঘৃণার একটি জ্বলজ্যান্ত উদাহারণ। বর্ণিত আছে যে, একবার আবু বকর(রা.) ফিনহাস নামের এক ইহুদীকে ডেকে তাকে আল্লাহকে ভয় করতে বলেন এবং ইসলাম গ্রহন করার উপদেশ দেন।

এর জবাবে ফিনহাস বলে,"আমরা আল্লাহর মতো দরিদ্র নই, কারণ তিনি নিজেকে আমাদের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। আমরা তাঁর উপর নির্ভর করি না, কিন্তু তিনি আমাদের উপর নির্ভর করেন। তিনি যদি আমাদের উপর নির্ভর নাই করতেন তবে তিনি আমাদের তাঁকে ঋণ দিতে বলতেন না, যেমনটি তোমাদের নবী বলে থাকেন। তোমাদের নবী তোমাদের সুদ নিতে নিষেধ করেন, কিন্তু আমাদের করেন না। তিনি(আল্লাহতায়ালা) যদি সত্যিকার ভাবেই অভাবমুক্ত হতেন তবে, আমাদের জন্য সুদ হালাল করতেন না।" ফিনহাস এ বিষয়ে আল্লাহর নাযিলকৃত নিম্নোক্ত আয়াতটিকে উদ্দেশ্য করে, যেখানে আল্লাহতায়ালা বলেছেন,

*"কে আছে এমন যে আল্লাহকে দেবে উত্তম ঋণ, তবে আল্লাহ তা বহুগুণে বর্ধিত করে দেবেন।"* [সুরা বাকারাহঃ ২৪৫]

আবু বকর(রা.) ফিনহাসের এ উদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে এতো বেশী রাগান্বিত হয়ে পড়েন যে, তিনি ফিনহাসের মুখে আঘাত করেন এবং বলেন,"সে সত্ত্বার কসম যাঁর হাতে আমার ভাগ্য! ওহে আল্লাহর শত্রু, যদি আমাদের মধ্যে কোনরূপ চুক্তি না থাকতো তবে আমি অবশ্যই তোকে হত্যা করতাম।"

ইহুদী ও মুসলিমদের মধ্যকার এই তর্কবিতর্কের উষ্ণতা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং এ অবস্থা বেশকিছু সময় ধরে বিরাজ করে। এ পরিস্থিতিতে খ্রীষ্টানদের ষাটজনের একটি দল নজরান থেকে মদীনায় আগমন করে। তারা ইহুদী ও মুসলিমদের মধ্যকার এই বিবাদ সম্পর্কে পূর্বেই অবহিত হয়েছিলো। তারা এ আশায় মদীনায় আগমন করেছিলো যে, হয়তো ইহুদী ও মুসলিমদের মধ্যকার এই ফাটল আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করবে এবং তাদের অসহনীয় পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করার জন্য খ্রীষ্টান ধর্মবিশ্বাস এক বিরাট ভূমিকা পালন করবে। একই সাথে খ্রীষ্টান ধর্মও ইহুদী ও ইসলাম ধর্মের ছুঁড়ে দেয়া চ্যালেঞ্জ থেকে চিরতরে মুক্তি পাবে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে খ্রীষ্টানদের এই দলটি ইহুদী ও মুসলিম উভয়ের সাথেই সম্পর্ক বজায় রেখেছিলো।

আল্লাহর রাসুল(সা.) ইহুদীদের সাথে সাথে তাদেরকেও আহলে কিতাব বলে সম্বোধন করেন এবং উভয় দলকে ইসলামের দিকে আহবান করেন। তিনি(সা.) তাদেরকে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পড়ে শোনান,

*"বল (হে মুহাম্মদ)! হে আহলে কিতাবগণ, একটি বিষয়ের দিকে আসো যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সমান যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো* **Bev`Z Ki‡ev bv, Zvi mv‡\_ KvD‡K kixK Ki‡ev** *না এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে পালনকর্তা বানাবো না। কিন্তু, যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়,* **Z‡e ejt Ò‡Zvgiv mv¶x \_v‡Kv †h Avgiv gmwjg‡`i Ašf³|Ó** [সুরা আলি ইমরানঃ ৬৪]

এরপর, ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা মুহাম্মদ(সা.)কে অন্যান্য নবীদের বিষয়ে প্রশ্ন করতে থাকে। আল্লাহর রাসুল(সা.) এর জবাবে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পড়ে শোনান,

*"বল! আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহর উপর এবং যা কিছু নাযিল হয়েছে আমাদের উপর এবং যা কিছু নাযিল হয়েছে ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক,* **BqvKe Ges Zv‡`i mšÍ**া*নদের উপর এবং যা কিছু নাযিল হয়েছে মুসা এবং ঈসার উপর এবং যা কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে* **K bex‡`i‡K †`qv n‡q‡Q Zvi Dci| Avgiv Zv‡`i g‡a¨ †Kvb cv_K¨ Kwi bv Ges wbðqB Avgiv Zvi cwZB AbMZ|Ó** [সুরা বাকারাহঃ ১৩৬]

এ কথার পর ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা মুহাম্মদ(সা.)কে বলার মতো আর কিছুই খুঁজে পেতো না। বস্তুতঃ তাদের অন্তর রাসুল(সা.) এ যুক্তিকে মেনে নিয়েছিলো এবং সত্য তাদের কাছে দিনের আলোর মতো প্রকাশিত হয়েছিলো। কিন্তু, তারা শুধু তাদের সম্মান, প্রভাব, প্রতিপত্তি এবং সামাজিক পদমর্যাদা হারানোর ভয়ে ইসলাম গ্রহন থেকে নিজেদের বিরত রেখেছিলো এবং তাদের মধ্যে অনেকে এ কথা স্বীকারও করেছিলো। বর্ণিত আছে যে, নজরান থেকে আগত আবু হারিছাহ্ নামে এক খ্রীষ্টান দুত, যে ছিল তাদের মধ্যকার একজন প্রসিদ্ধ আলেম, সে তার অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে একথা স্বীকার করেছিল যে, মুহাম্মদ(সা.) যে সত্য কথা বলছে এ ব্যাপারে তার মনে কোন সন্দেহ নেই। তার বন্ধু যখন তাকে জিজ্ঞেস করলো তাহলে কেন সে সত্য জেনেও ইসলাম গ্রহন করছে না? এর উত্তরে সে বলেছিলো,"তারা (রোমান বা বাইজাইন্টাইনরা) আমাদের যেভাবে সম্মানিত করেছে, বিভিন্ন পদমর্যাদায় ভূষিত করেছে, অর্থ-সম্পদ দিয়ে যাচ্ছে, যদি আমি ইসলাম গ্রহন করি, তবে তারা এ সমস্ত কিছু আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে। কারণ, মুহাম্মদ(সা.) যা বলে, তারা এর সম্পূর্ণ বিপরীতমূখী অবস্থানে।" এ ঘটনাই প্রমাণ করে যে, তাদের নির্লজ্জ স্বার্থপরতা, ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ ও অহেতুক অন্ধ গোর্য়াতুমিই আসলে তাদের ইসলাম গ্রহন করা থেকে বিরত রেখেছিলো। এরপর আল্লাহর রাসুল(সা.) খ্রীষ্টান দুতদেরকে মুবাহালার (নিজেদের উপর আল্লাহর ক্রোধ বর্ষণের প্রার্থনা) জন্য প্রকাশ্যে আহবান করেছিলেন, যেন খ্রীষ্টান ও মুসলিমদের মধ্য হতে যারা মিথ্যাবাদী তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে গজব বর্ষিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। তিনি(সা.) তাদের উদ্দেশ্যে নীচের আয়াতটি পাঠ করেছিলেন,

**ÒAZtci †Zvgvi wbKU mZ¨ G‡m hvevi ciI hw` G m¤ú‡K †Zvgvi mv‡\_ †KD weev` K‡i, Zvn‡j ejt Avgiv †W‡K †bB Avgv‡`i cÎ‡`i I †Zvgv‡`i cÎ‡`i Ges Avgv‡`i ¯¿x‡`i I †Zvgv‡`i ¯¿x‡`i Ges Avgv‡`i wb‡R‡`i I †Zvgv‡`i wb‡R‡`i| Zvici P‡jv** *আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করি এবং তাদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত করি যারা মিথ্যাবাদী।"* [সুরা ইমরানঃ ৬১]

এ আহবানের পর তারা (খ্রীষ্টান দুতেরা) নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে এবং ঘোষণা দেয় যে, তারা মুবাহালায় অংশগ্রহন করবে না এবং মুহাম্মদ(সা.)কে তাঁর আনীত দ্বীনের উপরই ছেড়ে দেবে আর, তারাও তাদের দ্বীনকেই আঁকড়ে থাকবে। এছাড়া, তারা মুহাম্মদ(সা.)কে অনুরোধ করে যেন, তিনি(সা.) তাঁর পক্ষ হতে একজন দায়িত্বশীল মুসলিমকে তাদের নির্দিষ্ট কিছু অর্থনৈতিক বিষয়ে মীমাংসা করার জন্য পাঠিয়ে দেন। এ

অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে, রাসুল(সা.) আবু 'উবাইদাহ ইবন আল-জাররাহকে ইসলাম দিয়ে তাদের বিচারকার্য পরিচালনা করার জন্য পাঠিয়ে দেন।

বস্তুতঃ এ পর্যায়ে, ইসলামী দাওয়াতের অপ্রতিরোধ্য গতি, ইসলামী আকীদাহর শক্তি এবং সত্যদ্বীনের শাণিত যুক্তিতর্কের ধার এমন ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে যে, মুনাফিক, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের উত্থাপিত সমস্ত মিথ্যা যুক্তিতর্ক ও অভিযোগ নিমেষেই ধুলিস্যাৎ হয়ে যায়। তাদের ইসলাম বর্হিভূত ভ্রান্ত ধ্যান-ধারনা খুব দ্রুত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং পরাক্রমশালী অস্তিত্ব ও সঠিক জীবনব্যবস্থা হিসাবে শুধুমাত্র ইসলামই টিকে থাকে। এভাবে, ইসলামের হুকুম-আহকাম সম্পর্কিত সার্বক্ষনিক আলোচনা-পর্যালোচনা, ইসলামের দিকে মানুষকে আহবান ইত্যাদির মাধ্যমে ইসলাম ধীরে ধীরে মানুষের অন্তরের গভীরে প্রোথিত হতে থাকে। আর, ইসলামের সমুন্নত পতাকাতলে সকল ভ্রান্ত জীবনব্যবস্থা, বিশ্বাস ও শাসনকার্য বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু, এ সবকিছুর পরও মুনাফিক ও ইহুদীদের অন্তরে মুসলিমদের প্রতি তীব্র ঘৃণা, বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার আগুন দিনে দিনে বাড়তেই থাকে। একথা অনস্বীকার্য যে, মদীনায় ইসলামের শাসন-ক্ষমতা ও দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সমাজ সে সময় সবকিছুর উপর কর্তৃত্বশীল হয়। এছাড়া, বিভিন্ন ছোট ছোট অভিযানের মাধ্যমে মুসলিমদের প্রদর্শিত শক্তি-সামর্থ্য ইসলামের শত্রুপক্ষের মুখও মোটামুটি বন্ধ করে দেয়। শেষ পর্যন্ত, মহান আল্লাহতায়ালা বাণীই সকল ভ্রান্ত মতাদর্শের উপর বিজয়ী হয় এবং ইসলামের শত্রুরা বাধ্য হয় আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও ইসলামের শাসন-কর্তৃত্বের কাছে সম্পূর্ণ ভাবে নতি স্বীকার করতে।

## বদরের যুদ্ধঃ

হিজরী দ্বিতীয় সনের রমজান মাসের ৮ তারিখে রাসুল(সা.) তিনশত পাঁচ জন সাহাবী ও সত্তরটি উট নিয়ে কাফিরদের উদ্দেশ্যে অভিযানে বের হন। এ সময় তিনি 'আমর ইবন উম্ম মাখতুমকে নামাজে ইমামতির দায়িত্ব এবং আবু লুবাবাহকে মদীনার দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। উটের পিঠে চড়ে রাসুল(সা.) এর দলটি আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কুরাইশদের এক বাণিজ্য কাফেলাকে খুঁজে ফিরছিলো। পথ চলতে চলতে তারা আবু সুফিয়ানের কাফেলা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে থাকেন। সৈন্যদল দাফরান উপত্যকায় পৌছালে রাসুল(সা.) সেখানে অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নেন। এ সময় তাদের কাছে খবর পৌঁছে যে, মক্কার কুরাইশরা তাদের বাণিজ্য কাফেলাকে রক্ষা করার জন্য তাদের দিকে ধেয়ে আসছে। মুসলিমদের কাছে এ খবর পৌঁছার সাথে সাথে অভিযানের গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ন ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। কারণ, তখন ব্যাপারটি আর কাফেলাকে ধাওয়া করা নয়, বরং পৌত্তলিক কুরাইশদের সাথে মুসলিমরা মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হবে কি হবে না সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহনের পর্যায়ে চলে যায়। আল্লাহর রাসুল(সা.) সাহাবাদের সাথে আলোচনা করেন। আবু বকর ও ওমর(রা.) যুদ্ধের পক্ষে তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন। আল-মিকদাদ ইবন 'আমর উঠে দাঁড়িয়ে বলেন,"হে আল্লাহর রাসুল! আপনি সেখানে যান যেখানে আল্লাহ আপনাকে আদেশ করেছেন এবং এ যাত্রায় আমরা অবশ্যই আপনার সাথে থাকবো। বনী ইসরাইল জাতির মতো আমরা কখনোই বলবো না যে, হে মুসা, তুমি আর তোমার আল্লাহ গিয়ে যুদ্ধ করো, আর আমরা ঘরে বসে থাকবো। বরং, আমরা বলবো, (হে নবী) তুমি এবং তোমার আল্লাহ যুদ্ধ করো এবং তার সাথে আমরাও যুদ্ধ করবো।" তারপর মুসলিমরা নিশ্চুপ হয়ে যায়। এ অবস্থায় রাসুল(সা.) আনসারদের উদ্দেশ্য করে বলেন, "এবার তোমরা আমাকে কিছু বলো।" একথার মাধ্যমে আসলে তিনি আনসারদের আকাবা উপত্যকায় কৃত তাদের শপথের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

বস্তুতঃ আনসাররা আকাবার প্রান্তরে রাসুল(সা.)কে নিরাপত্তা দেবার অঙ্গীকার করেছিলো যেভাবে তারা তাদের নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। আবার, অঙ্গীকারের সাথে এ শর্তটিও ছিলো যে, মদীনার বাইরে সংঘটিত কোন যুদ্ধের জন্য তারা দায়ী হবে না। যখন আনসাররা বুঝতে পারলো যে, রাসুল(সা.) তাদের মুখ থেকে কিছু শুনতে চাচ্ছেন তখন সা'দ ইবন মু'য়াজ ইসলামের পতাকা দৃঢ় ভাবে আঁকড়ে ঘোষণা করলো যে, "হে আল্লাহর রাসুল! আমার মনে হচ্ছে আপনি আমাদের উদ্দেশ্য করে কিছু বলছেন।" রাসুল(সা.) বললেন,"হ্যাঁ, আমি তোমাদের উদ্দেশ্য করেই বলছি।" উত্তরে সা'দ বললো,"আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি, আপনার সত্যতার ঘোষণা দিয়েছি এবং আপনি আমাদের কাছে যে সত্য এনেছেন তার সত্যতার সাক্ষী হয়েছি। এছাড়া, আমরা আপনার কাছে এ মর্মেও অঙ্গীকার করেছি যে, আমরা আপনার আনুগত্য করবো। সুতরাং, আপনার যেখানে ইচছা আপনি সেখানেই যান, আমাদের আপনার সাথেই পাবেন। যিনি আপনাকে প্রেরণ করেছেন সেই সত্ত্বার কসম, যদি আপনি আমাদের সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে বলেন তবে, আমরা আপনার সাথে সমুদ্রেও ঝাঁপ দিব। আমাদের মধ্য হতে একজনও এ ব্যাপারে পেছনে পড়ে থাকবে না। আগামীকালও যদি আপনি আমাদের সহ শত্রুপক্ষকে মোকাবিলা করতে চান তবে তাতেও আমাদের কোন আপত্তি নেই। আমরা যোদ্ধা জাতি, আমরা জানি কিভাবে যুদ্ধ করতে হয়। এমনও হতে পারে যে, আল্লাহতায়ালা হয়তো আমাদের মাধ্যমে আপনাকে এমন কিছু দান করবেন যাতে আপনার অন্তর প্রশান্ত হবে। সুতরাং, আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা করে আমাদের নিয়ে এগিয়ে যান।" আল্লাহর রাসুল(সা.) সা'দ ইবন মু'য়াজের কথায় অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং বললেন,"তোমরা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে এগিয়ে যাও। আল্লাহতায়ালা আমার কাছে দুটি দলের মধ্যে একটি দলের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহর কসম, আমি যেন কাফিরদের বধ্যভূমি দেখতে পাচ্ছি।"

আল্লাহর রাসুল(সা.) বদরের প্রান্তরের কাছাকাছি পৌঁছানো পর্যন্ত তাদের যাত্রা অব্যাহত রাখলেন। যখন মুসলিমরা বুঝলো যে, শত্রুপক্ষ কাছাকাছি কোথাও অবস্থান করছে, তখন কুরাইশ বাহিনীর খবর সংগ্রহের আশায় হযরত 'আলী, আল-জুবায়ির ইবন 'আওওয়াম এবং সা'দ ইবন

আবি ওয়াক্কাস সহ কিছু সাহাবী খবরের আশায় বদরের কুপের কাছে গেলেন। তারা কুপের কাছ থেকে দুইজন তরুণ যুবককে পাকড়াও করে ছাউনীতে ফেরত আসলেন। বন্দীদের প্রশ্ন করে তারা জানলেন যে, কুরাইশদের নেতারা নয়শত কিংবা একহাজার সৈন্যদলের একটি বাহিনী সহ তাদের বাণিজ্য কাফেলাকে রক্ষায় বের হয়েছে। রাসুল(সা.) তৎক্ষনাৎ বুঝতে পারলেন যে, তাকে তার সেনাদল অপেক্ষা তিনগুন শক্তিশালী একটি দলকে মুকাবিলা করতে হবে এবং তাদের মুখোমুখি হতে হবে এক ভয়ানক সংঘর্ষের। তিনি(সা.) সাহাবীদের জানালেন যে, মক্কা তার কলিজার বড় বড় টুকরাগুলোকে (অর্থাৎ, সবচাইতে যোগ্য সন্তানদের) যুদ্ধের ময়দানে ছুঁড়ে ফেলেছে। সুতরাং, তারা (সাহাবীরা) যেন তাদের চেষ্টার কোন কমতি না করে।

মুসলিমরা শত্রুপক্ষকে দৃঢ়ভাবে মুকাবিলা জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। তারপর তারা বদরের কুপের কাছে অবস্থান গ্রহন করে সেখানে একটি পানির কৃত্রিম জলাশয় তৈরী করলো এবং যুদ্ধের কৌশল হিসাবে অন্য সব কুপ গুলো বন্ধ করে দিলো, যাতে তাদের পান করার মতো পর্যাপ্ত পানি থাকলেও শত্রুপক্ষ পান করার জন্য পানি খুঁজে না পায়। সেই সাথে, তারা আল্লাহর রাসুল(সা.) এর নিরাপদ অবস্থানের জন্য একটি ছাউনী তৈরী করলো। এরপর, কুরাইশ যোদ্ধারা যুদ্ধের ময়দানে তাদের অবস্থান নিয়ে নিলো এবং পৌত্তলিক আসওয়াদ ইবন 'আবদ আল আসাদের ইন্ধনেই বদরের যুদ্ধের সূচনা হলো। আল-আসওয়াদ ইবন 'আবদ আল-আসাদ প্রথমে মুসলিমদের তৈরী জলাশয় ধ্বংস করার জন্য এগিয়ে এলো। হামযাহ(রা.) তাঁর তলোয়ার দিয়ে সজোরে আঘাত করে আসওয়াদের পা দুটি উড়িয়ে দিলেন। পা হারিয়ে আসওয়াদ মাটিতে ধপাস করে পড়ে গেলো আর তার কর্তিত পা থেকে রক্তের বন্যা বইতে লাগলো। এ অবস্থায় হামযাহ(রা.) আবারও তাকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করলেন এবং জলাশয়ের কাছে তাকে হত্যা করলেন। এরপর, 'উতবাহ ইবন রাবি'য়াহ তার ভাই শায়বা এবং তার পুত্র আল-ওয়ালিদকে সঙ্গে নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হলো। মুসলিমদের পক্ষ থেকে হামযাহ(রা.), 'আলী(রা.) এবং 'উবাইদাহ ইবন আল-হারিছ তাদের মুকাবিলা করতে এগিয়ে আসলেন। হামযাহ(রা.) খুব সহজেই তাঁর প্রতিপক্ষ শায়বাকে পরাস্ত করে ফেললেন, একই ভাবে আলী(রা.)ও তাঁর প্রতিপক্ষ আল-ওয়ালিদকে পর্যুদস্ত করলেন। তারপর, হামযাহ ও আলী(রা.) উবাইদাহ(রা.) এর সাহায্যে এগিয়ে আসলেন, যিনি তখন কুরাইশ নেতা ওতবার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে লড়ে যাচ্ছিলেন। ওতবাকে খতম করে তারা তাদের আহত সহযোদ্ধা 'উবাইদাহ(রা.)কে যুদ্ধের ময়দান থেকে উদ্ধার করলেন।

তারপর, রমজান মাসের ১৭ তারিখ শুক্রবার সকালে উভয় পক্ষ পরস্পরের নিকটবর্তী হলো। আল্লাহর রাসুল(সা.) মুসলিমদের কাতার সোজা করলেন এবং তাদের যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করতে থাকলেন। রাসুল(সা.) এর কথায় উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলিম যোদ্ধারা যুদ্ধের ময়দানে এগিয়ে গেলো। এরপর শুরু হলো ভয়ঙ্কর লড়াই। লড়াইয়ের তীব্রতা এতো বেশী ছিলো যে, মুসলিমদের তলোয়ারের আঘাতে কুরাইশদের মাথা তাদের দেহ থেকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল। মুসলিমদের আত্মবিশ্বাস ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং তাদের আহাদ! আহাদ! (আল্লাহ এক) ধ্বনিতে বদরের আকাশ, বাতাস ও প্রান্তর মুখরিত হচ্ছিল।

আল্লাহর রাসুল(সা.) যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝামাঝি এক অবস্থানে দাঁড়িয়ে এক মুঠো নুড়ি পাথর নিয়ে কুরাইশদের দিকে নিক্ষেপ করে বললেন," তোমাদের মুখ ধুলিধুসরিত হোক!" তারপর তিনি(সা.) সাহাবাদের প্রবল পরাক্রমের সাথে শত্রুকে আঘাত করার নির্দেশ দিলেন যে পর্যন্ত না শত্রুরা সম্পূর্ন ভাবে পরাস্ত হয়। অবশেষে, পৌত্তলিকরা পরাজিত হলো। আর বিজয় নির্ধারিত হলো মুসলিমদের জন্য। মুসলিমদের হাতে বহু সংখ্যক কুরাইশ যোদ্ধা ও কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রের নেতা নিহত হলো। বন্দী হলো আরও অনেকে। বাকী কুরাইশরা যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে বাঁচলো। আর মুসলিমরা বিজয়ীর বেশে মদীনায় ফিরে আসলো ।

## বনু কুরাইযা গোত্রকে শায়েস্তাঃ

বদরের যুদ্ধের পূর্ব হতেই ইহুদীরা মুসলিমদের প্রতি সবসময়ই তীব্র হিংসা-বিদ্বেষ পোষন করতো। বদরের প্রান্তরে মুসলিমদের নাটকীয় বিজয়ের পর তাদের বিদ্বেষের মাত্রা চরম আকার ধারণ করলো। মুসলিমদের সাথে কৃত চুক্তির কোন তোয়াক্কা না করেই তারা মুসলিমদের অপদস্ত করার জন্য নিত্যনতুন ষড়যন্ত্র ও হীন পরিকল্পনা করতে থাকলো। মুসলিমরা তাদের বিরুদ্ধে এ সব ষড়যন্ত্রকে দৃঢ়তার সাথে প্রতিহত করেছিলো এবং অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় এর জবাব দিয়েছিলো। বনু কুরাইযার বাজারে সংঘটিত জঘন্য ঘটনাটিই প্রমাণ করে দেয় যে, মদীনার ইহুদীরা মুসলিমদের উক্তত্য করার জন্য কত হীন পন্থা অবলম্বন করতো।

বনু কুরাইযার বাজারে একবার এক মুসলিম নারী সোনার দোকানে তার গয়না নিয়ে বসেছিলো। এ সময় পেছন থেকে এক ইহুদী এসে তার কাপড়ের এক প্রান্ত খুঁটির সাথে বেঁধে দেয়। মুসলিম নারীটি যখন উঠে দাঁড়ায় তখন তার কাপড় শরীর থেকে খুলে যায়। মুসলিম নারীকে এরকম একটি অপ্রস্তত অবস্থায় ফেলে উক্ত ইহুদী সহ আশেপাশের ইহুদীরা নির্লজ্জের মতো হাসিতে ফেটে পড়ে। এ অবস্থায় অপমানিত নারীটি সাহায্যের আশায় চিৎকার করতে থাকে। তার ডাকে সাড়া দিয়ে এক মুসলিম সেই বদমাশ ইহুদীকে হত্যা করে ফেলে। এ ঘটনার প্রতিশোধ হিসাবে ইহুদীরা একত্রিত হয়ে উক্ত মুসলিমকে হত্যা করে। পরবর্তীতে, শহীদ হয়ে যাওয়া সে মুসলিমের পরিবার মদীনার মুসলিমদের ব্যাপারটি অবহিত করে তাদের শাস্তির দাবী করে। পরিণতিতে মুসলিম ও ইহুদীদের মধ্যে যুদ্ধ হয়।

আল্লাহর রাসুল(সা.) বহুবার তাদের এ ধরনের জঘণ্য প্ররোচনামূলক কাজ করা থেকে বিরত থাকার আদেশ দেন। কিন্তু, তারা সে আদেশ-নিষেধের কোন তোয়াক্কা না করে প্রকাশ্যেই আল্লাহর রাসুলের বিরোধিতা ও তাঁর আদেশ অমান্য করতে থাকে। এ রকম পরিস্থিতিতে, রাসুল(সা.) বনু কুরাইযাকে শায়েস্তা করার সিদ্ধান্ত নেন এবং চারদিক থেকে তাদের আবাসস্থল ঘিরে ফেলেন। মুসলিমদের সাথে পরামর্শ করে তিনি এ গোত্রের সকলকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন। মূলতঃ এটা ছিলো তাদের মুসলিমদের সাথে ক্রমাগত বিশ্বাসঘাতকতা করার উপযুক্ত শাস্তি। এ পর্যায়ে 'আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবন সলুল, যার ইহুদী ও মুসলিম দু'পক্ষের সাথেই সুসম্পর্ক ছিলো, বারবার ইহুদীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করার জন্য রাসুল(সা.) অনুরোধ করতে থাকে। কিন্তু, মুহাম্মদ(সা.) তার এ কাতর আবেদনে কোন সাড়া না দিয়ে তাকে উপেক্ষা করেন।

কিন্তু, তা সত্ত্বেও, 'আব্দুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সলুল ইহুদীদের প্রাণরক্ষার জন্য ক্ষমা ভিক্ষার আবেদন করতেই থাকে। শেষ পর্যন্ত, তার আবেদনে সাড়া দিয়ে রাসুল(সা.) বনু কুরাইযাকে মদীনা ত্যাগ করে চলে যাবার নির্দেশ দেন। এরপর, বনু কুরাইযা গোত্র মদীনা থেকে বিতাড়িত হয়ে উত্তরে আদরা'ত আল-শামের দিকে চলে যায়।

## বিদ্রোহ দমনঃ

বদরের যুদ্ধে মুসলিমদের সংখ্যা ছিলো অতি নগন্য এবং যুদ্ধ সরঞ্জামের দিক থেকেও তারা ছিলো খুবই দূর্বল। কিন্তু, তারপরও, কাফিরদের সাথে মুসলিমের এ প্রথম মুকাবিলায় মুসলিমরা বীরের মতো বিজয় ছিনিয়ে এনেছিলো। মুসলিমদের এ বীরত্বপূর্ণ বিজয় কাফিরদের আত্মবিশ্বাসের ভীত এতো সাংঘাতিক ভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিলো যে, তারা শোকে-দুঃখে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিলো। এছাড়া, কুফরশক্তির উপর মুসলিমদের এ বিজয় মদীনার অভ্যন্তরে গৃহযুদ্ধ সহ ইহুদীদের নানারকম চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রকেও অনেকটা দমিয়ে দিয়েছিলো। এ ঘটনার প্রত্যক্ষ ফল স্বরূপ, কিছু ইহুদী গোত্র মুসলিমদের সাথে শান্তিচুক্তি করতে বাধ্য হয়, আর কিছু গোত্র মদীনা থেকে বিতাড়িত হয়। মদীনাতে মুসলিমদের শক্তিসামর্থ্য ক্রমশঃ বাড়ছিলো, আর কুরাইশরা এক মূহুর্ত সময় নষ্ট না করে অপমানের প্রতিশোধ নেবার পরিকল্পনা আঁটছিলো। পরের বছর ওহুদের যুদ্ধে যখন মুসলিম তীরন্দাজরা (যারা মুজাহিদদের পেছন থেকে পাহারা দেবার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলো) রাসুল(সা.) এর নির্দেশ অমান্য করে গণীমতের মালামাল সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে গেলো, ঠিক তখনই কুরাইশদের হাতে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার সুবর্ণ সুযোগ এসে গেলো। যুদ্ধে জয়ী হয়ে কুরাইশরা আনন্দে উৎফুল্ল হলো। আর, মুসলিম যোদ্ধারা ভগ্ন হৃদয়ে পরাজিত হয়ে মদীনায় ফিরে আসলো। যদিও যুদ্ধ শেষ হবার পর মুসলিমরা কুরাইশদের হামরা' আল-আসাদ পর্যন্ত ধাওয়া করেছিলো (এটি ছিলো মদীনা থেকে প্রায় আট মাইল দূরে)।

ওহুদের প্রান্তরে মুসলিমদের এই পরাজয়ে আরব ভূ-খন্ডে নানারকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। মদীনার অভ্যন্তরে বিভিন্ন দল মুসলিমদের শক্তিসামর্থ্য ও শাসনকর্তৃত্বকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে প্রকাশ্যেই বিদ্রোহ ঘোষনা করে। মদীনার বাইরের কিছু গোত্র, যারা ওহুদের যুদ্ধের পূর্বে কোনদিন মুসলিমদের সাথে কৃত চুক্তির সীমা অতিক্রম করার কথা চিন্তাও করেনি, তাদের মাঝেও বিদ্রোহের লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। ইহুদী ও মদীনার মুনাফিকদের মতো মদীনার বাইরের আরবরাও মুহাম্মদ(সা.)কে চ্যালেঞ্জ করার কথা ভাবতে থাকে। এ লক্ষ্যে তারা বিভিন্ন ভাবে মুসলিমদের প্ররোচিত করতে থাকে।

মদীনার ভেতরে-বাইরে শত্রুপক্ষের এ সব পরিকল্পনার কথা জানতে পেরে রাসুল(সা.) শত্রুপক্ষকে মুকাবিলা করার বিষয়ে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মুসলিমের প্রভাব-প্রতিপত্তি, মর্যাদা ও শক্তিসার্মথ্য পুণরুদ্ধারকল্পে তিনি(সা.) মুসলিমদের প্রতি অমুসলিমদের যে কোন ধরনের তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও বিদ্রোহকে কঠোর হস্তে দমনের সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন।

ওহুদ যুদ্ধের একমাস পর আল্লাহর রাসুলের কাছে এ মর্মে সংবাদ পৌঁছে যে, বনু আসাদ গোত্র মদীনা আক্রমণ করে শহরের চারিপার্শস্থ চারণভূমির পশুগুলো লুট করার পরিকল্পনা করেছে। এমতাবস্থায়, রাসুল(সা.) বনু আসাদ গোত্রকে মদীনা আক্রমণ করার কোন সুযোগ না দিয়ে তার আগেই তাদের আস্তানায় আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। শত্রুপক্ষের আক্রমণের পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করে দেয়াই ছিলো এ আক্রমণের উদ্দেশ্য। তিনি(সা.) আবু সালামাহ ইবন 'আবদ আল-আসাদের নেতৃত্বে ১৫০ জন মুসলিমের একটি দলকে এ অভিযানে প্রেরণ করেন। এ দলে আবু 'উবাইদাহ ইবন যাররাহ, সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস এবং উসাইদ ইবন হুদাইর সহ অনেক খ্যাতনামা যোদ্ধা ছিলো। এ অভিযানকে গোপন রাখা এবং শত্রুপক্ষকে চমকে দেবার জন্য আল্লাহর রাসুল(সা.) তাঁর সাহাবীদের দিনে লুকিয়ে থেকে রাতে যাত্রা করার নির্দেশ দেন। সেইসাথে, প্রচলিত পথে যাত্রা না করে ভিন্ন পথ ধরে চলার আদেশ দেন। আবু সালামাহ বনু আসাদ গোত্রের ঘাঁটিতে পৌঁছানোর পূর্ব পর্যন্ত যাত্রা করতে থাকেন। লক্ষ্যে পৌঁছানোর পর তিনি ভোরবেলায় দলবল সহ বনু আসাদ গোত্রকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেন এবং তার সঙ্গীদের জিহাদের নির্দেশ দিয়ে শত্রুপক্ষের উপর আক্রমণ চালান। মুসলিম সৈন্যদল খুব সহজেই বনু আসাদকে পরাজিত করে এবং যুদ্ধলব্ধ মালামাল সহ বীরের বেশে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে। এভাবে, মুসলিমদের শৌর্য-বীর্য আবারও প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এ ঘটনার মাধ্যমে প্রকারান্তরে মুসলিমরা অমুসলিমদের ইসলামের শক্তিসামর্থ্যের কথা মনে করিয়ে দেয়।

এরপর, রাসুল(সা.) এর কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, খালিদ ইবন সুফিয়ান আল-হনদালি নামে এক পৌত্তলিক 'উরনাহ বা নাখলাহর কাছে অবস্থান গ্রহন করেছে এবং মদীনা আক্রমণের জন্য লোকবল সংগ্রহ করছে। এ সংবাদ শোনার পর, আল্লাহর রাসুল(সা.) 'আব্দুল্লাহ ইবন আনিছকে খালিদ ইবন সুফিয়ান সম্পর্কে খোঁজখবর নেবার জন্য প্রেরণ করেন। 'আব্দুল্লাহ যাত্রা শুরু করার কিছুদিনের মধ্যেই খালিদের দেখা পেয়ে যান। খালিদ তাকে জিজ্ঞেস করে যে, সে কে? উত্তরে তিনি বলেন,"আমি আব্দুল্লাহ। আমি একজন আরব। আমি শুনতে পেয়েছি যে তুমি মুহাম্মদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য লোক সংগ্রহ করছো। আর এ কারনেই আমি এখানে এসেছি।" খালিদ তার পরিকল্পনার কথা স্বীকার করে। তারপর, তারা দু'জন কথাবার্তা বলতে বলতে সামনের দিকে হাঁটতে থাকে। যখন তারা দু'জন লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে আসে তখন 'আব্দুল্লাহ ইবন আনিছ তলোয়ার দিয়ে খালিদকে তীব্র ভাবে আঘাত করে তাকে হত্যা করেন। তারপর, তিনি মদীনায় ফিরে এসে রাসুল(সা.)কে তার অভিযানের কথা বর্ণনা করেন। খালিদের মৃত্যুর সাথে সাথে হাদায়েলের বনু লিহইয়ান গোত্র মদীনা আক্রমণের পরিকল্পনা বাতিল করে। আর এভাবেই, রাসুল(সা.) অত্যন্ত সফলতার সাথে খালিদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেন এবং সেইসাথে মদীনার বিভিন্ন প্রান্তরে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠা বিদ্রোহেরও অবসান হয়।

কিন্তু, এ ঘটনার পরেও কিছু আরব গোত্র মুসলিমদের শাসন-কর্তৃত্বকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহে লিপ্ত হয়। হাদায়েলের আশেপাশের এলাকার কোন গোত্র থেকে একবার একদল লোক মদীনায় আসে। তারা মুহাম্মদ(সা.) বলে যে, তারা দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে জানার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী। সুতরাং, তিনি(সা.) যেন তাদেরকে কুরআন শেখান জন্য কিছু সাহাবাকে তাদের গোত্রে পাঠান। একথা শুনে রাসুল(সা.) বয়োজেষ্ঠ্য ছয়জন সাহাবীকে তাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দেন। যাত্রা শুরু করার পর তারা হাদায়েলের কুপগুলোর কাছাকাছি আল-রাজি নামক এলাকায় পৌঁছালে উক্ত গোত্রের লোকেরা সাহাবীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। তারা হাদায়েলের অধিবাসীদেরকে সাহাবীদের আক্রমণ করার নির্দেশ দেয়। তারপর সেখানকার অধিবাসীরা সাহাবীদের ঘেরাও করে ফেলে এবং তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। মুসলিমরাও জীবন বাঁচানোর জন্য যুদ্ধ করতে থাকে এবং তাদের মধ্যে তিনজন সাহাবী সেখানেই শাহাদাত বরণ করেন। বাকী তিনজনকে তারা বন্দী করে মক্কার কুরাইশদের কাছে বিক্রির জন্য নিয়ে যায়। মক্কা যাত্রাকালে বন্দী সাহাবীদের মধ্য হতে 'আব্দুল্লাহ ইবন তারিক তার তলোয়ারের নাগাল পেয়ে যায় এবং নিজেকে মুক্ত করার জন্য কাফিরদের আক্রমণ করে। কিন্তু, শীঘ্রই কাফিররা তাকে হত্যা করে। অন্য দু'জন বন্দীকে তারা মক্কার পৌত্তলিকদের কাছে বিক্রি করে দেয়। এদের মধ্যে যায়িদ ইবন আল-দাছনাহকে সাফওয়ান ইবন উমাইয়াহর কাছে বিক্রি করা হয় যেন সে তার পিতা উমাইয়া ইবন খালফের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে পারে। সাফওয়ান সাহাবী যায়িদকে বলে,"আল্লাহর কসম, তুমি কি চাও না যে আজ তোমার পরিবর্তে যদি মুহাম্মদ আমাদের হাতে বন্দী থাকতো, আমরা তার মাথা কেটে নিতাম আর তুমি তোমার পরিবারের সাথে থাকতে?" এর উত্তরে যায়িদ বলেন,"আল্লাহর কসম, আমি কক্ষনো ভাবতে পারি না যে মুহাম্মদ যদি আজ আমার জায়গায় থাকতো। আমি ঘরে নিরাপদে বসে থাকবো আর এ অবস্থায় তাঁর গায়ে একটা কাঁটার আঘাতও লাগবে এটা আমি সহ্য করবো না।" একথা শুনে সাফওয়ান আশ্চর্য হয়ে যায়। সে প্রায়ই বলতো, মুহাম্মদের ছাড়া আমি আর কোন মানুষ দেখিনি যে তার সঙ্গীসাথীদের এতো ভালোবাসা পেয়েছে। এরপর, যায়িদ ইবন আল-দাছনাহকে কুরাইশরা হত্যা করে।

দ্বিতীয় বন্দী খুবাইবকে মক্কায় আনার পর কারারুদ্ধ করে রাখা হয় যে পর্যন্ত না কুরাইশরা তাকে নির্মম ভাবে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। মৃত্যুর আগে খুবাইব কুরাইশদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে দু'রাকাত নামাজ আদায় করে। অত্যন্ত চমৎকার ভাবে নামাজ আদায় করার পর তিনি কুরাইশদের উদ্দেশ্য করে বলেন,"যদি না তোমরা ভাবতে আমি মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে নামাজ দীর্ঘ করছি তবে আমি আমার নামাজকে আরও দীর্ঘায়িত করতাম।" এরপর কুরাইশরা তাকে কাঠের সাথে শক্ত করে বাঁধে, এ সময় খুবাইব তাদের দিকে তাকিয়ে ক্রোধান্বিত ভাবে চিৎকার করে বলে,"হে আল্লাহ! এদের প্রত্যেককে তুমি গুনে গুনে স্মরণে রেখো, তাদের প্রত্যেককে তুমি উপযুক্ত শাস্তি দিও, এদের মধ্যে কাউকে তুমি ছেড়ে দিও না।" উপস্থিত কুরাইশরা খুবাইবের এ কান্না জড়িত প্রার্থনায় ভীত হয়ে পড়ে, তারপর তাকে নির্মম ভাবে হত্যা করে। আল্লাহর রাসুল(সা.) ও তাঁর সাহাবীগণ ছয়জন সাহাবীর এ নির্মম মৃত্যুতে শোকে কাতর হয়ে পড়েন। মূলতঃ হাদায়েলের অধিবাসীদের জঘন্য পদ্ধতিতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ও সাহাবীদের প্রতি ভয়ঙ্কর অসম্মান প্রদর্শন করাই ছিলো মুসলিমদের তীব্র মনোকষ্টের আসল কারণ।

আল্লাহর রাসুল(সা.) এইসব বিদ্রোহের ঘটনা নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করতে থাকেন। ভাবতে থাকেন বিদ্রোহ দমনের উপায়। এ সময়ে আবু বারা' 'আমির ইবন মালিক (বর্শার খেলোয়ার) নামে এক ব্যক্তি মদীনায় আগমন করে। রাসুল(সা.) সত্যদ্বীনকে তার কাছে ব্যাখ্যা করেন এবং তাকে দ্বীন ইসলামের দিকে আহবান করেন। আবু বারা' ইসলাম গ্রহন না করলেও ইসলাম গ্রহনের খুব কাছাকাছি পর্যায়ে চলে যায়। এছাড়া, ইসলামের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষও তার মাঝে কখনো দেখা যায়নি। সে মুহাম্মদ(সা.) অনুরোধ করে যে,"আপনি যদি আপনার সাহাবীদের মধ্য থেকে একদল মুসলিমকে নজদ্ এলাকায় ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য পাঠান, তাহলে আশা করা যায়, তারা এ আহবানে সাড়া দেবে।" কিন্তু, সম্প্রতি হাদায়েলের অধিবাসীদের হাতে ছয় সাহাবীর নির্মম ভাবে নিহত হওয়ার ভয়ঙ্কর স্মৃতি স্মরণ করে রাসুল(সা.) তার প্রস্তাব মানতে অস্বীকার করেন। আবু বারা' শেষ পর্যন্ত নিজে সাহাবীদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিলে রাসুল(সা.) তার প্রস্তাব মেনে নেন। আবু বারা' রাসুল(সা.)কে বলে,"আপনার পক্ষ থেকে একদল মানুষকে আপনি আপনার দ্বীনের দিকে আহবান করার জন্য পাঠিয়ে দেন, তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার।" আরব ভূ-খন্ডে আবু বারা'র যথেষ্ট সুনাম ছিলো এবং তার কথার গুরুত্বও ছিলো যথেষ্ট। তাই, তার কাছ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা করা কিংবা তার দেয়া নিরাপত্তায় কারো কোন ক্ষতি হবার সম্ভাবনা ছিলো না।

এসব বিষয় বিবেচনা করে রাসুল(সা.) চল্লিশ জন প্রথম শ্রেনীর মুসলিমকে আল-মুনদির ইবন 'আমর এর নেতৃত্বে নজদ্ এলাকায় পাঠিয়ে দেন। দলটি পথ চলতে চলতে মা'য়ুনার কুপের কাছে পৌছালে মুসলিমদের পক্ষ হতে একজন রাসুল(সা.) এর চিঠি সহ 'আমর ইবন তুফাইলের সঙ্গে দেখা করতে যায়। 'আমর ইবন তুফাইল দূতকে দেখার সাথে সাথে চিঠি না পড়েই তাকে হত্যা করে। তারপর সে বনু 'আমির গোত্রকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আহবান করে। কিন্তু, বনু 'আমির গোত্র মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অসম্মতি জানিয়ে বলে যে, আবু বারা' মুসলিমদেরকে নিরাপত্তার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তারা তা ভঙ্গ করবে না। তখন, 'আমির সেখানকার অন্য গোত্রগুলোকে যুদ্ধের জন্য আহবান করলে তারা উটের পিঠে চড়ে চারদিক থেকে মুসলিমদের ঘিরে ফেলে। এ অবস্থায় মুসলিমরা যার যার অস্ত্র বের করে তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে আমৃত্যু কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এ ভয়ঙ্কর ঘটনার দু'জন ছাড়া বাকী সমস্ত মুসলিম শহীদ হয়ে যায়। এ সংবাদ মদীনায় পৌছানোর পর আল্লাহর রাসুল(সা.) মানসিক ভাবে সাংঘাতিক ভাবে ভেঙ্গে পড়েন এবং সেই সাথে শোকের সাগরে নিমজ্জিত হন তাঁর সাহাবীরাও।

মদীনার বাইরের আরব গোত্রগুলোর বিদ্রোহ কিভাবে দমন করা যায় তা নিয়ে রাসুল(সা.) গভীর ভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন। ভাবতে থাকেন কিভাবে বদরের যুদ্ধে অর্জিত মুসলিমদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শৌর্য-বীর্য ফিরিয়ে নিয়ে আসা যায়। একসময় তিনি(সা.) অনুভব করেন যে, মদীনার অভ্যন্তরেই আসলে অনেক সমস্যা রয়ে গেছে। তাই, তিনি(সা.) প্রথমে ইসলামী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীন সমস্যা সমাধানের দিকে মনোযোগী হন। তিনি(সা.) সিদ্ধান্ত নেন যে, অভ্যন্তরীন সমস্যা সমাধান করার পরই তিনি মদীনার বাইরের গোত্রগুলোর বিদ্রোহ দমনে চিন্তা-ভাবনা করবেন।

ওহুদের যুদ্ধে মুসলিমদের পরাজয়ের পর হাদায়েলের অধিবাসী কর্তৃক ছয় সাহাবীর হত্যাকান্ড এবং বীরে মায়ু'নার নৃশংস ঘটনার পর মদীনার মুনাফিক ও ইহুদী গোত্রগুলোর ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা নতুন করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। তারা পুণরায় মুহাম্মদ(সা.) এর বিরুদ্ধে ঘৃন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং মুসলিমদের কর্তৃত্বকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে শুরু করে। তারা সুযোগ খুঁজতে থাকে কিভাবে মুসলিমদের একহাত দেখে নেয়া যায়। আল্লাহর রাসুল(সা.) ধীরে ধীরে তাদের মনোভাব বুঝতে পারেন এবং ষড়যন্ত্র সম্পর্কেও অবহিত হন। এরপর, রাসুল(সা.) সাহাবী মুহাম্মদ ইবন মাসলামাহকে ইহুদীদের কাছে পাঠান। ইবন মাসলামাহ ইহুদীদেরকে রাসুল(সা.) এর নির্দেশ জানিয়ে দিয়ে বলেন,"আল্লাহর রাসুল আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন এবং তোমাদের মদীনা ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ, তোমরা তাঁর সাথে কৃত চুক্তির ওয়াদা ভঙ্গ করেছো এবং বারবার বিশ্বাসঘাতকতা করার চেষ্টা করেছো। তোমাদের মদীনা ত্যাগের জন্য দশদিন সময় দেয়া হলো, এরপর যদি তোমাদের মধ্য হতে কাউকে মদীনায় দেখা যায় তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হবে।"

'আব্দুল্লাহ ইবন উবাই জোর করে আটকে না রাখলে বনু নাদির গোত্র এ নির্দেশের পরই মদীনা ত্যাগ করতো। এছাড়া, ইহুদীদের নেতা হুবাই ইবন আখতাবও তাদের দূর্গে দৃঢ় ভাবে অবস্থান করার জন্য তাদের পরামর্শ দিতে থাকে। দশদিন অতিক্রম হয়ে যাবার পরও যখন বনু নাদির তাদের দূর্গ ত্যাগ করলো না, তখন আল্লাহর রাসুল(সা.) দলবল সহ তাদের ঘেরাও করেন এবং যে পর্যন্ত না বনু নাদির রাসুল(সা.) এর কাছে তাদের প্রাণ ভিক্ষা চায় সে পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ করেন। মদীনা ত্যাগের সময় আল্লাহর রাসুল(সা.) উটের পিঠে করে যতোটা মালামাল নিয়ে যাওয়া যায় ততোটা নেয়ার অনুমতিও তাদের দেন। শেষ পর্যন্ত তারা তাদের জমিজমা, খেজুর বাগান ও অস্ত্রসস্ত্র পেছনে ফেলে মদীনা ত্যাগ করে। রাসুল(সা.) তাদের ফেলে যাওয়া সম্পদ মুহাজিরদের ভেতরে ভাগ করে দেন। আনসারদের মধ্য হতে শুধু আবু দুজানাহ এবং সাহল ইবন হানিফ নামে দু'জন সাহাবীকে দরিদ্রতার কারণে বনু নাদিরের সম্পদের অংশ দেয়া হয়েছিলো। বনু নাদির গোত্রকে মদীনা থেকে বিতারনের মাধ্যমে রাসুল(সা.) মদীনার অভ্যন্তরীন বিদ্রোহকে সাফল্যের সাথে দমন করেন এবং মুসলিমদের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করেন।

আল্লাহর রাসুল(সা.) এবার ইসলামের পররাষ্ট্রনীতির দিকে নজর দিয়ে কুরাইশদের কাছে প্রতিশ্রুত বদর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে সামনে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু, বদরের প্রান্তরে তিনি(সা.) শত্রুপক্ষের দেখা পেলেন না। এটা ছিলো ওহুদের যুদ্ধের একবছর পরের ঘটনা। ওহুদের যুদ্ধে মুসলিমদের দুঃখজনক পরাজয়ের পর পৌত্তলিকদের সর্দার আবু সুফিয়ান সর্দপে ঘোষণা দিয়েছিলো যে,"এটা হলো বদরের পরাজয়ের প্রতিশোধ, আগামীবছর বদর প্রান্তরে তোমাদের সাথে আবার সাক্ষাৎ হবে।" রাসুল(সা.) আবু সুফিয়ানের এ উক্তিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাই, তিনি (সা.) যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন। প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে তিনি(সা.) 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্দুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সলুলকে (মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এর পুত্র) মদীনার দায়িত্বে রেখে বদরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। বদরের প্রান্তরে পৌছানোর পর তারা কুরাইশদের সাথে মুখোমুখি যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। ওদিকে, আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কুরাইশরা দুই হাজার যোদ্ধা সহ মক্কা ত্যাগ করলেও খুব শীঘ্রই আবার তারা সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ফিরে যায়।

আল্লাহর রাসুল(সা.) বদরের প্রান্তরে কুরাইশদের জন্য দীর্ঘ আট দিন অপেক্ষা করলেন। কিন্তু, কুরাইশরা আর ফিরে আসলো না। শেষ পর্যন্ত তাঁরা খবর পেলেন যে, কুরাইশরা দলবল সহ মক্কায় ফিরে গেছে। এ সংবাদ পাবার পর তিনি(সা.) তাঁর সাহাবীদের সহ মক্কায় ফিরে আসলেন, সাথে করে আনলেন বদরের প্রান্তরে ব্যবসা থেকে অর্জিত পর্যাপ্ত মুনাফা। এ যাত্রায় মুসলিমরা কুরাইশদের সাথে কোন যুদ্ধ না করেই বিজয়ীর বেশে উৎফুল্ল চিত্তে মদীনায় ফিরে এলো। এর পরপরই রাসুল(সা.) তাঁর দলবল নিয়ে নজদ এলাকার গাতাফান গোত্রকে আক্রমণ করেন। আক্রমণে হতবিহবল হয়ে গাতাফান গোত্রের লোকেরা তাদের সহায়-সম্পদ ও নারীদের রেখেই পালিয়ে যায়। এসব কিছু সহ মুসলিমরা মদীনায়

ফিরে আসে। এরপর রাসুল(সা.) সিরিয়া ও হেজাজের সীমান্তবর্তী এলাকায় দুমাত আল-জান্দাল গোত্রকে আক্রমণ করেন। এটা আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিলো অন্যান্য গোত্রগুলোকে সর্তক সংকেত দেয়া যারা প্রায়ই মুসলিমদের কাফেলার উপর হামলা করতো। কিন্তু, জুন্দাল গোত্র মুসলিমদের সাথে কোনরকম সংঘর্ষে না গিয়ে ধন-সম্পদ পেছনে ফেলে পালিয়ে যায়। আর মুসলিমরা সেগুলো নিয়ে মদীনায় ফেরত আসে।

আল্লাহর রাসুল(সা.) এর এ সমস্ত আক্রমণের সিদ্ধান্ত ও গৃহীত পদক্ষেপ মূলতঃ মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন-কর্তৃত্বকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করেছিলো এবং সমস্ত আরব ও ইহুদী গোত্রগুলোর নিকট মুসলিমদের প্রতাপ-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেছিলো। আর নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলো ওহুদের যুদ্ধে মুসলিমদের পরাজয়ের সকল নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া।

## আল-আহযাবের যুদ্ধঃ

ওহুদ যুদ্ধের পর অতর্কিত আক্রমণ সহ বিভিন্ন গোত্রের বিরদ্ধে যে সব শাস্তিমূলক পদক্ষেপ রাসুল(সা.) নিয়েছিলেন তা মদীনার মুসলিমদের অবস্থানকে পূণরায় উপরে তুলে ধরতে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন-কর্তৃত্বকে সুসংহত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলো ।

আল্লাহর রাসুলের এ সমস্ত সুচিন্তিত পদক্ষেপ মূলতঃ মুসলিমদের প্রভাব বলয়কে বিস্তৃত করে এবং আরব ভূ-খন্ডে রাতারাতি তাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে নতুন এক উচ্চতায় নিয়ে যায়। আর, সমস্ত আরব ভূ-খন্ড মুসলিমদের শক্তিসামর্থ্যের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে যায়। এরপর থেকে আরব গোত্রগুলো তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণের গন্ধ পাওয়া মাত্রই মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করার চাইতে পালিয়ে যাওয়াকেই শ্রেয় মনে করতো। গাতফান ও দুমান আল-জুন্দাল গোত্রের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছিলো। ওদিকে, কুরাইশরাও মুসলিমদের শক্তিসামর্থ্যের সাথে পাল্লা দিয়ে পেরে উঠছিলো না। এছাড়া, তারা নিজেরা মুসলিমদের মুখোমুখি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মনোবলও হারিয়ে ফেলেছিলো। এর চমৎকার উদাহরণ হচ্ছে বদরের প্রান্তরে দ্বিতীয় যুদ্ধ। যে যুদ্ধে কুরাইশরা ভীত ও আতঙ্কিত হয়ে পিছু হঠে যায়, এমনকি আর ফিরে আসার সাহসও করে না। এ সমস্ত ঘটনা মদীনার মুসলিমদের জীবনযাত্রাকে কিছুটা হলেও স্থিতিশীল করে। শত্রুপক্ষের অতর্কিত আক্রমণ থেকে তারা মোটামুটি নিশ্চিন্ত হয় এবং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মদীনার সমাজ গঠনে মনোযোগী হয়। এছাড়া, পরিবর্তিত এ নতুন পরিস্থিতি তাদের চলমান জীবনযাত্রাকেও পরিবর্তন করে দেয়। কারণ, ইতিমধ্যে যুদ্ধলব্ধ মালামাল হিসাবে প্রাপ্ত বনু নাযির গোত্রের জমিজমা, খেজুর বাগান, ঘরবাড়ী ও আসবাবপত্র রাসুল(সা.) মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছিলেন। যা তাদের জীবনযাত্রায় নতুন সৌভাগ্যের সূচনা করেছিলো। কিন্তু, এসব কোনকিছুই তাদেরকে মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি, আর তা হলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ। কারণ, আল্লাহ সুবহানুওয়াতায়ালা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত মুসলিমদের জন্য জিহাদ করা ফরজ করেছেন। যাই হোক, পরিবর্তিত এই নতুন পরিস্থিতি একদিকে মুসলিমদের জীবনযাত্রার মানকে যেমন উন্নত করলো, অন্যদিকে তাদের জীবনে ফিরে আসলো কাঙ্খিত স্থিতিশীলতা।

মদীনায় শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করলেও আল্লাহর রাসুল(সা.) শত্রুপক্ষের ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারে সবসময়ই সর্তক থাকতেন। সমস্ত আরব ভূ-খন্ডের কোথায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে কি ষড়যন্ত্র হচ্ছে কিংবা কারা কি ধরণের পরিকল্পনা করছে এ সমস্ত ব্যাপারে তিনি(সা.) সবসময়ই খোঁজখবর রাখতেন। খবর সংগ্রহ করার জন্য তিনি সমস্ত আরব উপদ্বীপ সহ এর বাইরের বিভিন্ন স্থানে গুপ্তচরও নিযুক্ত করেছিলেন। যে কোন ধরনের অতর্কিত আক্রমণ ও সহিংষতা মুকাবিলায় তিনি(সা.) থাকতেন অসম্ভব রকমের উদ্বিগ্ন। কারণ, একদিকে মুসলিমদের শক্তিসামর্থ্য যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছিল সেইসাথে বাড়ছিলো তাদের শত্রুর সংখ্যা, which was reactionary to the building of an army and a State to be reckoned with. This was particularly the case after ইহুদী গোত্র বনু কাইনুকা ও বনু নাযিরকে মদীনা থেকে বিতাড়ন করা এবং গাতফান, হাদায়েল ও অন্যান্য গোত্রগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেবার পর।

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, রাসুল(সা.) শত্রুপক্ষের গতিবিধি ও পরিকল্পনা সম্পর্কে গুপ্তচরবৃত্তির মাধ্যমে খবর সংগ্রহ করাকেই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ মনে করলেন। কুরাইশরা যখন অন্যান্য গোত্রকে সঙ্গে নিয়ে মদীনা আক্রমণ করতে আসছিলো তখন তিনি এ পদ্ধতিতেই বিপদ সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন। আর, নতুন বিপদ মুকাবিলার জন্য নিয়েছিলেন প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি।

এদিকে, মদীনা থেকে বহিস্কৃত হবার পর ক্রুদ্ধ বনু নাযির গোত্র অপমানের প্রতিশোধ নেবার সুযোগ খুঁজতে থাকে। এ লক্ষ্যে তারা চেষ্টা করে আরবের বিভিন্ন গোত্রকে মুহাম্মদ(সা.) এর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক মিলে মুহাম্মদ(সা.) এর বিরুদ্ধে একটি দলও তৈরী করে, যাদের মধ্যে ছিলো হুয়াই ইবন আখতাব, সালাম ইবন আবি আল-হুকাইক এবং কিনানাহ ইবন আবি আল-হুকাইক। আর, বনু ওয়ায়ি'ল গোত্র থেকে ছিলো হাওদাহ ইবন কায়েস এবং আবু 'আম্মার। তারা একত্রিত হয়ে মক্কার কুরাইশদের কাছে যায়। কুরাইশরা হুয়াইকে তার দলবল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে জানায়,"আমি তাদের খাইবার আর মদীনার মাঝামাঝি এলাকায় রেখে এসেছি এবং মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীদের আক্রমণ করার জন্য তোমাদের সাহায্যের অপেক্ষায় আছি।" এরপর কুরাইশরা তাকে বনু কুরাইযা গোত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে জানায় যে,"বনু কুরাইযা গোত্র মুহাম্মদ(সা.)কে বোকা বানানোর উদ্দেশ্যে মদীনাতেই রয়ে গেছে। যখন আক্রমণ হবে তখন তারা তোমাদের

মদীনার ভেতর থেকে সাহায্য করবে।" এ পর্যায়ে কুরাইশরা দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে ভাবতে থাকে যে, তারা মদীনা আক্রমণ করবে কি করবে না। তারা চিন্তা করে দেখলো যে, আসলে মুহাম্মদ(সা.) আর তাদের মধ্যে সত্যিকারের কোন বিরোধ নেই। বিরোধের একমাত্র কারণ মুহাম্মদ(সা.) এর দাওয়াতী কাজ। একসময় তারা এটাও ভাবলো যে, আসলে মুহাম্মদ যা বলে সেটাই কি সঠিক? দ্বিধাদ্বন্দে দোদুল্যমান হয়ে তারা শেষ পর্যন্ত ইহুদীদের জিজ্ঞেস করলো,"হে ইহুদীরা! তোমরা তো আল্লাহর কাছ থেকে পূর্বেই কিতাব পেয়েছো। আর, তোমরা আমাদের আর মুহাম্মদের মধ্যে মতভেদের ব্যাপারেও জানো। তোমরা বল তো আমাদের দ্বীন সঠিক না মুহাম্মদের?" উত্তরে ইহুদীরা বললো,"অবশ্যই তোমাদের দ্বীন মুহাম্মদের আনীত দ্বীনের থেকে অনেক ভালো এবং এ ব্যাপারে তোমাদের দাবীও সঠিক!"

ইহুদীরাও এক আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতো এবং তারা খুব ভালো করেই জানতো যে, মুহাম্মদ(সা.) এর দাবী সম্পূর্ন সঠিক। কিন্তু, তারপরেও তারা শুধু তাদের ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ স্পৃহা থেকে মুসলিমদের উপর চূড়ান্ত এক আঘাত হানার জন্যই আরব গোত্রগুলোকে মুহাম্মদ(সা.) এর বিরুদ্ধে উসকে দিচ্ছিল। বস্তুতঃ এক আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করার পরও মূর্তিপূজাকে সঠিক বলে ঘোষণা দেয়া তৌহিদবাদীদের জন্য এক চরম অবমাননাকর কাজ। কিন্তু, তা সত্ত্বেও হীন স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে এ ধরনের ঘৃণ্য কাজের পূণরাবৃত্তি করতেও ইহুদীদের কোন দ্বিধা নেই।

ইহুদীরা যখন নিশ্চিত হয়ে যায় যে, মদীনা আক্রমণ করার জন্য আহবান করা মাত্রই কুরাইশরা দ্বিধাহীন চিত্তে সাড়া দেবে, তখন তারা সমর্থনের আশায় কায়েস ঘাইলানের ঘাতাফান গোত্র, বনু মুর্‌রাহ থেকে আরম্ভ করে  বনু ফাযারাহ, বনু আসজা', বনু সালিম, বনু সা'দ, বনু আসাদ সহ আরবের যতো গোত্রের মুহাম্মদ(সা.) এর প্রতি বিদ্বেষমূলক মনোভাব ছিলো তাদের সকলের কাছে যায়। কিছুদিনের মধ্যেই কুরাইশদের নেতৃত্বে আরবের বিভিন্ন গোত্র একত্রিত হয়ে মদীনা উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

এ যুদ্ধে কুরাইশরা এগিয়ে যায় আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে। এ সময় তাদের সঙ্গে ছিলো ৪০০০ যোদ্ধা, ৩০০ অশ্বারোহী এবং আরও ১৫০০ উটের পিঠে আরোহনকারী যোদ্ধা। 'উইয়াইনা ইবন হিসন ইবন হুদায়ফার নেতৃত্বে বনু ফাযারাহ্ গোত্রের পক্ষে ছিলো ১০০০ যোদ্ধার এক বিরাট বাহিনী। আসজা' গোত্র মিশ'আর ইবন রাখাইলাহ্ এবং মুররাহ্ গোত্র আল-হারিছাহ্ ইবন 'আউফ এর নেতৃত্বে ৪০০ যোদ্ধা নিয়ে এ যুদ্ধ অংশগ্রহন করে। বনু সালিম এবং বীর মা'য়ুনার লোকেরা ৭০০ যোদ্ধা নিয়ে এ বিশাল বাহিনীর সাথে যুক্ত হয়। তারা সকলে একত্রিত হবার পর এদের সাথে বনু সা'দ এবং বনু আসাদ গোত্র তাদের দলবল নিয়ে যুক্ত হয়ে এ বাহিনীর শক্তি আরও বৃদ্ধি করে। বিশাল এ সৈন্যদলের মোট সংখ্যা শেষপর্যন্ত গিয়ে দাঁড়ায় ১০ হাজারে। মিলিত এ সৈন্যবাহিনী আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মদীনা আক্রমণ করতে এগিয়ে যায়। মুহাম্মদ(সা.)এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছালে তিনি(সা.) মদীনার ভেতরেই পরিখা খননের সিদ্ধান্ত নেন। মূলতঃ সালমান ফারসী(রা.) পরামর্শেই সাহাবীরা মদীনার চারপাশে পরিখা খননের কাজ শুরু করে এবং মুসলিমদের উৎসাহ দেবার জন্য এ কাজে রাসুল(সা.) নিজেও অংশগ্রহন করেন। পরকালে জান্নাতের আশায় সাহাবীরা প্রচন্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করতে থাকেন। আল্লাহর রাসুল(সা.)ও এ কাজে তাদের সর্বাত্মক শ্রম দেবার জন্য উৎসাহিত করতে থাকেন। ফলে, মাত্র ছয়দিনের মধ্যেই বিশাল এ পরিখা খননেন কাজ সম্পন্ন হয়। এছাড়া, পরিখার সম্মুখ ভাগে অবস্থিত বাড়ীগুলোকে সুরক্ষিত করা হয় আর পরিখার বাইরের (অর্থাৎ যে বাড়ীগুলো পরিখার বাইরের অংশে ছিলো) বাড়ীগুলোকে জনশূণ্য করা হয়। নারী ও শিশুদের সুরক্ষিত ঘর-বাড়ীগুলোর মধ্যে রাখা হয়। এরপর, আল্লাহর রাসুল(সা.) ৩০০০ যোদ্ধা সহ শত্রুপক্ষকে মুকাবিলা করতে এগিয়ে যান। তাঁর পেছন দিকে ছিলো সাল উপত্যকা এবং সদ্যসমাপ্ত পরিখাটি ছিলো রাসুল(সা.) এবং তাঁর শত্রুপক্ষের মাঝামাঝি। এখানেই তিনি(সা.) দলবল সহ অবস্থান নেন এবং তাঁর জন্য টানানো হয় একটি লাল রঙের তাঁবু।

ওদিকে কুরাইশ ও তাদের মিত্রবাহিনী বিশাল দলবল নিয়ে ওহুদের প্রান্তরে পৌঁছে যায়। তারা ভেবেছিলো হয়ত এখানেই তাদের কাঙ্খিত শত্রুপক্ষের সাথে সাক্ষাৎ হবে। কিন্তু, তাদের অদৃষ্টে তা হবার ছিলো না। বাধ্য হয়ে তারা দলবল নিয়ে আরও সামনের দিকে এগিয়ে যায় এবং মদীনায় না পৌঁছা পর্যন্ত তাদের এ যাত্রা অব্যাহত থাকে। মদীনায় পৌঁছে তারা তাদের সামনে বিরাট এক পরিখা দেখে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। কারণ, এ ধরনের কোন আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধকৌশলের সাথে তাদের একেবারেই পরিচয় ছিলো না। এ অবস্থায় তারা মদীনায় বাইরে পরিখার অপর পাশে অবস্থান নিতে বাধ্য হয় এবং ভাবতে থাকে তাদের পরবর্তী যুদ্ধ কৌশল। কিন্তু, আবু সুফিয়ান ও তার সাথীরা শীঘ্রই বুঝতে পারে এখানে তাদের অপেক্ষার সময় হবে দীর্ঘ। কারণ, এ বিশাল পরিখা অতিক্রম করা তাদের পক্ষে আসলে সম্ভব হবে না। এরকম একটা অমীমাংসিত যুদ্ধাবস্থা তাদের জন্য হয়ে যায় যন্ত্রনাদায়ক। তখন ছিলো শীতকাল, হু হু ঠান্ডা বাতাস সবার গায়ে যেন হুল ফোটাচ্ছিল। এ রকম অসহনীয় অবস্থায় ক্রমশঃ সবাই যুদ্ধের মনোবল হারিয়ে ফেলতে লাগলো এবং ভেতরে ভেতরে বাড়ী ফিরে যাবার জন্য ব্যকুল হয়ে পড়লো। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষন করে, হুয়াই ইবন আখতাব কুরাইশ ও তাদের মিত্রদের পরামর্শ দেয় যে, বনু কুরাইযা গোত্রকে মুসলিমদের সাথে কৃত শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করে তাদের পক্ষে যুদ্ধ করতে বলা উচিত।  কারণ, যদি তা হয় তাহলে বর্হিবিশ্বের সাথে মুসলিমদের সকল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং তারা তখন অবলীলায় মদীনা আক্রমণ করতে পারবে।

প্রস্তাবটি কুরাইশ ও ঘাতাফান গোত্রের খুবই পছন্দ হওয়ায় তারা হুয়াইকে এ প্রস্তাবটি বনু কুরাইযার নেতা কা'ব ইবন আসাদের কাছে উপস্থাপন করার জন্য নিযুক্ত করে। হুয়াই এর আগমনের সংবাদ শুনে কা'ব তার মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু, কা'ব দরজা খোলা না পর্যন্ত হুয়াই তার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। অনেক চেষ্টা-চরিত্রের পর শেষ পর্যন্ত কা'ব তার ঘরের দরজা খুলে দেয়। দরজা খোলার পর কা'ব

বলে,"তোমার উপর সৌভাগ্য বর্ষিত হোক কা'ব! আমি তোমার জন্য বহন করে এনেছি অনন্ত সৌভাগ্য। আর, আমার সাথে রয়েছে এক বিশাল বাহিনী। আমার সাথে রয়েছে কুরাইশ সর্দার ও তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা। আরও রয়েছে ঘাতাফানের সর্দার ও তাদের নেতৃস্থানীয় মানুষেরা। তারা আমাদের সাথে এ মর্মে প্রতিজ্ঞা করেছে যে, তারা মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীদের নিশ্চিহ্ন করে এখান থেকে যাবে না।" কা'ব ইবন আসাদ তার এ প্রস্তাবে ইতস্তত করছিলো। তার মনে পড়ছিলো মুহাম্মদ(সা.) এর সত্যবাদিতা ও মহানুভবতার কথা। একই সাথে সে এ ধরনের বিশ্বাসঘাতকতামূলক কর্মকান্ডের পরবর্তী ফলাফল নিয়েও আতঙ্কিত ছিলো। কিন্তু, হুয়াই অত্যন্ত ধূর্ততার সাথে তার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকলো। তাকে স্মরণ করিয়ে দিলো মুহাম্মদ(সা.)এর ইহুদীদের সাথে কৃত ব্যবহার এর কথা। আবারও তাকে জানালো শত্রু মুকাবিলায় মিত্রবাহিনীর শক্তি সম্পর্কে। শেষ পর্যন্ত হুয়াই এর ইচ্ছারই জয় হলো এবং কা'ব তার প্রস্তাবে সম্মতি দিলো।

এরপর কাফিরদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কা'ব মুসলিমদের সাথে তার কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং তার ও মুহাম্মদ(সা.) এর মধ্যকার সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়। এরপর সে রাসুল(সা.) এর অজান্তেই কুরাইশ ও তাদের মিত্রবাহিনীর সাথে যোগ দেয়। এ সংবাদ আল্লাহর রাসুল(সা.) ও সাহাবাদের কাছে পৌছালে তারা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। পরিস্থিতি অবনতি হওয়ার আশঙ্কায়, রাসুল(সা.) 'আউস গোত্রের নেতা সা'দ ইবন মু'য়াজ, খাযরাজ গোত্রের নেতা সা'দ ইবন 'উবাদাহ্ এবং তাদের সাথে 'আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহাহ্ ও খাওওয়াত ইবন জুবায়েরকে ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য পাঠিয়ে দেন। ঘটনা সত্য হলে তিনি(সা.) সাংকেতিক চিহ্নের মাধ্যমে তাঁকে জানানোর নির্দেশ দেন, যাতে মুসলিমদের মনোবলে কোন ফাটল না ধরে। আর যদি তা না হয়, অর্থাৎ বনু কুরাইযা যদি তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে তাহলে তাদের তা উচ্চস্বরে ঘোষণা করতে বলেন। এ নির্দেশ পাবার পর তারা গিয়ে দেখেন, তারা যতোটা শুনেছিলেন পরিস্থিতি আসলে তার চাইতেও ভয়াবহ। তারা বনু কুরাইযাকে তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার অনুরোধ করে। কিন্তু, বনু কুরাইযা এর বিনিময়ে তাদের ভাই বনু নাযিরকে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দাবী করে। সা'দ ইবন মুয়াজ যিনি একসময় বনু কুরাইযার মিত্রপক্ষ ছিলেন, আপ্রাণ চেষ্টা করেন কা'বের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে। কিন্তু, তার ফলাফল হয় আরও খারাপ। এ পর্যায়ে কা'ব ও তার সঙ্গিরা মুহাম্মদ(সা.)কে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে নানারকম কথা বলতে থাকে। তারা বলে,"আল্লাহর রাসুল আবার কে? আমাদের মুহাম্মদ নামে কারও সাথে কখনো কোনরকম চুক্তি ছিলো না।" দূতেরা মুহাম্মদ(সা.) এর কাছে গিয়ে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন এবং সমস্ত ঘটনা তাঁকে অবহিত করেন। এরপর পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করে, আর চারদিকে বিরাজ করতে থাকে মূর্তিমান আতঙ্ক।

এর মধ্যে শত্রুদের সম্মিলিত বাহিনী মুখোমুখি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। বনু কুরাইযা গোত্র তাদের মিত্রপক্ষের কাছে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য দশদিনের সময় চেয়ে নেয়। আর, এ সময়ের মধ্যে সম্মিলিত সৈন্যবাহিনী মুসলিমদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা করে। মুহাম্মদ(সা.)কে পরাস্ত করার জন্য তারা তাদের বাহিনীকে তিনভাগে ভাগ করে। ঠিক হয় যে, ইবন আল 'আওয়ার আল-সিলমীর নেতৃত্বাধীন দল উপত্যকার দিক হতে মদীনাকে রুদ্ধ করবে। 'উইয়াইনা ইবন হিসন এগিয়ে যাবে এক পাশ থেকে। আর আবু সুফিয়ান তার দলবল নিয়ে পরিখার সামনের দিক থেকে আক্রমণ চালাবে। এ অবস্থায় শ্বাসরুদ্ধকর আতঙ্ক মুসলিমদের গ্রাস করে, যাতে তারা হয়ে পড়ে প্রচন্ড পরিমাণে ভীত । আর, অপরদিকে প্রতিপক্ষের সম্মিলিত বাহিনী আত্মবিশ্বাসে টগ্‌বগ্ করে ফুটতে থাকে। মুসলিমদের চোখে পরিষ্কার ভাবে দৃশ্যমান হয় তাদের শক্তিসামর্থ্য। শত্রুপক্ষ পরিখার দিকে এগুতে থাকে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ পরিখা অতিক্রম করতেও সমর্থ হয়। এদের মধ্যে ছিল কুরাইশ গোত্রের কিছু অশ্বারোহী। 'আমর ইবন আবদুদ, 'ইকরামাহ্ ইবন আবি জাহল এবং দিরার ইবন আল-খাত্তাব পরিখার অপ্রশস্ত একটি অংশের মধ্য দিয়ে ওপারে চলে যায়। তারা তাদের ঘোড়াকে এমন ভাবে প্রহার করে যে, ঘোড়া তাদের সহ সজোরে লাফ দিয়ে পরিখা আর সালের মধ্যবর্তী স্যাঁতস্যাঁতে এলাকায় চলে আসে।

শত্রুপক্ষ পরিখার যে অপ্রশস্ত এলাকা দিয়ে এপারে আসার চেষ্টা করছিল 'আলী ইবন আবু তালিব কয়েকজন মুসলিম সহ সে স্থানে অবস্থান নিলেন। 'আলী ইবন আবু তালিব ও তাঁর সঙ্গীরা যখন পথরোধ করে দাঁড়ালো তখন 'আমর ইবন আবদুদ তাদরকে সম্মুখ যুদ্ধের জন্য আহবান করলো। 'আলী(রা.) তার চ্যালেঞ্জ গ্রহন করে বললেন,"তুমি আগে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে আসো।" উত্তরে 'আমর বললো,"হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, আমি তোমাকে হত্যা করতে চাই না।" 'আলী(রা.) বললেন,"কিন্তু, আমি তোমাকে হত্যা করতে চাই।" এরপর তাদের মধ্যে যুদ্ধ হলো এবং আলী(রা.) তাকে হত্যা করে ফেললেন। বাকী অশ্বারোহীরা এ দৃশ্য দেখে ঝড়ের গতিতে পরিখা পার হয়ে ওপারে চলে গেল। কিন্তু, এ দূর্ঘটনা কাফিরদের মনোবলে এতোটুকু ফাটল ধরাতে পারলো না বরং, তারা ক্রুদ্ধ হয়ে আরও দৃঢ়তার সাথে ভয়ঙ্কর আক্রমণের প্রস্তুতি নিলো। ইতিমধ্যে বনু কুরাইযার উম্মত্ত যোদ্ধারা একে একে তাদের দূর্গ ছেড়ে বের হয়ে মদীনায় প্রবেশ করতে শুরু করলো। আশেপাশের মুসলিম বসতিগুলোর মাঝে আতঙ্ক ছড়ানোই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। এ পরিস্থিতিতে মুসলিম বসতিগুলোতে বিরাজ করতে থাকল আতঙ্ক, বিভীষিকা ও চরম উদ্বেগ। কিন্তু, এ উদ্বেগ আল্লাহর রাসুল (সা.)কে এতোটুকু স্পর্শ করলো না। বরং, তিনি(সা.) ইস্পাত কঠিন মনোবল নিয়ে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়ের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

স্বস্তিদায়ক ঘটনা ঘটলো নু'য়াম ইবন মাস'উদ এর মাধ্যমে। তিনি ইতিমধ্যে ইসলাম গ্রহন করেছিলেন কিন্তু, তার গোত্রের লোকেরা এ সংবাদ জানতো না। মুসলিমদের এ সঙ্কটপূর্ণ সময়ে তিনি আল্লাহর রাসুলের কাছে আসলেন এবং শত্রুদের ঐক্যে ফাটল ধরানোর জন্য তাঁকে একটা উপায় বাতলে দিলেন। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি বনু কুরাইযা গোত্রের নিকট গেলেন। অজ্ঞতার যুগে বনু কুরাইযার ছিলো তার অন্তরঙ্গ বন্ধু,

আর তাদের মধ্যে ছিলো চমৎকার সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক। এ সম্পর্কের সূত্র ধরে তিনি বনু কুরাইযাকে বুঝিয়ে বললেন, যদি ঘাতাফান আর কুরাইশ গোত্র তাদের মুহাম্মদ(সা.)কে একাকী মুকাবিলার জন্য ফেলে চলে যায় তাহলে তার পরিণতি কি হতে পারে। তিনি এ বিষয়ে যে যুক্তি তুলে ধরলেন তা হলো, কুরাইশ আর ঘাতাফান গোত্র হয়তো এখানে খুব বেশীদিন অবস্থান করবে না, কারণ তারা এ এলাকার বাসিন্দা না। এ অবস্থায় যদি তারা যুদ্ধ ক্ষেত্র ছেড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে বনু কুরাইযা কোনভাবেই মুসলিমদের একক ভাবে মুকাবিলা করতে পারবে না।

সবশেষে তিনি তাদের পরামর্শ দিলেন যে, কুরাইশ ও ঘাতাফান গোত্রের নেতৃস্থানীয় দু'জনকে তাদের হাতে জিম্মি হিসাবে না রাখা পর্যন্ত যেন তারা যুদ্ধের ময়দানে না যায়। কারণ, জিম্মিদের জন্য তারা এখানে অবস্থান করতে বাধ্য হবে। পরিস্থিতি এ রকম হলেই একমাত্র তাদের মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করতে সম্মিলিত বাহিনীর সাথে প্রাণপণ যুদ্ধ করা উচিত। কুরাইযা ভেবে দেখলো যে, এটা একটা চমৎকার পরামর্শ। এরপর, নু'য়াম কুরাইশদের গিয়ে বললেন বনু কুরাইযা মুহাম্মদের বিরোধিতা করার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছে। শুধু তাই নয়, তাদের পূর্বের সিদ্ধান্তের জন্য তারা যথেষ্ট লজ্জিত ও অনুতপ্তও হয়েছে। তারা তাদের কর্মফলের প্রায়শ্চিত্য করার লক্ষ্যে কুরাইশ ও ঘাতাফান গোত্রের নেতৃস্থানীয় দু'জনকে মুসলিমদের হাতে তুলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যেন তারা তাদের হত্যা করতে পারে। সুতরাং, তারা যদি তোমাদের কাউকে জিম্মি হিসাবে দাবী করে তাহলে কক্ষনো তাদের দাবী মেনে নিও না। আর, খবরদার! তাদের হাতে তোমাদের কাউকে তুলে দিও না। ঘাতাফান গোত্রের কাছে গিয়েও তিনি তাদের একই কথা বললেন।

নু'য়ামের এ কথায় ইহুদীদের ব্যাপারে আরবদের সন্দেহ ঘনীভূত হলো এবং আবু সুফিয়ান কা'ব এর কাছে সংবাদ পাঠাল যে, তারা দীর্ঘদিন ধরে মুহাম্মদকে অবরোধ করে আছে, সুতরাং বনু কুরাইযা যেন আগামীকালই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। এর উত্তরে কা'ব জানাল যে, আগামীকাল হচ্ছে সাববাথ। এদিন তারা যুদ্ধও করে না, কোনও কাজও করে না। এ ধরনের উত্তরে আবু সুফিয়ান খুবই রাগান্বিত হয়ে গেল এবং তার কাছে নু'য়ামে কথাই সত্য মনে হলো। সে আবারও আর একদল বার্তাবাহক পাঠিয়ে জানালো যে, আগামীকালই মুহাম্মদকে আক্রমণ করা খুবই জরুরী। তারা যেন এ সাববাথ পালন না করে অন্যদিন তা পালন করে। বার্তাবাহকরা কুরাইযাকে এটাও জানালো যে, তারা যদি আগামীকাল যুদ্ধ না করে তাহলে তাদের আর সম্মিলিত বাহিনীর মধ্যে কৃত সকল চুক্তি এখানেই শেষ হয়ে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত বনু কুরাইযাকে একাকীই মুহাম্মদ(সা.) এর মুখোমুখি হতে হবে। একথা শোনার পরও কুরাইযা যুদ্ধ না করে তাদের সাববাথ পালনের সিদ্ধান্তেই অটল থাকলো, উপরন্তু, কুরাইশদের কাছে দু'জন জিম্মি দাবী করে বসলো। তাদের এ দাবীর পর নু'য়ামের কথার সত্যতা সম্পর্কে আবু সুফিয়ানের আর কোন সন্দেহ রইলো না। এরপর সে নতুন রনকৌশলের কথা ভাবতে লাগলো। আর, ঘাতাফান গোত্রের সাথে শলা-পরামর্শ করে মুহাম্মদ(সা.)কে আক্রমণ করার ব্যাপারে দ্বিতীয় চিন্তা করতে থাকল।

সে রাতে আল্লাহতায়ালা তাদের জন্য পাঠালেন তীব্র শীতল ঝড়ো হাওয়া, আর সেই সাথে বজ্রপাত ও বিজলীর চমক। তীব্র আচম্‌কা ঝড়ে শত্রুপক্ষের তাঁবুগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। এদিক ওদিক ছিট্‌কে গেল তাদের রান্নার সমস্ত সরঞ্জাম। ভয়াবহ আতঙ্ক তাদের গ্রাস করে ফেললো। প্রতিমূহুর্তে তারা ভাবতে লাগলো, নাজুক এই পরিস্থিতিতে কাজে লাগিয়ে এখনই বুঝি মুহাম্মদ আর তাঁর সঙ্গীরা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে তাদের। এরমধ্যে আবার, তুলাইহা চিৎকার করতে লাগলো,"মুহাম্মদ তোমাদের দিকে ধেয়ে আসছে, প্রাণ বাঁচানোর জন্য তোমরা পালাও।" একথা শুনে আবু সুফিয়ান ঘোষনা দিল,"কুরাইশরা, তোমরা ক্ষান্ত হও। আমি আর এর মধ্যে নেই।" এরপর তারা যে যা পারলো সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে বাঁচল। ঘাতাফান সহ বাকী সব গোত্রও একই কাজ করলো। সকাল হওয়ার পর দেখা গেল, শত্রুপক্ষ উধাও হয়ে গেছে।

শত্রুপক্ষের এই করুণ পরিণতি দেখার পর আল্লাহর রাসুল(সা.) মুসলিমদের সহ পরিখা ছেড়ে মদীনায় চলে আসলেন। আর এভাবেই আল্লাহতায়ালা ভয়াবহ শত্রু মুকাবিলা করা থেকে মুসলিমদের মুক্তি দিলেন। এরপর, রাসুল(সা.) বনু কুরাইযা গোত্রকে শায়েস্তা করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং ইহুদীদের বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্র থেকে চিরতরে মুক্তি পাবার বন্দোবস্ত করলেন। কারণ, এরাই হচ্ছে সেই বিশ্বাসঘাতকের দল যারা চুক্তি ভঙ্গ করে শত্রুপক্ষের সাথে হাত মিলিয়েছিল আর মুসলিমদের চিরতরে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করেছিল। তিনি(সা.) মুয়াজ্জিনকে ডেকে নির্দেশ দিলেন যেন সে ঘোষনা দেয়, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অনুগত সে যেন বনু কুরাইযার আবাসস্থলে না পৌঁছান পর্যন্ত আছর নামাজ না পড়ে। রাসুল(সা.) তাঁর পতাকা হাতে আলী(রা.)কে আগে পাঠিয়ে দিলেন এবং তার পিছে পিছে মুসলিম সেনাদল প্রচন্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে রওনা হল। মুসলিমরা বনু কুরাইযা গোত্রকে পঁচিশ দিন ঘেরাও করে রেখেছিল। শেষ পর্যন্ত, ইহুদীরা মুহাম্মদ(সা.) সাথে আপোষ করে বিষয়টা ফয়সালা করার সিদ্ধান্ত নিল। অনেক বাকবিতন্ডার পর সা'দ ইবন মু'য়াজের মধ্যস্থতাকে তারা মেনে নিল এবং তার দেয়া সিদ্ধান্ত তারা মেনে নেবে বলে ঠিক করল। সা'দ ইবন মু'য়াজ রায় দিলেন যে,"গোত্রের পুরুষদের হত্যা করা হোক। তাদের সমস্ত সম্পত্তি মুসলিমদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হোক আর নারী ও শিশুদের দাস (সাবাইয়া) হিসাবে গ্রহন করা হোক।" পরবর্তীতে সা'দের এ রায়কেই বাস্ত বায়ন করা হয়। আর, এভাবেই মদীনা থেকে বনু কুরাইযার অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় আর, মদীনাবাসীও তাদের বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্র থেকে চিরতরে মুক্তি পায়।

শত্রুপক্ষের সম্মিলিত বিশাল বাহিনীর লজ্জাজনক এ পরাজয় পরবর্তীতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের বড় ধরনের কোন আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ নেয়ার সকল সম্ভাবনাকে নির্মূল করে দেয়। আর, বনু কুরাইযার করুণ পরিণতি দেখার পর রাসুল(সা.)এর সাথে চুক্তি ভঙ্গকারী বিতাড়িত বাকী তিনটি ইহুদী গোত্রও মদীনার আশে-পাশে থাকার সাহস হারিয়ে ফেলে। যার ফলে, মদীনায় আল্লাহর রাসুল(সা.) ও সাহাবীদের একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম হয়। আর, আরবের সমস্ত গোত্ররাও মুসলিমদের ব্যাপারে চিরতরে সর্তক হয়ে যায়।

## হুদাইবিয়ার সন্ধিঃ

এভাবে, আল্লাহর রাসুল(সা.) মদীনায় হিজরতের পর একে একে ছয়টি বছর পার হয়ে যায় । ইতিমধ্যে, রাসুল(সা.) মদীনায় ইসলামী সমাজের সার্বিক সুসংহত অবস্থা এবং শত্রু মুকাবিলায় তাঁর সৈন্যবাহিনীর শক্তিসামর্থ্য সম্পর্কে মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে যান। আর, ইসলামী রাষ্ট্রও সমস্ত আরব ভূ-খন্ডে অন্যতম শক্তি হিসাবে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। কিন্তু, তা সত্ত্বেও, রাসুল(সা.) তাঁর দাওয়াতী কার্যক্রম বিস্তারে নতুন নতুন পদক্ষেপের কথা চিন্তা করতে থাকেন, যাতে একই সাথে ইসলামের আহবানও হয় প্রতিনিয়ত শক্তিশালী, আর শত্রুপক্ষ হয় আরও দূর্বল।

এরমধ্যে, রাসুল(সা.) এর কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, খায়বার ও মক্কার লোকেরা একত্রিত হয়ে আবারও মুসলিমদের আক্রমণ করার ফন্দি আঁটছে। এ খবর শোনার পর, মক্কার লোকদের নিবৃত করার জন্য তিনি(সা.) একটি চমৎকার পরিকল্পনা করেন। এ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল খায়বারের ইহুদীদেরকে তাদের মিত্র কুরাইশ গোত্রগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন করা এবং একই সাথে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করা, যাতে সমস্ত আরব ভূ-খন্ডে রাসুল(সা.)এর দাওয়াতী কার্যক্রমের পথ মসৃণ হয়ে যায়। এ লক্ষ্যে, তিনি(সা.) তাঁর সাহাবীদের সহ পবিত্র কাবাঘর তাওয়াফ করার উদ্দেশ্যে মক্কা যাবার পরিকল্পনা করেন। তিনি(সা.) জানতেন যে, যেহেতু আরব গোত্রগুলো পবিত্র মাসে যুদ্ধ করে না, সেহেতু তাঁর জন্য এ পরিকল্পনা বাস্ত বায়ন করা সহজ হবে। এছাড়া, তিনি(সা.) এটাও জানতেন যে, ইতিমধ্যে কুরাইশদের ঐক্যে ফাটল ধরেছে এবং মুসলিমদের সম্পর্কে তাদের মনে যথেষ্ট পরিমাণ ভীতিও জন্মেছে। সুতরাং এ পরিস্থিতিতে, মুসলিমদের ত্বড়িৎ বেগে আক্রমণ করার আগে তারা অবশ্যই দ্বিতীয়বার চিন্তা করবে। এ সমস্ত কিছু চিন্তা-ভাবনা করেই তিনি(সা.) হজ্জ্ব করার সিদ্ধান্ত নেন। কারণ, যদি কুরাইশরা তাঁকে উমরাহ করতে বাঁধা দেয়, তাহলে তিনি(সা.) এটাকে কুরাইশদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারবেন। আর, এর মাধ্যমে দ্বীন ইসলামের আহবানকেও জনসাধারনের কাছে অনেক গ্রহনযোগ্য করতে পারবেন।

এ সমস্ত সম্ভাবনাকে মাথায় রেখে, আল্লাহর রাসুল(সা.) যুল কা'দার পবিত্র মাসে হজ্জ্ব করার ঘোষনা দেন এবং আরবের অন্যান্য গোত্রগুলোকেও তাঁর সাথে শান্তিপূর্ণ এ সফরে অংশ নিতে আহবান করেন। বস্তুতঃ তিনি(সা.) যে এবার শুধু হজ্জের উদ্দেশ্যেই মক্কা যাচ্ছেন, আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে নয়, এ বার্তা সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেবার জন্যই তিনি(সা.) আরব গোত্রগুলোকে তাঁর সাথে এ পবিত্র কাজে শরীক হতে আহবান করেন। এমনকি, যারা তাঁর দ্বীনের অর্ন্তভূক্ত নয় অর্থাৎ অমুসলিম গোত্রগুলোকেও তিনি(সা.) তাঁর সঙ্গী হতে আহবান জানান। যাতে সকলেই পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারে যে, তাঁর যুদ্ধ করার কোন অভিপ্রায় নেই।

এ সফরে রাসুল(সা.) নিজে তাঁর মাদী উট কুসউয়া'র পিঠে চড়ে নেতৃত্ব দেন এবং ১৪০০ সাহাবী ও ৭০ টি উট সহ মদীনা ত্যাগ করেন। আল্লাহর পবিত্র ঘর কাবা সফরের এই শান্তিপূর্ণ মনোভাব সকলকে বুঝানোর উদ্দেশ্যে তিনি(সা.) ইহরাম বাঁধা অবস্থায় যাত্রা শুরু করেন। মদীনা থেকে ছয় বা সাত মাইল দূরত্বে যুল হালিফাহ্ নামক জায়গায় পৌঁছালে অন্যান্য সাহাবীরাও ইহরাম বাঁধেন এবং ইহরামের কাপড় পড়েন। তারপর, তারা আবার মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। কুরাইশরা পূর্বেই শুনেছিল যে, মুহাম্মদ(সা.) হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা দিকে আসছেন। কিন্তু, তারা এটা ভেবে ভীত হয় যে, হয়তো মক্কায় প্রবেশের জন্য এটা মুহাম্মদদের নতুন কোন চাল। এ সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দিতে না পেরে তারা শেষ পর্যন্ত মক্কা প্রবেশকালে মুহাম্মদ(সা.)কে বাঁধা দেবার সিদ্ধান্ত নেয়।

এ কাজে কুরাইশরা খালিদ ইবন আল-ওয়ালিদ ও 'ইকরামাহ্ ইবন আবি জাহল এর নেতৃত্বে দুইশত দুর্দান্ত অশ্বারোহীর একটি দলকে নিযুক্ত করে। মুশরিকদের এ দলটি মদীনা থেকে আগত হজ্জ্বযাত্রীদের বাঁধা প্রদানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়। ধি তুহা নামক স্থানে পৌঁছে তারা যাত্রা বিরতী করে এবং হজ্জ্বযাত্রীদের আগমনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। এদিকে, রাসুল(সা.) 'উসফান গ্রামে প্রবেশ করলে কুরাইশদের প্রেরিত এ বাহিনী সম্পর্কে খবর পান। এ গ্রামের কা'ব নামের এক ব্যক্তিকে রাসুল(সা.) কুরাইশদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে জানায় যে,"কুরাইশরা আপনার আগমনের সংবাদ পেয়ে, বাঘের চামড়া পরিধান করে দুগ্ধবতী উটের পিঠে আপনাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। তারা ধি তুহায় যাত্রা বিরতী করে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে এবং প্রতিজ্ঞা করেছে যে, তাদের সাথে মুকাবিলার আগপর্যন্ত তারা আপনাকে কোনভাবেই মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না। তাদের অশ্বারোহী দলের সাথে রয়েছে খালিদ ইবন আল-ওয়ালিদ, যাকে তারা আগে থেকেই কুরা' আল ঘামিম এলাকায় পাঠিয়ে দিয়েছে।" 'উসফান থেকে কুরা' আল ঘামিম এর অবস্থান ছিল আট মাইল দূরত্বে।

একথা শোনার পর রাসুল(সা.) বললেন,"ধ্বংস হোক কুরাইশরা! যুদ্ধ তাদেরকে আসলে গ্রাস করেছে। কি তাদের এমন ক্ষতি হত যদি তারা আমাদের ও অন্য গোত্রগুলোকে আমাদের হালে ছেড়ে দিত? তাদের অন্তরের অভিলাষ হল, যদি তারা আমাকে হত্যা করতে পারত! যদি আল্লাহতায়ালা আমাকে বিজয়ী করেন তাহলে তারা ইসলামে দলে দলে প্রবেশ করবে। যদি তারা তা না করে তবে শক্তি অর্জন করার পর তারা আমার সাথে যুদ্ধ করতো। সুতরাং, তারা আসলে চায় কি? আল্লাহর কসম, আল্লাহতায়ালা যে কাজের জন্য আমাকে নিযুক্ত করেছেন তার জন্য আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করতেও পিছ পা হব না। হয় আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করবেন অথবা আমি ধ্বংস হয়ে যাব।"

এরপর, আল্লাহর রাসুল(সা.) তাঁর পূর্ব পরিকল্পনার উপরই অটল থাকলেন এবং গভীর ভাবে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলেন। কারণ, এবারে তাঁর কৌশল ছিল শান্তিপূর্ণ এবং যুদ্ধের কোন প্রস্তুতি নিয়েও তিনি(সা.) আসেননি। কিন্তু, তাঁর যুদ্ধ করার ইচ্ছা না থাকলেও কুরাইশদেও উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করা এবং এ উদ্দেশ্যেই তারা দলবল পাঠিয়েছে। সুতরাং, তিনি(সা.) ভাবতে লাগলেন, তাঁর কি মদীনায় ফিরে যাওয়া উচিত, নাকি পূর্বপরিকল্পনা বাতিল করে যুদ্ধ করা উচিত? তিনি(সা.) মুসলিমদের ঈমান সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলেন। তিনি(সা.) এটাও জানতেন যে, যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন পথ যদি তাঁদের জন্য খোলা না থাকে তাহলে মুসলিমরা নির্দেশ পাওয়া মাত্র যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে এতটুকু পিছ পা হবে না।

যাই হোক, অনেক চিন্তা ভাবনার পর রাসুল(সা.) সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তাঁর আশঙ্কা অনুযায়ী যদি তাঁকে হজ্জ্ব করতে বাঁধা দেওয়াও হয় তবুও তিনি শান্তিপূর্ণ উপায়েই সমস্ত ব্যাপারটি ফয়সালা করবেন। এ ব্যাপারে তিনি(সা.) কুরাইশদের সাথে কোনরকম সংঘর্ষে যাবেন বা বিরূপ পরিস্থিতিতে জোরপূর্বক হজ্জ্বও করবেন না। কারণ, এবার তিনি(সা.) কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বেরও হননি বা আক্রমণ করার কথা চিন্তাও করেননি। এছাড়া, এবার তাঁর শান্তিপূর্ণ এই পরিকল্পনার প্রকৃত উদ্দেশ্যই ছিল ইসলামের আহবানের মহানুভবতা ও সৌন্দর্যকে কুরাইশদের কাছে তুলে ধরা এবং ইসলামের পক্ষে মক্কায় জনমত তৈরী করা। আর, কুরাইশদের নির্বোধ গোর্য়াতুমি, পথভ্রষ্টতা ও ভয়ঙ্কর আক্রমণাত্মক মনোভাব থেকে ইসলাম যে কতো উপরে সেটাও মক্কার সমাজের মানুষের কাছে তুলে ধরা। কারণ, ইসলামী দাওয়াতী কার্যক্রমকে সঠিক ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর ক্ষেত্রে জনমতের গুরুত্ব অপরিসীম। শুধু তাই নয়, সমাজে ইসলামের পক্ষে জনমত তৈরীর মাধ্যমেই ইসলামী দাওয়াতের বিস্তৃতি ঘটতে থাকে, ফলে ইসলাম বিজয়ী শক্তি হিসাবে আর্বিভূত হয়। তিনি(সা.) ভেবে দেখলেন যে, তিনি(সা.) যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে মক্কায় ইসলামের পক্ষে জনমত তৈরীর পরিকল্পনাটা ভেস্তে যেতে পারে। সুতরাং, তিনি(সা.) সিদ্ধান্ত নিলেন যে, কোন অবস্থাতেই তিনি(সা.) কোনরকম সংঘর্ষে যাবেন না এবং তাঁর শান্তিপূর্ণ পরিকল্পনাই বাস্তবায়ন করবেন।

এ পর্যায়ে, আল্লাহর রাসুল(সা.) গভীর ভাবে তাঁর পরবর্তী পদক্ষেপের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলেন। রাজনৈতিক অঙ্গনে রাসুল(সা.)এর দক্ষতা ও বিচক্ষনতা ছিল অতুলনীয়। এ বিচক্ষনতা ও দূরদর্শিতা থেকেই তিনি(সা.) তাঁর শান্তিপূর্ণ পূর্বপরিকল্পনায় অটল থাকতে চাচ্ছিলেন। তিনি(সা.) কোনভাবেই চাচ্ছিলেন না তার পরিকল্পনা ভেস্তে যাক কিংবা জনমত তৈরী করার চমৎকার এ সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাক। কারণ, তাঁকে যদি কোন কারণে যুদ্ধ করতে হয়, তাহলে তাঁর পরিকল্পনা বুমেরাং হয়ে তাঁর কাছেই ফিরে আসবে। তখন কুরাইশরা এ চমৎকার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে সমস্ত আরবে ভয়ঙ্কর প্রচারনা চালাবে। পরিণতিতে জনমত চলে যাবে তাঁর বিপক্ষে। তিনি(সা.) মুসলিমদের ডাকলেন এবং বললেন,"কেউ কি আছে যে আমাদের এমন এক রাস্তা দিয়ে নিয়ে যেতে পারবে সে রাস্তায় কুরাইশ বাহিনীর সাথে মুকাবিলা হবে না?" মুসলিমদের মধ্য হতে একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে এগিয়ে এল এবং তাদেরকে পাহাড়ের মধ্যবর্তী সঙ্কীর্ন পাথুরে গিরিপথের ভেতর দিয়ে নিয়ে চললো যে পর্যন্ত না তারা হুদাইবিয়া নামে মক্কার নিম্নবর্তী এক উপত্যকায় পৌঁছাল। এখানেই রাসুল(সা.) তাঁর দলবল সহ অবস্থান নিলেন। খালিদ ও 'ইকরামাহ্‌র সৈন্যদল মুহাম্মদ(সা.) এর দলবলকে হুদাইবিয়া প্রান্তরে দেখে আতঙ্কিত হয়ে মক্কা রক্ষায় দ্রুত সেখানে ফিরে গেল। মুসলিম বাহিনীর এই দুঃসাহসী পদক্ষেপ দেখে পৌত্তলিকদের মেরুদন্ডে যেন আতঙ্কের স্রোত প্রবাহিত হয়ে গেল। তারা নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছিল না, কিভাবে মুসলিমরা এতো দক্ষতা ও চতুরতার সাথে তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে তাদের অরক্ষিত সীমান্তে এসে উপস্থিত হল। এই পরিস্থিতিতে, কুরাইশরা মক্কার ভেতর সুদৃঢ় অবস্থান নিল আর রাসুল(সা.) তাঁর বাহিনী নিয়ে অবস্থান নিলেন হুদাইবিয়ার প্রান্তরে। দুইপক্ষ এভাবে মুখোমুখি অবস্থায় দিন পার করতে থাকল এবং প্রত্যেকেই ভাবতে লাগলো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে পরবর্তী পদক্ষেপের কথা। মুসলিমদের মধ্যে কেউ কেউ ভাবল যে, কুরাইশরা তাদের কোন অবস্থাতেই হজ্জ্ব পালন করতে দেবে না। বরং, তাদের সাথে যুদ্ধের জন্যই প্রস্তুতি নেবে। তারা ভেবে দেখল যে, এ অবস্থায় তাদের আসলে কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ ব্যতীত কোন পথ খোলা নেই। তাই, তাদের উচিত শত্রুপক্ষের প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে দেয়া, তারপর হজ্জ্ব পালন করা। এর ফলে, কুরাইশদেরকে চরম একটা শিক্ষা দেয়া যাবে।

ইতিমধ্যে, কুরাইশরাও মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করার স্বপ্নে বিভোর হল। এমনকি, যদি তারা যুদ্ধ করতে গিয়ে ধ্বংস হয়ে যায় তবুও। কিন্তু, খুব শীঘ্রই তাদের এ সব সুখস্বপ্ন বুদবুদের মতো মিলিয়ে গেল। কারণ, তারা জানত মুখোমুখি হবার জন্য মুসলিমরা হচ্ছে সবচাইতে ভয়ঙ্কর প্রতিপক্ষ। তাই, তারা শেষ পর্যন্ত মুসলিমদের পক্ষ থেকেই প্রথম পদক্ষেপের জন্য অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল।

প্রকৃত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে, আল্লাহর রাসুল(সা.) ইহরাম বাঁধা অবস্থায় পূর্ব পরিকল্পনার উপরই অটল থাকলেন। হুদাইবিয়ার প্রান্তরে তিনি(সা.) শুধু দৃঢ়তার সাথে অবস্থান গ্রহন করলেন। অপেক্ষা করতে লাগলেন কুরাইশদের পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য। তিনি(সা.) এটা খুব ভাল

করেই জানতেন যে, কুরাইশরা তাঁর ভয়ে অত্যন্ত ভীত এবং খুব শীঘ্রই তারা তাঁর সাথে হজ্জ্ব পালন বিষয়ে দেনদরবার করার জন্য প্রতিনিধি পাঠাবে। সুতরাং, তিনি(সা.) ধৈর্য্য সহকারে কুরাইশদের প্রতিনিধি দলের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। এরপর, কুরাইশরা প্রথমে খুযায়া' গোত্রের কিছু লোক সহ বুদাইল ইবন ওরাকা' কে রাসুল(সা.)এর কাছে পাঠায়।প্রতিনিধি দল এসে জানতে চায় যে, রাসুল(সা.) আসলে কি জন্য মক্কায় আগমন করেছেন। কিছুক্ষন কথাবার্তার পরই তারা নিশ্চিত হয়ে যায় যে. মুসলিমদের মক্কা আক্রমণ করার আসলে কোন উদ্দেশ্য নেই। বরং, তারা পবিত্র কাবাঘরের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্যই মদীনা থেকে যাত্রা করেছে।

প্রতিনিধি দল কুরাইশদের কাছে ফিরে গিয়ে ঘটনা বর্ণনা করে এবং পুরো ব্যাপারটি তাদের বুঝানোর চেষ্টা করে। কিন্তু, কুরাইশরা তাদের কথা অবিশ্বাস করে এবং বলে যে, তারা মুহাম্মদ(সা.) এর কথায় প্রভাবিত হয়ে গেছে। কুরাইশরা এরপর আরেকটি প্রতিনিধি দল পাঠায়, তারাও তাদের কাছে এসে একই কথাই বলে। এরপর, কুরাইশরা আল-আহবাস (আবিসিনিয়ার অধিবাসী) গোত্রের প্রধান আল-হুলাইসকে রাসুল(সা.)এর সাথে দেনদরবার করার জন্য পাঠায়। কুরাইশরা একরকম নিশ্চিত ছিল যে, আল-হুলাইসের মুহাম্মদ(সা.)কে নিবৃত করতে পারবে। আসলে, রাসুল(সা.)এর বিরুদ্ধে হুলাইসকে ক্ষেপিয়ে তোলাই ছিল তাদের হুলাইসকে পাঠানোর প্রকৃত উদ্দেশ্য।তারা ভেবেছিল, হুলাইস যখন রাসুলুল্লাহর সাথে কোন মীমাংসায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হবে, তখন মুহাম্মদ(সা.) এর প্রতি তার ঘৃণা আরও বেড়ে যাবে। ফলে, সে মুহাম্মদ(সা.)এর আক্রমণ থেকে মক্কা রক্ষা করার ব্যাপারে তার মনোভাব আরও দৃঢ় হবে। যা হোক, মুহাম্মদ(সা.) যখন হুলাইসের আসার কথা শুনলেন তিনি(সা.) তাদের কুরবানীর পশুগুলোকে মুক্ত করে দিতে বললেন যেন সে বুঝতে পারে মুসলিমরা হজ্জ্বের জন্যই এসেছে, যুদ্ধের জন্য নয়।

আল-হুলাইস উপত্যকার পাশ থেকে আগত কুরবানীর পশুগুলোকে তার পাশ দিয়ে ঘোরাফেরা করতে দেখল। সে আরও দেখল উমরাহ করার জন্য প্রস্তুত মুসলিমদের। সে দেখল মুসলিমদের তাঁবুগুলো হজ্জ্বের মতো পবিত্র ইবাদতের আমেজে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। তাদেরকে দেখে মনেও হচ্ছে না যে, তারা যুদ্ধ করতে এসেছে। এ সব কিছু দেখে সে এতো অভিভূত হল যে, সে নিশ্চিত হয়ে গেল যে, মুসলিমরা যুদ্ধ করতে নয় বরং হজ্জ্ব পালনের উদ্দেশ্যেই এসেছে। এমনকি সে মুহাম্মদ(সা.)এর সাথে সাক্ষাৎ না করেই কুরাইশদের কাছে ফিরে গেল এবং তাদেরকে সবকিছু বিস্তারিত বর্ণনা করল। শুধু তাই নয়, ফিরে এসে সে কুরাইশদের ধমক দিয়ে বলল, যেন তারা মুহাম্মদ(সা.) এবং কা'বার মাঝে বাঁধা হয়ে না দাঁড়ায়। আর, মুসলিমদের নিবিঘ্নে হজ্জ্ব পালন করতে দেয়া হয়। এর ব্যতিক্রম হলে, সে তাঁর সৈন্যদল প্রত্যাহার করে নেবে। কুরাইশরা তাদের উদ্যত স্বরকে নমনীয় করে হুলাইসকে শান্ত করল। তারা হুলাইসের কাছে আরও ভাল কোন প্রস্তাবের জন্য কিছুটা সময় চেয়ে নিল। হুলাইস এতে সম্মতি দিলে তারা 'উরওয়া ইবন মাস'উদ আল-ছাকাফিকে পরবর্তী প্রতিনিধি হিসাবে পাঠাল এবং তারা ছাকাফিকে এ ব্যাপারে নিশ্চিত করল যে, তারা দেয়া সিদ্ধান্তকেই মেনে নেবে। 'উরওয়া ইবন মাস'উদ রাসুল(সা.)এর কাছে গিয়ে তাকে হজ্জ্ব না করে মদীনার ফেরত যাবার অনুরোধ করল।কিন্তু, তার সে চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল।

একই সাথে, এটাও স্বীকার করল যে, মুহাম্মদ(সা.)এর অবস্থানই সঠিক। তারপর সে কুরাইশদের কাছে ফিরে গিয়ে বললো, "হে কুরাইশরা! আমি খসরুর দরবারে গিয়েছি, কায়সারের দরবারেও গিয়েছি, গিয়েছি নাজ্জাশীর দরবারেও। কিন্তু, পৃথিবীর কোথাও আমি এমন কোন বাদশাহ্ দেখিনি যিনি মুহাম্মদের চাইতে বেশী তাঁর সঙ্গীদের ভালোবাসা পেয়েছেন। যখন তিনি ওজু করেন তখন তাঁর সাহাবারাও সাথে সাথে তা করার জন্য দৌড়ে যায়। যদি তাঁর একটা চুলও পড়ে যায় তবে তারা তা কুড়াবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ছুটে যায়। আমার ধারণা, তারা কোন অবস্থাতেই মুহাম্মদকে পরিত্যাগ করবে না।সুতরাং, তোমরা কি করবে তা তোমরা নিজেরাই ঠিক কর।"

কিন্তু, উরওয়া ইবন মাস'উদের এ দ্বিধাহীন বক্তব্য শুধু মুহাম্মদ(সা.) এর প্রতি কুরাইশদের বিদ্বেষ, ঘৃণা আর প্রতিহিংসাই বৃদ্ধি করল।তাদের অন্ধ গোঁয়ার্তুমি ও মিথ্যা অহঙ্কার পরবর্তী মধ্যস্থতার সকল পথকে রুদ্ধ করে দিল। তাদের মধ্যকার আলাপ-আলোচনার আর কোন মূল্যই থাকল না। এরপর, রাসুল(সা.) তাঁর পক্ষ থেকে প্রতিনিধি দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি(সা.) ভাবলেন, হয়ত কুরাইশ প্রতিনিধিরা তাঁর সাথে আলোচনা করার ব্যাপারে আতঙ্ক বোধ করছে। তাই তিনি(সা.) তাঁর পক্ষ থেকে প্রতিনিধি পাঠালেন এবং আশা করলেন হয়ত সে কুরাইশদের সাথে মধ্যস্থতা করতে সমর্থ হবে। কিন্তু, কুরাইশরা রাসুল(সা.)এর প্রতিনিধিকে বহনকারী উটের পায়ের রগ কেটে ফেলল এবং দূতকে হত্যা করতে উদ্যত হল। সৌভাগ্যবশতঃ আল-আহবাসের সেনাদল তাকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসল। মুসলিমদের প্রতি কুরাইশদের বিদ্বেষ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং তারা এক পর্যায়ে মুসলিমদের তাঁবুতে পাথর নিক্ষেপ করার জন্য তাদের বখাটে ছেলেদের লেলিয়ে দেয়। কুরাইশদের এ হীন আচরনে মুসলিমরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু, রাসুল(সা.) তাদেরকে শান্ত করেন। পরদিন, কুরাইশরা মুসলিমদের ছাউনী ঘেরাও করে তাদের প্রহার করার জন্য ৫০ জনের একটি দল পাঠায়। কিন্তু, মুসলিমরা তাদের বন্দী করে রাসুল(সা.)এর কাছে নিয়ে যায়। রাসুল(সা.) তাদের ক্ষমা করে দেন এবং তাদের ছেড়ে দেবার নির্দেশ দেন।

মুহাম্মদ(সা.) এ মহানুভব আচরন মক্কাবাসীদের প্রচন্ড ভাবে নাড়া দেয় এবং এরপর তাদের মুহাম্মদ(সা.) এর দাবীর ব্যাপারে আর কোনই সন্দেহ থাকে না। তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যায় যে, মুহাম্মদ(সা.) আসলে প্রথম থেকে সত্য কথাই বলে আসছেন। এ ঘটনা তাদের পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দিল যে, মুহাম্মদ(সা.) আসলে হজ্জ্বের উদ্দেশ্যেই এসেছেন, যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে নয়। এ পদক্ষেপের মাধ্যমে,

মুহাম্মদ(সা.) মূলতঃ মক্কার জনসাধারনের জনমত তাঁর নিজের পক্ষে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। এরফলে, পরিস্থিতি এমন দাঁড়ালো যে, তিনি(সা.) যদি তাঁর দলবল নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতে চান আর কুরাইশরা যদি তাদের মক্কা প্রবেশ কালে বাঁধা দিতে চায়, তবে মক্কার জনগণ ও অন্যান্য আরব গোত্রগুলোই মুহাম্মদ(সা.) এর সাহায্যে এগিয়ে আসবে এবং মুসলিমদের সমর্থন করবে। সুতরাং, এ পর্যায়ে কুরাইশরা তাদের উদ্দেশ্যমূলক প্ররোচনা থেকে নিজেদের বিরত করল এবং খুব গুরুত্বের সাথে শান্তিপূর্ণ সমাধানের দিকে মনোযোগ দিল। রাসুল(সা.) এরপর আরেকজন দূতকে তাঁর পক্ষ থেকে কুরাইশদের নিকট পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন এবং তিনি(সা.) ওমর ইবন খাত্তাবকে মক্কার যাবার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু, ওমর(রা.) তাঁকে বললেন,"হে আল্লাহর রাসুল! আমি কুরাইশদের কাছে আমার জীবননাশের আশঙ্কা করছি। কারণ, এখন আমাকে নিরাপত্তা দেবার জন্য বনু 'আদি ইবন কা'ব আর মক্কায় নেই। আর আপনি কুরাইশদের সাথে আমার শত্রুতা এবং তাদের প্রতি আমার রূঢ় ব্যবহার সম্পর্কেও জানেন। আমি এক্ষেত্রে, আমার পরিবর্তে 'উসমান ইবন আফফানের নাম প্রস্তাব করতে চাই, যাকে পাঠানো আমার থেকেও বেশী ফলপ্রসু হবে।"

ওমর(রা.) এ প্রস্তাবে সম্মত হয়ে রাসুল(সা.) 'উসমান ইবন আফফানকে কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানের কাছে পাঠিয়ে দেন। 'উসমান(রা.) মক্কায় গিয়ে আল্লাহর রাসুলের বার্তা কুরাইশদের কাছে পৌছে দেন । তারা তাঁকে কাবাঘর তাওয়াফ করার প্রস্তাব দিয়ে বলে,"তুমি যদি কাবাঘর প্রদক্ষিন করতে চাও তবে তা করতে পার।" উত্তরে 'উসমান(রা.) বলেন,"আমি ততক্ষন পর্যন্ত তা করব না যতক্ষন পর্যন্ত না আল্লাহর রাসুল(সা.) তা করেন।" 'উসমান এরপর কুরাইশদের সাথে শান্তিচুক্তির বিষয়ে আলোচনা শুরু করেন, কিন্তু, প্রথম পর্যায়ে কুরাইশরা তা পুরোপুরি প্রত্যাখান করে। শান্তিচুক্তির বিষয়ে এই আলোচনার ক্ষেত্র ছিল ব্যাপক এবং সে সময়ে তা ছিল অত্যন্ত কঠিন। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত কুরাইশরা শান্তি চুক্তিকে পুরোপুরি প্রত্যাখানের অবস্থান থেকে ধীরে ধীরে সরে আসতে থাকে এবং এমন এক অবস্থানে এসে দাঁড়ায় যাতে উভয়পক্ষের কাছেই তা গ্রহনযোগ্য হয়। একসময় তারা 'উসমান(রা.)এর সাথে আলোচনা করতেও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে থাকে এবং তাঁর সাথে একত্রে বসেই অনেক বাকবিতন্ডার পর অবশেষে জটিল এ সমস্যা থেকে পরিত্রানের উপায় খুঁজে বের করে। যার ফলশ্রুতিতে, মুহাম্মদ(সা.)এর সাথে তাদের যুদ্ধাবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটে।

এদিকে 'উসমান(রা.) যখন মক্কায় তাঁর অবস্থানকে দীর্ঘায়িত করেন এবং মক্কার রাস্তাঘাটের কোথাওই তাকে দেখা যায়না, তখন মুসলিম শিবিরে রটে যায় যে, কুরাইশরা তাঁকে হত্যা করেছে। এ সংবাদ শোনার পর, মুসলিমরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যায় এবং কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য তলোয়ার নিয়ে প্রস্তুত হয়ে যায়। এ পর্যায়ে, রাসুল(সা.) আবার নতুন করে তাঁর পরিকল্পনা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেন। আপাতদৃষ্টিতে তাঁর কাছে মনে হয়, দূত হিসাবে মক্কায় গমনের পরও পবিত্র মাসে 'উসমানকে হত্যা করে কুরাইশরা তাঁর সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এ কারণে, তিনি(সা.) ঘোষনা দেন,"শত্রুপক্ষের সাথে যুদ্ধ না করা পর্যন্ত আমরা এ স্থান ত্যাগ করব না।" তিনি(সা.) সাহাবীদের সকলকে নিয়ে একটি গাছের নীচে দাঁড়ান এবং এ স্থানেই তাদের সকলের কাছ থেকে বাই'য়াত গ্রহন করেন। আমৃত্যু লড়ার শপথ করে তারা রাসুল(সা.) এর নিকট বাই'য়াত করেন। বাই'য়াত গ্রহন সম্পন্ন হলে, রাসুল(সা.) তাঁর এক হাত দিয়ে আরেক হাত শক্ত করে ধরে 'উসমান(রা.)এর পক্ষে এমন ভাবে বাই'য়াত করেন যে, মনে হয় যেন 'উসমান(রা.) তাঁদের সাথেই আছেন। এ বাই'য়াত পরবর্তীতে বাই'য়াত আল-রিদওয়ান নামে পরিচিত হয়। এসম্পর্কে আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেন,

***Òনিশ্চয়ই, আল্লাহ ঈমানদারদের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন যখন তারা গাছের নীচে তোমার নিকট বাই'য়াত করেছিল। wZwb Rvb‡Zb Zv‡`i ü`‡q wK Av‡Q Ges wZwb Zv‡`i Rb¨ (Zv‡`i Aš‡i) mvKxbvn (ckwš I ¯w¯) `vb Ki‡jb| Ges weRq‡K wbKUeZx K‡i wZwb Zv‡`i ci¯wZ Ki‡jb|Ó*** [সুরা ফাতহ্ঃ ১৮]

যখন বাই'য়াত গ্রহন সম্পন্ন হল এবং মুসলিমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল, এ সময়ে মুসলিম শিবিরে খবর পৌঁছাল যে, 'উসমার(রা.)কে হত্যা করা হয়নি। এর পরপরই 'উসমান(রা.) ছাউনীতে ফিরে আসেন এবং কুরাইশদের প্রস্তাব সম্পর্কে রাসুল(সা.)কে অবহিত করেন। এরপর, আবারও মুহাম্মদ(সা.) এবং কুরাইশদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ আলোচনা শুরু হয়। এরপর, কুরাইশরা সুহাইল ইবন 'আমরকে দুই শিবিরের মধ্যে যুদ্ধবিরতী চুক্তি স্বাক্ষর করার জন্য রাসুল(সা.)এর নিকট দূত হিসাবে প্রেরণ করে। কুরাইশদের দূত সেইসাথে মুসলিমদের হজ্ব এবং উমরাহ্ পালন বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা করে। আলোচিত দ্বিতীয় বিষয়টিতে তাদের শর্ত ছিল যে, মুসলিমদের এবার হজ্ব না করেই ফিরে যেতে হবে। কিন্তু, পরবর্তী বছরে তাদের হজ্বের অনুমতি দেয়া হবে।

আল্লাহর রাসুল(সা.) তাদের এ সমস্ত চুক্তি মেনে নিয়েই তাদের সাথে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেন। কারণ, তিনি(সা.) বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি(সা.) যে উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন ইতিমধ্যে তা অর্জিত হয়ে গেছে। সুতরাং, তিনি(সা.) এবার পবিত্র ঘর তাওয়াফ করেন বা না করেন তাতে আর কিছুই আসে যায় না। প্রকৃতপক্ষে, ইসলামের দাওয়াতী কার্যক্রমের পথকে মসৃণ ও বাঁধামুক্ত করতে এবং ইসলামের সুমহান বাণী আরবের প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে দিতে তিনি(সা.) চেয়েছিলেন খায়বারের বিশ্বাসঘাতক ইহুদী গোত্রগুলোকে পুরোপুরি কুরাইশদের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে। কারণ, ইহুদী আর কুরাইশদের এই মৈত্রীই প্রকৃত অর্থে তাঁর দাওয়াতী কার্যক্রম বিস্তারের পথে বিরাট বাঁধা সৃষ্টি করেছিল আর ইসলাম প্রচার-প্রসারের পথকে করেছিল রুদ্ধ। এ লক্ষ্যেই তিনি(সা.) কুরাইশদের সাথে একটি যুদ্ধবিরতী চুক্তি স্বাক্ষর করতে উদগ্রীব ছিলেন যেন,

কুরাইশদের পক্ষ থেকে কোন ধরনের আক্রমণের আশঙ্কা না থাকে। আর, হজ্জ্ব কিংবা উমরাহ্ পালন করা আসলে তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, কারণ, সেটা তিনি(সা.) পরবর্তী বছরই করতে পারতেন।

যুদ্ধবিরতী চুক্তি এবং এর শর্তাবলীর ব্যাপারে আল্লাহর রাসুল(সা.) সুহাইল ইবন 'আমরের সাথে দীর্ঘ সময় যাবত সুক্ষাতিসুক্ষ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। আসলে, এই আলোচনা ছিল খুবই ব্যাপক এবং একটা সমঝোতার জায়গায় এসে দুইপক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা করার বিষয়টি ছিল খুবই কঠিন কাজ। একেক সময় মনে হচ্ছিল আলোচনা ফলপ্রসু হবে না এবং পুরো ব্যাপারটিই ভেস্তে যাবে। আল্লাহর রাসুলের প্রচন্ড পরিমান রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞা না থাকলে হয়তো পুরো ব্যাপারটি ভেস্তেও যেত। মুসলিমরা খুব কাছ থেকেই পুরো ব্যাপারটি পর্যবেক্ষন করে এবং তারাও ভাবে যে, রাসুল(সা.) উমরাহ্ করার বিষয়েই দেনদরবার করছেন। কিন্তু, রাসুল(সা.) এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল কুরাইশদের সাথে যুদ্ধবিরতী চুক্তি সম্পাদন করা। যে জন্য, চুক্তির শর্তাবলী নিয়ে মুসলিমরাও বিরক্ত হলেও আল্লাহর রাসুল(সা.) তাঁর অতুলনীয় রাজনৈতিক প্রজ্ঞা থেকে এটাকেই আল্লাহর রহমত মনে করেন। ফলে, তিনি(সা.) চুক্তির প্রতিটি শর্ত ও স্বল্পমেয়াদী সুযোগসুবিধার দিকে লক্ষ্য না করে, সুহাইলের ইচ্ছা অনুযায়ীই আলোচনা চালিয়ে যান এবং শেষ পর্যন্ত, কিছু নির্দিষ্ট শর্তাবলীর ভিত্তিতে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে মুসলিম ও কুরাইশদের মধ্যে যুদ্ধবিরতী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

চুক্তির শর্তাবলী মুসলিমদের অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও রাগান্বিত করে। তারা অপমানজনক এ চুক্তি প্রত্যাখান করে কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করাকেই শ্রেয় মনে করে এবং এ জন্য রাসুল(সা.)কে বারবার অনুরোধও করে। চুক্তির শর্ত দেখে 'ওমর(রা.) লাফিয়ে উঠে যায় এবং আবু বকর(রা.)র কাছে গিয়ে বলেন, "কেন আমরা এমন সব শর্ত মেনে নিচ্ছি যা আমাদের দ্বীনকে হেয় প্রতিপন্ন করছে?" 'ওমর(রা.) তাঁর সঙ্গে রাসুল(সা.)এর কাছে গিয়ে এ চুক্তি বাতিলের দাবীতে আবেদন করার জন্য আবু বকর(রা.)কে জোর করতে থাকেন। আবু বকর(রা.) তাঁকে এ ধরণের প্রচেষ্টা থেকে বিরত রাখার নিষ্ফল চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত ওমর(রা.) একাই রাসুল(সা.) এর কাছে যান এবং চুক্তির ব্যাপারে তাঁর ক্রোধ ও উষ্মা প্রকাশ করেন। কিন্তু, এ সব কোন কিছুই রাসুল(সা.)এর সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করতে পারে না। বরং, তিনি(সা.) ইস্পাত কঠিন সংকল্প ও প্রচন্ড মানসিক দৃঢ়তার সাথে তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। তিনি(সা.) ওমর(রা.)কে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন,"আমি আল্লাহর রাসুল ও তাঁর অনুগত দাস। আমি অবশ্যই তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করে কোন কাজ করব না এবং অবশ্যই তিনি আমাকে অপমানিত ও ক্ষতিগ্রস্থ করবেন না।"

চুক্তিপত্র তৈরী করার জন্য রাসুল(সা.) 'আলী ইবন আবু তালিবকে নিযুক্ত করেন এবং তাঁকে লিখার নির্দেশ দিয়ে বলেন,"লিখ, শুরু করছি আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু।" এ সময় সুহাইল বাঁধা দিয়ে বলে,"থামো! আমি "পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু" একথা মানতে দিতে রাজী নই। বরং, তুমি লিখ,"তোমার নামে, হে প্রভু"। রাসুল(সা.) 'আলী(রা.)কে তাই লিখার নির্দেশ দিলেন। তারপর তিনি(সা.) বললেন,"লিখ,'এটা হচ্ছে সেই চুক্তি যা স্বাক্ষরিত হয়েছে আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ ও সুহাইল ইবন 'আমরের মধ্যে"। এ পর্যায়ে সুহাইল আবারও বাঁধা দিয়ে বললো,"থামো! যদি আমি স্বীকারই করে নিতাম তুমি আল্লাহর রাসুল, তাহলে তোমাদের আমাদের মধ্যে কোন বিরোধই থাকত না। বরং, তুমি তোমার নাম ও তোমার বাবার নাম লিখ।" রাসুল(সা.)'আলী(রা.)কে বললেন,"লিখ, 'এটা হচ্ছে সেই চুক্তিপত্র, যা মুহাম্মদ ইবন 'আব্দুল্লাহ, সুহাইল ইবন 'আমরের সাথে স্বাক্ষর করতে সম্মত হয়েছে।" শুরুতে এ বাক্যগুলি লিখার পর নিম্নোক্ত শর্তাবলীর ভিত্তিতে উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধিপত্র লিখা হয়ঃ

১. যুদ্ধবিরতী সময়কালে উভয়পক্ষ পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বা কোনরকম আক্রমণাত্মক কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকবে।

২. যদি কুরাইশদের মধ্য হতে কেউ ইসলাম গ্রহন করে এবং গোত্র প্রধানের অনুমতি ব্যতীত মুহাম্মদ(সা.)এর নিকট পালিয়ে যায় তবে, তিনি(সা.) তাকে কুরাইশদের কাছে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবেন। কিন্তু, মুহাম্মদ(সা.)এর নিকট থেকে যদি কেউ কুরাইশদের কাছে গমন করে তবে তারা তাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে না।

৩. আরব গোত্রসমূহের মধ্য থেকে যে কেউ যদি স্বাক্ষরিত এ চুক্তির পক্ষে মুহাম্মদ(সা.)এর মিত্র হতে চায় তবে, তা তারা পারবে। আবার, যদি কেউ কুরাইশদের মিত্র হতে চায় তবে তাও তারা পারবে।

৪. মুহাম্মদ(সা.) ও মুসলিমদের এবার হজ্জ্ব না করেই মদীনায় ফিরে যেতে হবে। সামনের বছর তাদের মক্কায় প্রবেশের ক্ষেত্রে কোন বাঁধা থাকবে না। তবে, তখন তারা মাত্র তিনদিন মক্কায় অবস্থান করতে পারবে। এ সময় তারা কোষবদ্ধ তলোয়ার ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধাস্ত্র বহন করতে পারবে না।

৫. এই চুক্তি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বলবৎ থাকবে এবং এ সময়কাল হচ্ছে স্বাক্ষরিত হবার সময় থেকে পরবর্তী দশবছর।

ইতিমধ্যে, এ চুক্তির ব্যাপারে মুসলিমদের মাঝে প্রচন্ড অসন্তোষ ও অস্থিরতা তৈরী হয়। তাদের এ ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের ভেতর দিয়েই আল্লাহর রাসুল(সা.) সুহাইল ইবন 'আমরের সাথে এ চুক্তি সম্পাদন করেন। মুসলিম শিবিরে দানা বেঁধে উঠা এ প্রচন্ড উত্তেজনা ও ভয়ানক অসন্তোষের মধ্যে আল্লাহর রাসুলকে রেখে সুহাইল মক্কায় ফিরে যায়। যুদ্ধ করার জন্য মুসলিমদের এতো ব্যাকুলতা ও চুক্তি স্বাক্ষরের পর তাদের চরম নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করে আল্লাহর রাসুল(সা.) ভেতরে ভেতরে খুবই মর্মাহত হন এবং প্রচন্ড অসহায় বোধ করতে থাকেন। শেষপর্যন্ত, তিনি(সা.) তাঁর স্ত্রী উম্ম সালামাহ্(রা.) এর কাছে তাঁর অন্তরের সমস্ত দুঃখ, কষ্ট ও হতাশার কথা খুলে বলেন। উম্ম সালামাহ্(রা.) তাঁকে বলেন,"হে আল্লাহর রাসুল! মুসলিমরা কখনোই আপনার অবাধ্য হবে না। তারা তো শুধু তাদের দ্বীন, আল্লাহর উপর তাদের অবিচল ঈমান ও আপনার আনীত বাণীর ব্যাপারে খুবই স্পর্শকাতর। আপনি আপনার মাথা কামিয়ে ফেলুন এবং হাদীর পশুগুলোকে জবাই করে ফেলুন। দেখবেন, মুসলিমরাও সাথে সাথে আপনাকে অনুসরণ করবে। তারপর, তাদের নিয়ে আপনি মদীনায় ফিরে যান।"

উম্ম সালামাহ্ (রা.) এর পরামর্শ অনুযায়ী রাসুল(সা.) তাঁবু থেকে বেরিয়ে তাঁর মাথা মুড়িয়ে ফেলেন এবং উমরাহ্র আনুষ্ঠানিকতা সমাপ্ত করে মানসিক ভাবে প্রশান্তি ও তৃপ্তি বোধ করেন। আল্লাহর রাসুল(সা.)কে এ অবস্থায় দেখে মুসলিমরাও শেষপর্যন্ত নিজ নিজ পশু জবাই করার জন্য ছুটে যায় এবং মাথা মুড়িয়ে ফেলে। এরপর, রাসুল(সা.) মুসলিমদের সহ মদীনার পথে যাত্রা করেন। প্রায় অর্ধেক পথ অতিক্রম করার পর আল্লাহতায়ালা সুরা ফাতহ্ নাযিল করেন। আল্লাহর রাসুল সদ্য নাযিলকৃত এ সুরার পুরোটাই সাহাবীদেরকে তিলওয়াত করে শোনান। শুধুমাত্র তখনই মুসলিমরা সত্যিকার ভাবে বুঝতে পারে যে, হুদাইবিয়া সন্ধির মাধ্যমে আসলে মুসলিমদেরই চুড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়েছে।

মদীনায় প্রত্যাবর্তন করার পরপরই রাসুল(সা.) এবার খায়বারের ইহুদীদের সাথে চুড়ান্ত বোঝাপড়া করে আরব ভূ-খন্ডের বাইরে ইসলামের আহবানকে ছড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা করেন। এর মাধ্যমে তিনি(সা.) ইসলামী দাওয়াতী কার্যক্রমকেও শক্তিশালী করার চিন্তা করেন। হুদাইবিয়া সন্ধিকে কার্যকরী অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে তিনি(সা.) একদিকে বর্হিবিশ্বের সাথে সম্পর্ক তৈরীর চেষ্টা করেন। আবার, অন্যদিকে, এ সন্ধির মাধ্যমেই তিনি(সা.) আরব ভূ-খন্ডে দাওয়াতী কার্যক্রমের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ানো কিছু ক্ষুদ্র প্রতিরোধ বলয়কে ভেঙ্গে দেন। অতুলনীয় রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা থেকে হজ্জ্ব পালন করার উছিলায় আল্লাহর রাসুল(সা.) যে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা করেছিলেন, এ চুক্তির মাধ্যমে তাঁর সে পুরো পরিকল্পনাই তিনি(সা.) শেষপর্যন্ত বাস্তবায়ন করেন। লক্ষ্য অর্জনের পথে অনেক বাঁধাবিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও, এ চুক্তির সুবাদেই তিনি(সা.) পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁর প্রতিটি উদ্দেশ্য হাসিল করেন। রাজনৈতিক অঙ্গনে তাঁর এ সমস্ত সাফল্য পরবর্তীতে সন্দেহাতীত প্রমাণ করে দেয় যে, হুদাইবিয়া সন্ধি প্রকৃত অর্থেই মুসলিমদের জন্য বিজয়ের বার্তা বহন করে এনেছে। রাসুল(সা.)এর অর্জিত কিছু সাফল্য হলঃ

১. হুদাইবিয়া প্রান্তরে সংঘটিত ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে আল্লাহর রাসুল(সা.) সাধারণ ভাবে সমস্ত আরবের মধ্যে এবং বিশেষ করে কুরাইশদের মধ্যে ইসলামের ব্যাপারে জনমত তৈরী করতে পেরেছিলেন। যা প্রকৃত অর্থে, আরবদের দৃষ্টিতে মুসলিমদের মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি করেছিল এবং কুরাইশদের মর্যাদাকে করেছিল ক্ষুন্ন ।

২. এ ঘটনার মধ্য দিয়ে আল্লাহর রাসুল(সা.) তাঁর সাহাবীদের ঈমানের দৃঢ়তা সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়েছিলেন। বস্তুতঃ হুদাইবিয়া সন্ধি সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করেছিল যে, মুসলিমদের ঈমান ইস্পাত কঠিন ও অনমনীয়। এছাড়া, দ্বীন রক্ষার খাতিরে তাদের দুঃসাহসী পদক্ষেপ ও স্বতঃস্ফুর্ত আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তও বিরল।

৩. এ ঘটনা থেকে মুসলিমরা এ শিক্ষাও লাভ করেছিল যে, ইসলাম প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে দক্ষ ও দূরদর্শী রাজনৈতিক চাল খুবই গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র।

৪. এর ফলে, মক্কায় অবস্থানকারী মুসলিমরা আসলে শত্রুবুহ্যের ভেতরে থেকেই ইসলামী দাওয়াতের ছোট ছোট কেন্দ্র তৈরী করেছিল।

৫. এছাড়া, এ চুক্তির মাধ্যমে এটাও প্রমাণিত হয়েছিল যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গৃহীত সকল পদ্ধতিই একই উৎস, সত্যবাদীতা ও ন্যায়পরায়নতার ভিত্তিতে হতে হবে। তবে, রাজনৈতিক দূরদর্শিতার ও প্রজ্ঞার মাধ্যমেই লক্ষ্য অর্জনের পথ নির্ধারন করতে হবে। এক্ষেত্রে, অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য কৌশল হিসাবে, শত্রুপক্ষের কাছে লক্ষ্য অর্জনের উপায় ও প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন রাখা যাবে।

## খায়বারের যুদ্ধঃ

আল্লাহর রাসুল(সা.) হুদাইবিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ১৫ দিন মদীনায় অবস্থান করেন। এরপর, তিনি(সা.) সাহাবীদের খায়বার আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশ দেন । সে সাথে তিনি(সা.) এটাও বলেন যে, শুধু যারা হুদাইবিয়া প্রান্তরে তাঁর সাথে উপস্থিত ছিল তারাই যেন যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়।

বস্তুতঃ হুদাইবিয়া প্রান্তরে যাত্রা করার পূর্বেই রাসুল(সা.) কুরাইশদের সাথে খায়বারের ইহুদী গোত্রগুলোর গোপন আঁতাতের খবর পেয়েছিলেন। মুসলিমদেরকে পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে ধ্বংস করার জন্য তারা একত্রিত হয়ে গোপনে মদীনা আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেছিল। গোপন এ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত হবার পরই তিনি(সা.) কুরাইশদের সাথে যুদ্ধবিরতী চুক্তি সম্পাদন করার লক্ষ্যে মক্কায় শান্তিপূর্ণ সফরের পরিকল্পনা করেন। যেন, কুরাইশ গোত্রের সাথে তাঁর অভিষ্ট সন্ধি হওয়া মাত্রই তিনি(সা.) খায়বারের বিশ্বাসঘাতক ইহুদীদের শায়েস্তা করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারেন। তাই, কুরাইশদের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধবিরতী চুক্তির মাধ্যমে যখন ইহুদীরা কুরাইশদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি(সা.) মুসলিমদের খায়বার আক্রমণ করার নির্দেশ দিলেন এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বললেন।

আল্লাহর রাসুল(সা.) ১৬০০ মুসলিম পদাতিক ও ১০০ জন অশ্বারোহী নিয়ে খায়বারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এদের সকলেই ছিল আল্লাহর সাহায্যের ব্যাপারে নিশ্চিত। যাত্রা করার তিনদিনের মধ্যে রাসুল(সা.) তাঁর দলবল সহ খায়বার পৌঁছে যান এবং ইহুদীরা তাদের উপস্থিতি টের পাবার আগেই তাদের দূর্গ ঘেরাও করে ফেলেন। যদিও মুসলিমরা রাতেই খায়বারে ইহুদীদের বসতিতে পৌঁছে গিয়েছিল, কিন্তু, তা সত্ত্বেও তারা আক্রমণ না করে শুধু দূর্গের বাইরে বসেই রাত পার করেছিল। সকালবেলায় ইহুদী গোত্রের কৃষকরা একে একে কোদাল-কাস্তে আর ঝুড়ি হাতে দূর্গের বাইরে বের হয়ে এল। হঠাৎ, দূর্গের পাশে মুসলিমদের দেখতে পেয়ে তারা ভয়ে পেছন ফিরে দৌড়ে পালালো আর চিৎকার করে বলতে লাগল,"মুহাম্মদ এসেছে তার বাহিনী নিয়ে।" তাদের চিৎকার শুনে রাসুল(সা.) বললেন,"আল্লাহু আকবর (আল্লাহ মহান)! খায়বারের ইহুদীদের ধ্বংস আসন্ন। আমরা যখন কোন এলাকায় আগমন করি তখনই তাদের দূর্ভাগ্য সূচিত হয়; তাদের সকালটা তাদের জন্য মন্দ, যাদের পূর্বে সতর্ক করা হয়েছিল।"

খায়বারের ইহুদীরা হুদায়বিয়া সন্ধির বিষয়ে অবহিত হবার পর থেকেই মুহাম্মদ(সা.)এর কাছ থেকে আক্রমণের আশঙ্কা করছিল। ইহুদীদেরকে তাদের মিত্রপক্ষ কুরাইশ থেকে বিচ্ছিন্ন করাই যে এ চুক্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য, তারা এটা পরিস্কার ভাবে বুঝেছিল। নতুন এ বিপদজনক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের মধ্য হতে কেউ কেউ ওয়াদি আল-কুরা' এবং তায়মা'র ইহুদী গোত্রগুলোর সাথে নতুন মিত্রতা তৈরী করার প্রস্তাবও দিয়েছিল, যেন তারা একত্রিত হয়ে মদীনা আক্রমণ করতে পারে। তাহলে, তাদের নিজেদের রক্ষা করতে আরবদের থলের আর কোন দরকার হত না। বিশেষ করে, এরকম একটা বিপদজনক সময়ে যখন কুরাইশরা আল্লাহর রাসুলের সাথে শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। অন্যান্য ইহুদীরা অবশ্য মুসলিমদের সাথে শান্তিচুক্তি করার সুখস্বপ্নে বিভোর ছিল। তারা আশা করেছিল যে, মুহাম্মদ(সা.)এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেই হয়তো মুসলিমদের ইহুদী বিদ্বেষ দূর হয়ে যাবে। তারা মাঝে মাঝেই একে অপরকে সম্ভাব্য এ বিপদের ব্যাপারে সর্তক করে দিত। তারা এটাও জানতো যে, মুহাম্মদ(সা.) কুরাইশদের সাথে তাদের গোপন চক্রান্তের কথা জানতে পেরেছেন এবং তাদের আক্রমণ করতে একরকম প্রস্তুত হয়েই আছেন। কিন্তু, তাদের নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আগেই, মুসলিমদের কাছ থেকে আকস্মিক এ আক্রমণের জন্য তারা একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। ফলে, সব পরিকল্পনা বাদ দিয়ে তারা ঘাতাফান গোত্রের সাহায্য চাইতে বাধ্য হল। তারা তাদের অবস্থানকে সুরক্ষিত করতে ও মুসলিমদের আক্রমণকে প্রতিহত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু, মুসলিম সেনাবাহিনীর ত্বড়িৎ আক্রমণের মুখে তাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।

অবশেষে, তারা মরিয়া হয়ে আল্লাহর রাসুল(সা.)এর সাথে সমঝোতা করার শেষ চেষ্টা করল। তিনি(সা.) তাদের জীবন ভিক্ষা দিলেন। শুধু তাই নয়, মুহাম্মদ(সা.) তাদের নিজ নিজ গৃহে থাকারও অনুমতি দিলেন। বিজয়ের নীতি অনুসারে সিদ্ধান্ত হল যে, ইহুদীদের জমিজমা ও আঙ্গুরের বাগান মুহাম্মদ(সা.)এর অধিকারে থাকবে। ইহুদীরা তাদের কৃষিক্ষেত ও বাগানে কাজ করতে পারবে তবে, বাৎসরিক উৎপাদিত ফসল ও ফলমূলের অর্ধেক মুসলিমদের দিতে হবে। শেষপর্যন্ত তারা মুহাম্মদ(সা.)এর এ সকল শর্ত মেনে নিয়েই সেখানে বসবাস করতে সম্মত হয়। এরপর, মুহাম্মদ(সা.) সাহাবীদের নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন এবং পরবর্তী বছর কাযা উমরাহ্ আদায় করার পূর্ব পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন।

খায়বারে ইহুদীদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব খর্ব করে ইসলামের শাসন-কর্তৃত্বের কাছে ইহুদীদের নতি স্বীকার করানোর মাধ্যমে বিপদজনক উত্তরাঞ্চল থেকে আল-শাম পর্যন্ত এলাকাকে রাসুল(সা.) নিরাপদ এলাকায় পরিণত করেন। যেভাবে, তিনি(সা.) হুদাইবিয়ার সন্ধির মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের দক্ষিনাঞ্চলকে করেছিলেন বিপদমুক্ত। প্রকৃতপক্ষে, রাসুল(সা.) এই সব কর্মকান্ডই সমস্ত আরব ভূ-খন্ড ও বর্হিবিশ্বে ইসলামের আহবানকে প্রসারিত করার ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছিল।

## প্রতিবেশী দেশে দূত প্রেরণঃ

যেহেতু, ইসলাম একটি সার্বজনীন দ্বীন এবং এ দ্বীন প্রেরণ করাই হয়েছে মানব জাতির সার্বিক কল্যাণে, তাই হেযাযে ইসলামী দাওয়াত একটা সন্তোষজনক পর্যায়ে পৌঁছানোর সাথে সাথেই মুহাম্মদ(সা.) হেযাযের বাইরে ইসলামের আহবান ছড়িয়ে দেয়ার চিন্তা–ভাবনা করতে লাগলেন। কারণ, আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন,

**ÒGes Avwg †Zvgv‡K mg¯ mwóRM‡Zi Rb¨ ingZ wnmv‡e cwV‡qwQ|Ó** [সুরা আম্বিয়াঃ ১০৭]

**আল্লাহতায়ালা সুরা সাবা-তে আরও বলেছেন,**

**ÒGes Avwg †Zvgv‡K mg¯ gvbeRwZi cwZ mmsev` `vZv I mZKKvix wnmv‡e †ciY K‡iwQ|Ó** [সুরা সাবাঃ ২৮]

**এছাড়া, আল্লাহতায়ালা সুরা তওবাতে বলেছেন,**

**Òwbðq B wZwb ivmj cwV‡q‡Qb †n`v‡qZ I mZ¨Øxb mnKv‡i †hb GB Øxb mKj Øx‡bi Dci weRqx nq, hw` I gkwiKiv Zv NYv K‡i|"** [সুরা তওবাঃ ৩৩]

নিজ দেশে ইসলামী দাওয়াতকে শক্তিশালী করা এবং ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা রক্ষায় সামর্থ্য অর্জন করার পরই আল্লাহর রাসুল(সা.) বর্হিবিশ্বের সাথে যোগাযোগ আরম্ভ করেন। তিনি(সা.) একে একে বিভিন্ন স্থানে তাঁর দূত পাঠাতে আরম্ভ করলেন। তাঁর শাসন-কর্তৃত্বের বাইরের সমস্ত আরব ভূ-খন্ডকে তিনি(সা.) ইসলামী রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির আওতায় নিয়ে এসেছিলেন। তারপর, যখন, সমস্ত হেযায অঞ্চলে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল, তখন আরবের সীমানার বাইরের যে কোন অঞ্চলের সাথে যোগাযোগকে পররাষ্ট্রনীতি হিসাবে বিবেচনা করা হত। যেমনঃ পারস্য বা রোমান সাম্রাজ্য। ইতিমধ্যে, হুদাইবিয়া চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় এবং খায়বারে ইহুদীদের কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হবার পর পুরো হেযায অঞ্চলেই মুহাম্মদ(সা.)এর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কারণ, কুরাইশদেরও আসলে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মতো কোন শক্তি ছিল না। এ রকম অবস্থাতেই তিনি(সা.) বর্হিবিশ্বে তাঁর প্রতিনিধি দল পাঠান। যা হোক, ইতিহাস বলে, ইসলামী রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিকে সমর্থন দেবার জন্য নিজভূমিতে রাসুল(সা.) শাসন-কর্তৃত্ব পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হবার পরই তিনি(সা.) বর্হিবিশ্বে তাঁর প্রতিনিধি প্রেরণ করেছিলেন।

খায়বার থেকে প্রত্যাবর্তনের একদিন পর রাসুল(সা.) সাহাবীদের ডেকে বললেন,"হে আমার লোকসকল! নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা আমাকে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণার্থে প্রেরণ করেছেন। সুতরাং, ঈসা ইবন মারিয়মের হাওয়ারীদের মতো তোমরা আমার বিরুদ্ধাচারন করো না।" তখন সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন,"আর কিভাবে হাওয়ারীগণ তার বিরুদ্ধাচারণ করেছিল হে আল্লাহর রাসুল?" তিনি(সা.) বললেন,"তিনি তাদের আহবান করেছিলেন, যার দিকে আমি তোমাদের আহবান করছি। কিন্তু, কাউকে নিকটবর্তী কোন স্থানে প্রেরণ করা হলে সে তা মেনে নিত। অথচ, দূরবর্তী স্থানে প্রেরণ করা হলে সে তা অপছন্দ করতো এবং পিছে পড়ে থাকত।"

এরপর তিনি(সা.) তাঁর সাহাবীদের বললেন যে, তিনি(সা.) হিরাক্লিয়াস (রোমান অধিপতি), খসরু (পারস্যের অধিপতি), আল-মুকাওকিস (মিশরের অধিপতি), আল-হারিছাহ আল-গাচ্ছানী (হীরার অধিপতি), আল-হারিছাহ আল-হিমইয়ারী (ইয়েমেনের অধিপতি) এবং আল-নাজ্জাশী (আবিসিনিয়ার অধিপতি)কে ইসলামে আহবান জানিয়ে দূত প্রেরণ করতে চান। সাহাবারা এ কথায় সম্মত হলেন এবং রাসুল(সা.) এর জন্য "মুহাম্মদ, আল্লাহর রাসুল" কথাটি খোদাই করা একটি রুপার সীলমোহর তৈরী করলেন। এরপর, তিনি(সা.) এ সমস্ত শাসকবর্গকে ইসলামের দিকে আহবান জানিয়ে তাদের কাছে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। হিরাক্লিয়াসের কাছে তাঁর বার্তা পৌছানোর জন্য দাহিয়াহ ইবন খালিফাহ আল-কালবী, খসরুর কাছে আব্দুল্লাহ ইবন হুযাইফা আল-সাহমী, নাজ্জাশীর কাছে 'উমর ইবন উমাইয়া আল-দামরী, মুকাওকিসের কাছে হাতিব ইব আবি বালতা', 'ওমানের বাদশাহর কাছে 'আমর ইবন আল 'আস আল-সাহমী, আল ইয়ামামাহর বাদশাহর কাছে সুলাইত ইবন 'আমর, বাহরাইনের বাদশাহর কাছে আল-'আলা ইবন আল-হাদারামী, আল-হারিছাহ আল-গাচ্ছানী, তুকহাম আল-শামের বাদশাহর কাছে সুজা' ইবন ওয়াহাব আল-আসাদী এবং আল-হারিছাহ আল-হিমইয়ারীর কাছে আল-মুহাজির ইবন উমাইয়া আল-মাখযুমী কে দূত হিসাবে প্রেরণ করলেন।

প্রেরিত দূতেরা একই সাথে যাত্রা শুরু করেন এবং আল্লাহর রাসুল(সা.) এর নির্দেশ অনুযায়ী নিজ নিজ গন্তব্যে পৌছান। প্রেরিত দূতেরা এসব শাসকবর্গের কাছে রাসুল(সা.) এর বার্তা পৌছে দেন। আল্লাহর রাসুলের আহবানে বেশীর ভাগই শাসকই মোটামুটি ইতিবাচক সাড়া দেয়। আর এদের মধ্যে কেউ কেউ অত্যন্ত রূঢ় ও নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানায়। আরবের শাসকদের মধ্যে, ইয়েমেন ও 'ওমানের বাদশাহ্ রূঢ় প্রতিক্রিয়া জানায়। বাহরাইনের বাদশাহ ইতিবাচক সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহন করে। আর, ইয়ামামার বাদশাহ বলে, সে ইসলাম গ্রহন করতে প্রস্তুত যদি তাকে শাসক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। আল্লাহর রাসুল(সা.) তার এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। আর, অনারব শাসকদের মধ্যে, আল্লাহর রাসুলের চিঠি পাঠ করার পর পারস্যের অধিপতি খসরু অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে সে চিঠি টুকরা টুকরা ফেলে। শুধু তাই নয়, হেযাযের নেতার কর্তিত মস্তক তার কাছে হাজির করার জন্য সে তার ইয়েমেনের গর্ভনর বুদহানকে নির্দেশ দেয়।

আল্লাহর রাসুল(সা.)একথা শোনার পর বলেন,"আল্লাহ যেন খসরুর রাজত্ব টুকরা টুকরা করে দেন।" এদিকে, খসরুর নির্দেশ পাবার পর ইয়েমেনের গর্ভনর বুদহান ইসলামের ব্যাপারে খোঁজখবর নেন এবং খুব দ্রুতই ইসলাম গ্রহনের ঘোষনা দেন। তাকে মুহাম্মদ(সা.) ইয়েমেনের গর্ভনর নিযুক্ত করেন। যদিও তিনি প্রকৃত অর্থে আল-হারিছাহ আল-হিমইয়ারী অর্থাৎ, ইয়েমেনের বাদশাহ ছিলেন না। আর, মিশরের অধিপতি

মুকাওকিস দাওয়াতের উত্তরে ইতিবাচক মনোভাব জানিয়ে আল্লাহর রাসুল(সা.)এর জন্য উপহার পাঠান। নাজ্জাশীর মনোভাবও ছিল ইতিবাচক, বলা হয়ে থাকে যে, নাজ্জাশী আসলে ইসলাম গ্রহন করেছিলেন। আর, হিরাক্লিয়াস আসলে রাসুল(সা.) এর এ আহবানকে এত গুরুত্ব দেয়নি। না সে কোন সৈন্য পাঠানোর ব্যাপারে মনযোগী ছিল, আর না এ ব্যাপারে কিছু বলেছিল। আল-হারিছাহ আল-গাচ্ছানী যখন আরবের এ ধর্মপ্রচারককে শাস্তি দেবার জন্য সৈন্যদল পাঠানোর অনুমতি চায়, তখন সে এর উত্তরে কিছুই বলেনি। বরং, গাচ্ছানীকে আল-কুদসে (জেরুজালেম) যাবার নির্দেশ দিয়েছিল।

বর্হিবিশ্বে এই দাওয়াতী কার্যক্রমের ফলে, আরবের লোকেরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে থাকে। তারা দলবদ্ধ হয়ে রাসুল(সা.)এর কাছে ছুটে আসে এবং ইসলাম গ্রহনের ঘোষনা দেয়। আর, অনারবদের সাথে রাসুল(সা.) জিহাদ করার ঘোষনা দেন এবং এজন্য তাঁর সৈন্যবাাহিনী প্রস্তুত করতে থাকেন।

## মু'তার যুদ্ধঃ

প্রতিনিধি দল বর্হিবিশ্ব থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পরপরই আল্লাহর রাসুল(সা.) তাঁর সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করেন এবং আরব ভূ-খন্ডের বাইরে জিহাদ করার ঘোষনা দেন। এ লক্ষ্যে, তিনি(সা.) রোমান ও পারস্যের গতিবিধি সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে আরম্ভ করেন। আর, রোমান সাম্রাজ্যের সাথে তাঁর সীমান্ত যুক্ত থাকায় তিনি(সা.) তাদের গতিবিধির উপর বিশেষ ভাবে নজর দেন এবং গুপ্তচরের মাধ্যমে ধারাবাহিক ভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে থাকেন। রাসুল(সা.) তাঁর প্রজ্ঞা ও দূরদর্শীতার কারণে এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে, যদি একবার আরব ভূ-খন্ডের বাইরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো যায়, তবে ইসলামের আহবানকে বিশ্বে দ্রুত ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব হবে। তাই তিনি(সা.) এ লক্ষ্যে, আল-শাম (বৃহত্তর সিরিয়া) থেকেই জিহাদের সূচনা করবেন বলে স্থির করেন। কারণ, খসরুর ইয়েমেনের গর্ভনর বুদহান ইসলাম গ্রহন করার পর তিনি(সা.) সেখান থেকে কোনরকম আক্রমণের আশঙ্কা মুক্ত ছিলেন। এজন্য, তিনি(সা.) রোমানদের মুকাবিলা করার জন্য আল-শামেই সৈন্য পাঠানোর চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন। এরপর, হিজরী ৭ম সালের জুমাদিউল 'উলা মাসে, হুদাইবিয়া সন্ধির কয়েকমাস পরেই তিনি(সা.) তিন হাজার যোদ্ধার এক দক্ষ বাহিনী তৈরী করেন। যায়েদ ইবন হারিছাহকে এ বাহিনীর নেতা নিযুক্ত করে নির্দেশ দেন যে,"যদি যায়েদ নিহত হয় তবে, জা'ফর নেতৃত্বে থাকবে, আর জা'ফর নিহত হলে 'আব্দুল্লাহ ইবন রুওয়াহাহ্ নেতৃত্ব দেবেন।"

নির্দেশ পাবার পর সৈন্যবাহিনী নিদিষ্ট গন্তব্যে যাত্রা শুরু করে, আর নও মুসলিম হিসাবে খালিদ ইবন ওয়ালিদ (তিনি হুদাইবিয়া সন্ধির পরপরই ইসলাম গ্রহন করেছিলেন) তাদের সঙ্গী হন। রাসুল(সা.) সৈন্যদলের সাথে মদীনার প্রান্তবর্তী সীমানা পর্যন্ত যান। মুসলিম যোদ্ধাদের তিনি(সা.) নারী, পঙ্গু বা অচল ব্যক্তি ও শিশুদেরকে আক্রমণ না করার নির্দেশ দেন এবং সেইসাথে, গাছপালা বা বাড়ীঘরও ধ্বংস করতে নিষেধ করেন। তারপর, রাসুল(সা.) এবং মদীনার বাকী মুসলিমরা সৈন্যদলের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করে বলেন,"এ যাত্রায় আল্লাহ তোমাদের সহায় হউন, তোমাদের রক্ষা করুন আর নিরাপদে আমাদের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন।"

এরপর, সৈন্যবাহিনী রনাঙ্গনের দিকে এগিয়ে যায়। এর মধ্যেই নেতৃস্থানীয়রা যুদ্ধের কৌশল নির্ধারন করে। তারা ঠিক করে যে, শত্রুকে ত্বড়িৎগতিতে আচম্কা আক্রমণ করে তাদের বিজয়কে সুনিশ্চিত করবে, ঠিক যেভাবে রাসুল(সা.) আক্রমণ পরিচালনা করে থাকেন। সৈন্যদলের নেতৃস্থানীয় যোদ্ধারা এতে সম্মতি দিলে তারা উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু, মু'য়ান (আরবের উত্তরাঞ্চল) এলাকায় পৌঁছানোর পর তারা শুনতে পায় যে, হিরাক্লিয়াসের আল-শাম অঞ্চলের গর্ভনর শারহাবিল আল-গাচ্ছানী তাদের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে ১,০০,০০০ সৈন্য সমাবেশ করেছে। আকস্মিক এ সংবাদে তারা হতবিহবল হয়ে দুই রাত সেখানেই যাত্রা বিরতী করে এবং ভয়ঙ্কর এ বাহিনীকে কিভাবে মুকাবিলা করবে সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে। এ অবস্থায় তারা চিন্তা করে দেখে যে, তাদের জন্য সবচাইতে নিরাপদ পদক্ষেপ হচ্ছে রাসুল(সা.)কে পত্র মারফত অবস্থা বর্ণনা করা। তিনি(সা.) যদি তাদের সাহায্য করার জন্য আরও সৈন্য পাঠান তো ভাল, আর তা না হলে, পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য তারা তাঁর সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করবে।

এ অবস্থায় 'আব্দুল্লাহ ইবন রুওয়াহাহ্ সৈন্যদলকে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে বলেন,"আল্লাহর কসম! তোমরা শাহাদতের পেয়ালা পান করার জন্যই এখানে এসেছো, যদিও তোমরা মৃত্যুকে অপছন্দ করো। জেনে রাখো, শত্রুর সাথে আমরা আমাদের সংখ্যা কিংবা শক্তিসামর্থ্য দিয়ে যুদ্ধ করি না, আমরা যুদ্ধ করি আমাদের দ্বীন ইসলামের শক্তি দিয়ে যা দিয়ে আল্লাহতায়ালা আমাদের সম্মানিত করেছেন। সুতরাং, তোমরা নির্ভয়ে এগিয়ে যাও। শাহাদত কিংবা বিজয়, দুটোর যে কোনটাই আমাদের জন্য পছন্দনীয়।" একথা শোনার পর, মুসলিম বাহিনী ঈমানী শক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে উঠে এবং দৃঢ় চিত্তে শত্রুপক্ষের মুকাবিলায় এগিয়ে যায়, যে পর্যন্ত না তারা মাশরিফ নামের এক গ্রামে পৌঁছে। শত্রুপক্ষ যখন মুসলিম বাহিনীর দিকে এগিয়ে আসে ততক্ষনে মুসলিমরা মু'তাহ গ্রামে প্রবেশ করেছে। এখানেই, দুইপক্ষ পরস্পরের মুখোমুখি হয়। শুরু হয় যুদ্ধ।

মু'তার প্রাঙ্গনে এ যুদ্ধ ছিল স্মরণকালের মধ্যে ভয়াবহ। যুদ্ধের ময়দানের সর্বত্র ছিল মৃত্যুর বিভীষিকা, আর চারিদিকে বইছিলো রক্তের বন্যা। শাহাদতের অমিয় সুধা পান করার তীব্র আকাঙ্খায় মাত্র ৩০০০ মুসলিম সৈন্য জীবন বাজি রেখে লড়েছিল ২,০০,০০০ রোমান যোদ্ধার সাথে (রোমানরা তাদের বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য আরও ১,০০,০০০ অতিরিক্ত সৈন্য প্রস্তুত করে রেখেছিল)। ভয়ঙ্কর ও অসম এ যুদ্ধে যায়িদ ইবন হারিছাহ্ ইসলামের পতাকা হাতে লড়াই করছিলেন। এক পর্যায়ে, পরিণামের কথা বিন্দুমাত্র না ভেবে তিনি শত্রুব্যুহ ভেদ করে অরক্ষিত অবস্থায় রোমান সৈন্যদের ভেতরে ঢুকে যান। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও তিনি প্রচন্ড সাহসের সাথে যুদ্ধ করতে থাকেন। তার সাহসিকতা ছিল দুর্দান্ত আর নায়কচিত বীরত্ব ছিল অতুলনীয়। শেষ পর্যন্ত শত্রুর বর্শার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। এরপর জা'ফর ইবন আবি তালিব ইসলামের পতাকা তুলে নেন। জা'ফর ছিলেন ৩৩ বছরের সুদর্শন এক টগবগে যুবক। মৃত্যুর ভয়ঙ্কর বিভীষিকাকে উপেক্ষা করে তিনিও বীর বিক্রমে যুদ্ধ করতে থাকেন। একপর্যায়ে, শত্রুপক্ষ তার সওয়ারকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। তিনি ক্ষিপ্র গতিতে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে তলোয়ারের এক আঘাতে ঘোড়ার পায়ের রগ কেটে দেন। তারপর, দ্রুততার সাথে শত্রুকে আঘাত করতে করতে পায়ে হেঁটেই শত্রুবুহ্যের একেবারে ভেতরে ঢুকে যান। এ সময়ে এক রোমান সৈন্য তাকে তলোয়ারের আঘাতে দ্বিখন্ডিত করে হত্যা করে ফেলে। এরপর, 'আব্দুল্লাহ্ ইবন রুওয়াহাহ্ পতাকা তুলে নেন এবং ঘোড়ার পিঠে চড়ে শত্রুর মুকাবিলায় অগ্রসর হন। প্রথমদিকে সামনে এগুতে একটু দ্বিধাগ্রস্থ হলেও একরকম জোর করেই তিনি নিজেকে ভয়ঙ্কর রণক্ষেত্রে ঠেলে দেন, তারপর যুদ্ধ করতে করতে একসময় তিনিও শহীদ হয়ে যান। এ সময়ে, ছাবিত ইবন আকরাম পতাকা হাতে বলেন,"মুসলিমরা! তোমরা একজনের পেছনে সারিবদ্ধ হও।" এরপর, মুসলিমরা খালিদ ইবন আল-ওয়ালিদের পেছনে সমবেত হয়। খালিদ ইবন আল-ওয়ালিদ তার সৈন্যদলকে এমন দক্ষতার সাথে সজ্জিত করেন, যাতে শত্রুপক্ষ বেশ চাপের মুখে পড়ে যায়। অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পূর্ব পর্যন্ত তিনি শত্রুপক্ষকে ছোট ছোট আক্রমণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য করেন।

বস্তুতঃ এ যুদ্ধ ছিল এক অসম যুদ্ধ, কারণ শত্রুপক্ষের বিপুল সংখ্যার তুলনায় মুসলিম বাহিনী ছিল অত্যন্ত নগন্য। এ বাস্তবতা উপলব্ধি করে, রাতের বেলায় খালিদ চাতুর্যপূর্ণ এক যুদ্ধকৌশলের পরিকল্পনা করেন। খালিদ তার বাহিনীর একটি অংশকে শোরগোল তৈরী করার জন্য পেছনে রেখে দেন, যাতে রোমানরা মনে করে মুসলিমদের সাহায্য করার জন্য আরও সৈন্যদল এসে পৌঁছেছে। হট্টগোল শুনে রোমানরা ভীত হয়ে একপর্যায়ে আক্রমণ বন্ধ করে দেয়। এমনকি এ অবস্থায় খালিদ(রা.) আক্রমণ বন্ধ করলে তারা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে যায়। এরপর, খালিদ(রা.) যুদ্ধের ময়দান থেকে তার সৈন্যদল প্রত্যাহার করে নেন এবং দলবল নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন। যদিও এ যুদ্ধে মুসলিমরা বিজয়ী বা পরাজিত কোনটাই হয়নি, কিন্তু তাদের অর্জন ছিল উল্লেখযোগ্য।

এ যুদ্ধে অংশগ্রহনকারী মুসলিমদের প্রত্যেকেই জানত যে, প্রতিটি মূহুর্তে মৃত্যু তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে, কিন্তু তারপরেও তারা বীরের মতো যুদ্ধ করেছে এবং মৃত্যুকে নির্ভয়ে আলিঙ্গন করেছে। কারণ, আল্লাহর জন্য হত্যা করতে বা জীবন দিতে মুসলিমরা আদিষ্ট। আর, আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করা হচ্ছে বিনিয়োগের সবচাইতে লাভবান ক্ষেত্র। এটাই হচ্ছে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন,

*Òনিশ্চয়ই, আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে মু'মিনদের জান ও মাল কিনে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর **c‡_ h× K‡i, hv‡Z Zviv [KL‡bv] nZ¨v K‡i Ges [KL‡bv]** নিহত হয়। এ সত্য অঙ্গীকার করা হয়েছে তাওরাত, ইঞ্জিল এবং কুরআনে। আর, কে আছে যে আল্লাহ অপেক্ষা অঙ্গীকার পালনে **AwaK mZ¨ev `x? AZGe, †Zvgiv Avb›` Ki‡Z _v‡Kv** তোমাদের এই ক্রয়-বিক্রয়ের উপর যা তোমরা সম্পাদন করেছ, আর এটাই হচ্ছে **Povš mdjZv|Ó*** [সুরা তওবাঃ ১১১]

আর, এ কারণেই নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও এ যুদ্ধের নায়করা বীরের মতো যুদ্ধ করেছে। তারা এটাও প্রমাণ করেছে যে, যুদ্ধ ছাড়া মুসলিমদের জন্য যদি অন্য কোন পথ খোলা না থাকে, তাহলে তাদের অবশ্যই যুদ্ধ করতে হবে। সেক্ষেত্রে, নিশ্চিত মৃত্যুর বিভীষিকা কখনোই বিবেচ্য বিষয় হবে না। আর, জিহাদের ক্ষেত্রেও শত্রুপক্ষের সংখ্যা, শক্তিসামর্থ্য, অস্ত্রসস্ত্র এগুলো বিবেচ্য বিষয় হবে না, বরং লক্ষ্য অর্জনই হবে মূল বিষয়, তার জন্য যতো বড় ত্যাগেরই প্রয়োজন হোক না কেন কিংবা তার ফলাফল যাই হোক না কেন।

মুসলিমদের সাথে রোমানদের এই যুদ্ধ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যে জন্য মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও মুসলিম সেনানায়কদের যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুকে মুকাবিলা করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। বস্তুতঃ মুসলিমদের মৃত্যুর ভয়ে কখনোই ভীত হওয়া উচিত না। আর, না তাদের আল্লাহর পথে জিহাদ করা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন বিষয় চিন্তা করা উচিত। এ যুদ্ধের শুরু থেকেই আল্লাহর রাসুল(সা.) জানতেন রোমান সাম্রাজ্যের সীমান্তে তাদের শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়ানো কতোটা বিপদজনক। কিন্তু, শত্রুপক্ষের অন্তরে ভীতি ছড়িয়ে দেয়ার জন্য এটা খুবই কার্যকরী উপায় ছিল। আর সমস্ত বিশ্ববাসীকে এটা দেখানোও প্রয়োজন ছিল যে, সংখ্যায় নগন্য হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বাসীরা কিভাবে শুধু তাদের অতুলনীয় ঈমানী শক্তিকে পুঁজি করে, তাদের রবের সন্তুষ্টির জন্য দুর্দান্ত সাহসিকতার সাথে শত্রুকে মুকাবিলা করতে পারে। প্রকৃত অর্থে, জিহাদই হচ্ছে একমাত্র উপায়, যার মাধ্যমে মুসলিমরা নতুন নতুন ভূ-খন্ড জয় করে সেখানে ইসলামের হুকুম-আহকাম বাস্তবায়ন করতে পারে, ছড়িয়ে দিতে পারে ইসলামের আলোকিত আহবান বিশ্বব্যাপী। আর, এ যুদ্ধ মূলতঃ মুসলিমদের অপরিহার্য সেই জিহাদের জন্যই প্রস্তুত করেছিল, সাফল্যের সাথে ক্ষেত্র তৈরী করেছিল পরবর্তীতে রোমানদের সাথে সংঘটিত তাবুক যুদ্ধের। মু'তার যুদ্ধ রোমানদের এত বেশী নাড়া দিয়েছিল যে, পরবর্তীতে মুসলিমরা আল-শাম জয় করা না পর্যন্ত দুঃসাহসী এ বাহিনীর মুখোমুখি হবার সম্ভাবনাই ছিল রোমানদের আতঙ্কের ব্যাপার।

## মক্কা বিজয়ঃ

কুরাইশদের সাথে আল্লাহর রাসুল(সা.)এর হুদাইবিয়া চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পরপরই খুযাআ'হ গোত্র মুহাম্মদ(সা.)এর নিরাপত্তায় চলে আসে এবং বনু বকর কুরাইশদের পক্ষ নেয়। এরপর থেকে আল্লাহর রাসুলের সাথে কুরাইশদের শান্তিপূর্ণ সম্পর্কই বজায় থাকে এবং উভয়পক্ষই আবার ব্যবসাবাণিজ্য শুরু করে। মুসলিমদের সাথে সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য কুরাইশরা তাদের ব্যবসার ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করে। এদিকে, আল্লাহর রাসুল(সা.) সমগ্র মানবজাতির কাছে ইসলামের আহবান ছড়িয়ে দেবার পাশাপাশি আরব ভূ-খন্ডে ইসলামী রাষ্ট্রের অবস্থানকে সুসংহত ও শক্তিশালী করেন এবং ইসলামী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীন নিরাপত্তার ব্যাপারে জোর দেন।

খায়বারে ইহুদীদের কর্তৃত্ব ধ্বংস করার পর তিনি(সা.) বিভিন্ন রাজ্যের অধিপতিদের কাছে তাঁর দূত পাঠিয়ে বর্হিবিশ্বের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন। তিনি(সা.) ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে বিস্তৃত করে এমন পর্যায়ে নিয়ে আসেন যে, একপর্যায়ে সমস্ত আরব ভূ-খন্ডে ইসলামের ছায়াতলে চলে আসে। এরপর, হুদাইবিয়া সন্ধির ঠিক একবছর পূর্ণ হলে তিনি(সা.) সাহাবীদের কাযা উমরাহ আদায়ের জন্য প্রস্তুতি নিতে বলেন, যে উমরাহ পালন করতে আগের বছর তাদের কুরাইশরা বাঁধা দিয়েছিল। এ উদ্দেশ্যে দুই সহস্র মুসলিম যাত্রা করে। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী এ সময় তাদের সাথে শুধু কোষবদ্ধ তলোয়ার ছাড়া আর কোনকিছুই ছিল না।

কিন্তু, তারপরেও কুরাইশরা যে কোন সময় বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে একথা মাথায় রেখে তিনি(সা.) মুহাম্মদ ইবন মাসলামাহর নেতৃত্বে অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত ১০০ অশ্বারোহীর একটি দলকে উমরাহ যাত্রীদের সামনে রাখেন। মক্কার পবিত্রতা নষ্ট করা কিংবা চুক্তিভঙ্গ করা কোনটাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। এরপর, মুসলিমরা কোনরকম সংঘর্ষ বা দূঘটনা ছাড়াই মক্কায় যায়, উমরাহ পালন করে নিরাপদে মদীনায় ফিরে আসে। রাসুল(সা.) উমরাহ পালন করে মদীনায় ফিরে আসার পর মক্কার জনগণ ইসলাম গ্রহন করতে আরম্ভ করে। খালিদ ইবন আল-ওয়ালিদ, 'আমর ইবন আল-'আস এবং কাবার রক্ষক 'উসমান ইবন তালহা সহ মক্কার বিপুল সংখ্যক মানুষ ইসলামের ছায়াতলে চলে আসে। ফলে, দিনে দিনে মুসলিমরা শক্তিশালী হয়ে উঠে। আর, অন্যদিকে দূর্বলতা আর আতঙ্ক কুরাইশদের গ্রাস করে।

মু'তার যুদ্ধে মুসলিমরা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ায় কুরাইশরা ধরেই নেয় যে, মুসলিমরা নিঃশেষ হয়ে গেছে। এজন্য, তারা তাদের মিত্রপক্ষ বনু বকরকে বনু খুযাআ' গোত্রকে আক্রমণের ইন্ধন যোগাতে থাকে। এলক্ষ্যে, তারা তাদের প্রয়োজনীয় অস্ত্রসস্ত্র দিয়েও সাহায্য করে। কুরাইশদের প্ররোচনায় বনু বকর খুযাআ' গোত্রকে আক্রমণ করে তাদের কিছু ব্যক্তিকে হত্যা করে। আর, বাকীরা নিরাপত্তার আশায় পালিয়ে মদীনায় চলে আসে। খুযাআ' গোত্রের 'আমর ইবন সালিম দ্রুত মুহাম্মদ(সা.)এর গিয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে এবং সাহায্যের আবেদন করে। মুহাম্মদ(সা.) তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেন,"তোমারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে, হে 'আমর ইবন সালিম।"

এ পর্যায়ে, আল্লাহর রাসুল(সা.) কুরাইশদের এ বিশ্বাসঘাতকতাকে উপেক্ষা না করার সিদ্ধান্ত নেন এবং তিনি(সা.) এটাও ভাবেন যে, মক্কা বিজয় না করা পর্যন্ত এ সমস্যার কোন সমাধান করা সম্ভব না। এদিকে, চুক্তি ভঙ্গ করে কুরাইশরা অত্যন্ত ভীত হয়ে যায়। তারা চুক্তিকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে চুক্তির সময় বৃদ্ধি করার জন্য আবু সুফিয়ানকে মদীনায় প্রেরণ করে। আবু সুফিয়ান সরাসরি মুহাম্মদ(সা.)এর কাছে না গিয়ে প্রথমে তার কন্যা ও রাসুল(সা.)এর স্ত্রী উম্ম হাবীবার কাছে যায়। গৃহে প্রবেশ করার পর, সে যখন রাসুল(সা.)এর বিছানায় বসতে যায় উম্ম হাবীবাহ্ দ্রুত বিছানা গুটিয়ে ফেলেন যেন আবু সুফিয়ান সেখানে বসতে না পারে। আবু সুফিয়ান তাকে জিজ্ঞেস করে যে, আমি কি এই বিছানার অযোগ্য, না কি এই বিছানাই আমার অযোগ্য? উত্তরে উম্ম হাবীবাহ্ বলেন,"এটা হচ্ছে আল্লাহর রাসুল(সা.)এর বিছানা। আর তুমি হচ্ছো একজন ঘৃণিত মুশরিক। সুতরাং, আমি চাই না যে তুমি তাঁর বিছানায় বসো।" এ কথার উত্তরে আবু সুফিয়ান বলে,"আল্লাহর কসম! আমাকে ছেড়ে আসার পর তোমার অনেক অধঃপতন হয়েছে।" তারপর, উত্তেজিত হয়ে উম্ম হাবীবা'র গৃহ থেকে বেড়িয়ে যায়।

পরবর্তীতে, আবু সুফিয়ান কোনক্রমে রাসুল(সা.)এর সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাঁকে চুক্তির সময় বৃদ্ধির আকুল আবেদন জানায়। কিন্তু, তার এ আবেদনে রাসুল(সা.) কোন সাড়া না দিয়ে তাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করেন। এরপর, আবু সুফিয়ান আবু বকরের কাছে ছুটে যায় এবং তাঁকে রাসুল(সা.)এর কাছে এ বিষয়ে আবেদন করার জন্য অনুরোধ করে। আবু বকর(রা.) তাকে প্রত্যাখান করেন। এরপর, সে 'ওমর ইবন খাত্তাবের কাছে ছুটে যায়, কিন্তু, 'ওমর(রা.) তাকে ধমক দিয়ে বলে,"তুমি কি আশা কর যে, আমি তোমার পক্ষ হয়ে আল্লাহর রাসুলের কাছে আবেদন করবো? আল্লাহর কসম, যদি আমার কাছে একটি মাত্র পিপড়াও থাকত তবে, তা দিয়েই আমি তোমার সাথে যুদ্ধ করতাম।" শেষ পর্যন্ত, সে 'আলী ইবন আবি তালিবের সাথে সাক্ষাৎ করে। তিনি তখন ফাতিমা(রা.)এর সাথে ছিলেন। আবু সুফিয়ান 'আলী(রা.)কে তার পক্ষ হয়ে আল্লাহর রাসুলের কাছে আবেদন করতে অনুরোধ করলে 'আলী(রা.) বলেন, আল্লাহর রাসুল(সা.) যখন কোন বিষয়ে মনস্থির করেন তখন সে বিষয়ে তাঁকে বিরত রাখার চেষ্টা করা অর্থহীন। এরপর, সে ফাতিমা(রা.)এর দিকে ঘুরে তাঁর সন্তান হাসান(রা.)কে তাদের নিরাপত্তা দেবার আবেদন করে। এর উত্তরে তিনি বলেন,"তোমাকে একমাত্র আল্লাহর রাসুল(সা.) ছাড়া কেউ নিরাপত্তা দিতে পারবে না।"

এ পর্যায়ে আবু সুফিয়ান মরিয়া হয়ে দ্রুতগতিতে মক্কায় ফিরে যায় এবং কুরাইশদের অভিজ্ঞতার কথা খুলে বলে। ইতিমধ্যে, আল্লাহর রাসুল(সা.) সাহাবীদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নিতে বলেন এবং তিনি(সা.) তাঁর দলবল সহ মক্কার দিকে যাত্রা করেন। তিনি(সা.) তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে আচমকা উপস্থিত হয়ে কুরাইশদের হতবিহবল করে দিতে চেয়েছিলেন, যেন অপ্রস্তুত অবস্থায় তারা বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং বিনা রক্তপাতেই মক্কা বিজয় করা যায়।

মক্কা বিজয় অভিযানে ১০,০০০ মুসলিম সৈন্য মদীনা থেকে যাত্রা করে। কুরাইশদের অজান্তেই তারা মক্কার মাত্র পাঁচ কিলোমিটার দূরবর্তী মার আল-দাহ্‌রান এলাকায় পৌঁছে যায়। কুরাইশরা ইতিমধ্যেই আঁচ করতে থাকে যে, মুসলিমরা তাদের যে কোন সময় আক্রমণ করতে পারে এবং তাদের নেতৃস্থানীয়রা এই আক্রমণ প্রতিহত করার ব্যাপারে গবেষনাও করতে থাকে। এ অবস্থায় কুরাইশদের অঘোষিত সর্দার আবু সুফিয়ানের নও মুসলিম আল-'আব্বাসের সাথে সাক্ষাৎ হয়ে যায়। সে তার কাছ থেকে মক্কার উপর ঘনিয়ে আসা সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে অবহিত হয়। এ সময় তিনি রাসুল(সা.)এর সাদা রঙের খচ্চরের উপর আরোহন করছিলেন, যেন কুরাইশরা বুঝতে পারে যে, হয় তাদের রাসুল(সা.)এর কাছে নিরাপত্তা চাইতে হবে অথবা নিশ্চিত ধ্বংসের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। কারণ, মুসলিমদের এই সুসজ্জিত বিশাল বাহিনীকে মুকাবিলা করার কোন উপায়ই তখন কুরাইশদের ছিল না। আল-'আব্বাস আবু সুফিয়ানকে বলেন,"দেখছো তো আল্লাহর রাসুল(সা.) বিশাল বাহিনী নিয়ে উপস্থিত। তাদের যদি জোরপূর্বক মক্কায় প্রবেশ করতে হয়, তাহলে মনে হয় তোমাদের ধুলার সাথে মিশে যেতে হবে।" আবু সুফিয়ান ব্যাকুল হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে,"এ অবস্থায় আমাকে কি করতে হবে তাই বল?" তিনি তখন তাকে তার খচ্চরের পিঠে আরোহন করতে বলেন এবং রাসুল(সা.)এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর কাছে নিরাপত্তা কামনা করতে বলেন। মুসলিমদের ছাউনী অতিক্রম করার সময় তারা ওমর(রা.) এর আগুনের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে। 'ওমর(রা.) রাসুল(সা.)এর খচ্চর এবং তাদের চিরশত্রু আবু সুফিয়ানকে চিনে ফেলেন।

পরিস্থিতি বুঝতে পেরে, 'আব্বাস(রা.) আবু সুফিয়ানের প্রাণ ভিক্ষার আবেদন করতে উদ্যাত হলেন। কিন্তু, তার আগেই ক্ষিপ্রগতিতে 'ওমর(রা.) আল্লাহর রাসুলের তাঁবুর দিকে ছুটে গেলেন। উদ্দেশ্য প্রাণের শত্রুর দেহ থেকে গর্দান নামিয়ে ফেলার অনুমতি প্রার্থনা করা। এ অবস্থায় তার খচ্চরকে দ্রুতবেগে চালিয়ে 'ওমরের আগেই পৌঁছে গেলেন রাসুল(সা.)এর তাঁবুতে। চিৎকার করে বললেন,"হে আল্লাহর রাসুল! আমি তাকে(আবু সুফিয়ান) আমার পক্ষ থেকে নিরাপত্তা দিয়েছি।" এরপর, 'আব্বাস(রা.) এবং 'ওমর(রা.) মধ্যে এ বিষয়কে কেন্দ্র করে তুমুল বির্তক আরম্ভ হয়। আল্লাহর রাসুল(সা.) আব্বাস(রা.)কে বলেন,"আপনি একে আপনার গৃহে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং আগামীকাল সকালে তাকে নিয়ে আসেন।" পরদিন, তাকে আল্লাহর রাসুলের কাছে নিয়ে আসা হয় এবং সে ইসলাম গ্রহন করে।

এরপর, আব্বাস(রা.) রাসুল(সা.)কে বলেন,"হে আল্লাহর রাসুল! আবু সুফিয়ান এমন একজন মানুষ, যে সবসময়ই মানুষের মাঝে সম্মানিত হতে ভালবাসে। আপনি কি এ ব্যাপারে কিছু করবেন?" একথা শোনার পর রাসুল(সা.) ঘোষনা দিলেন,"যে আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ। যে নিজ গৃহে দরজা বন্ধ করে অবস্থান করবে সে নিরাপদ। যে কাবাঘরে অবস্থান করবে সেও নিরাপদ।" এরপর, আল্লাহর রাসুল(সা.) আবু সুফিয়ানকে চুঁড়ার একটি অংশে দাঁড় করিয়ে দিলেন যেন, মুসলিমদের বিশাল বাহিনী তাকে অতিক্রম করার সময় সে তা দেখতে পায়। এরপর, সে দ্রুতগতিতে মক্কায় ফিরে এসে চিৎকার করে ঘোষনা দেয়,"তোমরা শোন, আল্লাহর রাসুল, মুহাম্মদ তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত, যাদের মুকাবিলা করার কোন সামর্থ্যই তোমাদের নেই। সুতরাং, যে আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে, সে নিরাপত্তা লাভ করবে। যে নিজগৃহে দরজা বন্ধ করে থাকবে, সে নিরাপত্তা লাভ করবে। আর, যে কাবাগৃহে অবস্থান করবে সেও নিরাপত্তা লাভ করবে।" এ ঘোষনা শোনার পর কুরাইশরা সমস্ত প্রতিরোধ উঠিয়ে নেয়। এরপর, আল্লাহর রাসুল(সা.) সর্তকতার সাথে মক্কায় প্রবেশ করেন। তিনি(সা.) তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনীকে চারটি ভাগ করেছিলেন এবং নিতান্ত বাধ্য না হলে কোনপ্রকার রক্তপাত করতে নিষেধ করেছিলেন। মুসলিম বাহিনী বিনা বাঁধায় বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করে। শুধুমাত্র, খালিদ ইবন আল-ওয়ালিদের বাহিনীকে কিছুটা প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, যেটা তিনি দ্রুত নিষ্পত্তি করেছিলেন।

এরপর, আল্লাহর রাসুল(সা.) মক্কার উচ্চভূমি থেকে নেমে আসেন। তাওয়াফ করার উদ্দেশ্যে কাবাঘরের দিকে এগিয়ে যাবার আগে তিনি(সা.) এ স্থানে কিছুক্ষন থেমেছিলেন। এরপর তিনি(সা.) সাতবার কা'বা ঘর প্রদক্ষিন করে 'উসমান ইবন তালহাহ্‌কে কা'বা ঘরের দরজা খোলার নির্দেশ দেন। এ সময় সমস্ত জনসাধারণ তাঁর পাশে সমবেত হয়। তাদের উদ্দেশ্য করে তিনি(সা.) পবিত্র কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলওয়াত করেন, যেখানে আল্লাহতায়ালা বলছেন,

*Ò‡n gvbeRwZ! Avgiv †Zvgv‡`i‡K GK‡Rvov gvbe-gvbex †_‡K mó K‡iwQ| Zvici, †Zvgv‡`i wewfb RwZ I †Mv‡Î wef³ K‡iwQ যেন তোমরা পরস্পর পরস্পরকে চিনতে পার। নিশ্চয়ই, আল্লাহর দৃষ্টিতে সেই সবচাইতে বেশী সম্মানিত যার তাকওয়া mePvB‡Z †ekx|* Verily, Allah is All-Knowing, All-Aware.*Ó* [সুরা আল-হুজুরাতঃ ১৩]

তারপর, তিনি(সা.) কুরাইশদের উদ্দেশ্য করে বলেন,"হে কুরাইশরা, তোমরা আজ আমার কাছ থেকে কি আচরন আশা করো?" উত্তরে তারা বলে,"ভালো, কারণ তুমি আমাদের মহৎ ভাই, আমাদের মহৎ ভাইয়ের সন্তান।" তিনি(সা.) বললেন,"তোমরা এখন মুক্ত, তোমরা যে যেখানে

চাও যেতে পার ।" কা'বার ভেতরের দেয়ালে যত ফেরেশতা ও নবীদের ছবি অঙ্কিত ছিল, তিনি(সা.) সে সবকিছু ছিঁড়ে ফেলার নির্দেশ দেন। তিনি(সা.) কাঠের তৈরী একটি ঘুঘু পাখি কা'বার ভেতর আবিস্কার করেন, যা তিনি(সা.) নিজহাতে ভেঙ্গে ছুঁড়ে ফেলে দেন। সবশেষে, কা'বার ভেতরের অসংখ্য মূর্তিগুলোর দিকে তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে নির্দেশ করে তিনি(সা.) পবিত্র কোরআনের নীচের আয়াতটি তিলওয়াত করেন,

*ÒGes ejt mZ¨ G‡m‡Q Ges wg_¨v wbðý n‡q‡Q| wbðqB, wg_¨v‡K ‡Zv wbðý n‡ZB n‡e|Ó* [সুরা আল-ইসরাঃ ৮১]

এরপর, কা'বা ঘরের অভ্যন্তরের মূর্তিগুলো একে একে মাটিতে পরে গেল, তারপর সেগুলোকে ভেঙ্গে, পুড়িয়ে কা'বার প্রাঙ্গন থেকে সরিয়ে ফেলা হল। আর, এভাবেই শেষপর্যন্ত, পবিত্র কা'বাঘর মুশরিকদের অপবিত্রতা থেকে মুক্তি পেল।

এরপর, আল্লাহর রাসুল(সা.) পনের দিন মক্কায় অবস্থান করলেন। এর মধ্যে, মক্কার শাসন কার্যাবলী বিন্যস্ত করেন এবং জনসাধারনকে ইসলাম শিক্ষা দেন।

এভাবে, মক্কা পুরোপুরি পৌত্তলিকদের কবল থেকে মুক্ত হয় এবং শেষপর্যন্ত ইসলামী দাওয়াতের পথে অন্যতম বস্তুগত বাঁধা অপসারিত হয়। এরপরেও আরব উপদ্বীপে কিছু কিছু ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন প্রতিরোধ বলয় থেকে যায় যেমনঃ হুনায়ুন, তা'য়িফ ইত্যাদি। এ শহরগুলো জয় করে নেয়ার পরই মূলত সমগ্র আরব ভূ-খন্ডে মুসলিমদের চুড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। আর, প্রকৃতপক্ষে, মক্কা বিজয়ের পর এ ক্ষুদ্র প্রতিরোধ বলয়গুলোকে ভেঙ্গে দেয়া মুসলিমদের জন্য বিশেষ কঠিন কাজও ছিল না।

## হুনায়ুনের যুদ্ধঃ

হাওয়াজিন গোত্রের লোকেরা যখন শুনতে পেল কিভাবে মুসলিমরা মক্কা জয় করে নিয়েছে, তখন তারা আশঙ্কা করতে লাগল যে, তারাও হয়ত মুসলিমদের আক্রমণের শিকার হতে পারে কিংবা তাদের ঘরবাড়ী মুসলিমদের হাতে ধ্বংস হতে পারে। এজন্য, সম্ভাব্য এ বিপদ মুকাবিলার জন্য তারা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। মালিক ইবন 'আউফ আল-নাদরি হাওয়াজিন ও বনু ছাকিফ গোত্রের যোদ্ধাদের একত্রিত করে মুসলিমদের আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে উতাস উপত্যকায় পৌঁছাল।

মক্কা বিজয়ের ১৫ দিন পর হাওয়াজিন ও বনু ছাকিফ গোত্রের ধেয়ে আসা এ সৈন্যবাহিনীর সংবাদ মুসলিমদের কাছে পৌঁছাল। সাথে সাথে তারা তাদেরকে মুকাবিলা করার প্রস্তুতি নিল। এদিকে, মালিক তার সৈন্যদল সহ উতাস উপত্যকায় অবস্থান নেয়ার পরিবর্তে উপত্যকার সবচাইতে দূর্গম অঞ্চল হুনায়ুন এলাকায় অবস্থান নিল। এখানে, সে খুবই সর্তকতার সাথে কৌশলগত ভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তার বাহিনীকে সজ্জিত করল। মুসলিমরা উপত্যকায় প্রবেশ করা মাত্রই সে তার বাহিনীকে আক্রমণ করার নির্দেশ দিয়েছিল, যাতে মুসলিম বাহিনী অতর্কিত আক্রমণে দিশেহারা হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। অত্যন্ত সর্তকতার সাথে পুরো পরিকল্পনা করে তারা উপত্যকায় মুসলিমদের আগমনের অপেক্ষা করতে লাগল।

এর কিছুদিনের মধ্যেই মুসলিমরা হুনায়ুন উপত্যকায় প্রবেশ করে। আল্লাহর রাসুল(সা.) মক্কা থেকে দুই সহস্র যোদ্ধা এবং মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে আগত আরও ১০,০০০ যোদ্ধা নিয়ে যাত্রা করেন। এই অপরাজেয় বাহিনী নিয়ে তিনি(সা.) বিকেলবেলায় হুনায়ুনের উপত্যকায় পৌঁছান। এখানে তাঁরা পরদিন সুবহে সাদিক পর্যন্ত বিশ্রাম নিয়ে একেবারে উষালগ্নে উপত্যকার অভ্যন্তরে যাত্রা করেন। মুসলিমদের সেনাবাহিনী যখন উপত্যকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করছিল তখন আল্লাহর রাসুল(সা.) তাঁর সাদা খচ্চরের পিঠে আরোহন করে তাঁর সৈন্যবাহিনীর পেছনের দিকে ছিলেন। এরপর, হাওয়াজিনের নেতা মালিকের পরিকল্পনা অনুযায়ী শুরু হয় শত্রুপক্ষের অতর্কিত আক্রমণ। অন্ধকার ভেদ করে চর্তুদিক থেকে বৃষ্টির মতো বর্শার আঘাত আসতে থাকে। অর্তকিত এ আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মুসলিম বাহিনী দিশেহারা হয়ে যায়। আক্রমণ যেহেতু চর্তুদিক থেকে আসছিল, মুসলিমরা চর্তুমূখী এ আক্রমণকে কি করে প্রতিহত করবে তা বুঝে উঠতে পারছিল না। তারপর, ভয়ে আতঙ্কে কেউ কারো দিকে লক্ষ্য না করে প্রাণ বাঁচাতে যে যেদিক পারে পালিয়ে যায়। তারা দলে দলে মুহাম্মদ(সা.) এর পাশ দিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছিল এবং তাঁর দিকেও লক্ষ্য করছিল না কিংবা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল না। শেষপর্যন্ত শুধু আল-'আব্বাস এবং আল্লাহর রাসুল(সা.) যুদ্ধক্ষেত্রে রয়ে গেলেন। এছাড়া, বাকী সবাই পরাজিত হয়ে নিজ নিজ জীবন রক্ষায় পালিয়ে বাঁচল। মুহাম্মদ(সা.) যেখানে ছিলেন সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকলেন, তাঁর চারপাশে রইল শুধু আনসার, মুহাজির ও তাঁর পরিবারের সম্বনয়ে গঠিত ছোট্ট একটি দল। তিনি(সা.) তাঁর লোকদের ডেকে বললেন,"ওহে মানুষেরা, তোমরা কোথায় যাচ্ছ?" কিন্তু, তারা মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে তাঁর আহবান শুনতে ব্যর্থ হল এবং পেছন দিকে না তাকিয়ে পালাতে থাকল। হাওয়াজিন ও ছাকিফ গোত্রের লোকেরা তাদের ধাওয়া করে যাকে যেখানে পেল হত্যা করল।

এটি ছিল আল্লাহর রাসুলের জীবনের সবচাইতে জটিল ও সঙ্কটপূর্ণ এক অভিজ্ঞতা। এ অভিযানের চরম হতাশাজনক পরিসমাপ্তি ছিল তাঁর কাছে অচিন্তনীয়। সাহাবা, তাঁর শক্তিশালী বাহিনী ও মক্কার নও মুসলিমদের পুর্ণ উদ্যেমে পলায়নপর অবস্থার মধ্যে তিনি(সা.) দৃঢ় চিত্তে অবিচল ভাবে

দাঁড়িয়ে থাকলেন। তাদেরকে ফিরে আসার জন্য বারবার আহবান করতে লাগলেন। এদের মধ্যে যারা খুব সম্প্রতি(মক্কা বিজয়ের পর) ইসলাম গ্রহন করেছিল, তারা প্রকাশ্যেই ইসলামের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করতে লাগল। তারা মুসলিমদের এ পরাজয়ে বিদ্বেষে পূর্ণ আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল। কালদা ইবন হাম্বল বলল,"নিশ্চয়ই, আজ সমস্ত যাদুটোনার পরাজয় হয়েছে।" শায়বা ইবন 'উসমান ইবন তালহা বলল,"আজ আমার মুহাম্মদের উপর প্রতিশোধ নেবার দিন।" আবু সুফিয়ান উপহাসের সাথে বলল,"তাদের (সেনাবাহিনীর) এ পলায়ন থামবে না, যতক্ষন পর্যন্ত না তারা সমুদ্র তীরে পৌছায়।"

এরকম একটা নিশ্চিত পরাজয়ের সম্ভাবনা মূলতঃ তাদের পলায়নকেই তরান্বিত করেছিল, যারা মক্কায় খুব সম্প্রতি ইসলাম গ্রহন করেছিল এবং নিজেদের হীন উদ্দেশ্য ও প্রকৃত চেহারা আড়াল করতে আল্লাহর রাসুল(সা.)এর সাথে এ শরীক হয়েছিল। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ সময় মুহাম্মদ(সা.) যে কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তা ছিল অত্যন্ত জঘন্য। কিন্তু, পিছু হটে যাবার কোন চিন্তা না করে, তিনি(সা.) অবিচল চিত্তে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে থাকলেন এবং তাঁর সাদা খচ্চরের পিঠে আরোহন করে শত্রুপক্ষের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলেন। এ সময় তাঁর চাচা আল-'আব্বাস ইবন 'আবদ আল-মুত্তালিব রাসুল(সা.) এর সাথে ছিলেন। আর, আবু সুফিয়ান ইবন আল-হারিছ ইবন 'আবদ আল মুত্তালিব (not to be confused with Abu Sufyan ibn Harb Abu Mu'awiyah) রাসুল(সা.) এর বাহনের নাকের রশি ধরে সাথে সাথে এগুতে থাকলেন যেন, এটি কোন বিপদজনক অবস্থানের দিকে যেতে না পারে। এ পর্যায়ে, আল-'আব্বাস চিৎকার করে বললেন,"হে আনসার, যারা তোমরা আল্লাহর রাসুলকে আথিতেয়তা ও নিরাপত্তা দিয়েছ! হে মুহাজির, যারা তোমরা বৃক্ষের নীচে তাঁর কাছে শপথ করেছ! মুহাম্মদ(সা.) এখনও বেঁচে আছে, সুতরাং, তোমরা ফিরে আস।"

আল-'আব্বাসের পূণঃপূণঃ এই আর্তনাদ উপত্যকার চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। পরাজিত পলায়নপর মুসলিমরা অবশেষে তার আহবান শুনতে পেল। তাদের মনে পড়লো আল্লাহর রাসুলের কথা। মনে পড়লো জিহাদের দায়িত্বের কথা। সহসাই তারা অনুভব করলো এই লজ্জাজনক পরাজয়ের ভয়াবহ পরিণামের কথা। তারা অনুভব করলো, যদি এখানে আজ পৌত্তলিকরা তাদের গুঁড়িয়ে দেয়, তাহলে যে দ্বীন রক্ষার তারা নিঃশেষে জীবন দিয়েছে, তার পরিসমাপ্তি এখানেই ঘটবে। শেষপর্যন্ত, আল-'আব্বাসের আহবানে সাড়া দিয়ে তারা রাসুল(সা.)এর চারিদিকে সমাবেত হতে লাগলো এবং পূর্ণ উদ্যেম ও সাহসিকতার সাথে একে একে পুণরায় যুদ্ধে যোগ দিতে লাগলো। এরপর তারা আবারও এক বিশাল বাহিনীতে পরিণত হল এবং যুদ্ধ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করলো। ঘটনার এ নাটকীয় পরিবর্তনের পর আল্লাহর রাসুল(সা.) ধীরে ধীরে বিজয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে লাগলেন এবং এক পর্যায়ে, একমুঠো নুড়ি পাথর তুলে শত্রুপক্ষের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন,"আজ তোমাদের মুখ ধূলিমলিন হোক!"

এরপর, মুসলিমরা জীবনের পরোয়া না করে হাওয়াজিন ও ছাকীফ গোত্রের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালায়। ভয়ঙ্কর এ আক্রমণের মুখে কিছুক্ষনের মধ্যেই পৌত্তলিকরা বুঝে যায় যে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে না গেলে ধ্বংস অনিবার্য। পালাবার সময় তারা তাদের ধনসম্পদ ও নারীদের রেখে ফেলেই চলে যায়, যেগুলো পরে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসাবে মুসলিমদের হস্তগত হয়।

পলায়নপর পৌত্তলিকদের পিছু পিছু মুসলিমরা ধাওয়া করে এবং তাদের মধ্যে অনেককে বন্দী করে। এমনকি তারা উপত্যকার ভেতর লুকিয়ে থাকা মুশরিকদেরও খুঁজে বের করে হত্যা করে। তাদের দলনেতা মালিক ইবন 'আউফ তায়েফে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এভাবেই আল্লাহতায়ালা মুসলিমদের সাহায্য করেন অভাবনীয় এক সাফল্য অর্জন করতে। এবং এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে নীচের আয়াতগুলো নাযিল করেন,

*"অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে যুদ্ধে বহুক্ষেত্রে (কাফিরদের উপর) বিজয়ী করেছেন এবং হুনায়নের দিনেও, যখন সংখ্যাধিক্যের গর্ব তোমাদেরকে* ***D¤§Ë K‡iwQj| AZtci, †Zvgv‡`i †mB msL¨waK¨ †Zvgv‡`i †KvbB Kv‡R Av‡mwb, Avi f-cô wb‡Ri ck¯Zv m‡Ë I †Zvgv‡`i Rb¨*** *সঙ্কীর্ণ হয়েছিল। অতঃপর, তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্বক পলায়ন করলে। তারপর, আল্লাহ নিজ রাসুলের প্রতি এবং অন্যান্য ঈমানদারদের প্রতি* ***wb‡Ri c¶ †\_‡K mwwKbvn (mvšbv, ¯w¯) bwhj Ki‡jb Ges Ggb ewnbx (†d‡ikZv) cvVv‡jb hv‡`i‡K †Zvgiv †`L‡Z cvI wb| Avi, Kwdi‡`i‡K kw¯ c`vb Ki‡jb| Avi, GUvB n‡"Q Zv‡`i K‡gi djvdj| Abš*** *ও আল্লাহ যাকে চান তাকে সুযোগ দান করেন। আর, আল্লাহ হচ্ছেন অতি ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।"* [সুরা তওবাঃ ২৫-২৭]

শত্রুকে পরাজিত করার পর এ যুদ্ধে প্রচুর পরিমাণ ধনসম্পদ যুদ্ধলব্ধ মালামাল হিসাবে মুসলিমদের হস্তগত হয়েছিল। এ যুদ্ধে প্রায় বিশ হাজার উট, চল্লিশ হাজার ভেড়া এবং চার হাজার রূপার বর্ম মুসলিমদের হাতে আসে। অসংখ্য পৌত্তলিক নিহত হয়। আর, প্রায় ছয় হাজার পৌত্তলিক যুদ্ধবন্দী হয়। এদের সবাইকে ওয়াদি আল-যি'রানাহ নামক স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। মুসলিমদের মধ্যে ঠিক কতজন শহীদ হয়েছিল তা জানা যায়নি। তবে, তারা সংখ্যায় অনেক ছিল এবং কিছু সীরাতের বর্ণনা অনুযায়ী প্রায় দুটো মুসলিম গোত্র পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল।

এরপর, আল্লাহর রাসুল(সা.) যুদ্ধলব্ধ মালামাল ও বন্দীদের আল-যি'রানাহতে রেখে দলবল নিয়ে তা'য়িফ ঘেরাও করেন, যাদের কাছে মালিক ইবন 'আউফ পরাজিত হয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। তা'য়িফ ছিল বনু ছাকিফদের বাসস্থান। পুরো তা'য়িফ নগরী ছিল সুরক্ষিত দূর্গ সদৃশ এবং এ

অঞ্চলের লোকেরা ছিল অবরোধ যুদ্ধে পারদর্শী। এছাড়া, এরা ছিল অত্যন্ত বিত্তশালী ও প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী। বনু ছাকিব গোত্রের লোকদের তীর চালনায় ছিল অসাধারণ দক্ষতা। মুসলিমদের কোন দল নগরীর দিকে অগ্রসর করার চেষ্টা করা মাত্রই তারা বৃষ্টির মতো তীর নিক্ষেপ করে মুসলিম যোদ্ধাদের হত্যা করছিল। কিছুক্ষনের মধ্যেই মুসলিমরা বুঝে ফেলে যে, দূর্গের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করা তাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হবে। এজন্য, তারা মুহাম্মদ(সা.)এর পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় শত্রুর তীরের নিশানার বাইরে অবস্থান গ্রহন করে। এমতাবস্থায়, আল্লাহর রাসুল(সা.) কামানের মতো গোলা নিক্ষেপকারী এক অস্ত্রের সাহায্যে তা'য়িফের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গুঁড়িয়ে দেবার জন্য বনু দাওস গোত্রের সাহায্য চাইলেন। তা'য়িফ অবরোধ করার চারদিন পর দাওস গোত্র তাদের এ যুদ্ধাস্ত্র সহ মুসলিমদের সাথে যোগ দেয়। এরপর, মুসলিমরা নতুন এ যুদ্ধাস্ত্রের সাহায্যে দূর্গ আক্রমণ করে। আর, ট্যাঙ্কের মতো এক বাহনে চড়ে মুসলিমরা দূর্গের দেয়ালের কাছাকাছি গিয়ে আক্রমণ করার চেষ্টা করছিল যেন খুব তাড়াতাড়িই দূর্গের প্রতিরক্ষা দেয়াল ধসিয়ে দেয়া যায়। কিন্তু, অগ্রসর হওয়া মাত্রই তা'য়িফের যোদ্ধারা তাদের দিকে জ্বলন্ত ধাতুর টুকরা ছুঁড়ে মারতে থাকে যাতে ট্যাঙ্কগুলো পুড়ে যায় আর মুসলিমরা আত্মরক্ষার্থে পালাতে থাকে। এ সুযোগে শত্রুপক্ষ তাদের দিকে বৃষ্টির মতো তীর নিক্ষেপ করে মুসলিম যোদ্ধাদের অনেককে হত্যা করে। সরাসরি দূর্গ ধ্বংস করতে না পেরে যুদ্ধকৌশল হিসাবে মুসলিমরা তাদের আঙ্গুর বাগান কেটে পুড়িয়ে দেয় যেন ছাকিফ গোত্র আত্মসর্মপন করতে বাধ্য হয়। কিন্তু, তারপরও বনু ছাকিফ আত্মসর্মপন না করায় মুসলিমরা অবরোধ উঠিয়ে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়।

এরমধ্যে পবিত্র মাস শুরু হয়ে যায়। আল্লাহর রাসুল(সা.) যুল আল-ক্বা'দা মাসের প্রথম দিনে তা'য়িফ থেকে অবরোধ উঠিয়ে মুসলিমদের সহ মক্কা যাত্রা করেন। যাত্রাপথে যুদ্ধলব্ধ মালামাল ও বন্দীদের জন্য তারা আল-যি'রানাহতে কয়েকদিন অবস্থান করেন। এ সময়কালে, অনেক সমস্যা সমাধান করার সাথে সাথে আল্লাহর রাসুল(সা.) এটাও ঘোষনা দেন যে, যদি মালিক ইবন 'আউফ ইসলাম গ্রহন করে, তবে তিনি(সা.) সমস্ত ধনসম্পদ সহ পরিবারের সবাইকে তার কাছে ফিরিয়ে দেবেন। এ সংবাদ মালিক ইবন 'আউফের কানে পৌঁছানো মাত্রই সে ত্বড়িৎ বেগে মুহাম্মদ(সা.)এর নিকটে হাজির হয় এবং ইসলাম গ্রহন করে। মাত্র কিছুদিন পূর্বে মুহাম্মদ(সা.) যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তা'য়িফ ঘেরাও করেছিলেন, আশ্চর্যজনক ভাবে সেই একই ব্যক্তিকে তিনি(সা) তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী সমস্ত সম্পদ ফিরিয়ে দেয় এবং সেইসাথে তাকে অতিরিক্ত ১০০ উটও দান করেন।

এ ঘটনার পর মুসলিমরা আশঙ্কা করে যে, এভাবে হাওয়াজিন গোত্রের যে কেউ এসে দাবী করা মাত্রই যদি মুহাম্মদ(সা.)তার সম্পদ ফিরিয়ে দিতে শুরু করে তবে তাদের যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মধ্যে অবশিষ্ট আর কিছুই থাকবে না। এজন্য তারা দাবী করে যে, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ তাদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হোক, যেন সকলে তাদের প্রাপ্য বুঝে পায়। এ বিষয় নিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে কানাঘুষা করতে থাকে এবং একপর্যায়ে তাদের এ কানাঘুষা মুহাম্মদ(সা.)এর কান পর্যন্ত পৌঁছায়। এ কথা শোনার পর, তিনি(সা.) জনসম্মুখে পার্শ্ববর্তী উটের কুঁজ থেকে একটা লোম উঠিয়ে তাঁর আঙ্গুল দিয়ে শক্ত করে ধরে বলেন,"হে মানুষেরা! আল্লাহর কসম তোমাদের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে আমার নিজের জন্য এক পঞ্চমাংশ ব্যতীত অতিরিক্ত আর কিছুই নেই, এমনকি এই লোমের সমপরিমাণও নয়। আর এই এক-পঞ্চমাংশ সম্পদও আমি তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দেব। সুতরাং, কেউ যদি অন্যায় ভাবে একটা সূঁচ পরিমান জিনিসও নেয়, তবে কিয়ামতের দিনে এটা হবে তার জন্য খুবই অপমান ও যন্ত্রনার কারণ এবং এজন্য সে ও তার পরিবারবর্গ চুড়ান্ত ভাবে অপমানিত হবে।" আল্লাহর রাসুল(সা.) তাঁর জন্য (আল্লাহ থেকে নির্দিষ্ট) একপঞ্চমাংশ সম্পদ রেখে বাকী সম্পদকে সাহাবাদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। তাঁর নিজের সম্পদকে তিনি(সা.) যাদের অন্তর জয় করার প্রয়োজন ছিল তাদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন, বিশেষ করে ইসলাম গ্রহনের পূর্বে যারা তাঁর ঘোরতর শত্রু ছিল তাদেরকে তিনি(সা.) এ সম্পদ দান করে দিলেন। তিনি(সা.) আবু সুফিয়ান, তার ছেলে মুয়া'য়িয়া, আল-হারিছাহ ইবন আল-হারিছাহ, আল-হারিছাহ ইবন আল-হিশাম, সুহাইল ইবন 'আমর, হাওয়াইতিব ইবন 'আবদ আল-উজ্জা এবং বিভিন্ন গোত্রের প্রধানদের তাদের নিজ নিজ অংশের সাথে অতিরিক্ত আরও ১০০ উট দান করলেন এবং অন্যদেরকে তাদের অংশের সাথে অতিরিক্ত আরও ৫০টি করে উট দিলেন।

যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসুল(সা.) অসম্ভব উদারতা ও মহানুবতা প্রদর্শন করেছিলেন। একই সাথে, তিনি(সা.) প্রদর্শন করেছিলেন অসাধারন রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা। কিন্তু, তাঁর এ সুচিন্তিত ও দূরদর্শীতাপূর্ণ পদক্ষেপের অর্ন্তনিহিত উদ্দেশ্যে অনেক মুসলিমই বুঝতে পারল না। আনসাররা, যারা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে কিছুই পেল না, তারা মুহাম্মদ(সা.) এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজেদের মধ্যে কানাঘুষা করতে শুরু করলো এবং দূর্ভাগ্যবশতঃ বিষয়টি নিয়ে ভেতরে ভেতরে তাদের অন্তরে ক্ষোভের সৃষ্টি হলো। আনসারদের মধ্য হতে একজনের কথায় তাদের এই ক্ষোভের বিষয়টি শেষপর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে পড়লো। ক্ষোভের সাথে সে বললো,"আল্লাহর কসম! আল্লাহর রাসুল(সা.) তাঁর নিজের লোকজনের স্বার্থ রক্ষা করেছেন।" এ পর্যায়ে, সা'দ ইবন 'উবাদাহ আল্লাহর রাসুলের কাছে গিয়ে তাঁকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। আল্লাহর রাসুল(সা.) সা'দকে জিজ্ঞেস করলেন,"এ ব্যাপারে তোমার অবস্থান কোথায় সা'দ?" উত্তরে তিনি বললেন,"আমি আমার লোকদের সাথে একমত।" আল্লাহর রাসুল(সা.) তাকে বললেন,"তাহলে তুমি তোমার লোকদের সবাইকে এখানে একত্রিত করো।" যখন এ বিষয়ে সচেতন সবাই একসাথে হলো, তখন মুহাম্মদ(সা.) তাদেরকে বললেন,"তোমাদের কাছ থেকে আজ আমি একি শুনতে পাচ্ছি? তোমরা কি আমার ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষন করছো? আমি কি তোমাদের কাছে এমন এক অবস্থায় আসিনি যখন তোমরা পথভ্রষ্ট ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে আমার মাধ্যমে পথ দেখিয়েছেন? তোমরা কি দরিদ্র ছিলে না, অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে স্বচ্ছলতা দিয়েছেন? তোমরা কি একে অপরের শত্রু ছিলে না, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের হৃদয়কে ভালোবাসায় পূর্ণ করেছেন? উত্তরে তারা বললো,"হ্যাঁ, সবই আল্লাহ আর তাঁর

রাসুলের অনুগ্রহ ।" তিনি(সা.) আবারও বললেন,"তোমরা কেন উত্তর দিচ্ছো না, হে আনসারেরা?" তারা উত্তরে বললো,"কিভাবে আমরা আপনার কথার উত্তর দিবো? যখন সকল অনুগ্রহ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ।" রাসুল(সা.) বললেন,"তোমরা চাইলে এ কথা বলতে পারো যে, যখন সবাই আপনাকে মিথ্যাবাদী বলেছে, আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি । আপনি যখন অসহায় ছিলেন আমরা তখন আপনাকে সাহায্য করেছি । আপনি যখন ভাসমান ছিলেন, আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি । যখন আপনি নিঃস্ব ছিলেন তখন আমরা আপনাকে স্বস্তি দিয়েছি । তাহলে, এর প্রতিটি কথার উত্তরে আমি বলবো তোমরা সত্য কথা বলছো । আজ তোমরা দুনিয়ার সামান্য কিছু ভালো জিনিসের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করছো, অথচ আমি দূর্বল মুসলিমদের এ উদ্দেশ্যে তা দিয়েছি যেন তা দিয়ে তাদের অন্তরকে জয় করতে পারি । আর, তোমাদের উপর আমি দ্বীন ইসলাম এর আমানত অর্পন করেছি । তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও হে আনসাররা যে, অন্য সব লোক ভেড়া আর উটের পাল নিয়ে ফেরৎ যাবে, আর তোমরা আল্লাহর রাসুলকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবে? সেই সত্ত্বার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যদি আমাকে হিজরত করতে না হতো তবে আমি তোমাদের মতোই আনসার হতাম । যদি সমস্ত মানুষ একদিকে যায় আর আনসাররা যায় অন্য পথে, তবে আমি তোমাদের পথে যাওয়াই পছন্দ করবো । হে আল্লাহ! তুমি আনসারদের উপর তোমার করুণা বর্ষণ করো, করুণা বর্ষণ করো তাদের সন্তান এবং তারপরে তাদের সন্তানদের উপর ।" একথা শুনে আনসাররা তাদের ভুল বুঝতে পেরে অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলো । এমনকি কাঁদতে কাঁদতে তাদের দাঁড়ি অশ্রুতে ভিজে গেল । কান্নাজড়িত কণ্ঠে তারা বললো,"হে আল্লাহর রাসুল! আমরা আমাদের অংশ নিয়েই সন্তুষ্ট আর আপনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট ।"

এরপর, আল্লাহর রাসুল(সা.) তাঁর দলবল নিয়ে মক্কায় উমরাহ করার উদ্দেশ্যে গমন করলেন । মক্কার শাসনকার্য পরিচালনার জন্য 'উতবা ইবন উসাইদকে সেখানকার ওয়ালী হিসাবে নিযুক্ত করলেন । আর, সেখানকার জনগণকে ইসলামের শিক্ষা দান করার জন্য মনোনিত করলেন মুয়া'দ ইবন জাবালকে । তারপর, তিনি(সা.) আনসার ও মুহাজিরদের সহ মদীনায় ফিরে আসলেন ।

## তাবুকের যুদ্ধঃ

আল্লাহর রাসুল(সা.)এর কাছে, এ মর্মে সংবাদ পৌঁছে যে, মু'তার যুদ্ধে মুসলিম যোদ্ধাদের অসাধারণ রণকৌশলের জন্য রোমানদের বিশালবাহিনীকে বাধ্যতামূলক সৈন্য প্রত্যাহার করতে হয়েছিল, সে অসহনীয় লজ্জাজনক স্মৃতি মুছে ফেলার জন্য তারা আরব উপদ্বীপের উত্তরাংশে আক্রমণ করার পরিকল্পনা করছে । এ সময় রোমান বাহিনীকে মুকাবিলা করার জন্য রাসুল(সা.) নিজেই সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন, যেন রোমানদের এ উচ্চাভিলাসকে এমন ভাবে ধ্বংস করে দেয়া যায়, যাতে তারা ভবিষ্যতে আর কখনোই মুসলিমদের ভূমি আক্রমণ করা বা মুসলিমদের ব্যাপারে কোনরকম হস্তক্ষেপ করার দুঃসাহস না করে ।

সময়টা ছিল গ্রীষ্মের শেষভাগ । অসহনীয় গরমের ফলে চারিদিকে চলছিল খরা আর অনাবৃষ্টি । এছাড়া, মদীনা থেকে আল-শামের দূরত্বও ছিল অনেক । যাত্রাপথ ছিল কঠিন আর দুরপাল্লার যাত্রার জন্য তখন অনুকুল সময়ও ছিল না । এ সমস্ত পরিস্থিতির বিবেচনায়, এ অভিযান ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য । আল্লাহর রাসুল(সা.) এ সমস্ত বিষয় বিবেচনা করার পরে অনেকটা অপ্রত্যাশিত ভাবেই শত্রুপক্ষকে মুকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নিলেন । তাঁর সিদ্ধান্তের কথা সাহাবাদের জানালেন এবং তাদের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিলেন । অন্যান্য অভিযান বা যুদ্ধের ক্ষেত্রে রাসুল(সা.) সাধারনতঃ তাঁর যাত্রার আসল উদ্দেশ্য গোপন রেখে, কৌশলগত দিক থেকে শত্রুকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করতেন ।

কিন্তু, এ যাত্রায় তিনি(সা.) পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে, প্রস্তুতির প্রথম দিন থেকেই রাসুল(সা.) রোমান সীমান্তে তাদের শক্তিশালী বাহিনীকে মুকাবিলা করার ঘোষনা দিলেন । এ লক্ষ্যে, তিনি(সা.) সকল গোত্রকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেবার আহবান জানালেন যেন যুদ্ধক্ষেত্রে মুজাহিদদের সংখ্যাকে যথা সম্ভব বৃদ্ধি করা যায় । তিনি(সা.) বিত্তশালী মুসলিমদের নির্দেশ দিলেন যেন, আল্লাহ তাদেরকে অনুগ্রহ পূর্বক যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তারা উদার হস্তে দান করে । যাতে, মুসলিম সৈন্যদল অস্ত্র-সস্ত্রের দিক থেকে যথাসম্ভব শক্তিশালী হতে পারে । এছাড়া, রোমানদের বিরুদ্ধে এ জিহাদে অংশগ্রহন করার জন্য তিনি(সা.) সাধারন ভাবে সবাইকে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন । তাঁর এ আহবানে মুসলিমরা বিভিন্ন ভাবে সাড়া দিয়েছিল । যারা ইসলামের আলোকিত আহবান ও পথনির্দেশনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে ইসলাম গ্রহন করেছিল, তারা আল্লাহর রাসুলের এ আহবানে প্রচন্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে সাড়া দিলো । এদের মধ্যে কেউ কেউ এতো দরিদ্র ছিল যে, তাদের যুদ্ধে যাবার জন্য একটি খচ্চরও ছিল না । আবার, অনেকে ছিল বিত্তশালী, যারা রাসুল(সা.)এর কাছে তাদের সমস্ত সম্পদ তুলে দিলো । এরা ছিল তারা, যারা স্বেচ্ছায় তাদের জীবনকে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করেছিল, আর শহীদ হবার তীব্র আকাঙ্খাকে বুকে নিয়ে জিহাদে অংশ গ্রহন করেছিল । আর, যারা প্রাণভয়ে কিংবা দুনিয়ার ধনসম্পদের আকাঙ্খায় ইসলাম গ্রহন করেছিল (হয় তারা ভেবেছিল ইসলাম গ্রহণ না করলে তাদের ধনসম্পদ মুসলিমদের হস্তগত হয়ে যাবে, অথবা গণীমতের আশায় তারা ধর্মান্তরিত হয়েছিল), তাদের কাছ থেকে তেমন কোন সাড়া পাওয়া গেল না । উপরন্তু, যুদ্ধে যোগদান না করার জন্য তারা নানারকম উছিলা খুঁজতে লাগল । তারা নিজেদের মধ্যে কানাঘুষা করে বলতে লাগলো, এই ভয়াবহ গরমে যদি আমরা এতো দূরে যুদ্ধ করতে যাই, তবে তীব্র গরমেই আমরা মারা পড়বো । এরা ছিল প্রকৃত অর্থে মুনাফিক । তারা একে অন্যকে বললো,"এই প্রচন্ড গরমে গিয়ে তোমরা যুদ্ধ করো না ।" আল্লাহতায়ালা তাদের এই অসন্তোষ নিয়ে কোরআনের আয়াত নাযিল করলেন,

***ÒZvix e‡j, ÔGB Mi‡g †Zvgiv AMÖmi n‡qv bv|Õ Zv‡`i‡K e‡j `vI (†n gnv¤§`)t Rvnvbœv‡gi Av¸b Gi †_‡KB A‡bK †ekx DËß, hw` Zviv Zv eS‡Zv|Ó*** [সুরা আত-তাওবাঃ ৮১]

আল্লাহর রাসুল(সা.) যাদ্দ ইবন কায়িসকে জিজ্ঞেস করলেন,"তুমি কি বনু আসফারদের মুকাবিলা করতে চাও না, যাদ্দ?" উত্তরে যাদ্দ বললো,"আপনি যদি আমাকে যুদ্ধে যাবার জন্য উদ্বুদ্ধ না করে পেছনে থাকার অনুমতি দেন তো ভালো। কারণ, সবাই জানে যে, আমি নারীদের প্রতি একটু বেশী আসক্ত। সুতরাং, আমার ভয় হচ্ছে যে, রোমানদের সুন্দরী রমণীদের দেখে আমি আত্মসংবরণ করতে পারবো না।" একথা শোনার পর, রাসুল(সা.) তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এরপর, আল্লাহতায়ালা যাদ্দ সম্পর্কে কোরআনে আয়াত নাযিল করে বললেন,

***ÒAvi, Zv‡`i g‡a¨ †h e‡j, ÔAvgv‡K (wRnv` †_‡K) wb®KwZ w`b Ges cix¶v †_‡K †invB w`b|Õ (†R‡b iv‡Lv †h) Aek¨B, Zviv GK wei vU cix¶vi g‡a¨ c‡o‡Q| wbðqB, Rvnvbœvg Awekvmx‡`i Pviw`K †_‡K wN‡i iv‡L‡e|Ó*** [সুরা আত-তওবাঃ ৪৯]

মুনাফিকরা আল্লাহ ও রাসুলের সাথে তাদের বিশ্বাসঘাতকতায় এখানেই থেমে থাকলো না, তারা অন্যদেরকেও যুদ্ধে না যাবার জন্য উৎসাহিত করতে লাগলো। এ অবস্থায়, রাসুল(সা.) মুনাফিকদের কঠিন শাস্তি দিয়ে তাদেরকে উচিত শিক্ষা দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। যখন, আল্লাহর রাসুলের কাছে এ সংবাদ পৌঁছালো যে, কিছু মুনাফিক সুওয়াইলিম নামের ইহুদীর বাসায় বসে যুদ্ধের বিষয়ে মুসলিমদের মনে সন্দেহ ও দ্বিধাদ্বন্দ সৃষ্টি করার জন্য ষড়যন্ত্র করছে, সাথে সাথে তিনি(সা.) তাঁর সাহাবী তালহা ইবন 'উবাইদুল্লাহর নেতৃত্বে একদল লোক পাঠিয়ে উক্ত ইহুদীর বাড়ী পুড়িয়ে দেবার নির্দেশ দিলেন। আগুন লাগানোর পর, সব চক্রান্তকারীরা দ্রুত পালিয়ে গেল। এদের মধ্যে একজন পালাতে গিয়ে পা ভেঙ্গে ফেললেও শেষ পর্যন্ত পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। এ ঘটনা সমস্ত মুনাফিকদের জন্য একটা দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি হয়ে যায় এবং এ ধরনের কাজের পূণরাবৃত্তি করা থেকে তারা বিরত হয়।

সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসুল(সা.) এর এই প্রচন্ড দৃঢ়তা ও অক্লান্ত প্রচেষ্টা জনসাধারনকে গভীর ভাবে নাড়া দিলো এবং শেষপর্যন্ত অসংখ্য মুসলিম যুদ্ধ অংশে করার জন্য সমবেত হলো। মোট ৩০,০০০ মুসলিম এ জিহাদে অংশ গ্রহন করার জন্য আল্লাহর রাসুলের ডাকে সাড়া দিয়েছিল। এ সেনাবাহিনীর নামকরণ করা হয়েছিল আল-'উসরাহ(বিপদ অথবা সঙ্কট)। কারণ, তাদেরকে গ্রীষ্মের প্রচন্ড দাবদাহে, মদীনা থেকে বহুদূরে রোমান সীমান্তে অপরাজেয় বাইজেন্টাইন বাহিনীকে মুকাবিলা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এছাড়া, বিরাট এ সৈন্যবাহিনীকে নিয়ে অভিযান পরিচালনা করার জন্য অনেক অর্থবলেরও প্রয়োজন ছিল। যাই হোক, সৈন্যবাহিনীকে একত্রিত করা হলো। আবু বকর(রা.) এ বাহিনীকে যখন ইমামতি করছিলেন, সেই ফাঁকে আল্লাহর রাসুল(সা.) মদীনাতে তাঁর অসমাপ্ত কাজগুলো সম্পাদন করছিলেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে সাহাবাদের মদীনার শাসনকার্য পরিচালনার নির্দেশ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। তিনি(সা.) এ সময় মুহাম্মদ ইবন মাসলামাহকে মদীনার দায়িত্বে নিযুক্ত করে এবং 'আলী ইবন আবু তালিবকে তাঁর স্ত্রীদের দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে তাদেরকে মদীনায় রেখে যান। এরপর, রাসুল(সা.) সৈন্যবাহিনীর সাথে পুণরায় যোগ দেন এবং তাদের নেতৃত্ব দেন। এরপর, সৈন্যদলকে সামনে অগ্রসর হবার নির্দেশ দেয়া হয়। বিশাল সৈন্যবাহিনী একযোগে তাদের শক্তিসামর্থ্য ও শৌর্য-বীর্য অতুলনীয় ভাবে প্রদর্শন করতে করতে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। আর, মদীনায় থেকে যাওয়া লোকেরা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাদের নয়নাভিরাম এ যাত্রাকে উপভোগ করে। এমনকি, মদীনার মুসলিম নারীরাও তাদের বাড়ির ছাদে উঠে চমৎকার এ দৃশ্য উপভোগ করে এবং বিশাল এ বাহিনীকে বিদায় জানায়।

দ্বিতীয় কোন চিন্তা মনে স্থান না দিয়ে এবং তীব্র দাবদাহ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও রুক্ষ ধূলি-ধূসর প্রান্তরের সকল কষ্টকে অবলীলায় উপেক্ষা করে মুসলিম বাহিনী গন্তব্যের পানে বিরতিহীন ভাবে চলতে থাকে। মুসলিম সৈন্যদলের ক্লান্তিহীন দুঃসাহসী এ যাত্রা এবং অজেয়কে জয় করার দুর্দান্ত এ প্রচেষ্টা পেছনে পড়ে থাকা দলগুলোকে দারুন ভাবে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে, তারাও দ্রুতগতিতে এগিয়ে এসে মূলবাহিনীর সাথে যুক্ত হয় এবং তাবুকের প্রান্তরে যেখানে রোমান সৈন্যরা মুসলিমদের আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে ঘাঁটি গেড়ে ছিল সেদিকে এগিয়ে দৃঢ় চিত্তে যায়। যখন অগ্রসরমান এ মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ও শক্তিসামর্থ্য সম্পর্কে রোমানরা অবগত হয়, সাথে সাথে মু'তার যুদ্ধের তিক্তস্মৃতি তাদের মানসপটে ভেসে উঠে। তারা স্মরণ করে, কিভাবে সংখ্যায় নগন্য ও অস্ত্রসস্ত্রের দিক থেকে অত্যন্ত দূর্বল হওয়া সত্ত্বেও মুসলিমরা দুর্দান্ত সাহসিকতার সাথে বীরের মতো তাদের সাথে যুদ্ধ করেছে। আর, আল্লাহর রাসুল(সা.) স্বয়ং এবার তাঁর বাহিনীকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন শুনে তাদের মেরুদন্ডে ভয়ের শীতল স্রোত প্রবাহিত হতে থাকে। সমস্ত অবস্থা পর্যবেক্ষন করে, তারা মুসলিমদের ভয়ে সাংঘাতিক ভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং শেষপর্যন্ত আল-শামের অভ্যন্তরস্থ সুরক্ষিত দূর্গে পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। রোমান বাহিনীর এভাবে সম্পূর্ন রূপে পিছু হটে যাবার ফলে, রোমানদের আল-শামের সীমান্ত অঞ্চল অরক্ষিত হয়ে যায়। এ সংবাদ আল্লাহর রাসুল(সা.)এর কাছে পৌঁছানোর পর তিনি(সা.) বিরতীহীন ভাবে যাত্রা করে তাবুকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন এবং কোনরকম যুদ্ধ ছাড়াই এ অঞ্চল জয় করে তাবুকের প্রান্তরে অবস্থান গ্রহন করেন। তিনি(সা.) এ যাত্রায় রোমান বাহিনীর সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত না হবার সিদ্ধান্ত নেন এবং তাবুক ও এর আশেপাশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের দখল নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন। এ সময় যারা মুখোমুখি মুসলিমদেরকে মুকাবিলা করতে চেয়েছিল এবং বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল তাদেরকে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য মুসলিম বাহিনী প্রায় একমাস তাবুকের প্রান্তরে অবস্থান করে। এ অঞ্চল জয় করার পর, রাসুল(সা.) রোমানদের নিযুক্ত গর্ভনর ও এ অঞ্চলের বিভিন্ন গোত্রীয় নেতাদের কাছে তাঁর পক্ষ থেকে বার্তা পাঠান। তিনি(সা.) আইলা'র গর্ভনর ইয়ুহানা ইবন রু'মাহ সহ আল-যাবরা' এবং আদরাহ'র

অধিবাসীদেরকে তাঁর কাছে আত্মসর্মপনের নির্দেশ দেন এবং তাঁর শাসন-কর্তৃত্ব মেনে নিতে বলেন। তারা নিরুপায় হয়ে রাসুল(সা.) এর সাথে শান্তিচুক্তি করে এবং জিযিয়া প্রদান করতে সম্মত হয়। অভিযানের উদ্দেশ্য পুরোপুরি বাস্তবায়িত হবার পর আল্লাহর রাসুল(সা.) মদীনায় ফিরে আসেন।

রাসুল(সা.)এর এ অনুপস্থিতির সুযোগে, মদীনার মুনাফিকরা মুসলিমদের মধ্যে মিথ্যা প্রচারনা চালায়, যার ফলে মুসলিমদের মধ্যে বিভক্তির সৃষ্টি হয়। তারা তু আওয়ান এলাকায় একটি মসজিদ নির্মাণ করে তাদের এ অসৎ ও বিভক্তিমূলক প্রচারনাকে শক্তিশালী করে। এ মসজিদটি ছিলো দিনের বেলায় মদীনা থেকে এক ঘন্টা দূরের পথ। যারা কোরআনের আয়াতকে বিকৃত করার চেষ্টায় লিপ্ত থাকতো এবং মুসলিমদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে সমাজের মধ্যে বিষাক্ত কর্থাবার্তা ছড়িয়ে দিতো, এ মসজিদটিকে মূলতঃ তারাই আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবহার করতো। আল্লাহর রাসুল(সা.) যখন তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন এ মসজিদের নির্মাতা রাসুল(সা.)কে অনুরোধ করেছিলেন এখানে নামাজ আদায় করার জন্য। কিন্তু, আল্লাহর রাসুল(সা.) তাকে যুদ্ধ থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার নির্দেশ দেন। ফিরে আসার পথে তিনি(সা.) মুনাফিকদের এ সমস্ত জঘন্য কার্যকলাপ সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত হন এবং মসজিদ সম্পর্কে আসল তথ্য জানতে পারেন। সবকিছু শোনার পর, তিনি(সা.) মসজিদটিকে সম্পূর্ন ভাবে ধ্বংস করে পুড়িয়ে দেবার নির্দেশ দেন। এভাবেই, তিনি(সা.) কোন দয়া প্রদর্শন না করে, মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রকে কঠিন ভাবে মুকাবিলা করেছিলেন। এ শিক্ষা পাবার পর, তারা এতো আতঙ্কিত হয়েছিল যে, পরবর্তীতে আর কখনোই এ ধরনের কার্যকলাপ করার দুঃসাহস প্রদর্শন করেনি।

তাবুক অভিযানের সমাপ্তির পর সমস্ত আরব ভূ-খন্ডে মুসলিমদের একচ্ছত্র শাসন-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সমস্ত উপদ্বীপ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিলো আল্লাহতায়ালার সুমহান বাণীর আলোকিত আহবান এবং শেষপর্যন্ত সমস্ত চ্যালেঞ্জ মুকাবিলা করে আল্লাহর রাসুল(সা.) এ অঞ্চলে তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শাসন-ক্ষমতাকে সম্পূর্ন ভাবে নিশ্চিত করেছিলেন। বস্তুতঃ এ অভিযানের পর, সমস্ত আরব ভূ–খন্ড থেকে দলে দলে বিভিন্ন গোত্রের মানুষ মুহাম্মদ(সা.) কাছে আগমন করতে থাকে এবং তাঁকে বাই'য়াত দিয়ে আনুগত্যের শপথ করে ইসলাম গ্রহন করে।

## আরব উপদ্বীপ শাসনঃ

তাবুক অভিযানের মাধ্যমে মূলতঃ আল্লাহর রাসুল(সা.) ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেছিলেন, যার ফলে ইসলামের শত্রুপক্ষের লোকেরা এ রাষ্ট্রকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে বাধ্য হয়েছিলো। একই সাথে, এ অভিযান বর্হিবিশ্বে ইসলামের উদাত্ত আহবানকে ছড়িয়ে দেয়ার পদ্ধতি হিসাবে তাঁর উত্তরসূরীদের কাছে একটি চমৎকার দৃষ্টান্তও হয়ে থাকলো।

আল্লাহর রাসুল(সা.) তাবুকের অভিযান থেকে ফিরে আসার পরপরই ইয়েমেন, হাজরামাউত ও 'ওমান সহ আরব উপদ্বীপের সমস্ত দক্ষিনাঞ্চল রাসুল(সা.) এর আনুগত্য স্বীকার করে ইসলামের পতাকাতলে চলে আসে। শুধু তাই নয়, তারা ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন-কর্তৃত্বকেও মেনে নেয়।

হিজরী নবম সালে, এ অঞ্চলের দূতেরা উদ্বিগ্ন চিত্তে একে একে আল্লাহর রাসুল(সা.)এর কাছে আসতে লাগলো এবং তাদের ও তাদের গোত্রভূক্ত লোকদের ইসলাম গ্রহনের স্বীকৃতি দিলো। এ সমস্ত ঘটনার ফলশ্রুতিতে, সমস্ত আরব ভূ-খন্ডে ইসলামী রাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শুধু আরবের অভ্যন্তরীন বিষয়গুলোর মধ্যে মূর্তিপূজারীই যা একটু সমস্যা তৈরী করছিলো। কারণ, মুহাম্মদ(সা.)এর কৃত চুক্তি অনুযায়ী পৌত্তলিকদের মূর্তিপূজা করা কিংবা কাবাঘর তাওয়াফ করার অনুমতি ছিলো। এ চুক্তিতে পরিষ্কার ভাবে বলা ছিলো যে, তারা নির্ভয়ে কাবাঘর তাওয়াফ করতে পারবে এবং পবিত্র মাসে তাদের কোন প্রকার ক্ষতি করা হবে না।

কিন্তু, এ অবস্থা বেশীদিন চলতে দেবার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ ছিলো না। কারণ, কতোদিন আর ইসলামের আকীদার সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক বিশ্বাসে বিশ্বাসী মুর্তিপূজারীদের পবিত্র কাবাঘরে আগমনকে সহ্য করা যায়? কিভাবে এই সম্পূর্ন বিপরীতধর্মী দুটো বিশ্বাসের মানুষেরা একত্রিত হয়ে পবিত্র এ ঘরকে তাওয়াফ করতে পারে, যখন এই দুটি বিশ্বাসের মধ্যে একটির আগমনই হয়েছে মূর্তিপূজাকে সম্পূর্ন রূপে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করতে? এছাড়া, এ জনপদের সকলেই যখন ইসলামী রাষ্ট্র ও এক আল্লাহর নিরঙ্কুশ শাসন-কর্তৃত্বের কাছে মাথা নত করেছে, তখন কি মূর্তিপূজারীদেরকে তাদের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী ছেড়ে দেয়া যায়? তাছাড়া, মূর্তিপূজা ছিলো একটি সম্পূর্ন পরিত্যক্ত ও ভ্রান্ত বিশ্বাস, যা সমাজের সামগ্রিক ঐক্যের জন্যও ছিলো বিপদজনক। তাই, এ পরিত্যক্ত বিশ্বাসকে সমাজ থেকে সম্পূর্ন রূপে নিশ্চিহ্ন করা ছিল অপরিহার্য। তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর মুসলিমরা যখন আবু বকর(রা.)এর নেতৃত্বে হজ্জের প্রস্তুতি নিচ্ছিলো, ঠিক এ সময়েই আল্লাহতায়ালা মুশরিকদের উদ্দেশ্য করে রাসুল(সা.)এর কাছে সুরা আত-তাওবা নাযিল করেন। আল্লাহর এ নির্দেশ পেয়ে আল্লাহর রাসুল(সা.) 'আলী ইবন আবি তালিবকে আবু বকর(রা.)এর সাথে মক্কায় পাঠিয়ে দেন এবং মক্কার জনসাধারনকে আল্লাহর নাযিলকৃত আয়াত শুনাতে বলেন। মক্কায় গিয়ে 'আলী ইবন আবি তালিব আবু হুরায়রাকে সঙ্গে নিয়ে মক্কার জনগণকে নাযিলকৃত আয়াতসমূহ তিলওয়াত করে শোনান।

***"আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ হতে অব্যাহতি (ঘোষনা করা) হচ্ছে ঐ মুশরিকদের (অঙ্গীকার) হতে, যাদের সাথে তোমরা সন্ধি করেছিলে।"*** [সুরা আত-তাওবাঃ ১]

সুরা তওবার উপরোক্ত আয়াত হতে তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পর্যন্ত তিলওয়াত করেন,

***ÒAvi GB gkwiK‡`i wei"‡× †Zvgiv mK‡j wgwjZ fv‡e h× K‡iv, †hgb Zviv †Zvgv‡`i wei"‡× mK‡j wg‡j h× K‡i| Avi †R‡b iv‡Lv, wbðqB আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথেই রয়েছেন।"*** [সুরা আত-তওবাঃ ৩৬]

এ আয়াত পর্যন্ত তিলওয়াত করার পর 'আলী(রা.) কিছুক্ষন নীরব থাকলেন। তারপর, চিৎকার করে বললেন,"হে মানুষেরা! অবশ্যই কোন অবিশ্বাসীই জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং কোন মুশরিকই এ বছরের পর থেকে হজ্জ্ব করতে পারবে না। আর, কেউ কাবাঘরকে নগ্ন হয়ে প্রদক্ষিন করতে পারবে না। আজকের পর থেকে যাদের সাথে মুহাম্মদ(সা.)এর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চুক্তি আছে, সেই চুক্তি ব্যতীত আর কোন চুক্তি হবে না।" এ চারটি নির্দেশ 'আলী(রা.) জারি করলেন এবং জনসাধারনকে নিজ নিজ বাড়ী ফিরে যাবার জন্য চারমাস সময় দিলেন। ঐ বছরের পর থেকে আর কখনো কোন মুশরিক হজ্জ্ব করতে আসেনি, না তারা আর কোনদিন নগ্ন হয়ে কা'বাঘরকে প্রদক্ষিন করেছে।

এরপর, আল্লাহতায়ালার নাযিলকৃত ইসলামিক আক্বীদাহর ভিত্তিতে নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের ছত্রছায়াই সমস্ত আরব ভূ–খন্ডে আল্লাহর বাণী বিস্তৃতি লাভ করতে আরম্ভ করলো। সুরা বারা'য়াহ(তাওবা), সবচাইতে শেষ সুরা, নাযিল হবার সাথে সাথেই সমগ্র আরব উপদ্বীপ থেকে মূর্তিপূজা সমূলে উৎপাটিত হলো এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভিত্তি সমাপ্ত হয়ে গেল। ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক সকল ধ্যান-ধারনা এবং ইসলামী রাষ্ট্র ব্যতীত অন্য সবকিছুর শাসন-কর্তৃত্বকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হলো। আর, এভাবেই সমস্ত মানবজাতির কাছে দ্বীন ইসলামের আহবান পৌঁছে দেবার শক্তিশালী ভিত্তি প্রস্তুত হলো।

## ইসলামী রাষ্ট্রের কাঠামোঃ

মদীনার পা' রাখার প্রথম দিন থেকেই আল্লাহর রাসুল(সা.) মুসলিম ও অমুসলিম সহ সবাইকে শাসন করেছেন এবং তাদের সমস্ত বিষয় দেখাশুনা করেছেন। ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করার পর তিনি(সা.) একটি আদর্শ ইসলামী সমাজ গঠনে মনোনিবেশ করেন যেন, এ সমাজ প্রকৃত অর্থেই একটি জনকল্যাণমূলক সমাজে পরিণত হয়। মদীনার রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন কালে তিনি(সা.) ইহুদী গোত্র, বনু দামরাহ এবং বনু মুদলাজের সাথে চুক্তি করেন। পরবর্তীতে তিনি(সা.) কুরাইশ এবং আইলাহ, আল-যারবা' ও উযরাহ'র গোত্র প্রধানদের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। তিনি(সা.) একথাও মেনে নেন যে, কোন গোত্রের মানুষকেই হজ্জ্ব করতে বাঁধা দেয়া যাবে না আর, না কারো পবিত্র মাসে আক্রান্ত হবার কোন ভয় থাকবে। সেনাবাহিনীর প্রধান হিসাবে তিনি(সা.) অনেক যুদ্ধের পরিকল্পনা করেন এবং এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন। তিনি(সা.) হামযাহ ইবন 'আব্দুল মুত্তালিব, মুহাম্মদ ইবন 'উবাইদা ইবন আল-হারিছাহ এবং সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাসকে কুরাইশদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। তিনি(সা.) যায়িদ ইবন হারিছাহ, জা'ফর ইবন আবি তালিব এবং 'আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহাকে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন। একই ভাবে, তিনি(সা.) খালিদ ইবন আল-ওয়ালিদকে দুমাত আল-জান্দাল গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নেতৃত্বে নিযুক্ত করেন। এছাড়া, অসংখ্য যুদ্ধে তিনি(সা.) নিজে নেতৃত্ব দেন যেখানে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

এছাড়াও তিনি(সা.) প্রতিটি প্রদেশে একজন ওয়ালী (governor) এবং প্রতিটি অঞ্চলে একজন 'আমিল (উপ-governor) নিযুক্ত করেন। উদাহরন স্বরূপ, তিনি(সা.) মক্কা বিজয়ের পরপরই 'উতাব ইবন উসাইদকে মক্কার ওয়ালী হিসাবে নিযুক্ত করেন এবং বাদান ইবন সাসান ইসলাম গ্রহন করার পর তিনি(সা.) তাকে ইয়েমেনের ওয়ালী নিযুক্ত করেন। মু'য়াজ ইবন আল জাবাল আল-খাযরাজী আল-জানান প্রদেশের এবং খালিদ ইবন সা'য়িদ ইবন আল'আস সানা'র ওয়ালী হিসাবে নিযুক্ত হন। আল্লাহর রাসুল(সা.) যায়িদ ইবন লুবাইদ ইবন ছালাবাহ আল-আনসারীকে হাযরামাউতের ওয়ালী নিযুক্ত করেন। আবু মুসা আল-আশ'য়ারীকে যাবিদ ও এডেন'এর এবং 'আমর ইবন আল'আস 'ওমানের ওয়ালী হিসাবে নিযুক্ত করেন। আর, মদীনাতে তিনি(সা.) আবু দুজানাহকে মদীনার 'আমিল হিসাবে দায়িত্ব দেন। আল্লাহর রাসুল(সা.) তাঁর চারপাশের মানুষদের মধ্যে যোগ্যতা অনুসারে বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন দায়িত্বের জন্য নিযুক্ত করতেন। যাদের অন্তর ঈমানের আলোতে পরিপূর্ণ ছিলো শুধু তাদেরকেই তিনি(সা.) শাসনকার্যের গুরুদায়িত্ব দেন। বর্ণিত আছে যে, মু'য়াজ ইবন জাবাল আল-খাযরাজিকে ইয়েমেনের শাসনকর্তা হিসাবে নিযুক্ত করার সময় তিনি(সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন,"তুমি কি দিয়ে জনগণকে শাসন করবে হে মু'য়াজ?" উত্তরে মু'য়াজ বলেন,"আমি আল্লাহর কিতাব দিয়ে তাদের শাসন করবো।" তারপর তিনি(সা.) বলেন,"যদি এ ব্যাপারে সেখানে কিছু না পাও?" তখন মু'য়াজ বলেন,"তাহলে আমি রাসুলের সুন্নাহর মধ্যে তা খুঁজবো।" এটা শুনে রাসুল(সা.) তাকে বলেন,"যদি সেখানেও না পাও?" উত্তরে মু'য়াজ বলেন,"তাহলে আমার জ্ঞান অনুযায়ী ইজতিহাদ(গবেষণা) করবো।" একথা শুনে আল্লাহর রাসুল(সা.) অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে যান এবং বলেন,"প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি তাঁর রাসুলের বার্তাবাহককে এমন জ্ঞান দিয়েছেন যা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ভালবাসেন।" এছাড়া, আরও বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রাসুল(সা.)

আব্বান ইবন সা'য়িদকে বাহরাইনের ওয়ালী নিযুক্ত করার সময় তাকে বলেন,"'আবদ আল কায়েসের লোকেদের সাথে সুন্দর আচরন করবে। আর, তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন করবে।"

আল্লাহর রাসুল(সা.) আচার-আচরন ও ঈমানের দিক থেকে সবচাইতে শ্রেষ্ঠ মুসলিমদেরকেই শাসক হিসাবে নিযুক্ত করতেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তিনি(সা.) ওয়ালীকে অর্থসংগ্রহ, জনগণকে ইসলামের আগমনের সুসংবাদ দেয়া, মানুষকে কুরআনের আলোকে গড়ে তোলা এবং তাদেরকে দ্বীন-ইসলাম বোঝানোর দায়িত্ব দিতেন। তিনি(সা.) তাঁর নিযুক্ত ওয়ালীকে কঠিন হস্তে অন্যায় ও বিদ্রোহ দমনের নির্দেশ দিতেন। কিন্তু, সত্যবাদীতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিনয়ী ও অমায়িক আচরন করতে বলেন। এছাড়া, বিবাদমান গোত্রগুলোর মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের নিষ্পত্তি করার ক্ষেত্রে কোন প্রকার গোত্রীয় রীতিনীতিকে মানদন্ড হিসাবে নিতে নিষেধ করেন। বরং, সকলক্ষেত্রে, আল্লাহ প্রদত্ত আইনকানুনকেই একমাত্র মানদন্ড হিসাবে গ্রহন করার নির্দেশ দেন।

আল্লাহর রাসুল(সা.) তাঁর নিযুক্ত শাসকদের যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ সংগ্রহ করার নির্দেশ দেন। এছাড়া, মুসলিমদেরকে আল্লাহতায়ালা যে সমস্ত ক্ষেত্রে সাদাকাহ্ দিতে বলেছেন, সে সমস্ত অর্থও সংগ্রহ করতে বলেন। তিনি(সা.) ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের মধ্য হতে যারা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহন করেছে তাদেরকে এ সুসংবাদ দেবার নির্দেশ দেন যে, এখন থেকে তারা বিশ্বাসীদের সমপরিমান অধিকার লাভ করবে এবং তাদেরকে অন্যসব মুসলিমদের মতোই একই দায়িত্ব পালন করতে হবে। তিনি(সা.) ইহুদী, খ্রিষ্টান বা অন্য যে কারো উপর যে কোন ধরনের অত্যাচার প্রতিহত করার নির্দেশও দেন। আল্লাহর রাসুল(সা.) মু'য়াজ(রা.)কে ইয়েমেনে পাঠানোর পূর্বে তাকে বলেন,"আহলে কিতাবের লোকদের শাসন করার জন্য তোমাকে পাঠানো হচ্ছে। তোমার প্রথম কাজ হবে তাদের এক আল্লাহর দাসত্বের দিকে আহবান করা। যদি তারা তা মেনে নেয়, তবে তুমি তাদের জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন, সম্পদশালীদের কাছ থেকে যাকাত সংগ্রহ এবং দরিদ্রদের মধ্যে তা বিতরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যদি তারা তা মেনে নেয়, তবে তাদের কাছ থেকে তা সংগ্রহ করবে এবং তাদের এ আমানত দেখাশুনা করবে এবং নির্যাতিত মানুষের আর্তনাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে। মনে রেখ, নির্যাতিত মানুষ ও আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা নেই।"

আল্লাহর রাসুল(সা.) খায়বারের ইহুদীদের উৎপাদিত শষ্য ও ফলফলাদি পরিমাপ করে তা থেকে রাষ্ট্রের নির্ধারিত অংশ সংগ্রহ করার জন্য সাধারনত 'আব্দুল্লাহ ইবন রুওয়াহাকে নিযুক্ত করতেন। তারা আল্লাহর রাসুল(সা.)এর কাছে একবার তার মূল্যায়নের ব্যাপারে অভিযোগ করে এবং 'আব্দুল্লাহকে ঘুষ হিসাবে কিছু সোনা-দানা দেবার চেষ্টা করে। তারা বলে,"এগুলো (সোনা-দানা) নিয়ে যাও এবং শষ্য ভাগাভাগির ব্যাপারে একটু ছাড় দাও।" উত্তরে 'আব্দুল্লাহ বলেন,"হে ইহুদীরা, তোমরা হচ্ছো আল্লাহর সৃষ্টি জগতের মধ্যে সবচাইতে নিকৃষ্ট। কিন্তু, আমি ন্যায়বিচারের ব্যাপারে এতটুকু ছাড় দেব না। যা তোমরা আমাকে ঘুষ হিসাবে গ্রহন করতে বলেছো তা আল্লাহর দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। সুতরাং, তা আমি গ্রহন করতে পারবো না।" এ কথা শুনে ইহুদীরা বলে,"এজন্যই আল্লাহ পৃথিবী ও জান্নাত তৈরী করেছেন।"

আল্লাহর রাসুল(সা.) সবসময়ই বিভিন্ন প্রদেশে তাঁর নিযুক্ত শাসক ও ব্যবস্থাপকদের উপর নজর রাখতেন এবং তাদের কার্যকলাপের সম্পর্কে খোঁজখবর নিতেন। তিনি(সা.) তাদের বিরুদ্ধে উত্থিত অভিযোগও মনোযোগের সাথে শুনতেন। একবার বাহরাইনে তাঁর নিযুক্ত 'আমিল আল-'আলা' ইবন আল-হাদরামির বিরুদ্ধে 'আবদ কায়িসের একদল প্রতিনিধি তাঁর কাছে অভিযোগ উত্থাপন করায়, তিনি(সা.) উক্ত 'আমিলকে ঐ অঞ্চল থেকে অপসারন করেন। এছাড়া, তিনি(সা.) এটাও লক্ষ্য রাখতেন যে, তাঁর নিয়োগকৃত ব্যবস্থাপকরা কিভাবে রাষ্ট্রের নির্ধারিত অর্থ সংগ্রহ করছে এবং রাজস্ব খাতে অর্জিত অর্থ কিভাবে ব্যয় করছে। একবার তিনি(সা.) একব্যক্তিকে যাকাত সংগ্রহের জন্য নিয়োজিত করেন। সেখান থেকে ফেরার পর উক্ত ব্যক্তি তাঁকে বলেন,"এই হচ্ছে আপনার নির্ধারিত অংশ আর এগুলো আমাকে উপহার হিসাবে দেয়া হয়েছে।" একথা শোনার পর আল্লাহর রাসুল(সা.) বলেন,"এই ব্যক্তির বিষয়টা কি? আল্লাহ আমাদের উপর যে দায়িত্ব অর্পন করেছেন আমরা তাকে সে অনুযায়ী কাজে নিযুক্ত করেছি, আর সে কি না বলছে, এটা আপনার অংশ আর এটা আমাকে উপহার হিসাবে দেয়া হয়েছে? সে কি বাড়ীতে তার মাতা-পিতার সাথে বসে উপহারের প্রত্যাশা করতে পারে না? আমরা যদি কাউকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোন কাজের জন্য নিযুক্ত করি এবং তারপরেও যদি সে এর বাইরে কোনকিছু গ্রহন করে, তবে সেটা হবে অসৎ উপার্জন।"

আল্লাহর রাসুল(সা.) মানুষের মাঝে ঝগড়া-বিবাদের নিষ্পত্তি করার জন্য বিচারক নিযুক্ত করেছেন। তিনি(সা.) 'আলী(রা.)কে ইয়েমেনের বিচারক এবং 'আব্দুল্লাহ ইবন নওফেলকে মদীনার বিচারক হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। সেইসাথে, তিনি(সা.) মু'য়াজ ইবন জাবাল এবং আবু মুসা আল-আশ'য়ারীকেও ইয়েমেনের বিচারক নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি(সা.) তাদের জিজ্ঞেস করেছিলেন,"কি দিয়ে তোমরা বিচার-ফয়সালা করবে?" উত্তরে তারা বলেন,"আমরা যদি আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের সুন্নাহতে তা খুঁজে না পাই তবে, কিয়াসের মাধ্যমে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত বের করবো।" তিনি(সা.) তাদের এ পদ্ধতিকে স্বীকৃতি দেন। আল্লাহর রাসুল(সা.) বিভিন্ন স্থানে শুধু বিচারক নিযুক্ত করেই সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি(সা.) বিচারক এবং শাসকদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সকল অভিযোগের সঠিক তদন্ত ও বিচার করার জন্য বিচারকদের সমন্বয়ে জুরী বোর্ড (মাযালিম) গঠন করেন। তিনি(সা.) বিচার বিভাগ ও জুরী বোর্ডের আমির (নেতা) হিসাবে রাশিদ ইবন 'আব্দুল্লাহকে নিযুক্ত করেন এবং জুরী বোর্ডের সামনে উপস্থাপিত সকল অভিযোগ তদন্ত করার দায়িত্ব দেন।

আল্লাহর রাসুল(সা.) জনগণের সমস্ত বিষয়াদির ব্যাপারেই দেখাশুনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি(সা.) ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিটি বিভাগের প্রধান হিসাবে একজন রেজিষ্টার বা লিপিবদ্ধকারক নিয়োগ করেছিলেন। 'আলী ইবন আবি তালিব এর দায়িত্ব ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে অন্যান্য গোত্র বা রাষ্ট্রের সকল প্রকার চুক্তি লিপিবদ্ধ করা। আল-হারিছ ইবন 'আউফ রাসুল(সা.) এর সীলমোহরের দায়িত্বে ছিলেন, মু'য়াইকিব ইবন আবি ফাতিমাহ ছিলেন যুদ্ধলব্ধ মালামালের দায়িত্বে, হুযাইফা ইবন আল-ইয়ামান ছিলেন সমগ্র হেযাযে উৎপন্ন ফল-ফলাদি ও শষ্য পরিমাপ ও মূল্যায়ন করার দায়িত্বে, যুবাইর ইবন আল-'আওওয়াম ছিলেন সাদাকা বিভাগের সেক্রেটারী, আল-মুগীরা ইবন শু'বাহকে দেয়া হয়েছিল ঋণ বিষয়ক ও লেনদেন সংক্রান্ত দলিলপত্র লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব এবং শারকাবিল ইবন হাসানাহ'কে নিযুক্ত করা হয়েছিল বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ'র কাছে রাসুল(সা.)এর প্রেরিত পত্র লেখার দায়িত্ব। তিনি(সা.) প্রতিটি বিভাগের একজন সেক্রেটারী বা পরিচালক নিযুক্ত করেছিলেন, বিভাগের সংখ্যা যতো বেশীই হোক না কেন। এ সমস্ত বিষয়ে তিনি(সা.) তাঁর সাহাবীদের মধ্যে যাদের গভীর চিন্তাশক্তি ও বিভিন্ন বিষয় উপলব্ধি করার ক্ষমতা রয়েছে, বিশেষ করে যারা দ্বীন-ইসলামের জন্য তাদের জীবনকে পুরোপুরি উৎসর্গিত করেছিল, তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করতেন। আনসারদের মধ্য হতে এ রকম ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল সাত জন আর মুহাজিরদের মধ্য হতে ছিল সাত জন। এদের মধ্যে ছিল, হামযাহ, আবু বকর, ওমর, জা'ফর, 'আলী, ইবন মাস'উদ, সালমান, 'আম্মার, হুযাইফা, আবু দার, আল-মিকদাদ এবং বিলাল। এছাড়া, তিনি(সা.) বিভিন্ন সময়ে অন্যদের সাথেও পরামর্শ করতেন, কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই উল্লেখিত ব্যক্তিদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান নিতেন। এদের সকলকে নিয়েই আসলে মাজলিশ্ আল-উম্মাহ গঠিত হয়েছিল।

আল্লাহর রাসুল(সা.) মুসলিম-অমুসলিম সহ নির্বিশেষে সকলের উপর কয়েক প্রকার জমিজমা, উৎপন্ন ফসল এবং গবাদি পশুর উপর কর আরোপ করেন। এগুলো যাকাত, উশর (নির্দিষ্ট ফসলের এক দশমাংশ), ফা'ই (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ), খারাজ (জমির উপর আরোপিত খাজনা) এবং জিযিয়া (রাষ্ট্রের অমুসলিমদের নাগরিকদের উপর আরোপিত কর) নিয়ে গঠিত ছিল। আনফাল ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ছিল বায়তুল মালের সম্পদ (রাষ্ট্রের সম্পদ)। যাকাতের অর্থ পবিত্র কোরআনের নির্দেশ অনুযায়ী আট প্রকারের মানুষের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হতো, এর বাইরে কেউ যাকাতের সম্পদ পেত না। যাকাতের অর্থ কখনোই রাষ্ট্রীয় ব্যয় মেটানোর কাজে ব্যবহার করা হতো না। রাষ্ট্রের সকল ব্যয় ফা'ই, খারাজ, জিযিয়া এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হতে প্রাপ্ত অর্থের মাধ্যমেই করা হতো। বস্তুতঃ এ সমস্ত খাত হতে প্রাপ্ত সম্পদই রাষ্ট্রের সকল ব্যয়ভার বহন করা কিংবা যুদ্ধ পরিচালনায় প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য যথেষ্ট ছিল। যে জন্য, ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থজনিত কোন সমস্যা কখনো ছিল না।

এভাবেই আল্লাহর রাসুল(সা.) ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার কাঠামোগত ভিত্তি তৈরী করেন। প্রতিটি জিনিস তিনি(সা.) নিজের হাতে করেন এবং তাঁর জীবদ্দশায়ই এ কাজ সম্পন্ন করেন। তিনি(সা.) ছিলেন তাঁর নিজের হাতে গড়া এ রাষ্ট্রের প্রধান। এছাড়া, তাঁকে রাষ্ট্রীয় কাজে সাহায্য করার জন্য ছিল তাঁর সহকারী, গর্ভনর, বিচারক, সৈন্যবাহিনী, সেক্রেটারী এবং তাঁকে পরামর্শ দেবার জন্য ছিল শুরা কাউন্সিল (পরিষদ)। তাই, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এই কাঠামোর ভিত্তিতেই তা তৈরী করতে হবে এবং এই কাঠামোই অনুমোদন করতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কিত এ সকল খুঁটিনাটি বিষয়গুলো বহু সংখ্যক মানুষের বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনার (তাওয়াতুর) মাধ্যমে এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছেছে। আল্লাহর রাসুল(সা.) মদীনার আসার প্রথম দিন থেকেই রাষ্ট্র প্রধানের ভূমিকা পালন করেছেন। এ দীর্ঘ সময়ে আবু বকর এবং 'ওমর তাঁর সহকারী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর সাহাবীগণ সর্বসম্মতিক্রমে রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে আবু বকরকে নিযুক্ত করেন, নবী কিংবা ওহীর বার্তাবাহক হিসাবে নয়। কারণ, তিনি(সা.) ছিলেন সর্বশেষ নবী এবং তাঁর পরে আর কারও কাছে ওহী নাযিল হবে না।

তাহলে, দেখা যাচ্ছে যে, আল্লাহর রাসুল(সা.) তাঁর জীবদ্দশায়ই একটি পরিপূর্ণ সরকার ব্যবস্থা তৈরী করেছিলেন। বস্তুতঃ মৃত্যুর পর তিনি(সা.) এমন এক শাসন-ব্যবস্থা বা সরকার-ব্যবস্থা রেখে যান, যা ইতিমধ্যে সকলের কাছে পরিচিত ও সুস্পষ্ট ছিল।

## ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি ইহুদীদের আচরণঃ

ইহুদীরা আসলে ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য কখনোই তেমন কোন হুমকী ছিল না। আরবরাই মূলতঃ আল্লাহর রাসুল(সা.)এর শাসন কর্তৃত্বের সামনে হুমকী হয়ে দাঁড়িয়েছিল, বিশেষ করে কুরাইশরা ছিল এ ব্যাপারে অগ্রগামী। এজন্যই তিনি(সা.) ইহুদীদের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন, যেন ইহুদীরা তাঁর কর্তৃত্ব মেনে নেয় এবং রাসুল(সা.)এর শত্রুপক্ষের সাথে কোনরকম মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ না হয়। কিন্তু, ইহুদীরা যখন দেখতে থাকে যে, ইসলামী রাষ্ট্র দিনে দিনে শক্তিশালী হয়ে উঠছে এবং হেযাযে মুসলিমদের শাসন-কর্তৃত্ব ধীরে ধীরে বিস্তৃত হচ্ছে, তখন তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে নানারকম অপপ্রচার ও কুৎসা রটনা করে। বদরের যুদ্ধে কাফিরদের উপর মুসলিমদের নিরঙ্কুশ বিজয়ের পর তারা আরও উদ্বিগ্ন হয়ে তাদের মিথ্যা অপপ্রচারের মাত্রা বৃদ্ধি করে, এমনকি আল্লাহর রাসুল(সা.)এর বিরুদ্ধেও তারা ষড়যন্ত্র করতে আরম্ভ করে।

ইহুদীদের এ দূর্বৃত্তপনা ও চুড়ান্ত ঔদ্ধত্যের কথা একসময় আল্লাহর রাসুল(সা.) এবং মুসলিমদের কাছে পৌঁছে যায়। এর ফলশ্রুতিতে, ইহুদী ও মুসলিমদের পরস্পরের মধ্যে সৃষ্টি হয় প্রচন্ড ঘৃণা, বিদ্বেষ ও শত্রুতা। দুই পক্ষই একে অন্যকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্য মুখিয়ে থাকে। এদিকে, সময়ের সাথে সাথে ইহুদীদের ঔদ্ধত্য দিনে দিনে বাড়তেই থাকে। ইহুদীদের মধ্যে বনু 'উমার ইবন 'আউফ গোত্রের আবু 'আফাক নামের এক

ব্যক্তি মুহাম্মদ(সা.) এবং সাহাবীদের উদ্দেশ্যে অপমানজনক কবিতা আবৃত্তি করতো। 'আসমা বিনত মারওয়ান নামের এক মহিলা সবসময় ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করে কথা বলতো এবং রাসুল(সা.)কেও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতো। মুসলিম নারীরা পথ-ঘাটে যাতায়াত করার সময় কা'ব ইবন আশরাফ নামের এক ইহুদী তাদের দিকে অশ্লীল বাক্য ছুঁড়ে দিত। এমনকি, সে মদীনা থেকে মক্কায় গিয়ে কুরাইশদের মুহাম্মদ(সা.)এর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য উত্তেজক কবিতা আবৃতি করতো। এ পর্যায়ে, মুসলিমরা তাদের এই অত্যাচার সহ্য না করতে পেরে তাদের এই আশায় হত্যা করে যে, এতে হয়তো ইহুদীরা ভীত হয়ে এ সমস্ত জঘন্য কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকবে। কিন্তু, এরপরেও ইহুদীরা তাদের এই ঘৃণা মিশ্রিত মিথ্যা অপপ্রচার ও অত্যাচার চালিয়ে যায় এবং এর মাত্রা চুড়ান্ত ভাবে বৃদ্ধি করে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনার জন্য আল্লাহর রাসুল(সা.) তাদের বিভিন্ন ভাবে সর্তক করেন এবং তারা যদি এই সমস্ত জঘন্য কার্যকলাপ থেকে বিরত না হয়, তবে তার পরিণতি কি হতে পারে সেটাও তাদের জানিয়ে দেন। কিন্তু, কোনকিছুই তাদের নিবৃত করতে পারে না। এছাড়া, আল্লাহর রাসুলের এ সর্তক বাণীকে তারা গুরুত্বের সাথেও গ্রহন করে না। বরং, তারা মুহাম্মদ(সা.) এর এ সকল উপদেশকে পুরোপুরি প্রত্যাখান করে চরম বিদ্বেষের সাথে তাঁকে বলে,"শোন হে মুহাম্মদ! তুমি বোধ হয় ভাবছো আমরা তোমারই লোক। কিন্তু, নিজেকে ভ্রান্তির মধ্যে রেখো না। যুদ্ধ সম্পর্কে কোন রকম জ্ঞান ছাড়াই তুমি শত্রুর মুকাবিলা করেছো এবং সৌভাগ্যবশতঃ ফলাফল তোমার পক্ষেই এসেছে। আল্লাহর কসম, আমরা যদি কোনদিন তোমার সাথে যুদ্ধ করি তাহলে তুমি দেখবে আমরাই প্রকৃত যোদ্ধা।"

এ পর্যায়ে আসলে আল্লাহর রাসুল(সা.)এর মদীনার ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। এরপর মুসলিমরা বনু কাইনুকা'র দূর্গ ঘেরাও করে এবং কাউকে তাদের বসতি থেকে বের হতে না দিয়ে ১৫ দিন অবরুদ্ধ করে রাখে। এমনকি অন্যান্যদের তাদের কাছে খাদ্যদ্রব্য পৌঁছে দেয়া থেকেও বিরত রাখে। এ অবস্থায় ইহুদীদের মুহাম্মদ(সা.)এর আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর ফয়সালাকে মেনে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। এরপর, রাসুল(সা.) তাঁর স্বীয় অনুগ্রহে ইহুদীদেরকে তাদের সমস্ত ধন-সম্পদ ও মালামাল নিয়ে মদীনা ত্যাগ করার অনুমতি দেন। এ ফয়সালা মেনে নিয়ে তারা মদীনা ত্যাগ করে ওয়াদী আল-কুরা নামক স্থানে কিছুদিন অবস্থান করে। তারপর, তারা মদীনার আরও উত্তরে যাত্রা করে আল-শামের সীমান্তবর্তী অঞ্চল আদরা'তে পৌঁছায়। বস্তুতঃ বনু কাইনুকা' গোত্রকে বহিস্কার করার পর মদীনার ইহুদীদের মেরুদন্ড ভেঙ্গে যায় এবং যে সমস্ত ইহুদীরা মদীনায় রয়ে যায় তারা বহিস্কৃত হবার আশঙ্কায় মুসলিমদের কর্তৃত্বের কাছে আত্মসর্মপণ করে। কিন্তু, যখন তারা পুণরায় শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে তাদের ভেতর আবারও পুরনো ঘৃণ্য অভ্যাস মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। বিশেষ করে, ওহুদের ময়দানে মুসলিমদের পরাজয়ের পর তাদের ভেতর প্রতিহিংসা আর ঘৃণার আগুন জ্বলে উঠে। আবারও তারা মুহাম্মদ(সা.)এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে আরম্ভ করে এবং এক পর্যায়ে তাঁকে হত্যা করার ঘৃণ্য চক্রান্তে লিপ্ত হয়।

আল্লাহর রাসুল(সা.) তাদের এ গোপন চক্রান্ত সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ করলেন এবং তাদের এ সব ঘৃণ্য চক্রান্তের প্রকৃত স্বরূপ উম্মোচন করার লক্ষ্যে কিছু পদক্ষেপ গ্রহন করলেন। একদিন তিনি(সা.) আবু বকর, 'ওমর এবং 'আলী সহ দশজন সাহাবাকে নিয়ে ব্যবসায়িক কাজে বনু নাযির গোত্রের বসতিতে গেলেন। আল্লাহর রাসুল(সা.)কে দেখে ইহুদীরা কৃত্রিম আনন্দ উদ্ভাসিত হলো এবং সাদরে তাঁকে বরণ করলো। কিন্তু, কিছুক্ষনের মধ্যেই তিনি(সা.) তাদের আচার-আচরনে ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেলেন। একজন ইহুদীকে তিনি(সা.) একপাশ থেকে হেঁটে যেতে দেখলেন এবং আরেক ইহুদীকে তিনি(সা.) যে বাড়ীতে বসে ছিলেন সেখানে ঢুকতে দেখলেন। বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কায় তিনি(সা.) দ্রুতবেগে সেখান থেকে উঠে গেলেন এবং এমন ভাবে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন যাতে মনে হলো তিনি(সা.) আবার কিছুক্ষন পরেই ফিরে আসবেন। এর মধ্যে শুধু একটু সময়ের জন্য থেমে তিনি(সা.) একজন সাহাবীকে বললেন, তিনি(সা.) ফিরে না আসা পর্যন্ত যেন সে এখানে অপেক্ষা করে।

রাসুল(সা.)এর আকস্মিক প্রস্থানে ইহুদীরাও দ্বিধাদন্দ্বের ভেতরে পড়ে যায়। কারণ, উপরে উপরে তারা মুসলিমদের সাথে খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ আচরন করছিল। সাহাবাগণ এখানে কিছুক্ষন অপেক্ষা করে আল্লাহর রাসুলের খোঁজে বাইরে বের হবার সিদ্ধান্ত নেন। শেষপর্যন্ত তারা রাসুল(সা.)কে মসজিদে নববীর মধ্যে খুঁজে পান এবং নবী(সা.) তাদেরকে ইহুদীদের ষড়যন্ত্রের কথা অবহিত করেন। এরপর, আল্লাহর রাসুল(সা.) মুহাম্মদ ইবন মাসলামাহকে বনু নাযির গোত্রে পাঠিয়ে ইহুদীদের মদীনা ত্যাগ করার নির্দেশ দেন। বনু নাযির গোত্রকে এ নির্দেশ বাস্তবায়িত করার জন্য দশদিন সময় দেয়া হয়েছিল অর্থাৎ, দশদিনের মধ্যে তাদের দেশ ত্যাগ করার আদেশ দেয়া হয়েছিল। দশদিন পরও তারা দেশত্যাগ না করায় রাসুল(সা.) তাদের বসতি ঘেরাও করেন। অবশেষে, বনু নাযির রণে ভঙ্গ দিয়ে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এদের মধ্যে কেউ কেউ খায়বারে বসতি স্থাপন করে। আর, বাকীরা আল-শামের আদরা' অঞ্চলে চলে যায়।

তারপর থেকে মদীনা ইহুদীদের দূর্বৃত্তপণা থেকে মোটামুটি ভাবে মুক্ত হয়ে যায়। শুধু, বনু কুরাইযা নামে একটি বৃহৎ ইহুদী গোত্র মদীনায় রয়ে যায়। কিন্তু, চুক্তি ভঙ্গের কোন কাজ না করায় আল্লাহর রাসুল(সা.) তাদের ব্যাপারে নীরব থাকেন।

কিন্তু, এ শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি আসলে খুব স্বল্প সময়ের জন্যই বিরাজ করে। কারণ, বনু কুরাইযা স্বচক্ষে বনু কাইনুকা' ও বনু নাযির গোত্রের পরিণতি দেখেছিল। এছাড়া, অবস্থানগত দিক থেকে দূর্বল থাকায় মুসলিমদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তি নিয়েও তারা ক্রমশঃ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছিল। ফলে, হুয়াই ইবন কা'ব এর নিকট হতে কুপ্রস্তাব পাবার পর তারাও দ্রুত তাদের অবস্থান পরিবর্তন করে এবং খন্দকের যুদ্ধের সময়

মুসলিমদের ধ্বংস করতে আসা শত্রুপক্ষের সাথে মিত্রতা করার যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালায়। মূলতঃ মুসলিমদের পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করার এই ষড়যন্ত্রে শরীক হয়ে তারা রাসুল(সা.)এর সাথে তাদের কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে। আবারও তারা তাদের কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করে বিশ্বাসঘাতকতার মতো ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হয়। এ কারণেই, মুহাম্মদ(সা.) সম্মিলিত শত্রুবাহিনীর হুমকী থেকে মুক্ত হওয়ার সাথে সাথেই বনু কুরাইযাকে শায়েস্তা করার সিদ্ধান্ত নেন এবং ২৫ রাত তাদের দূর্গ ঘেরাও করে রাখেন। অবরুদ্ধ অবস্থায় দূর্গ থেকে বের হতে না পেরে তারা তীব্র মানসিক যন্ত্রনায় আচ্ছন্ন হয় এবং আল্লাহতায়ালা তাদের অন্তরে ভীতি সৃষ্টি করে দেন।

এ পর্যায়ে তারা আল্লাহর রাসুল(সা.)কে খবর পাঠিয়ে বলে,"আমাদের কাছে আবু লুবাবাহ্‌কে পাঠিয়ে দিন যেন আমরা সমস্যা সমাধানে তার সাথে পরামর্শ করতে পারি।" আবু লুবাবাহ্‌ ছিল তাদের প্রাক্তন মিত্র গোত্র বনু 'আউসের প্রতিনিধি। তাকে দেখা মাত্রই তারা তার কাছে ছুটে আসে। ইহুদীদের নারী ও শিশুরা তার কাছে এসে কাঁদতে শুরু করে। তাদের কান্না দেখে আবু লুবাবাহ্‌ খুবই দুঃখিত হন। এরপর, ইহুদীরা বলে,"হে আবু লুবাবাহ্‌! তোমার কি মনে হয় আমাদের মুহাম্মদের ফয়সালা মেনে নেয়া উচিত?" আবু লুবাবাহ্‌ "হ্যাঁ," সূচক উত্তর দেয় এবং তার হাত দিয়ে গলার দিকে নির্দেশ করে ফয়সালা মেনে না নেয়ার ভয়ঙ্কর পরিণতি সম্পর্কে সর্তক করে। তারপর তিনি ফিরে আসেন। কা'ব ইবন আসাদ সমঝোতা করার জন্য কিছু প্রস্তাব দেয় কিন্তু ইহুদীরা তাও প্রত্যাখান করলে সে বলে,"তোমাদের মুহাম্মদের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই।" এরপর, ইহুদীরা মুহাম্মদ(সা.)এর খবর পাঠায় যেন, তিনি(সা.) তাদেরকে খালি হাতে শহর ত্যাগ করে আদরা' যাবার অনুমতি দেন। কিন্তু, তিনি(সা.) তা প্রত্যাখান করেন এবং তাদেরকে তাঁর ফয়সালা মেনে নেবার জন্য চাপ দিতে থাকেন।

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইহুদীরা তাদের প্রাক্তন মিত্র আউসকে বিষয়টি ফয়সালা করার অনুরোধ জানায়। আউস গোত্র আল্লাহর রাসুল(সা.)এর কাছে আসলে তিনি(সা.) তাদের বলেন,"হে আউস, তোমাদের মধ্য হতে যে কোন একজন যদি তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়, তাহলে কি তোমরা এতে সন্তুষ্ট থাকবে?" উত্তরে তারা বলে,"হ্যাঁ, আমরা তা গ্রহন করবো।" এরপর, রাসুল(সা.) বলেন,"ইহুদীদের বলে দাও তোমাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা তাকেই যেন তারা নির্বাচিত করে।"

ইহুদীরা আউস গোত্র থেকে সা'দ ইবন মু'য়াজকে বিচারক হিসাবে নির্বাচিত করে। সা'দ উভয় পক্ষ থেকে এ প্রতিজ্ঞা নেয় যে, সে যে সিদ্ধান্ত দেবে উভয়পক্ষকেই বিনা প্রতিবাদে তা মেনে নিতে হবে। দুই পক্ষই এতে সম্মত হবার পর, সা'দ বনু কুরাইযাকে তাদের অস্ত্রসস্ত্র সহ দূর্গ থেকে বের হয়ে আসার নির্দেশ দেন এবং তার সামনে তা রাখতে বলেন । ইহুদীরা তার নির্দেশ অনুযায়ী অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে আসে। তারপর, তিনি তার বিচারের রায় দিয়ে বলেন, বনু কুরাইযার পুরুষদের হত্যা করা হবে, তাদের সমস্ত সম্পদ মুসলিমদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হবে এবং তাদের নারী ও শিশুদের যুদ্ধবন্দী হিসাবে গ্রহন করা হবে। বিচারের এ রায় শোনার পর আল্লাহর রাসুল(সা.) উচ্চকণ্ঠে বলেন,"তাঁর শপথ যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, আল্লাহ এবং মুসলিমরা তোমার ফয়সালাকে গ্রহন করেছে এবং আমার পক্ষ থেকে আমি অবশ্যই তা বাস্তবায়ন করবো।" এরপর, তিনি(সা.) মদীনার বাজারে গিয়ে সেখানে বড় বড় গর্ত খোঁড়ার নির্দেশ দেন। দলে দলে ইহুদী পুরুষদের সেখানে আনা হয়। তারপর, তাদের শিরচ্ছেদ করে গর্তের ভেতর পুঁতে ফেলা হয়। তিনি(সা.) ইহুদীদের সমস্ত ধন-সম্পদ, জমি-জমা, খেজুরবাগান এবং নারী ও শিশুদেরকে মুসলিমদের মধ্যে ভাগ করে দেন। আর, নিজের জন্য এর থেকে এক পঞ্চমাংশ রাখেন। তিনি(সা.) এ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে প্রাপ্ত অর্থের কিছুটা সা'দ ইবন যায়িদ আল-আনসারীকে অস্ত্রসস্ত্র ক্রয় করার জন্য দেন। সা'দ নয্‌দে গিয়ে ঘোড়া ও অস্ত্রসস্ত্র কিনে নিয়ে আসে, যা মুসলিম সেনাবাহিনী ও তাদের অস্ত্রভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে।

এভাবেই বনু কুরাইযাকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়। কিন্তু, মদীনার আশেপাশের অন্যান্য ইহুদী গোত্রগুলো তখনো ঘাপটি মেরে ছিল। এদের মধ্যে সবচাইতে শক্তিশালী ছিল খায়বারের ইহুদী গোত্রগুলো। তারা আল্লাহর রাসুল(সা.)এর সাথে কোনরকম চুক্তি করতেও প্রস্তুত ছিল না। এছাড়া, হুদাইবিয়ার সন্ধির পূর্বে মুসলিমদের ধ্বংস করে দেয়ার লক্ষ্যে তারা গোপনে কুরাইশদের সাথে ষড়যন্ত্রও করেছিল। ফলে, তাদের স্বাধীন উপস্থিতি ইসলামী রাষ্ট্রেকে প্রতিনিয়ত করছিল হুমকীর সম্মুখীন। এজন্য, কুরাইশদের সাথে হুদাইবিয়া সন্ধি করার পরপরই আল্লাহর রাসুল(সা.) তাঁর সেনাবাহিনীকে খায়বার জয়ের প্রস্তুতি নিতে বলেন। এরপর, খায়বার জয় করার লক্ষ্যে, ১৭০০ মুজাহিদ যাত্রা আরম্ভ করে, যাদের মধ্যে ১০০ জন ছিল অশ্বারোহী। আল্লাহর সাহায্যের ব্যাপারে তারা ছিল নিশ্চিত। এরপর, মুসলিম বাহিনী খায়বারে গিয়ে ইহুদীদের দূর্গ ঘেরাও করে রাখে এবং তাদের ধ্বংস করার প্রস্তুতি নেয়। ওদিকে, দূর্গের ভেতর ইহুদীরা আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য নিজেদের মধ্যে শলা-পরামর্শ করতে থাকে। সালাম ইবন মাসকাম নামের এক ইহুদী প্রস্তাব দেয় যে, তারা তাদের নারী-শিশু ও তাদের ধন-সম্পদ আল-ওয়াতিহ্‌ ও আল-সালালিম দূর্গে নিরাপদে রেখে আসবে। আর, তাদের অস্ত্রভান্ডার লুকিয়ে রাখবে না'য়িম দূর্গে। এরপর, ইহুদী যোদ্ধারা সালাম ইবন মাসকামের নেতৃত্বে নাতাত দূর্গের অভ্যন্তরে অবস্থান নেবে।

দুইপক্ষের মধ্যে প্রথম সংঘর্ষ হয় নাতাত দূর্গের কাছে, তারপর আরম্ভ হয় ভয়াবহ আক্রমণ, আর পাল্টা আক্রমণ। বর্ণিত আছে যে, ঐ দিনের যুদ্ধে ৫০ জন মুসলিম যোদ্ধা আহত হয়েছিল। আর, ইহুদীদের নেতা সালাম ইবন মাসকাম নিহত হওয়ায় আল-হারিছ ইবন আবি যয়নাব তাদের নেতৃত্ব গ্রহন করেছিল। এক পর্যায়ে, ইহুদী নেতা আল-হারিছ প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে দৃঢ় চিত্তে মুসলিমদের মুকাবিলা করার জন্য দূর্গের বাইরে বেরিয়ে আসে, কিন্তু খাযরাজের যোদ্ধারা তাকে পিছু হটতে বাধ্য করে।

ইহুদীদের অবরুদ্ধ করে মুসলিমরা ধীরে ধীরে তাদের আক্রমণকে আরও শানিত করে। আর, অন্যদিকে ইহুদীরা তা সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করার চেষ্টা করে। এভাবে কিছুদিন পার হয়। এরপর, একদিন আল্লাহর রাসুল(সা.) আবু বকর(রা.)কে না'য়িম দূর্গ ধ্বংস করার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি বীরের মতো যুদ্ধ করেন, কিন্তু তাকে শূন্য হাতে ফিরে আসতে হয়। পরদিন, রাসুল(সা.) 'ওমর(রা.)কে একই দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। কিন্তু, তিনিও শূন্য হাতে ফিরে আসেন। সবশেষে, তিনি(সা.) 'আলী(রা.)কে ডেকে বলেন,"এই পতাকা হাতে এগিয়ে যাও যে পর্যন্ত না আল্লাহ তোমাকে বিজয় দান না করেন।" এ নির্দেশের পর 'আলী(রা.) দূর্গের দিকে রওনা হয়ে যান। দূর্গের কাছাকাছি পৌঁছানোর পর কিছু ইহুদী যোদ্ধা বের হয়ে এসে তাকে আক্রমণ করে। এক ইহুদীর আঘাতে তার হাত থেকে বর্ম পড়ে যায়। এরপর, 'আলী দূর্গের দরজা শক্ত করে ধরেন এবং এ দরজাকেই ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে যুদ্ধ করতে থাকেন। দূর্গের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস না করা পর্যন্ত তিনি দরজা ধরেই আক্রমণ চালাতে থাকেন। তারপর, তিনি দূর্গের এ দরজাকে অস্থায়ী সেতু হিসাবে ব্যবহার করে বাকী মুসলিমদের ইহুদীদের সুরক্ষিত আস্তানায় ঢোকার ব্যবস্থা করে দেন।

না'য়িম দূর্গকে নিজেদের কব্জায় আনার পরপরই মুসলিমরা ইহুদীদের অন্যান্য দূর্গগুলো আক্রমণ করতে আরম্ভ করে এবং একটার পর একটা দূর্গ ধ্বংস করে নিজেদের নিয়ন্ত্রনে নিয়ে আসে। শেষপর্যন্ত, তারা আল-ওয়াতিহ্ এবং আল-সালালিম দূর্গকে আক্রমণ করতে এগিয়ে যায়। এ পর্যায়ে, ইহুদীরা বিজয়ের আশা একেবারেই ছেড়ে দিয়ে মুসলিমদের কাছে আত্মসর্মপণ করে। তারা শান্তিচুক্তির বিনিময়ে মুহাম্মদ(সা.)এর কাছে তাদের জীবন ভিক্ষা করে। আল্লাহর রাসুল(সা.) তাদের এ প্রস্তাব মেনে নিয়ে তাদেরকে খায়বারে বসবাস করার অনুমতি দেয়। তবে, যুদ্ধের নীতিমালা অনুযায়ী ইহুদীদের সমস্ত সম্পদ মুসলিমদের অধিকারে চলে আসে। আল্লাহর রাসুল(সা.) তাদের এ শর্তে খায়বারে বসবাস করার অনুমতি দেয় যে, এখানকার সমস্ত ভূমিতে উৎপাদিত ফলমূল ও শষ্যের অর্ধেক তারা মুসলিমদের দেবে আর বাকী অর্ধেক তারা মজুরী হিসাবে রেখে দেবে। এভাবে, খায়বারে ইসলামী রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠিত হয়। এদিকে, ফাদাকের ইহুদীরা খায়বারের ইহুদীদের আত্মসর্মপণের কথা জানতে পেরে প্রাণভয়ে তাদের উৎপাদিত অর্ধেক ফসলের বিনিময়ে মুসলিমদের সাথে শান্তিচুক্তি করে। এরপর, আল্লাহর রাসুল(সা.) ওয়াদি আল-কুরা হয়ে মদীনায় ফিরে আসার প্রস্তুতি নেন। মুসলিম বাহিনীর প্রত্যাবর্তন কালে কোন রকম যুদ্ধ ছাড়াই তায়মা'র ইহুদীরা মুসলিমদের জিযিয়া দিতে সম্মত হয় এবং তাদের আধিপত্য মেনে নেয়।

এ সমস্ত ঘটনার ফলশ্রুতিতে, সমস্ত আরব উপদ্বীপে ইহুদীদের শাসন-কর্তৃত্ব একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আর, এভাবেই আল্লাহর রাসুল(সা.) সমগ্র আরবে তাঁর শাসন-কর্তৃত্ব বিস্তৃত করে ইসলামী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীন নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করেন।

## ইসলামী রাষ্ট্রের ধারাবাহিকতাঃ

আল্লাহর রাসুল(সা.)এর ইন্তেকালের পর সাহাবাগণ সর্বসম্মতিক্রমে রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে রাসুল(সা.)এর স্থলে একজন খলিফা নিয়োগ করে তাকে বাই'য়াত দেবার সিদ্ধান্ত নেন। এ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে, মুসলিমরা ১৩৪২ হিজরী বা ১৯২৪ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে খলিফা নিয়োগ করে। তবে, তারা নিযুক্ত খলিফাকে আমির আল-মু'মিনীন (মুমিনদের নেতা) কিংবা সাধারন ভাবে ইমাম বলেও সম্বোধন করত।

ইসলামের ইতিহাসে বাই'য়াত গ্রহন ছাড়া কখনো কেউ খলিফা হয়নি। ইসলামী রাষ্ট্র এই নিয়মের ধারাবাহিকতা তার অস্তিত্ব টিকে থাকার শেষ দিন পর্যন্ত রক্ষা করেছে। তবে, বাই'য়াতের প্রয়োগ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে খলিফাকে সরাসরি বাই'য়াত দেয়া হয়েছে। কোন সময় খলিফাগণ তাদের আত্মীয়-স্বজনের বাইরে অন্য কাউকে খলিফা হিসাবে মনোনীত করেছেন। কেউ কেউ আবার স্বীয় পুত্র বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মনোনীত করেছেন। আর, অন্যরা তাদের পরিবারের মধ্য হতে একাধিক সদস্যকে খলিফা হিসাবে মনোনয়ন দিয়ে গেছেন। কিন্তু, এই মনোনয়ন কখনোই খলিফা হবার জন্য যথেষ্ট ছিল না। বরঞ্চ, খলিফার দায়িত্ব বুঝে নেবার আগে তাকে অবশ্যই মুসলিমদের পক্ষ হতে বাই'য়াত গ্রহন করতে হয়েছে। বাই'য়াত ছাড়া কোন খলিফাকেই কখনো এ পদের দায়িত্ব দেয়া হয় নাই। বাই'য়াত গ্রহনের পদ্ধতিও সবসময় একরকম ছিল না। কখনো আহল্ আল-হাল ওয়াল 'আকদ্ (সমাজের সম্মানিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ) এর কাছ থেকে বাই'য়াত গ্রহন করা হয়েছে। কখনো আবার জনসাধারনের কাছ থেকেও বাই'য়াত নেয়া হয়েছে। আবার, কোন কোন ক্ষেত্রে শাইখ আল-ইসলাম (প্রসিদ্ধ 'আলিম) এর কাছ থেকে বাই'য়াত গ্রহন করা হয়েছে। তবে, কিছু নির্দিষ্ট সময়ে বাই'য়াত গ্রহন পদ্ধতির অপব্যবহার হয়েছে। কিন্তু, তারপরেও এই বাই'য়াত গ্রহন পদ্ধতি সবসময়ই কার্যকর ছিল এবং বাই'য়াত ব্যতীত কেউ কখনো উত্তরাধিকার সূত্রে খিলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রধান বা খলিফা হিসাবে দায়িত্ব গ্রহন করেনি।

প্রত্যেক খলিফাই তার সাহায্যকারী হিসাবে একাধিক সহকারী নিযুক্ত করেছেন, যাদের ইতিহাসে কিছু সময় পর্যন্ত ওয়াজির (সহকারী) বলা হত। এছাড়া, খলিফাগণ বিভিন্ন প্রদেশের গর্ভনর, প্রধান বিচারপতি, সেনাবাহিনী প্রধান এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিটি বিভাগের বিভাগীয় প্রধানকে নিযুক্ত করতেন। ইসলামী রাষ্ট্রের কাঠামো সবসময়ই এই রকমই ছিল। সাম্রাজ্যবাদী কাফিররা 'উসমানী খিলাফত ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে ইসলামী রাষ্ট্রকে ভেঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে পরিণত করার পূর্ব পর্যন্ত এ রাষ্ট্রের কাঠামো কখনো পরিবর্তিতও হয়নি।

ইতিহাসের পুরোটা সময় জুড়েই ইসলামী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে নানারকম ঘটনার অবতারণা হয়েছিল। তবে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এ ঘটনাগুলো বাইরের শক্তি বা কারণ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত ছিল না। বস্তুতঃ এ ঘটনাগুলো ছিল তৎকালীন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ইসলামের ব্যাখ্যা নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির ফলাফল। পরবর্তী সময়ে যারা এ ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করেছে তারা তাদের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা অনুযায়ী এ প্রেক্ষাপটকে ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে। মূলতঃ ইসলামের ব্যাখ্যা নিয়ে যাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে, তাদের প্রত্যেকে ইসলামের আলোকেই তৎকালীন পরিস্থিতিকে নিজস্ব মতামত অনুযায়ী ব্যাখ্যা করেছে। কিন্তু, তারপরও তাদের এ বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা ছিল ইসলামিক।

এই মতভেদগুলো আসলে একজন ব্যক্তি হিসাবে খলিফার সাথে সম্পর্কিত ছিল, খলিফার পদ বা দায়িত্বের সাথে সম্পর্কিত ছিল না। উদাহরন স্বরুপ বলা যায়, মতপার্থক্য ছিল কে খলিফা হবে সে বিষয়ে, কিন্তু শাসন-ব্যবস্থার কাঠামো নিয়ে কোন মতপার্থক্য ছিল না। মতপার্থক্য সবসময়ই সীমাবদ্ধ ছিল কিছু ক্ষুদ্র বিষয়ের মধ্যে। ফলে, শাসন-ব্যবস্থার ভিত্তি বা মূলনীতির সাথে এর কোন সম্পর্ক ছিল না। কোরআন ও সুন্নাহ যে শাসন-ব্যবস্থার মূলভিত্তি হবে, এ বিষয়ে মুসলিমদের মধ্যে কখনো মতভেদ হয়নি। মতপার্থক্য হয়েছিল কোরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যায়। একই ভাবে, একজন খলিফাকে যে মুসলিম উম্মাহ্‌র নেতা হিসাবে নিযুক্ত করতে হবে, এ বিষয়েও মুসলিমদের মধ্যে কখনো মতভেদ হয়নি। কিন্তু, কে খলিফা হিসাবে নিযুক্ত হবে তা নিয়ে মতভেদ হয়েছিল। এছাড়া, মুসলিমরা সবসময়ই এ ব্যাপারে একমত ছিল যে, দ্বীন-ইসলামকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং ইসলামের আলোকিত আহবানকে সমস্ত পৃথিবী ব্যাপী ছড়িয়ে দিতে হবে। আল্লাহর হুকুম-আহকামকে বাস্তবায়িত করতে হবে এবং মানুষকে দ্বীন-ইসলামের দিকে আহবান করতে হবে, এ ভিত্তির উপরই সকল খলিফা শাসনকার্য পরিচালনা করতো । এদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য ইসলামকে ভুল ভাবে বোঝার কারণে ইসলামের আইন-কানুনের ভুল প্রয়োগ করেছিল। আর কেউ কেউ ইচ্ছাকৃত ভাবেই এসব আইন-কানুনের অপব্যবহার করেছিল। কিন্তু, সবকিছুর পরেও তারা সকলেই শুধু ইসলামকেই বাস্তবায়ন করেছিল। তাদের সকলেই ইসলামের ভিত্তিতে এবং ইসলামের আহবান সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তৃত করার উদ্দেশ্যেই অন্যান্য দেশ, জাতি ও মানুষের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখেছিল।

এজন্যই, বিভিন্ন বিষয়ে মুসলিমদের মধ্যে এই আভ্যন্তরীন মতপার্থক্য কখনো ইসলামের জয়যাত্রাকে স্তব্ধ করতে পারেনি, কিংবা পারেনি ইসলামের বিস্তার রোধে কার্যকরী কোন ভূমিকা রাখতে। বরঞ্চ, প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে ১১'শ হিজরী (১৭'শ খ্রীষ্টাব্দ) পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্র কোরআনের আলোকিত আহবানকে পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত করতে একের পর এক অঞ্চল জয় করেছে। ইসলামের পতাকাতলে এসেছে পারস্য, ভারতবর্ষ ও ককেশিয়া (রাশিয়ার একটি অংশ)। পূর্বে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা চীন, রাশিয়া এবং কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। এছাড়া, ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে এসেছে পশ্চিমে মিশর, উত্তর আফ্রিকা, আন্দালুস (স্পেন) এবং উত্তরে শামের সমগ্র অঞ্চল। একই সাথে আনাদ্‌হউল (তুরস্ক), বলকান, দক্ষিন ও পূর্ব ইউরোপ জয় করে এ রাষ্ট্রের সীমানা পৌঁছে গেছে ব্ল্যাক সী পর্যন্ত। ইসলামী রাষ্ট্র আরও জয় করেছে আল-ক্বারাম (ক্রাইমিন উপদ্বীপ) এবং ইউক্রেনের দক্ষিনাঞ্চল। বিস্তীর্ণ ভূমিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করবার পর এ রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী পৌঁছেছে একেবারে ভিয়েনার দরজা পর্যন্ত। বস্তুতঃ মানসিক দূর্বলতা উম্মাহর ভেতর শেকড় গেঁড়ে না বসা পর্যন্ত এবং ইসলামের অপব্যাখ্যা তীব্র আকারে প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত, শক্তিশালী মুসলিম বাহিনী না কোনদিন দেশ জয় করা বন্ধ করেছে, আর না ইসলামের আহবানকে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত করা থেকে বিরত থেকেছে। এরপর, ইসলামী রাষ্ট্র দ্রুত অধঃপতনের দিকে চলে যায়। এমনকি ইসলাম বর্হিভূত জীবনব্যবস্থা থেকে প্রাপ্ত আইন-কানুনকেও শরীয়াহ্‌ আইনের সাথে সাংঘর্ষিক নয় ভেবে স্বীকৃতি দেয় এবং শেষপর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যায়।

আসলে, ইসলামী রাষ্ট্রের উন্নতি ও সমৃদ্ধির রহস্য নিহিত ছিল এ রাষ্ট্রের বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তিসামর্থ্য, এর সৃজনশীলতা এবং ইজতিহাদ ও কিয়াস (যৌক্তিক তুলনামূলক ব্যাখ্যার মাধ্যমে ইসলামী শরীয়াহ'র মূল উৎস থেকে হুকুম বের করা) করার ক্ষমতার উপর। হিজরী প্রথম শতাব্দীতে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জয় করার পর ইসলামী রাষ্ট্র যখন ব্যাপক ভাবে বিস্তৃত হল, তখন অধিকৃত এলাকাগুলোতে উদ্ভুত নতুন নতুন সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে ইজতিহাদ এক নতুন মাত্রা লাভ করেছিল। নতুন নতুন বিষয়ে শরীয়াহ্‌ আইনের বাস্তবায়ন মূলতঃ পারস্য, ইরাক, আল-শাম, মিশর, স্পেন, ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের ইসলামে গ্রহনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আর, তৎকালীন এই পরিস্থিতি মুসলিমদের কৃত ইজতিহাদের গ্রহনযোগ্যতা ও নতুন সমস্যা সমাধানে তাদের সৃজনশীলতাকেও নিশ্চিত করেছিল। হিজরী পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত এ অবস্থা বিরাজমান থাকে। তারপর, কাঠামোগত ভাবে যখন ইসলামী রাষ্ট্র দূর্বল হতে থাকে, সেইসাথে মুসলিমদের সৃজনশীলতা ও ইজতিহাদ করার ক্ষমতাও ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়।

এর মধ্যে আবার সংঘটিত হয় ক্রুসেড এবং বিজয়ী শক্তি হিসাবে পূণরায় আর্বিভূত না হওয়া পর্যন্ত এ ক্রুসেড মুসলিমদের মনমগজ আচ্ছন্ন করে রাখে। এরপরে আসে মামলুকদের রাজত্বকাল। তারা ইসলামী রাষ্ট্রের চালকের আসনে বসে ঠিকই, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়গুলো খুবই কম গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। ফলে, মুসলিমদের বুদ্ধিবৃত্তিক অন্ধত্ব আরও বিস্তৃত হয় এবং রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা অসারতার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এরপর, তাতারদের ধ্বংসাত্মক আগ্রাসনের ফলে মুসলিমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তাতার বাহিনী কর্তৃক বিপুল সংখ্যক বই-পুস্তক টাইগ্রীস নদীতে নিক্ষিপ্ত হওয়া এবং তাদের হাতে উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত বিশাল জ্ঞানভান্ডার ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ার ঘটনা বুদ্ধিবৃত্তিক শূণ্যতাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। আর, এ সমস্ত কারণ থেকে উৎসরিত গভীর বুদ্ধিবৃত্তিক শূণ্যতাই মূলতঃ ইজতিহাদের পথকে

অবরুদ্ধ করে। ফলে, নতুন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে যখন সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হয়, তখন ইজতিহাদের পরিবর্তে শুধু ফতোয়া জারি করা কিংবা কোরআন ও সুন্নাহ'র বিকৃত ও অপব্যাখ্যার মধ্যেই বিষয়টি সীমাবদ্ধ থাকে।

এ সমস্ত ঘটনার ফলশ্রুতিতে, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে ইসলামী রাষ্ট্র পতনোম্মুখ অবস্থার সম্মুখীন হয়। এ পর্যায়ে আসে 'উসমানী খিলাফতের যুগ। ক্ষমতায় আরোহন করার পর তারা সামরিক বাহিনীর শক্তিসামর্থ্য বৃদ্ধির দিকে মনোযোগী হয় এবং ইস্তাম্বুল (কন্সট্যান্টিনোপল) ও বলকান অঞ্চল জয় করে নেয়। ইসলামী রাষ্ট্রকে আবারও নেতৃত্বের আসনে বসিয়ে তারা দর্শনীয় ভাবে ইউরোপ তছ্নছ্ করে দেয়। কিন্তু, এ সব কোনকিছুই মুসলিমদের বুদ্ধিবৃত্তিক ভাবে পূণঃজাগরিত করতে পারে না। আসলে,'উসমানী খিলাফতের সময়ে মুসলিমদের সামরিক বাহিনীর শক্তিসামর্থ্য বৃদ্ধি হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তা বুদ্ধিবৃত্তিক পূণঃজাগরনের ভিত্তিতে হয়নি। ফলে, ইসলামী রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর এই দূর্দান্ত প্রতাপ সময়ের সাথে বুদ্‌বুদের মতো মিলিয়ে যেতে থাকে এবং একসময় সম্পূর্ন ভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিন্তু, এ সকল সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও 'উসমানী খিলাফত সাফল্যের সাথে দ্বীন ইসলামকে বিস্তৃত করেছিল। আর, বিভিন্ন অঞ্চলে বহন করেছিল ইসলামের আলোকিত আহবান। বিজিত এ সব অঞ্চলের অধিবাসীরা একসময় ইসলামও গ্রহন করেছিল। এ অঞ্চলে বর্তমানে লক্ষ লক্ষ মুসলিমের উপস্থিতির কৃতিত্ব অনেকটাই 'উসমানী খলিফাদের।

নিম্নলিখিত কারণ দুটি কিছু খলিফা ও গর্ভনরকে এমন ভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে সহায়তা করেছে, যা ইসলামী রাষ্ট্রের ঐক্যবদ্ধ শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তিকে ক্রমশ দূর্বল করেছে।

১. ইসলামী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ধরনের মতামতের উপস্থিতি বিরাজ করা। (শরীয়াহ্ প্রদত্ত হুকুমের ব্যাপারে)

২. রাজনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে, খলিফাগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট কিছু হুকুম-আহকামকে গ্রহন করার ক্ষেত্রে গাফিলতি করা, যদিও অন্যান্য ক্ষেত্রে, যেমন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু হুকুম-আহকামকে গ্রহন করা হয়েছিল।

কিন্তু, এ সকল কারণও আসলে এ রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে বিপন্ন করার জন্য যথেষ্ট ছিল না। উদাহরন স্বরূপ বলা যায়, গর্ভণরদের সাধারন ভাবে কিছু শাসন-ক্ষমতা ছিল এবং এই ক্ষমতা ছিল ব্যাপক। এ ক্ষমতাবলেই তারা খলিফার প্রতিনিধি বা সহকারী হিসাবে বিভিন্ন বিষয়ে স্বাধীন ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারতো। ব্যাপক এ শাসন-ক্ষমতার অধিকারী হয়ে কিছু কিছু গর্ভণর একসময় নিজেদের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ভাবতে শুরু করে এবং স্বাধীন ও স্বায়ত্বশাসিত ভূ-খন্ডের শাসকের মতো আচরন করতে থাকে। খলিফার প্রতি তাদের আনুগত্য শুধু খলিফাকে বাই'আত প্রদান করা, জু'মার নামাজে তার জন্য দোয়া করা, মুদ্রাতে তার নাম ব্যবহার করা সহ অন্যান্য ছোটখাট বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু, তাদের অধীনস্ত অঞ্চলের শাসন-কর্তৃত্ব পুরোপুরি ভাবেই তাদের কাছে চলে যায়। ফলে, ইসলামী রাষ্ট্রের এই প্রদেশগুলো কার্যত স্বায়ত্বশাসিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়। উদাহরন স্বরূপ, হামদানিইন, সালযুক এবং অন্যান্য শাসনামলের কথা বলা যায়। কিন্তু, ওয়ালী বা গর্ভণরদের এই ব্যাপক ক্ষমতার কারণেও আসলে ইসলামের বিশাল রাষ্ট্র খন্ড খন্ড হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র তৈরী হয়নি।

যেমন, মিশরের গর্ভণর হিসাবে নিযুক্ত 'আমর ইবন আল-'আসও ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। একই ভাবে, মু'য়ায়িয়া ইবন আবু সুফিয়ানও শামের বিশাল অঞ্চলের গর্ভণর ছিলেন। কিন্তু, তা সত্ত্বেও, এই গর্ভণররা কখনোই নিজেদের খিলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করেননি। কিন্তু, পরবর্তী সময়ে যখন রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে খলিফাদের দূর্বলতা প্রকাশ হতে থাকে, তখন গর্ভণরদের ভেতর প্রদেশগুলোকে স্বাধীন ও স্বায়ত্বশাসিত রাষ্ট্র হিসাবে শাসন করার এই ধারা ধীরে ধীরে শেঁকড় গড়ে বসে। ফলে, উলাইয়াহ্ বা প্রদেশগুলো বিশাল ইসলামী রাষ্ট্রের অংশ হিসাবে একক সরকার-ব্যবস্থার অধীনে থাকা সত্ত্বেও ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্রের মতো আচরণ করতে থাকে।

কিন্তু, এ সবকিছু সত্ত্বেও ইসলামী রাষ্ট্র অবিভক্ত ছিল। একক রাষ্ট্র হিসাবে এর ঐক্য ছিল অটুট, যেখানে খলিফাগণ সবসময়ই ওয়ালী বা গর্ভণরকে নিযুক্ত করতেন কিংবা পদচ্যুত করতেন। আর, গর্ভণররা যতো ক্ষমতার অধিকারীই হোক না কেন, তারাও কখনো নিজেদের খলিফার শাসন-কর্তৃত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করার দুঃসাহস দেখায়নি। বাস্তবতা হলো, ইসলামী রাষ্ট্র ইতিহাসের কোন সময়েই বিভিন্ন প্রদেশের সমন্বয়ে গঠিত কনফেডারেশন ছিল না, এমনকি যখন গর্ভণররা শাসন-কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে চুড়ান্ত স্বাধীনতা উপভোগ করেছে তখনো না। এটা সবসময়ই ছিল একটি একক রাষ্ট্র, যার প্রধান ছিলেন একজন খলিফা। সমস্ত রাষ্ট্রের উপর তারই ছিল সর্বময় ক্ষমতা। এমনকি, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থ ছোট ছোট গ্রামেও খলিফার কর্তৃত্বই বিরাজমান ছিল।

এছাড়া, স্পেনে খিলাফত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং মিশরে ফাতিমিদ রাষ্ট্র জন্মের বিষয়গুলো ছিল অন্য ধরনের সমস্যা। এগুলো ঠিক স্বায়িত্বশাসিত গর্ভণরদের তৈরী করা সমস্যার মতো ছিল না। স্পেনের গর্ভণররা তাদের অধীনস্ত প্রদেশের (উলাইয়াহ্) উপর সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিল, আর সেই সাথে তাদের শাসিত প্রদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষনাও দিয়েছিল। কিন্তু, এই গর্ভণরদেরকে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ কখনো খলিফা হিসাবে বাই'আত দেয়নি। পরবর্তী সময়ে, এই গর্ভণররা নিজেদের উক্ত প্রদেশে বসবাসকারী মুসলিমদের খলিফা হিসাবে ঘোষনাও দিয়েছিল।

কিন্তু, সমগ্র মুসলিম উম্মাহ'র খলিফা হিসাবে স্বীকৃতি তারা কখনোই পায়নি। বস্তুতঃ তখনো, সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্‌র খলিফা একজনই ছিল। আর, শাসন-কর্তৃত্বও ছিল তার হাতেই। স্পেনের উলাইয়াহ্‌কেও (প্রদেশ) সেই সময় আলাদা একটি উলাইয়াহ্ বা প্রদেশ হিসাবেই স্বীকৃতি দেয়া হতো, শুধু এই প্রদেশটি খিলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থা বা খলিফার অধীনে ছিল না। 'উসমানী শাসনামলে ইরানের ক্ষেত্রে একই ব্যাপার ঘটেছিল। ইরানে কোন খলিফা ছিল না, কিন্তু, উলাইয়াহ্ বা প্রদেশ হিসাবে ইরান আবার খলিফার কর্তৃত্বের অধীনেও ছিল না। আর, ফাতিমিদদের রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল ইসমাইলীদের দ্বারা, যারা প্রকৃত অর্থে ছিল ইসলাম বর্হিভূত সম্প্রদায়।

সুতরাং, ইসলামের দৃষ্টিতে ফাতিমিদদের কর্মকান্ডের কোন আইনগত বৈধতা নেই এবং তাদের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রও ইসলামী রাষ্ট্র হিসাবে বিবেচিত হবার পক্ষে কোন যুক্তি নেই। আব্বাসীয় খিলাফতের পাশাপাশি তাদের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকে তাই কোনভাবেই একের অধিক খিলাফত রাষ্ট্র হিসাবে বিবেচনা করা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ, ফাতিমিদরা পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় হওয়ায় শরীয়াহ্ আইনের দৃষ্টিতে তাদের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের বৈধতা ছিল না। আসলে, এই সম্প্রদায়টি গোপন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রকে এমন ভাবে পরিবর্তন করতে চেয়েছিল, যেন তাদের ভ্রান্ত মতাদর্শ দ্বারাই ইসলামী রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু, তাদের সে চেষ্টা সফল হয়নি। এরপরেও ইসলামী রাষ্ট্র অবিভক্ত থেকে এর একতা বজায় রেখেছে। যদিও বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন মতালম্বী সম্প্রদায় তাদের ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে এর শাসন-কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কার্যত, এই সব অপচেষ্টা ইসলামী রাষ্ট্রকে কখনো খন্ড-বিখন্ড করে বহুসংখ্যক রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারেনি।

এভাবেই ভিন্ন মতালম্বীদের সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে ইতিহাসে ইসলামী রাষ্ট্র অবিভক্ত থাকে। যদিও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে চেয়েছিলো এবং মূলতঃ এ অভিলাষ থেকেই তারা ক্ষমতা দখলের প্রয়াস চালিয়েছিল, কিন্তু, শেষ পর্যন্ত এ সমস্ত প্রতিকুল পরিস্থিতির মোকাবিলা করে ইসলামী রাষ্ট্র একটি অবিভক্ত একক রাষ্ট্র হিসাবেই টিকে ছিলো। ইসলামী রাষ্ট্রের অবিভক্ততা এবং একটি একক অভিন্ন রাষ্ট্র হিসাবে টিকে থাকার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো, বিভিন্ন উলাইয়াহ্‌তে বিভিন্ন ধরনের শাসন অবস্থা বিরাজ করা সত্ত্বেও যে কোন মুসলিম কোন রকম বাঁধা বিপত্তি বা প্রশ্ন ছাড়াই পূর্ব থেকে পশ্চিমে অবিভক্ত ইসলামী রাষ্ট্রের এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ভ্রমন করতে পারতো। সমস্ত সাম্রাজ্যের কোথাও তাদের পরিচয় সম্পর্কে কোনরকম প্রশ্ন করা হতো না।

এভাবেই ইসলামী রাষ্ট্র সমস্ত মুসলিম উম্মাহকে একটি মাত্র অভিন্ন ব্যবস্থার নীচে ঐক্যবদ্ধ রেখেছিলো এবং ইতিহাসে এর ধারাবাহিকতাও বজায় ছিলো। পশ্চিমা কাফির সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ১৯২৪ সালে তাদের এজেন্ট মুস্তফা কামালের হাতে এ রাষ্ট্র ধ্বংস করে দেবার পূর্ব পর্যন্ত এ রাষ্ট্র ছিলো শক্তিশালী ও সমৃদ্ধশালী।

## ইসলামী রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন নীতিমালাঃ

ইসলামী রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন নীতিমালা বলতে মূলতঃ বুঝায় রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ইসলামের হুকুম-আহ্‌কামকে বাস্তবায়িত করা। আল্লাহ্ প্রদত্ত এ সমস্ত হুকুম-আহ্‌কামকে ইসলামী রাষ্ট্র এর নিজস্ব ব্যবস্থার অধীনেই বাস্তবায়িত করতো। এ রাষ্ট্র জনগণের মাঝে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক ও লেনদেন নির্ধারন ও দেখাশুনা করা, হুদুদ ও আল্লাহ্ প্রদত্ত শাস্তি সমূহ বাস্তবায়ন করা, সমাজের সর্বস্তরে উচ্চ মানের মূল্যবোধ বজায় রাখা, সমাজে ইসলামের বিভিন্ন রীতি-নীতি ও ইবাদতকে নিশ্চিত করা এবং সেইসাথে ইসলামী আইন-কানুনের ভিত্তিতে জনগণের সমস্ত বিষয়াদির তদারকি করতো। বস্তুতঃ ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে বসবাসরত মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের উপর আল্লাহ্ প্রদত্ত হুকুম-আহ্‌কামকে কিভাবে প্রয়োগ করা হবে ইসলামে তার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি নির্ধারিত রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র এ নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করেই এ সমস্ত হুকুম-আহ্‌কামকে জনগণের উপর প্রয়োগ করতো। এ পদ্ধতি হুকুম শরীয়া'হ্ এবং নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য নির্ধারিত আহ্‌কামের সাথে সম্পর্কিত। কারণ, ইসলাম এসেছে সমগ্র মানবজাতির জন্য। আল্লাহ্‌তায়ালা পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে সমগ্র মানবজাতিকে ইসলামের দিকে আহবান করেছেন। যেমন, তিনি বলেছেন,

> *Ò‡n gvbe RwZ! †Zvgiv †Zvgv‡`i †mB i‡ei `vmZ K‡iv whwb †Zvgv‡`i I †Zvgv‡`i ceeZx‡`i mwó K‡i‡Qb, Avkv Kiv hvq †h, তোমরা মুত্তাকী (আল্লাহ্‌ভীরু) হতে পারবে।"* [সুরাঃ বাকারাহ্, ২১]

তিনি আরও বলেছেন,

> *Ò‡n gvbI! wK †Zvgv‡K †Zvgvi gnvb cwZcvjK n‡Z cZwiZ Ki‡jv?Ó* [আল-ইনফিতরঃ ৬]

উসুল উল-ফিকহ্ (শরীয়াহ্‌র মূল উৎস) বিষয়ে পন্ডিত ব্যক্তিবর্গ বলেছেন যে, ইসলামী শরীয়া'হ্ আসলে এ পৃথিবীর প্রতিটি সুস্থ জ্ঞানসম্পন্ন মানুষকে উদ্দেশ্য করেই নাযিল করা হয়েছে। হোক সে মুসলিম অথবা অমুসলিম। ইমাম গাজ্জালী তার *ÒAvj g¯vdv wd Avj-Dmjó* বইতে

বলেন, "শরীয়া'হ্ আইন দিয়ে শাসিত ব্যক্তিকে আইন অনুযায়ী অবশ্যই একজন দায়িত্বশীল, সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন ও আইনপ্রণেতার (আল্লাহতায়ালা) আহবান বোঝার যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে। (বস্তুতঃ) যে সকল গুনাবলীর জন্য একজন মানুষের উপর আল্লাহ'র হুকুম ফরজ হয়ে যায় তা হলো, তার এমন স্বভাবসুলভ মানবপ্রকৃতি যা দিয়ে সে আল্লাহ্'র আদেশ-নিষেধকে (পুরোপুরি) গ্রহন করতে ও মেনে চলতে পারে।"

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ইসলাম আসলে সমস্ত মানবজাতিকেই আহবান করেছে। এ আহবান ইসলামের দিকে সমস্ত মানবজাতির উপর সাধারণ আহবান ও দায়িত্ব হিসাবে আরোপিত হয়েছে। সাধারণ আহবানের মাধ্যমে প্রথমে সমস্ত মানুষকে ইসলামে প্রবেশ করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। পরবর্তীতে সমস্ত মানুষকে আল্লাহ্ প্রদত্ত সমস্ত হুকুম-আহ্কামের কাছে আত্মসর্মপণ করতে আদেশ দেয়া হয়েছে। আর, যারা নাগরিক হিসাবে রাষ্ট্রের অধীনে বসবাস করে, ইসলামী রাষ্ট্র তাদের দল, মত, বিশ্বাস কিংবা সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলকে একটি দলবদ্ধ মানুষ হিসাবে বিবেচনা করে এবং সকলকে ইসলামী আইন-কানুন দিয়েই শাসন করে। প্রয়োজন হয় শুধু জনগণের ইসলামী রাষ্ট্র ও শাসন-ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলে এ রাষ্ট্রে কোনকিছু নেই। কারণ, এখানে সমস্ত মানুষকেই সাধারণ মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে দেখা হয় এবং এদের প্রত্যেককেই ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যতোক্ষন পর্যন্ত তারা অর্পিত নাগরিক দায়িত্ব-কর্তব্য মেনে চলে। রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে রাষ্ট্রে বসবাসরত প্রত্যেক ব্যক্তিই শরীয়া'হ্ প্রদত্ত পূর্ণ নাগরিক অধিকার ভোগ করে, সে মুসলিমই হোক বা অমুসলিম হোক। আবার, মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও যদি কেউ ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক না হয়, তবে শরীয়া'হ্ প্রদত্ত নাগরিক অধিকার তাকে প্রদান করা হবে না। ধরা যাক, (ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত) কোন মুসলিম ব্যক্তির মা খ্রিষ্টান এবং ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক। আর, তার বাবা মুসলিম কিন্তু তার ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব নেই। সেক্ষেত্রে, সে ব্যক্তির মা সন্তানের কাছ থেকে ভরণপোষণ পাবার অধিকারী হবে, কিন্তু বাবা নয়। মা যদি বিচারকের কাছে ভরণপোষণের ব্যাপারে অভিযোগ করে, তবে বিচারক তার পক্ষে রায় দেবে এবং সন্তানকে মায়ের ভরণপোষণ দিতে বাধ্য করবে, কারণ এক্ষেত্রে উক্ত মহিলা ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে বিবেচিত হবে। কিন্তু, যদি সে ব্যক্তির বাবা অভিযোগ উত্থাপন করে, তবে বিচারক তার বিপক্ষে রায় প্রদান করবে। কারণ, সে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক বলে বিবেচিত হবে না। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, শরীয়া'হ্ শুধু ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের উপরই ইসলামী হুকুম-আহ্কাম বাস্তবায়িত করে এবং এক্ষেত্রে রাষ্ট্রে বসবাসরত সকল মানুষকে সাধারণ ভাবে রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যার কারণে, তারা সকলেই নাগরিক হিসাবে শরীয়া'হ্ প্রদত্ত অভিভাবকত্ব বিষয়ক কিংবা কল্যাণমূলক সকল অধিকার ভোগ করে থাকে।

এটা হচ্ছে শাসন ও অভিভাবকত্বের দৃষ্টিকোন থেকে নাগরিকের অবস্থান সম্পর্কিত বিষয়। আর, ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলামী হুকুম-আহ্কাম বাস্ত বায়নের বিষয়টি কখনও ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে বিবেচিত হয় না, বরং তা সর্ম্পূণ ভাবে আইনগত দৃষ্টিকোন থেকে দেখা হয় । তাই কোরআন-সুন্নাহ'র দলিলগুলোকে অবশ্যই আইনগত দৃষ্টিকোন থেকে দেখতে হবে এর কারণ হচ্ছে, শরীয়া'হ্ সম্পর্কিত দলিলগুলোর মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের সমস্যার সমাধান করা। এক্ষেত্রে, আইনপ্রণেতা (আল্লাহ্তায়ালা)'র উদ্দেশ্য হলো মানুষ যেন শুধু আয়াতগুলোর বাহ্যিক অর্থের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে আয়াতগুলোর অর্থ ও বিষয়বস্তুকে পরিপূর্ণ ও যথাযথ ভাবে অনুধাবন করে। এজন্য, হুকুম শরীয়া'র উপর ভিত্তি করে যে কোন আইন তৈরী করার ক্ষেত্রে সবসময়ই শরীয়া'হ্ প্রদত্ত হুকুমের পেছনের কারণ(ইল্লাহ্)কেও বিবেচনা করা হয়। অন্য কথায় বলা যায় যে, হুকুম শরীয়া'হ্ ভিত্তিক কোন সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে সবসময়ই কোরআন–সুন্নাহ্র দলিলের আইনগত বিষয়টিকেই প্রধান্য দেয়া হয়। যখন খলিফা (রাষ্ট্র প্রধান) এই সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে গ্রহন করে, তখন রাষ্ট্রে সেটা আইনে পরিণত হয় এবং সকলের জন্য সেই আইন মেনে চলা ও তা প্রয়োগ করা কর্তব্য হয়ে যায়।

সুতরাং, ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে বসবাসরত সকল নাগরিকের জন্য শরীয়া'হ্ আইনের কাছে আত্মসর্মপণ করার বিষয়টি প্রমাণিত ও অপরিবর্তনীয়। আসলে, শরীয়া'হ্ আইনের কাছে আত্মসর্মপণের বিষয়টি মুসলিমদের বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত বিষয়। কারণ, এ ব্যাপারে তারা আল্লাহ্তায়ালা'র কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ। ঈমান আনার অর্থই হলো আকীদাহ্ বা বিশ্বাস থেকে উৎসরিত সমস্ত হুকুম–আহ্কামের কাছে নিঃশর্ত ভাবে আত্মসর্মপণ করা। এক্ষেত্রে মুসলিমদের আকীদাহ্ বা বিশ্বাস তাকে বাধ্য করে এ সমস্ত হুকুম–আহ্কাম পরিপূর্ণ ভাবে মেনে চলতে। প্রতিটি মুসলিম শরীয়া'হ্ আইন দিয়ে জীবন পরিচালনার জন্য আল্লাহ্'র কাছে ওয়াদাবদ্ধ, হোক তা তার সাথে আল্লাহ্'র সম্পর্কের বিষয়ে, যেমনঃ বিভিন্ন ধরনের 'ইবাদত (নামাজ, রোজা ইত্যাদি)। কিংবা, হোক তা নিজের সাথে নিজের সম্পর্কের বিষয়ে, যেমনঃ মূল্যবোধ বা খাবার সম্পর্কিত বিষয়ে অথবা, হোক তা তার সাথে অন্য সকল মানুষের সম্পর্কের বিষয়ে, যেমনঃ লেন–দেন কিংবা ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত বিষয়ে।

ইসলামী রাষ্ট্র সমস্ত মুসলিমকে ইসলামী আকীদাহ্ বা বিশ্বাস দিয়েই ঐক্যবদ্ধ রাখে এবং এক্ষেত্রে অবশ্যই কোরআন ও সুন্নাহ'র দলিলকেই হুকুম–শরীয়া'র মূল ভিত্তি হিসাবে ধরা হয়। হুকুম শরীয়া'র মূলনীতি এবং আইনগত সকল সিদ্ধান্ত কোরআন–সুন্নাহ'র দলিলের উপর ভিত্তি করেই প্রণয়ন করা হয় এবং এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত প্রকাশের কোন অবকাশ থাকে না। কিন্তু, ইজ্তিহাদের কারণে অতীতের মুসলিমরা বিভিন্ন সময় কোরআন–সুন্নাহ'র দলিলকে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেছে। মূলতঃ এ সমস্ত দলিলের(কোরআনের আয়াত ও রাসুলের হাদিস) ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যার কারণেই বিভিন্ন ধরণের মতবাদ (School of Thought) ও সম্প্রদায়ের জন্ম হয়েছে। এর মূল কারণ হলো, ইসলাম সবসময়ই মুসলিমদের গবেষণা (ইজ্তিহাদ) করতে উৎসাহিত করে এবং সেইসাথে মানুষের মধ্যকার চিন্তা–ধারার স্বাভাবিক পার্থক্যকেও স্বীকার করে নেয়।

এজন্য সবসময়ই মুসলিমদের মাঝে আকীদাহ্, আইন-কানুন ও উসুল উল-ফিকহ্ এর পদ্ধতি বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। রাসুল(সা.) সবসময়ই মুসলিমদের ইজ্তিহাদ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং বলেছেন যে, মুজ্তাহিদের (ইজ্তিহাদের যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি) ইজ্তিহাদ যদি ভূল হয় তবে তার জন্য রয়েছে একটি নেকী। আর, সঠিক হলে রয়েছে দু'টি নেকী। এ কারণে, সুন্নী, শিয়া'হ, মুতা'যিলাহ এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের আর্বিভাব হওয়া কোন আশ্চর্য বিষয় ছিলো না। না আশ্চর্যের বিষয় ছিলো বিভিন্ন মতবাদের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন মাযহাব যেমনঃ শাফি'ঈ, হানাফি, মালিকি, হাম্বলী, জা'ফরী, যায়িদী ইত্যাদি মাযহাবের সৃষ্টি হওয়া। এ সমস্ত সম্প্রদায় এবং মাযহাবগুলো একটি মাত্র আকীদাহ্ বা বিশ্বাসকেই আকঁড়ে ধরেছিল, যা ছিলো ইসলামের আকীদাহ্। তাদের সকলের উপরই আল্লাহ্ নির্ধারিত সমস্ত ফরজ দায়িত্ব মেনে চলা এবং নিষিদ্ধ সকল বিষয়কে পরিহার করার কর্তব্য ছিলো। কোন নির্দিষ্ট মাযহাব নয়, তারা সকলেই সর্বাবস্থায় হুকুম-শরীয়া'হ্ দিয়ে জীবন পরিচালনা করতেই বাধ্য ছিলো।

আসলে, মাযহাবগুলো হচ্ছে হুকুম-শরীয়া'র একটি নির্দিষ্ট ধরনের ব্যাখ্যা, যে ব্যাখ্যা অনুযায়ী মুকাল্লিদগন (যারা মুজতাহিদ নয়), যারা নিজেরা ইজতিহাদ করতে পারে না, তারা হুকুম–শরীয়া'হ্ অনুসরণ করে থাকে। এখানে মনে রাখা দরকার যে, মুসলিমরা শুধু আল্লাহ্ প্রদত্ত আইন–কানুন দিয়েই জীবন পরিচালনা করতে বাধ্য, কোন মাযহাব অনুসরণ করতে বাধ্য নয়। তাই, হয় তাকে হুকুম–শরীয়া'র মূল উৎস থেকে নিজে ইজতিহাদ করে শরীয়া'হ্ আইন মানতে হবে, অথবা, সে যদি নিজে ইজতিহাদ করতে অপারগ হয় তবে তাকে কোন মাযহাব অনুসরণ করতে হবে। এ কারণেই, যে সমস্ত সম্প্রদায় ও মাযহাব কোরআন ও সুন্নাহকে হুকুম–শরীয়া'র একমাত্র উৎস গ্রহন করেছে এবং ইসলামী আকীদাহ্কে আকঁড়ে ধরেছে – তারা সবাই ইসলামের অর্ন্তভূক্ত। এ সমস্ত মতবাদের প্রচারকবৃন্দও মুসলিম এবং তারা ইসলামী আইন–কানুন দিয়েই পরিচালিত। যতক্ষন পর্যন্ত এ সমস্ত মাযহাবের অনুসারীরা ইসলামী আকীদাহ্'র সীমারেখার মধ্যে থাকবে ততক্ষন পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্র এ সমস্ত সম্প্রদায় ও মাযহাবের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। কিন্তু, যদি কোন মুসলিম ব্যক্তিগত কিংবা দলবদ্ধ ভাবে ইসলামী আকীদাহ্ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় তবে, এ বিষয়টিকে ইরতিদাদ(ধর্মত্যাগ) হিসাবে বিবেচনা করা হবে এবং সে ব্যক্তি বা দলের উপর রাষ্ট্র কর্তৃক মুরতাদ(ধর্মত্যাগী) এর শাস্তি আরোপিত হবে। হুকুম–শরীয়া'র কিছু কিছু বিষয় আছে যাতে দ্বিমত প্রকাশের কোন অবকাশ নেই। অর্থাৎ, এ সমস্ত বিষয়ে একটি মাত্র সুনির্দিষ্ট হুকুমকে গ্রহনযোগ্য হিসাবে ধরা হয়। যেমনঃ চোরের হাত কাটা, সুদ নিষিদ্ধ হওয়া, যাকাতের প্রদানের অপরিহার্যতা, দৈনিক পাঁচ বার নামাজের বাধ্যবাধকতা ইত্যাদি। এ সমস্ত বিষয়ে হুকুম–শরীয়া'হ্ সুনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়। তাই, মুসলিমরা এ সকল ক্ষেত্রে এই সুনির্দিষ্ট হুকুমগুলোই মেনে চলতে বাধ্য।

আবার, হুকুম–শরীয়া'র কিছু কিছু বিষয় ও ধ্যান–ধারণা আছে যে সমস্ত বিষয় মুজতাহিদগণ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করার কারণে মুসলিমদের মধ্যে এ সমস্ত বিষয়ে মতপার্থক্য ঘটেছে। যেমনঃ খলিফা হবার পূর্বশর্ত কিংবা খারায আরোপিত ভূমির নির্ধারিত করের অংশ অথবা জমির ভাড়া প্রদান সর্ম্পকিত বিষয় ইত্যাদি। এ সমস্ত আইনের ক্ষেত্রে, খলিফা একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে গ্রহন করেন এবং রাষ্ট্রে বসবাসরত সকলের জন্য সেই আইন মেনে চলা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। যারা এই বিষয়গুলোর ব্যাপারে খলিফার সিদ্ধান্তের সাথে দ্বিমত পোষন করে তাদের সকলের জন্যই তাদের নিজস্ব মতামত ত্যাগ করে খলিফার মতামতকে গ্রহন করা কর্তব্য হয়ে যায়। আর, এভাবেই খলিফার সিদ্ধান্ত সকলের মধ্যে বিদ্যমান মতপার্থক্য দূর করে। বস্তুতঃ ইমাম বা খলিফা হুকুম–শরীয়া'র কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনের পর প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে সেই আইন মেনে চলা মুসলিমদের জন্য অবশ্য কর্তব্য হয়ে যায়। এ সিদ্ধান্তের বিপরীতে কেউ যদি সেই নির্দিষ্ট বিষয়ে অন্য কোন হুকুম অনুসরণ করে তবে সে গুনাহগার হবে। কারণ, খলিফা যখন কোন নির্দিষ্ট শরীয়া'হ্ আইন কার্যকরী করেন, সঙ্গে সঙ্গে তা সকল মুসলিমের জন্য মেনে চলা ফরজ হয়ে যায়। আর, কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে শরীয়া'হ্ আইন কারো জন্য কখনো একের অধিক হতে পারে না।

তবে, খলিফার জন্য আকীদাহ্ সম্পর্কিত বিষয়ে কোন হুকুমকে সুনির্দিষ্ট করে দেয়া ঠিক নয়, কারণ তাহলে এটা মেনে চলা মুসলিমদের জন্য কষ্টকর হয়ে যেতে পারে। কিন্তু, ভ্রান্ত বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে যদি নতুন ধরনের ধ্যান–ধারণা আর্বিভাব হবার সম্ভাবনা থাকে, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র এসব দুস্কৃতিকারীদের কঠোর হস্তে দমন করবে যতক্ষন পর্যন্ত না নতুন এইসব ধ্যান–ধারণা মুসলিমদের কুফরীর (অবিশ্বাস) দিকে ধাবিত না করে। কিন্তু, যদি এইসব ধ্যান–ধারণা মুসলিমদের কুফরীর (অবিশ্বাস) দিকে ধাবিত করে, তবে যারা এ ধরণের অপকর্মের সাথে জড়িত থাকবে রাষ্ট্র তাদের ধর্মত্যাগী হিসাবে বিবেচনা করবে। এছাড়া, খলিফার 'ইবাদত সম্পর্কিত বিষয়েও কোন নির্দিষ্ট হুকুম গ্রহন করা ঠিক নয়, কারণ এটাও মুসলিমদেরকে কষ্টকর পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেবে।

সুতরাং, আকীদাহ্ সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদের মধ্য হতে কোন নির্দিষ্ট মতামতকে গ্রহন করা খলিফার জন্য সঠিক নয়, যতক্ষন পর্যন্ত না এই সকল মতামত ইসলামী মতবাদ হিসাবে বিবেচিত হয়। আবার, যাকাত ব্যতীত 'ইবাদত সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রেও কোন মতবাদকে নির্দিষ্ট করে দেয়া খলিফার জন্য সঠিক নয়, যতক্ষত পর্যন্ত না 'ইবাদতের এই সমস্ত বিষয় শরীয়া'হ্ প্রদত্ত আইন–কানুনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এ সকল বিষয় ছাড়া খলিফা লেন–দেন, ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া প্রদান, বিবাহ, তালাক, বিবাহ-বিচ্ছেদ পরবর্তী ভরণ–পোষণ, অংশীদারিত্ব ভিত্তিক ব্যবসা–বাণিজ্য, সন্তানের অভিভাবকত্ব ইত্যাদি বিষয়ে হুকুম–শরীয়া'হ্ ভিত্তিক যে কোন আইনকে সকলের জন্য নির্দিষ্ট ও কার্যকরী করতে পারেন। এছাড়া, খলিফা শাস্তি প্রদান বা খাদ্য, বস্ত্র অথবা মূল্যবোধ সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে শরীয়া'হ্ ভিত্তিক যে কোন সুনির্দিষ্ট আইনকে কার্যকরী করতে পারেন এবং এক্ষেত্রে সকল মুসলিমের খলিফার গৃহীত সিদ্ধান্ত মেনে চলা আবশ্যক হয়ে যায়।

এছাড়া, খলিফাকে অবশ্যই 'ইবাদতের বিষয় সম্পর্কিত সকল শরীয়া'হ্‌ আইন প্রয়োগ করতে হবে। যারা নামাজ ত্যাগ করবে এবং রমযান মাসে রোযা রাখবে না শরীয়া'হ্‌ আইন অনুযায়ী খলিফা তাদেরকে শাস্তি দিবেন। এ সকল 'ইবাদত সম্পর্কিত আইন-কানুন সহ সমস্ত শরীয়া'হ্‌ আইন রাষ্ট্রে বাস্তবায়িত বা প্রয়োগ করা খলিফার দায়িত্ব। নামাজ আদায় করার বাধ্যবাধকতা কোন ইজতিহাদ করার বিষয় নয়, বরং এটা যে সমস্ত মুসলিমের উপর ফরয তা একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য। তাই, এ সমস্ত প্রতিষ্ঠিত বিষয়ে খলিফাকে শরীয়া'হ্‌ আইন সরাসরি প্রয়োগ করতে হবে। এ সমস্ত বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা না করার কোন অবকাশ থাকবে না। শাস্তিমূলক বিধানের (Penal Code) ক্ষেত্রে খলিফা একটি নির্দিষ্ট আইন গ্রহন করবে এবং সকল মুসলিমকে তা মেনে চলার জন্য আদেশ দেয়া হবে। অন্যান্য শাস্তিমূলক বিধানের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার প্রযোজ্য হবে। এ সমস্ত কিছুই শুধু মুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য হবে। আর, অমুসলিমদের ক্ষেত্রে, যারা কিনা ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন বিশ্বাসে বিশ্বাসী তাদেরকে তিন ভাগে ভাগ করা হবে।

১. যারা নিজেদের মুসলিম বলে দাবী করে কিন্তু তাদের আকীদাহ্‌'র মধ্যে এমন কিছু বিষয় আছে যা ইসলামী আকীদাহ্‌'র সাথে সাংঘর্ষিক।
২. আহলে কিতাবের দলভূক্ত মানুষ।
৩. মুশরিক যাদের মধ্যে রয়েছে – মাজুস(অগ্নিপূজারী), হিন্দু, বৌদ্ধ এবং আহলে কিতাব বর্হিভূত জনগণ।

এ সকল দলভূক্ত মানুষদের তাদের বিশ্বাসের উপরই ছেড়ে দেয়া হবে এবং তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস বা উপাসনার ব্যাপারে কোনরকম হস্তক্ষেপ করা হবে না। বিবাহ কিংবা তালাক সংক্রান্ত বিষয়ে তাদেরকে নিজ নিজ ধর্মীয় আইন–কানুন মেনে চলতে দেয়া হবে। এ সকল বিষয়ে ঝগড়া–বিবাদ তাদের ধর্মীয় আইন–কানুন অনুযায়ীই ফয়সালা হবে এবং এজন্য রাষ্ট্র তাদের মধ্য হতে একজন ব্যক্তিকে রাষ্ট্র অধিকৃত বিচারালয়ে বিচারক হিসাবে মনোনীত করবে। এছাড়া, তাদের খাদ্য ও সাজসজ্জা বিষয়েও তাদের ধর্মীয় রীতি–নীতিকেই প্রধান্য দেয়া হবে এবং এ সকল বিষয়ই সাধারণ নির্দেশের আওতাভূক্ত হবে। আহলে কিতাব বর্হিভূত সম্প্রদায়ের জন্য একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। মাজুসদের সম্পর্কে আল্লাহর রাসুল(সা.) বলেছেন,"তোমরা আহলে কিতাবদের সাথে যেমন আচরণ করো তাদের(মাজুস) সাথেও একই রকম আচরণ করো।"

কিন্তু, লেন–দেন সংক্রান্ত এবং শাস্তিমূলক বিধান সমূহ মুসলিম–অমুসলিম সহ সকলের উপরই সমান ভাবে প্রযোজ্য হবে। বস্তুতঃ বিভিন্ন অন্যায়ের শাস্তি সম্পর্কিত বিচারকার্যের ব্যাপারে মুসলিম–অমুসলিম সহ সকলের উপরই শরীয়া'হ্‌ আইন প্রয়োগ করা হবে। যারা ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিক হিসাবে বসবাস করবে তারা সবাই লেন–দেন ও শাস্তি প্রদান সম্পর্কিত শরীয়া'হ্‌ আইন মেনে চলতে বাধ্য থাকবে। এক্ষেত্রে, ধর্মীয়, জাতিগত কিংবা গোত্রীয় ভেদাভেদ বিবেচিত হবে না। অমুসলিমরা মূলতঃ রাষ্ট্রের শাসন–কর্তৃত্ব এবং আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকেই এ সমস্ত আইন–কানুন মেনে চলবে, ধর্মীয় কিংবা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। তাদের কোন অবস্থাতেই এ সমস্ত আইন–কানুনের উপর বিশ্বাস আনতে বাধ্য করা হবে না। কারণ, তা করা হলে তাদের প্রকৃতপক্ষে জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহনে বাধ্য করা হবে। আল্লাহ্‌তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন,

**ÒØx‡bi e¨vcv‡i †Kvb Rei `w¯— †bB|Ó** [সুরা বাকারাহঃ ২৫৬]

আল্লাহর রাসুল(সা.) আহলে কিতাবের অর্ন্তভূক্ত মানুষদের ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ কিংবা বিশ্বাসের জন্য তাদের নিপীড়ন করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু, নাগরিক হিসাবে তাদের অবশ্যই রাষ্ট্রের শাসন-ক্ষমতা ও আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে শরীয়া'হ্‌ আইন মেনে চলতে হবে।

পরিশেষে এটা বলা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন নীতি হবে রাষ্ট্রে বসবাসরত মুসলিম–অমুসলিম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের উপর শরীয়া'হ্‌ আইন কার্যকর করা। নাগরিকদের উপর নিম্নোক্ত উপায়ে শরীয়া'হ্‌ আইন কার্যকর করা হবেঃ

১. সকল মুসলিম নাগরিকের উপর শরীয়া'হ্‌ আইন কার্যকর করা হবে।

২. বিশ্বাস এবং উপাসনা সংক্রান্ত বিষয়ে অমুসলিম নাগরিককের উপর কোনরকম হস্তক্ষেপ করা হবে না।

৩. সাধারণ আইনের আওতায় খাদ্য ও সাজসজ্জা সম্পর্কিত বিষয়ে অমুসলিম নাগরিককে তাদের নিজস্ব ধর্মীয় রীতি–নীতি অনুসরণ করতে দেয়া হবে।

৪. অমুসলিমদের বিবাহ ও তালাক সংক্রান্ত বিষয়ে রাষ্ট্র তাদের পক্ষ হতে রাষ্ট্র অধিকৃত বিচারালয়ে বিচারক নিয়োগ করবে এবং এ সংক্রান্ত সকল ঝগড়া–বিবাদ উক্ত বিচারালয়েই ফয়সালা করা হবে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে গঠিত কোন আদালত (Private Court) গ্রহনযোগ্য হবে

না। কিন্তু, এ সংক্রান্ত বিবাদ যদি অমুসলিম এবং মুসলিমদের সংঘটিত মধ্যে হয়, তবে তা মুসলিম বিচারকের মাধ্যমে ইসলামী আইন অনুযায়ী ফয়সালা করা হবে।

৫. অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং আইনগত লেন-দেন সংক্রান্ত বিষয়ে ইসলামী রাষ্ট্র মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের উপর কোনরকম পূর্বশর্ত ছাড়াই শরীয়া'হ্ কার্যকর করবে।

৬. ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত সকলকেই রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে বিবেচনা করা হবে। কোনরকম বৈষম্য ছাড়াই রাষ্ট্র তাদের অভিভাবক হিসাবে দায়িত্ব পালন করবে এবং তাদের সকল কার্যাবলী দেখাশুনা করবে।

## ইসলামী রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিঃ

ইসলামী রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি বলতে মূলতঃ বুঝায় এ রাষ্ট্রের সাথে অন্যান্য রাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্ক। এ সম্পর্ক মুসলিম উম্মাহ'র পররাষ্ট্র বিষয়ক কার্যাবলী দেখাশুনা করার ভিত্তিতেই গড়ে উঠে। বস্তুতঃ ইসলামী রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি একটি স্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয় ভিত্তির উপর গঠিত। আর তা হলো, সমগ্র পৃথিবীতে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেয়া এবং সকল জাতি ও সমাজের কাছে ইসলামের সুমহান বাণী পৌঁছে দেয়া। এটাই হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি। মুসলিম উম্মাহ্কে যেই শাসন করুক না কেন, এই ভিত্তি অপরিবর্তনীয় এবং এ ব্যাপারে কোনরকম মতপার্থক্য করার কোন অবকাশ ইসলামে নেই। ইসলামের ইতিহাসের সকল সময়ে এই নীতিকেই মূলভিত্তি হিসাবে ধরা হয়েছে এবং আল্লাহর রাসুল(সা.) মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করার সময় থেকে 'উসমানী খিলাফতের শেষদিন পর্যন্ত পররাষ্ট্রনীতির এই মূল ভিত্তিকেই অনুসরণ করা হয়েছে।

আল্লাহর রাসুল(সা.) মদীনায় হিজরত করার প্রথম দিন থেকেই ইসলামকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে তাঁর নবগঠিত রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতিমালা প্রস্তুত করেন। সমগ্র হিজাযে ইসলামকে ছড়িয়ে দেয়ার মানসে তিনি(সা.) ইহুদীদের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এছাড়া, সমস্ত আরব উপদ্বীপে ইসলামের আহবান পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে তিনি(সা.) কুরাইশদের সাথে হুদাইবিয়া চুক্তি করেন। পরিশেষে, তিনি(সা.) আরব উপদ্বীপের বাইরে বিভিন্ন অঞ্চলে দূত পাঠিয়ে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করেন এবং ইসলামের বাণী প্রচারের ভিত্তিতেই তাদের সাথে সম্পর্ক তৈরীর উদ্যোগ নেন।

এরপরে আসে খলীফাদের যুগ। রাসুল(সা.)কে অনুসরণ করে তারাও ইসলাম প্রচারের ভিত্তিতেই অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক গঠন করেন এবং সমস্ত পৃথিবীব্যাপী ইসলাম প্রচারের ধারাকে অব্যাহত রাখেন। পরবর্তীতে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন-ক্ষমতায় আসা প্রতিটি শাসকই ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে একে অন্যের সাথে প্রতিযোগীতায় অবতীর্ন হয়েছেন। আব্বাসীয় খলিফাগণের চাইতে 'উমাইয়া খলিফাগণ নতুন দেশ জয় করা এবং ইসলামের আহবান বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে অনেক বেশী সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। আবার, মামলুকদের চাইতে 'উসমানী খলিফাগণ অনেক বেশী সংখ্যক দেশ জয় করেছেন এবং ইসলামের বাণীর প্রচার-প্রসার ঘটিয়েছেন। এ পার্থক্য মূলতঃ কোন শাসনামলে রাষ্ট্র তার অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় পররাষ্ট্রনীতিকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছে, তার উপর ভিত্তি করেই নির্ধারিত হয়েছে। যাইহোক, সব শাসনামলেই দ্বীন ইসলাম প্রচারকে মূলভিত্তি হিসাবে ধরেই ইসলামী রাষ্ট্র অন্যান্য সকল রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক তৈরী করেছে। খলিফাগণের শাসনামলের সুদীর্ঘ সময়ে কখনই এ অবস্থা পরিবর্তিত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ইসলামকে পরিপূর্ণ ভাবে বাস্তবায়ন করা এবং বর্হিবিশ্বে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়াই হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের মূলদায়িত্ব। তাই, ইসলামকে বিশ্বব্যাপী প্রচার-প্রসারের দায়িত্ব সবসময় ইসলামী রাষ্ট্রের উপরই অর্পিত হয়েছে। আল্লাহতায়ালা ইসলামের সুমহান বাণী সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশ্যে নাযিল করেছেন, আর এ কারণেই ইসলামকে সুনির্দিষ্ট পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে প্রচার করা এবং এর আহবান সকলের কাছে পৌঁছে দেয়া সবসময় ইসলামী রাষ্ট্রের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়েছে। আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন,

*ÒGes (†n gnv¤§`) Awg †Zv †Zvgv‡K mgM gvbeRwZi cwZ mmsev``vZv I mZKKvix i|‡c †ciY K‡iwQ| wKš, †ekxi fvM gvbIB Zv Rv‡b bv|Ó* [সুরা সাবাঃ২৮]

আল্লাহতায়ালা আরও বলেছেন,

*Ò‡n gvbeRwZ! †Zvgv‡`i wbKU G‡m‡Q †Zvgv‡`i cwZcvj‡Ki c¶ n‡Z bmxnZ (m`c‡`k)Ó* [সুরা ইউনুসঃ ৫৭]

তিনি আরও বলেছেন,

*"বল, হে মানবজাতি! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর রাসুল হিসাবে প্রেরিত হয়েছি।"* [সুরা আ'রাফঃ ১৫৮]

এবং তিনি আরও বলেছেন,

***ÒAvi GB †KviAvb Avgvi wbKU Anxi gva¨‡g cvVv‡bv n‡q‡Q †hb Awg †Zvgv‡`i‡K Ges hv‡`i wbKU GUv †cŠQv‡e Zv‡`i mKj‡K Gi Øviv mZK Ki‡Z cvwi|Ó*** [সুরা আন'আমঃ ১৯]

এছাড়া তিনি বলেছেন,

***Ò‡n ivmj(mv.)! hv wKQ †Zvgvi cwZcvj‡Ki c¶ †_‡K †Zvgvi Dci AeZxY Kiv n‡q‡Q, Zvg (gvbl‡K) mewKQ †cŠwQ‡q `vI| Avi hw` Zvg Zv bv K‡iv Z‡e [a‡i †bqv n‡e]*** *তুমি আল্লাহর বাণী মানুষকে পৌঁছিয়ে দাওনি।"* [সুরা মায়িদাহ্ঃ ৬৭]

মুহাম্মদ(সা.) তার জীবদ্দশায় এই বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব পালন করেছেন এবং তার মৃত্যুর পর মুসলিমরা অব্যাহত ভাবে এ দায়িত্ব পালন করেছে। আসলে, মানুষকে ইসলামের দিকে আহবান করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর রাসুল(সা.) যে কাজ শুরু করে গিয়েছিলেন সে কাজেরই ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। আর তাই, মুসলিমরা সবসময় রাসুল(সা.)এর প্রদত্ত শিক্ষাকে অনুসরণ করে ইসলাম প্রচার-প্রসারের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে। আল্লাহর রাসুল(সা.) তাঁর বিদায়ী ভাষণে (খুতবাহ্ আল-ওয়াদা') বলেছেন, "তোমরা যারা উপস্থিত তারা অনুপস্থিত লোকদের কাছে তা পৌঁছে দেবে। হয়তোবা অনুপস্থিত ব্যক্তি উপস্থিত ব্যক্তির চাইতে বেশী সতর্ক হবে।" তিনি(সা.)আরও বলেছেন,"আল্লাহতায়ালা তার মুখ উজ্জ্বল করুক, যে আমার কথা শুনবে, তা বুঝবে এবং যেভাবে সে শুনেছে সেভাবেই মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে।"

এজন্যই রাসুল(সা.)এর জীবদ্দশায় এবং তাঁর উত্তরাধিকারী খলিফাদের সময়ে ইসলামের বাণীর প্রচার-প্রসার করাই সবসময় অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের সম্পর্কের মূলভিত্তি হিসাবে বিবেচিত হত। আর, কোরআন-সুন্নাহ এবং সাহাবাদের ঐক্যমত (ইজমা' আস-সাহাবাহ্) অনুযায়ী এটাই হচ্ছে আল্লাহতায়ালা'র সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্ট নির্দেশ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ইসলামী রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি বলতে আসলে বোঝায় ইসলামের আহবানকে বিশ্বব্যাপী পৌঁছে দেয়া। এই পররাষ্ট্রনীতি সবসময় একটি নির্দিষ্ট অপরিবর্তনীয় পদ্ধতিতে কার্যকর করা হয় – সেটা হচ্ছে জিহাদ। এখানে আলোচ্য বিষয় নয় কে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতায় আছে। বস্তুতঃ রাসুল(সা.) মদীনায় রাষ্ট্র গঠন করার সময় থেকে একেবারে ইসলামী রাষ্ট্রের শেষদিন পর্যন্ত এ পদ্ধতি কখনও পরিবর্তিত হয়নি। আল্লাহর রাসুল(সা.) ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করার পরপরই তাঁর সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেছিলেন এবং তিনি(সা.) ইসলামী দাওয়াতের পথে বস্তুগত বাঁধা দূর করার লক্ষ্যে জিহাদের সূচনা করেছিলেন। যেহেতু কুরাইশরা দাওয়াতের পথে বস্তুগত বাঁধা তৈরী করেছিল, তাই তিনি(সা.) সে বাঁধা দূর করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি(সা.) (জিহাদের মাধ্যমে) কুরাইশদের অস্তিত্বকে সম্পূর্ন ভাবে নিশ্চিহ্ন করে দাওয়াতী কার্যক্রম বিস্তারের পথকে প্রশস্ত করেন। এরপর তিনি(সা.) একের পর এক বাঁধা অপসারণ ও নিশ্চিহ্ন করতে থাকেন, যে পর্যন্ত ইসলামের আহবান সমস্ত আরব উপদ্বীপে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর, ইসলামী রাষ্ট্র অন্যান্য জাতির মাঝে ইসলাম বিস্তৃত করার লক্ষ্যে তাদের দরজায় কড়া নাড়তে থাকে। কিন্তু, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিদ্যমান শাসনব্যবস্থা সেখানকার মানুষের মাঝে ইসলাম বিস্তারের পথে বস্তুগত বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই, সেখানকার জনগণের কাছে ইসলামী দাওয়াত পৌঁছে দেবার জন্য বস্তুগত এই বাঁধা অপসারণ করা জরুরী হয়ে যায়। যেন তারা প্রত্যক্ষ ভাবে ইসলামের সুবিচার অবলোকন ও অনুভব করতে পারে এবং ইসলামের পতাকাতলে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ জীবনের সাক্ষী হতে পারে। এছাড়া, এর মাধ্যমে কোনরকম জোরজবরদস্তি কিংবা বলপ্রয়োগ ছাড়াই ইসলামী রাষ্ট্র মানুষকে একটি সত্যিকারের উন্নত জীবনের দিকে আহবান করতে পারে। ইসলামের আহবান প্রচার-প্রসার করার পদ্ধতি হিসাবে অতীতে সবসময়ই জিহাদের ধারা অব্যাহত ছিল। প্রকৃতপক্ষে, জিহাদের মাধ্যমেই ইসলামী রাষ্ট্র বিভিন্ন বাদশাহী ও রাষ্ট্রকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে সেখানকার জনগণকে ইসলামী শাসনের নীচে নিয়ে আসে। এভাবেই চারিদিকে ইসলামের আহবান ছড়িয়ে পড়ে এবং ইসলাম দিয়ে শাসিত হবার পর লক্ষ লক্ষ মানুষ স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করে। অতীতে ইসলামের পররাষ্ট্রনীতিকে জিহাদের মাধ্যমেই কার্যকরী করা হয়েছে, কোনসময়ই এ নীতি পরিবর্তিত হয়নি এবং ভবিষ্যতেও তা পরিবর্তিত হবে না।

মুসলিমদের জিহাদের মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের দিকে আহবান করতে হলে হয় সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহন করতে হবে, অথবা অর্থ, মতামত কিংবা লেখালেখির মাধ্যমে যুদ্ধকে সমর্থন করতে হবে। মুসলিমদের জন্য এটি বাধ্যতামূলক – যা কোরআন ও হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত। নিয়মানুযায়ী ১. মুসলিমরা শত্রুপক্ষকে ইসলাম গ্রহনে কিংবা ২. জিযিয়া প্রদানের দিকে আহবান না পর্যন্ত কখনোই শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ সূচনা করতে পারবে না। এ বিষয়ে শরীয়া'হ্ আইন হলো, যখন মুসলিমরা শত্রুপক্ষকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলবে তখন প্রথমে তাদেরকে ইসলাম

গ্রহন করতে আহবান জানাতে হবে। যদি শত্রুপক্ষ ইসলাম গ্রহন করে, তবে তারা মুসলিম উম্মাহ্'র অংশ হিসাবে বিবেচিত হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। আর, যদি তারা ইসলাম গ্রহনে অস্বীকৃতি জানায়, তবে তাদেরকে জিযিয়া প্রদান করতে বলা হবে। যদি তারা তা প্রদান করতে সম্মত হয়, তবে মুসলিমদের তাদের জান–মাল এবং ধন–সম্পদের নিরাপত্তা দিতে হবে এবং তাদের দেশ ইসলামী রাষ্ট্রের অংশ হিসাবে বিবেচিত হবে। ইসলামী রাষ্ট্রের অংশ হিসাবে মুসলিম নাগরিকদের মতোই তারা ন্যায়বিচার, সমতা, নিরাপত্তা এবং অভিভাবকত্ব বিষয়ক ও কল্যাণমূলক সকল সুবিধা ভোগ করবে। সেইসাথে তাদের মৌলিক সকল চাহিদা নিশ্চিত করা হবে। তবে, জিযিয়া প্রদানের সাথে সাথে তাদের ইসলামী রাষ্ট্র ও শাসনকর্তৃত্বেরও আনুগত্য স্বীকার করে নিতে হবে। আর, যদি তারা ইসলাম গ্রহন না করে কিংবা জিযিয়া প্রদানেও অস্বীকৃতি জানায়, তবে সেক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আইনসঙ্গত হবে।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, কোন জনগোষ্ঠির বিরুদ্ধে ততক্ষন পর্যন্ত যুদ্ধ করা আইনসঙ্গত নয়, যতক্ষন পর্যন্ত না তাদের ইসলামের দিকে আহবান করা হয়। ইসলামের পন্ডিতবর্গ (Scholars) এ বিষয়ে জোর দিয়েছেন যে, যতক্ষন পর্যন্ত না কোন জাতিগোষ্ঠির কাছে ইসলামের আহবান না পৌঁছে, ততক্ষন পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা আইনসঙ্গত নয়। সুতরাং, শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনার পূর্বে তাদের মাঝে ইসলামের ব্যাপারে জনমত গঠন করা এবং ইসলামের একটি সত্যিকার চিত্র তাদের কাছে উপস্থাপন করা উচিত। সেইসাথে, সেখানকার জনগণকে ইসলামী আইন–কানুনের সংস্পর্শে আসারও উদ্যোগ নেয়া উচিত যেন অমুসলিমরা অনুভব করতে পারে যে, ইসলাম তাদেরকে প্রকৃত মুক্তির দিকে আহবান করছে। ইসলামী রাষ্ট্র এ লক্ষ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহন করতে পারে, যেমনঃ ইসলামের ধ্যান-ধারণাগুলোকে পরিস্কার ভাবে ব্যাখ্যা করা, অমুসলিমদের সামনে ইসলামের একটি জীবন্ত চিত্র ফুটিয়ে তোলা এবং ইসলামের পক্ষে বিভিন্ন রকম প্রচারণা চালানো ইত্যাদি। এ ধরণের কর্মকান্ডের মধ্যে ইসলামী রাষ্ট্রের শক্তি–সামর্থ্য ও প্রভাব–প্রতিপত্তি প্রদর্শন করাও অর্ন্তভূক্ত হতে পারে। বিভিন্ন সময়ে আল্লাহর রাসুল(সা.) এ ধরণের পদক্ষেপ নিয়েছেন। তিনি(সা.) কুফর রাষ্ট্রগুলোর কেন্দ্রস্থলে দূত পাঠিয়েছেন। একবার তিনি(সা.) নাজদ্ এলাকায় ইসলামের বাণী পৌঁছে দেবার জন্য চল্লিশ জন সাহাবীকে প্রেরণ করেছিলেন। এছাড়া, তিনি(সা.) তাবুক যুদ্ধে যাবার পূর্বে মদীনায় তাঁর সেনাবাহিনীর শক্তিমত্তা প্রদর্শন করেছিলেন। এর কারণ রাসুল(সা.) বলেছেন, "একমাসের দূরত্ব থাকা অবস্থায় শত্রুর মনে ভীতি সৃষ্টির মাধ্যমে আমাকে বিজয়ের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।"

অতীতে মুসলিমদের সেনাবাহিনী সবসময়ই শত্রুপক্ষের ভীতি ও শ্রদ্ধা অর্জনে সমর্থ হয়েছে। শত শত বছর যাবত ইউরোপে একথা প্রচলিত ছিল যে, মুসলিম সেনাবাহিনীকে কখনোই পরাজিত করা যায় না। যাই হোক, রাজনৈতিক ভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করা আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে, প্রত্যক্ষ সমর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার আগে ইসলামের ধ্যান–ধারণাগুলোকে প্রচার–প্রসার করা এবং ইসলামী রাষ্ট্রের শক্তিমত্তা প্রদর্শন বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলো গ্রহন করা ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য জরুরী। যদিও ইসলামের বাণী প্রচারে জিহাদ একটি অপরিবর্তনীয় ও সুনির্দিষ্ট পন্থা, কিন্তু সামরিকবাহিনীর সাথে মূল সংঘর্ষের পূর্বে অন্যান্য রাজনৈতিক পদক্ষেপ ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কর্মকান্ডগুলো মূলতঃ প্রস্তুতিমূলক কর্মকান্ড এবং এগুলো নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরণের পদক্ষেপ সাধারনত অন্যান্য জাতি, রাষ্ট্র কিংবা জনগোষ্ঠির সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে, হোক তা অর্থনৈতিক সম্পর্ক কিংবা সৎ প্রতিবেশীমূলক সম্পর্ক অথবা অন্য কোন ভিত্তির উপর গঠিত সম্পর্ক, যা হয়তো বা পরবর্তীতে ইসলাম প্রচার–প্রসারে সহায়ক হতে পারে।

সুতরাং, যে রাজনৈতিক চিন্তার উপর ভিত্তি করে অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ধারিত হয় তা মূলতঃ তাদের মাঝে ইসলামের বিস্তৃতি ঘটানো এবং ইসলামের বাণী তাদের কাছে পৌঁছে দেয়ার ভিত্তিতেই গঠিত। এক্ষেত্রে, অনুসরণীয় একমাত্র পদ্ধতি হল জিহাদ। তবে, এ ব্যাপারে ইসলামী রাষ্ট্র বিভিন্ন রকমের পরিকল্পনা ও উপায় অবলম্বন করতে পারে। যেমনঃ ইসলামী রাষ্ট্র তার কিছু সংখ্যক শত্রু রাষ্ট্রের সাথে সৎ প্রতিবেশীসুলভ চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারে এবং অন্যদের সাথে যুদ্ধ করতে পারে। আল্লাহর রাসুল(সা.) এ ধরনের পদ্ধতির অনুমোদন দিয়েছেন। তিনি(সা.) মদীনায় আসার পরপরই এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহন করেছিলেন। আবার, রাষ্ট্র তার সমস্ত শত্রুর বিরুদ্ধে একই সাথে যুদ্ধ ঘোষনা করতে পারে। আবু বকর যখন ইরাক এবং আল–শামে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন তখন এ পদ্ধতি গ্রহন করেছিলেন। আবার, রাষ্ট্র তার আকাঙ্খিত ফলাফলের পক্ষে জনমত তৈরীর জন্য কোন শত্রুরাষ্ট্রের সাথে অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি চুক্তিও করতে পারে।

আল্লাহর রাসুল(সা.) কুরাইশদের সাথে আল–হুদাইবিয়াহ চুক্তি স্বাক্ষর করার সময় এ পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। আবার, শত্রুপক্ষের মনে ভীতি সৃষ্টি করার লক্ষ্যে, রাষ্ট্র এলাকা ভিত্তিক খন্ড যুদ্ধের পরিকল্পনা করতে পারে। আল্লাহর রাসুল(সা.) বদর যুদ্ধের পূর্বে এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহন করেছিলেন। আবার, উমাইয়া খলিফাদের শাসনামলে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তারা একই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহন করেছিলো, তাদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন প্রচারনাও এ পরিকল্পনার অর্ন্তভূক্ত ছিল।

দাওয়াতী কার্যক্রমের স্বার্থে, ইসলামী রাষ্ট্র একই সময়ে কোন কোন রাষ্ট্রের সাথে অর্থনৈতিক চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারে আবার কোন কোন রাষ্ট্রের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত নাও করতে পারে। প্রয়োজনে রাষ্ট্র কারো সাথে কুটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করতে পারে আবার নাও করতে পারে। দাওয়াতী কার্যক্রমকে অভিষ্ট গন্তব্যে নেবার লক্ষ্যে রাষ্ট্রকে খুব সতর্কতার সাথে এ সমস্ত পরিকল্পনা করতে হবে। ইসলামের আহবানের

বিস্তৃতির উদ্দেশ্যে ইসলামী রাষ্ট্র [শত্রুর বিরুদ্ধে] প্রপাগান্ডা এবং [ইসলামের পক্ষে] প্রচারনার আশ্রয়ও নিতে পারে অথবা, শত্রুপক্ষের গোপন পরিকল্পনা উন্মোচন করা কিংবা স্নায়ু যুদ্ধের (Cold War) কৌশলও গ্রহন করতে পারে ।

দাওয়াতী কার্যক্রমের স্বার্থসংশ্লিষ্ট এবং দাওয়াতকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই রাষ্ট্রকে তার সকল পরিকল্পনা করতে হবে । কারণ, এ ধরনের পরিকল্পনা সবসময়ই ইসলাম বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে এবং জিহাদের গুরুদায়িত্বকে সহজতর করেছে । এজন্যই এ সমস্ত পদক্ষেপ পররাষ্ট্রনীতির বাস্তবায়নের জন্য অত্যন্ত জরুরী । এছাড়া, আল্লাহর রাস্তায় কৃত জিহাদের (জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ্) মাধ্যমে ইসলামের বিস্তৃতি ঘটানোর লক্ষ্যে সর্বদা ইসলাম এবং ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে জনমত গঠন করাও জরুরী ।

## ইসলাম প্রচারে জিহাদের ভূমিকাঃ

মুসলিম উম্মাহ'র পার্থিব জীবনের মূল উদ্দেশ্য হলো সমস্ত মানবজাতির কাছে ইসলামের সুমহান বাণী পৌঁছে দেয়া । এ লক্ষ্যে, মুসলিম উম্মাহকে সবসময়ই বিশ্বের কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে হয়েছে । আর, ইসলামের বাণী প্রচার–প্রসারের গুরুদায়িত্ব সবসময় ইসলামী রাষ্ট্রের কাঁধেই অর্পিত হয়েছে । তাই, অন্যান্য দেশ জয় করা এবং অত্যন্ত সফলতার সাথে লক্ষ্য অর্জন করা ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য খুব স্বাভাবিক একটা বিষয় । প্রকৃতপক্ষে, ইসলাম নির্ধারিত দায়িত্ব-কর্তব্যকে সঠিক ভাবে পালন করার কারণেই অতীতে মুসলিমদের বিজয়ের ধারা অব্যাহত ছিল । আর, এ দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করার অর্থ হলো, ইসলামী আইন–কানুনকে অমুসলিমদের উপর প্রয়োগ করে এবং ইসলামী ধ্যান–ধারনাগুলোকে ব্যাখ্যা করে তাদের কাছে এমন ভাবে ইসলামকে পৌঁছে দেয়া যেন ইসলাম তাদের চিন্তার জগতে বিচরণ করতে পারে ।

এজন্য, ইসলামের বিজয় অভিযান না পরিচালিত হয়েছে কোন হীন স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে বা কোন জনগোষ্ঠিকে কলোনীতে পরিণত করার উদ্দেশ্যে, আর না তা পরিচালিত হয়েছে কোন বিশেষ এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ করতলগত করার উদ্দেশ্যে । এ সমস্ত বিজয়যাত্রার এক এবং একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের মহান বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া এবং সেইসাথে তারা যে দুর্নীতিগ্রস্থ শাসনের অধীনে দুঃসহ জীবনযাপন করছিল তা থেকে তাদের মুক্ত করা ।

বস্তুতঃ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল খুবই শক্তিশালী ভিত্তির উপর । যে কারণে, প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এ রাষ্ট্র অবলোকন করেছে এর সমৃদ্ধি এবং বিস্তৃতি, বিভিন্ন দেশ জয় করেছে এবং প্রতিনিয়ত এর সীমানাকে বৃদ্ধি করেছে । যেহেতু এ রাষ্ট্রের আকীদাহ্ বা বিশ্বাস সার্বজনীন, তাই এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূলেই নিহিত রয়েছে এর সার্বজনীন রাষ্ট্রে পরিণত হবার মূলমন্ত্র । এ আকীদাহ্ সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত আকীদাহ্, যা থেকে উৎসরিত হয়েছে বিশ্বকেন্দ্রিক এক ব্যবস্থা এবং এ ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হয়েছে বিশ্বের সকল মানুষের জন্য ।

যে জন্য প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এর ক্রমশঃ বিস্তৃতি ঘটা এবং একের পর এক দেশকে জয় করা ছিল খুব স্বাভাবিক ব্যাপার । প্রকৃতপক্ষে, এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূল কারণই এ বিষয়গুলোকে অবধারিত করে তুলেছিল । রাসুল(সা.) আকাবার দ্বিতীয় শপথের সময় যে সকল মুসলিমের কাছ থেকে বাই'য়াত গ্রহন করেছিলেন তারা সকলেই আল্লাহর রাসুলের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন, যদিও এ যুদ্ধে তাদের ধন-সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয় কিংবা তাদের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের মৃত্যু ঘটে । তারা সুখ এবং দুঃখ উভয় অবস্থাতেই আল্লাহর রাসুল(সা.)এর পরিপূর্ণ আনুগত্য করার শপথ নিয়েছিলেন এবং সর্বাবস্থায় সত্য কথা বলার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন । তারা এটাও প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তারা কারও অসন্তুষ্টির ভয়ে ভীত হবে না এবং ইসলামী দাওয়াতকে রক্ষার জন্য নিজেদের জীবন বাজি রেখে আমৃত্যু লড়াই করবে । আর, এ একনিষ্ঠ আনুগত্যের পুরস্কার হিসাবে তারা পাবে চিরসবুজ জান্নাত । প্রকৃতঅর্থে, ইসলামী রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী প্রস্তুতির মূলে এ বিষয়গুলোই সবসময় মূলমন্ত্র হিসাবে কাজ করেছে । মুসলিমদের সবসময়ই মনে রাখতে হবে, কোন কারণে ইসলামী রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী প্রস্তুত করা হয়েছে? তাদের মূল কাজ কি? সেনাবাহিনী প্রস্তুতির মূল উদ্দেশ্য কি শুধুই ইসলামের দাওয়াত বহন করা নয়? এ উদ্দেশ্যেই কি মুসলিমরা সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়নি, আনুগত্যের শপথ করেনি এবং প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গ করে দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়নি?

আল্লাহর রাসুল(সা.) তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত একের পর এক অভিযানের পরিকল্পনা করেন । সমগ্র আরব উপদ্বীপকে ইসলামের পতাকাতলে নিয়ে আসার পর তিনি(সা.) কায়সার এবং খসরুর কাছে তাঁর দূত প্রেরণ করেন । আরব উপদ্বীপের বাইরে ইসলামের আহবানকে ছড়িয়ে দেয়াও তাঁর দাওয়াতী পরিকল্পনার একটা অংশ ছিল এবং হিজরী ৭ম সালে তিনি(সা.) এ কাজ শুরু করেন । এছাড়া, তিনি(সা.) ইসলামী রাষ্ট্রের আশেপাশের বিভিন্ন রাজা ও রাজপুত্রদের কাছে দূত পাঠান, তাদের সকলকে ইসলামের দিকে আহবান করেন । মু'তা এবং তাবুকের যুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ এবং 'উসামার সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করা তাঁর এ সমস্ত পরিকল্পনারই বাস্তব প্রতিফলন । তাঁর উত্তরসূরী খলিফাগণ রাষ্ট্রের শাসক হিসাবে তাঁর গৃহীত পরিকল্পনার অনুসরণ করেছেন এবং যে সমস্ত দেশে দূত পাঠিয়ে তিনি(সা.) মানুষকে ইসলামের দিকে আহবান করেছিলেন, খলিফাগণ সে সমস্ত দেশ জয় করে প্রকৃতঅর্থে তাঁর পরিকল্পনাকেই বাস্তবায়ন করেছে ।

পরবর্তীতে, খুব শীঘ্রই একই পদ্ধতি ও মূলনীতি অনুসরণ করে নতুন নতুন বিজয় অভিযানের প্রস্তুতি নেয়া হয়। রাসুল(সা.) এর মূলনীতি অনুসরণ করার কারণে ইসলামী রাষ্ট্র দেশ জয়ের ব্যাপারে কখনো বিশেষ কোন পছন্দকে প্রাধান্য দেয়নি। কিংবা, এ কাজ কতোটা সহজ বা কতোটা কঠিন এ বিষয়েও মুসলিমরা কখনো চিন্তা-ভাবনা করেনি। যদিও মিশর জয় করা মুসলিমদের জন্য তুলনামূলক ভাবে সহজ ছিল এবং দারিদ্রপীড়িত উত্তর আফ্রিকার রুক্ষ মরুময় প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে সে অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণ ধনসম্পদও ছিল, কিন্তু, তারপরেও এ সমস্ত কোন বিষয়ই কখনো মুসলিমরা বিবেচনা করেনি। কারণ, তাদের বিভিন্ন দেশজয়ের পেছনের একমাত্র কারণ ছিল ইসলামের বাণীকে সে সমস্ত অঞ্চলে পৌঁছে দেয়া। মূলতঃ এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই মুসলিমরা প্রাচূর্যমন্ডিত কিংবা প্রাচূর্যহীন সকল রাষ্ট্রকেই মুক্ত করেছে। অথবা, কোন দেশের জনগণ যখন বিজয়ের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে বাঁধাকেও তারা অবলীলায় অপসারণ করেছে। এ কারণেই বিভিন্ন দেশে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেয়ার পেছনে সে দেশে ধনসম্পদের উপস্থিতি কিংবা তাদের দারিদ্রপীড়িত অবস্থা কখনো মূল বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়নি। কিংবা, কোন জনগোষ্ঠির ইসলাম গ্রহন করা বা প্রত্যাখান করাও ইসলামের বাণী বহন করার পথকে রুদ্ধ করতে পারেনি। প্রকৃতঅর্থে, মুসলিমদের বিভিন্ন দেশজয় করার মূলকারণই ছিল ইসলামের আহবানকে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত করা এবং সেইসাথে ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা। কারণ, ইসলামের এই বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব থেকেই উৎসরিত হয়েছে এক পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, যা এই পৃথিবীর প্রতিটি দেশে, প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া জরুরী।

পবিত্র কোরআনে পরিস্কার ভাবে জিহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং এর বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। একই সাথে, কোরআনে এ বিষয়েও জোর দেয়া হয়েছে যে, জিহাদ একমাত্র ইসলাম অনুমোদিত পদ্ধতি অনুসারেই হতে হবে এবং একমাত্র ইসলামের আহবান বিস্তৃতির লক্ষ্যেই হতে হবে। এ ব্যাপারে শক্তিশালী আয়াত নাযিল করে আল্লাহতায়ালা মুসলিমদের তাঁর পথে জিহাদের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহতায়ালা সুরা আনফালে বলেছেন,

*ÒGes †Zvgiv Zv‡`i mv‡_ ZZ¶b chš h× Ki hZ¶b chš bv (cw_ex †_‡K) wdZbv `ixfZ nq Ges দ্বীন কেবল আল্লাহ'র জন্যই wbw`ó nq|Ó* [সুরা আল–আনফালঃ ৩৯]

তিনি সুরা বাকারায় বলেছেন,

*ÒGes †Zvgiv Zv‡`i mv‡_ h× Ki hZ¶b chš না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং দ্বীন কেবল আল্লাহ'র জন্যই নির্দিষ্ট হয়। অতঃপর hw` Zviv wbeZ nq, Z‡e AZ¨vPvix e¨ZxZ Avi Kv‡iv mv‡_ kÎ"Zv †bB|Ó* [সুরা বাকারাহ্ঃ ১৯৩]

আল্লাহতায়ালা সুরা তওবাতে বলেছেন,

*Òh× Ki Zv‡`i mv‡_ hviv আল্লাহর উপর ঈমান আনে না, আর না ঈমান আনে কিয়ামত দিবসের উপর, না তারা নিষেধ করে তা হতে যা থেকে আল্লাহ্ ও তাঁর ivmj wb‡la K‡i‡Qb Ges Zv‡`i mv‡_ hviv Avn‡j wKZve‡`i ga¨ n‡Z mZ¨Øxb‡K ¯xKwZ †`q bv, †h chš bv Zviv ¯ZtùZ AvbM‡Z¨i mv‡_ wRwhqv c`v‡b m¤úZ nq|Ó*
[সুরা তওবাঃ ২৯]

অন্যান্য অনেক আয়াতের সাথে এই আয়াতগুলোও মুসলিমদের জিহাদ করার নির্দেশ দিয়েছে এবং জিহাদের মূল উদ্দেশ্য কি হবে তার ইঙ্গিতও এখানে দেয়া হয়েছে। মূলতঃ এ ধরনের আয়াতগুলোই সবসময় মুসলিমদের অন্যান্য দেশ জয় করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, দ্বীন ইসলাম প্রচারের ভিত্তিতেই মূলতঃ ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করা হয়েছিল এবং এ উদ্দেশ্যেই শক্তিশালী মুসলিম সেনাবাহিনী গঠিত হয়েছিল। তাই একথা অস্বীকার্য যে, জিহাদ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত একটি বিষয় এবং এর মাধ্যমেই মুসলিমরা বিভিন্ন দেশে বিজয় পতাকা উত্তোলন করেছিল। ইসলামের দাওয়াত বহনের এই গুরুদায়িত্ব আবারও মুসলিমদেরকে ইসলামী রাষ্ট্র ফিরিয়ে দেবে।

## ইসলামের বিজয়যাত্রা সুসংহতকরণঃ

অতীতে মুসলিমরা বহু দেশ জয় করে সেখানে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছে। বস্তুতঃ ইসলামই তাদের শাসন-ক্ষমতা ও নেতৃত্ব-কর্তৃত্বে উপবিষ্ট হবার নির্দেশ দিয়েছে। কারণ, অমুসলিমদের দ্বারা শাসিত হওয়া মুসলিমদের জন্য নিষিদ্ধ। আল্লাহতায়ালা সুরা নিসাতে বলেছেন,

*"আল্লাহ কখনোই মু'মিনদের উপর কাফিরদেরকে Rb¨ †Kvb c_ ivL‡eb bv|Ó* [সুরা নিসাঃ ১৪১]

এছাড়া, আল্লাহতায়ালা সম্মান ও মর্যাদা মু'মিনদের জন্য নির্ধারিত করেছেন। তিনি সুরা মুনাফিকুনে বলেছেন,

*"এবং সম্মান ও মর্যাদা তো শুধু আল্লাহ, তাঁর রাসুল এবং মু'মিনদের জন্যই নির্দিষ্ট, কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।"*
[সুরা মুনাফিকুনঃ ৮]

আল্লাহতায়ালা মুসলিমদের ততক্ষন পর্যন্ত প্রতিপত্তি, শাসন-ক্ষমতা এবং নেতৃত্ব দেননি, যতক্ষন পর্যন্ত না তারা তাদের মনমানসিকতাকে সত্যিকার ভাবে ইসলামের আলোকে গঠন করতে পেরেছে। আর প্রকৃত অর্থে, এ মানসিকতা বলতে বোঝায়, শাসন-কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব অর্জনের মাধ্যমে ইসলামকে পরিপূর্ণ ভাবে বাস্তবায়ন করা এবং ইসলামের বাণীকে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত করা, ক্ষমতা অর্জনের মোহে মত্ত হয়ে যাওয়া নয়। মুসলিমরা যতক্ষন পর্যন্ত না এই যোগ্যতা ও মানসিকতা অর্জন করেছে [অর্থাৎ, তারা বুঝতে পেরেছে জনগণকে শাসন করা বলতে আসলে কি বোঝায় এবং আল্লাহর কাছে এর জবাবদিহিতা কতোটুকু] ততক্ষন পর্যন্ত আল্লাহতায়ালা তাদেরকে শাসন-কর্তৃত্ব এবং জনগণের দেখাশোনা করার দায়িত্ব থেকে সরিয়ে রেখেছেন। বস্তুতঃ ইসলামের অভূতপূর্ব সৌন্দর্য নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত এই সমস্ত ন্যায়পরায়ণ শাসকদের বিভিন্ন কর্মকান্ড ও উক্তির মধ্য দিয়ে অত্যন্ত জোরালো ভাবে প্রকাশিত হয়েছে এবং জনগণও এ আলোকিত সৌন্দর্যের সাক্ষী হয়েছে, যখন শাসকরা তাদের শরীয়া'হ্ আইন-কানুনের মাধ্যমে শাসন করেছে। এর অবশ্যম্ভাবী ফলাফল হিসাবে, এই সমস্ত জনগোষ্ঠির মানুষ ইসলামের সৌন্দর্যে এতো বেশী মুগ্ধ হয়েছে যে, তারা স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করেছে। ফলে, ইসলামের প্রতিপত্তি, নেতৃত্ব ও ক্ষমতার তারাও অংশীদার হয়েছে এবং সেইসাথে তাদের দেশগুলোও মুসলিম উম্মাহ'র অংশ হিসাবে ইসলামী রাষ্ট্রের অর্ন্তভূক্ত হয়ে গেছে।

বিজিত এ সমস্ত দেশগুলোকে ইসলামী আইন–কানুন অনুসারে শাসন করে ইসলামের এই বিজয়যাত্রাকে সুসংহিত করা হয়েছে, যা পরবর্তীতে আরও শক্তিশালী হয়েছে এ সমস্ত অঞ্চলের মানুষের ইসলাম গ্রহনের মধ্য দিয়ে **[until the conquest of countries by the Islamic State was a given until the Day of Judgement]** । মূলতঃ এ অভিযানগুলো বিজিত জনগোষ্ঠির মানুষদেরকে তাদের পূর্ববর্তী অবস্থা ও শাসন-ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ন ভাবে বিচ্ছিন্ন করেছিল এবং তাদেরকে অবিশ্বাসী জনগোষ্ঠি থেকে বিশ্বাসী জনগোষ্ঠিতে রূপান্তরিত করেছিল। সেইসাথে তাদের ভূ-খন্ড দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হয়েছিল। ইসলামী শাসন-ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেবার পূর্ব পর্যন্ত এই অবস্থা বিরাজ করে। তবে, ইসলামী শাসন-ব্যবস্থা ও মুসলিমদের কর্তৃত্ব ধ্বংস হয়ে যাবার পরও এই অঞ্চলের মানুষেরা মুসলিমই থেকে গিয়েছিল এবং তাদের ভূ-খন্ডগুলোও মুসলিম ভূ-খন্ড হিসাবেই বিবেচিত। যদিও বর্তমানে ইসলামী রাষ্ট্র অনুপস্থিত, কিন্তু তারপরও যে সমস্ত দেশগুলো একসময় মুসলিমরা জয় করেছিল সে সমস্ত দেশের মানুষ এখনও ইসলামকেই আঁকড়ে ধরে আছে এবং তাদের ভূ-খন্ডগুলো এখনও মুসলিম ভূ-খন্ড হিসাবেই বিবেচিত হচ্ছে। এজন্য, এই সমস্ত অঞ্চলগুলোতে ইসলামের কর্তৃত্ব পূনঃপ্রতিষ্ঠিত করে আবারও এ অঞ্চলে ইসলামী শাসন-ব্যবস্থা ফিরিয়ে নিয়ে আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

মূলতঃ কিছু কিছু বিষয় ইসলামের বিজয়যাত্রাকে স্থায়ী করতে এবং সেইসাথে ইসলামের বীজকে বিচারদিবস পর্যন্ত মানুষের অন্তরে প্রোথিত করতে সাহায্য করেছিল। এগুলোর মধ্যে কিছু বিষয় বিজিত ভূ-খন্ডগুলোকে শাসন করা সহজ করেছিল, যেমনঃ ইসলামী আইন-কানুনের প্রকৃতি। আবার অন্যকিছু বিষয় ছিল যা বিজিত জনগোষ্ঠির মানুষকে ইসলাম গ্রহনে উদ্বুদ্ধ করেছিল, যেমনঃ জনগণের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকদের ব্যবহার। আবার কিছু কিছু বিষয় ধর্মান্তরিত নও মুসলিমদের অন্তরে চিরস্থায়ী ভাবে ইসলামকে প্রোথিত করতে সাহায্য করেছিল, যেমন, ইসলামী আকীদাহ্'র প্রকৃতি।

সংক্ষেপে এই বিষয়গুলো নিম্নরূপে সাজানো যায়ঃ

১. ইসলাম একটি যৌক্তিক আকীদাহ্ বা বিশ্বাস, যা মানুষকে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়ায় চিন্তা–ভাবনার মাধ্যমে ইসলাম গ্রহন করতে বাধ্য করে। এজন্য, যখনই কোন মানুষ ইসলাম গ্রহন করে, তখনই সে চিন্তাশীল ব্যক্তিতে পরিণত হয়। এর কারণ হল, ইসলাম গ্রহনের সাথে সাথেই তার চিন্তা-চেতনা বিশ্ব-ব্রহ্মান্ড এবং সৃষ্ট জগতের দিকে ধাবিত হয় এবং আল্লাহ্র এ সৃষ্ট জগতের ব্যাপকতা ও রহস্যময়তা প্রতিনিয়ত তাকে স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত করে তোলে। এ চিন্তা-চেতনাই তাকে মহান স্রষ্টার হুকুম-আহ্কাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে, [শরীয়া'র মূল উৎস থেকে] বিভিন্ন হুকুম অনুসন্ধান করতে এবং তা অনুযায়ী তার জীবনের সমস্ত সমস্যা সমাধান করতে উৎসাহিত করে। আর এভাবেই, ইসলাম ব্যক্তি মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয় এবং সে স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে, জেনেবুঝে ইসলাম দিয়ে তার জীবন পরিচালনা করে।

২. ইসলাম মুসলিমদের জ্ঞানার্জন করা এবং ইসলামের রীতি-নীতি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অবহিত থাকাকে বাধ্যতামূলক করেছে। তাই, ইসলামকে পরিপূর্ণ ভাবে জানা ও বোঝার জন্য শুধু মুখে দুই কালেমা উচ্চারণ করা যথেষ্ট নয়। বরং, একজন মুসলিমের উচিত ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞানার্জন করা। মানুষ, মহাবিশ্ব ও জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইসলামের আলোকে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি তৈরী করা এবং ইসলাম এদের মধ্যকার পারস্পারিক সম্পর্ক কিভাবে নির্ধারণ করেছে সে ব্যাপারে অনুসন্ধান করা মুসলিমদের দায়িত্ব। কারণ, এসব

বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান মানুষের চিন্তার জগতকে বিস্তৃত ও প্রসারিত করে, তার ধ্যান-ধারণাকে স্বচ্ছ করে এবং সর্বোপরি প্রতিনিয়ত তার মনমানষিকতাকে উন্নত করে - যা তাকে অন্যদের শিক্ষককে পরিণত করে।

৩. বস্তুতঃ ইসলামী জীবনাদর্শ এবং এর শরীয়াহ্'র প্রকৃতি হল, এ সম্পর্কিত জ্ঞানকে ধাপে ধাপে ও ক্রমান্বয়ে অর্জন করার প্রয়োজন হয়। এটি একজন মুসলিমকে সে যে সমাজে বসবাস করে সেখান থেকে জ্ঞানার্জন করার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার শিক্ষা দেয়। মুসলিমরা সবসময় বাস্তবায়ন করাই লক্ষ্যেই ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেছে। একারনেই মুসলিমরা প্রচন্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেছে। ইসলামী আকীদাহ্ তাদের অন্তর ও হৃদয়ে দৃঢ় ভাবে প্রোথিত হয়ে যাবার কারনে তাদের ছিল চর্তুদিক পরিবেষ্টনকারী ধ্যান-ধারণা এবং সেইসাথে ছিল সমৃদ্ধ ও দিগন্ত বিস্তৃত জ্ঞানভান্ডার। এছাড়া, মুসলিমরা সাধারনত কোন বিষয় সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা ও চিন্তাভাবনা করার পরই সে ব্যাপারে ইসলামের হুকুম-আহকাম কি হবে সে সিদ্ধান্ত গ্রহন করতো। কারণ, এ ক্ষেত্রেও ইসলামকে বাস্তব ভাবে প্রয়োগ করাই মূল বিষয় হিসাবে বিবেচিত হত।

প্রকৃতঅর্থে, মুসলিমরা শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জন করার খাতিরে কখনো ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা কিংবা চিন্তাভাবনা করেনি। কারণ, এক্ষেত্রে এই জ্ঞানসাধনা তাদেরকে শুধু ইসলামের হুকুম-আহকাম বা চিন্তাচেতনায় পরিপূর্ণ জীবন্ত এক লাইব্রেরী বা বইতে পরিণত করতো, যার কোন বাস্তব প্রয়োগ থাকতো না। এই ধরনের জ্ঞানসাধনা তাদেরকে জ্ঞানের এমন এক ধারকে পরিণত করতো, যা তাদের কার্যকলাপ ও জীবনাচরণকে প্রভাবিত করতো না এবং লব্ধ সে জ্ঞানের আলোকে সমাজ পরিবর্তন করার কাজেও উদ্বুদ্ধ করতো না। অর্জিত এই জ্ঞান সঞ্চিত জলাধারের মতো সমাজে কোন প্রভাব না ফেলেই একসময় শুকিয়ে যেত। এছাড়া, মুসলিমরা ইসলামকে শুধুমাত্র কিছু উপদেশাবলীর সমষ্টি হিসাবেও গ্রহন করেনি। কারণ, তা হলে, ইসলামী আদর্শ তাদেরকে সংকীর্ণ চিন্তাচেতনার ব্যক্তিবর্গে পরিণত করতো, যার ফলে তারা বিশ্বাসের সাথে তাদের দৈনন্দিন জীবনের কার্যকলাপের সম্পর্ক স্থাপন করতে ব্যর্থ হতো। মুসলিমরা খুব সতর্ক ভাবে বিপদজনক এই দুটি পথকে পরিহার করেছে; একটি হল, শুধুমাত্র জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা করা। আর, অন্যটি হল, ইসলামকে শুধু কিছু উপদেশাবলীর সমষ্টি হিসাবে গ্রহন করা। বস্তুতঃ ইসলামের নির্ধারিত পথেই মুসলিমরা ইসলাম ও এর হুকুম-আহকাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেছে। আর, তা হল আলোকিত চিন্তার মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তব ভাবে প্রয়োগ করা।

৪. ইসলাম প্রগতিশীল আদর্শ। এ আদর্শ সবসময়ই মুসলিমদেরকে নতুন নতুন উচ্চতার দিকে নিয়ে যায় এবং তাদেরকে পরিপূর্ণতা অর্জনের আলোকিত এক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত করে। বস্তুতঃ ইসলাম মুসলিমদেরকে বাস্তব জীবনে কিছু কাজ করতে বাধ্য করে। আর এ সমস্ত কার্যাবলী মুসলিমদেরকে ধীরে ধীরে এমন এক পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যায় যেখানে তারা আধ্যাত্মিক উচ্চতা, মানসিক শান্তি এবং সত্যিকারের সুখকে অনুভব করতে পারে। মানুষ যখন এ উচ্চতায় পৌঁছে যায়, তখন সে সেখানেই অবস্থান করতে চায়। সে অবস্থান থেকে পতিত হতে চায় না। কিন্তু, বাস্তবতা হলো, পরিপূর্ণতার এ রকম এক উচ্চতায় পৌঁছানো যত না কঠিন, সে অবস্থানকে ধরে রাখা তার চাইতেও কঠিন কাজ। এজন্য, মুসলিমদেরকে তাদের কাজের ব্যাপারে হতে হবে দৃঢ় প্রত্যয়ী, সংকল্পবদ্ধ ও চিন্তাশীল। এ সমস্ত গুনাবলীর মাধ্যমেই মুসলিমরা তাদের অর্জিত উচ্চতা ও প্রগতিকে ধরে রাখতে পারবে।

মুসলিমদের করণীয় এই সমস্ত কার্যাবলী আসলে সামগ্রিক ইবাদতের সমষ্টি; যাদের মধ্যে কিছু অবশ্য পালনীয় [ফরজ], আর কিছু আনুসাঙ্গিক। সমগ্র মুসলিমের জন্য অবশ্যপালনীয় এ ফরজ কর্তব্যগুলো স্বাভাবিক ভাবেই সমগ্র জাতিকে প্রগতির সাধারণ এক উচ্চতায় নিয়ে আসতে সহায়তা করে। আর, অবশ্যপালনীয় কর্তব্য ছাড়া অন্যসব কাজগুলো প্রতিনিয়ত মানুষকে পরিপূর্ণতা অর্জন করতে উৎসাহিত করে।

ইবাদত হিসাবে করণীয় এই সমস্ত কাজগুলো আসলে দুরূহ বা ভারবহ কোন দায়িত্ব নয়। কিংবা, নয় ক্লান্তিকর বা দমবন্ধকরা কোন অনাঙ্খিত অভিজ্ঞতা। এ সমস্ত কার্যাবলী মানুষকে তার জীবনের স্বাভাবিক আনন্দ, উচ্ছ্বাস কিংবা প্রাণ চঞ্চলতা থেকেও বঞ্চিত করে না। না মানব প্রকৃতিকে অস্বীকার করে তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগত চাহিদাগুলোকে দমিয়ে রাখে। আসলে, ইবাদত হিসাবে করণীয় এই সমস্ত কর্তব্যগুলো, বিশেষ করে বাধ্যতামূলক কর্তব্যগুলো পালন করা যে কারও জন্য খুবই সহজ একটি ব্যাপার এবং প্রতিটি মানুষের পক্ষে তা পালন করা সম্ভব। এই ইবাদতগুলো মানুষকে তার জীবন উপভোগ করার পথেও বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় না। বস্তুতঃ অবশ্য পালনীয় ইবাদতগুলো ছাড়া, আনুসাঙ্গিক অন্যান্য ***g\b `e*** ইবাদতগুলো [যে সমস্ত কাজ করার জন্য মুসলিমদের উৎসাহিত করা হয়েছে] মুসলিমরা প্রচন্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে পালন করে। কারণ, তারা জানে এই সমস্ত কাজের মাধ্যমেই তারা আল্লাহ'র সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে।

৫. অতীতের মুসলিমরা দ্বীন ইসলামের আলোকিত বাণীকে সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে দেবার লক্ষ্যেই অন্যান্য দেশ জয় করেছে। এজন্য তারা বিশ্বাস করতো যে, তারা এমন এক বাহিনী যাদের অন্তর মহানুভবতা ও হেদায়েতে পরিপূর্ণ। মুসলিমরা যখন কোন দেশ জয় করতো,

তখন সে দেশকে ইসলাম দিয়েই শাসন করতো। আর, কোন জনগোষ্ঠী ইসলাম গ্রহন করার সাথে সাথেই তারা মুসলিমদের মতোই সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করতো এবং সেইসাথে, মুসলিমদের জন্য যা যা অবশ্যপালনীয় তারা সে সমস্ত কার্যাবলীও পালন করতে বাধ্য থাকতো। বিজিত নতুন ভূখন্ড ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনস্থ অন্যান্য অঞ্চলের মতোই সমান অধিকার ও মর্যাদা উপভোগ করতো এবং ইসলামী রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে বিবেচিত হত। কারণ, ইসলামী শাসনব্যবস্থা ঐক্য ও সমতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এ কারণেই, বিজিত ভূমির জনগোষ্ঠী কখনো অনুভব করেনি যে, তারা দখলদারিত্ব কিংবা আগ্রাসনের শিকার হয়েছে। না তারা ঔপনিবেশিকতার কোন চিহ্ন কোনদিন প্রত্যক্ষ করেছে। সুতরাং, এটা বিস্ময়কর নয় যে, ইসলামের বাস্তব প্রয়োগকে স্বচক্ষে অবলোকন করার পর বিজিত জনগোষ্ঠীর মানুষেরা স্বেচ্ছায় দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে এসেছে।

৬. ইসলামের জীবনাদর্শ এবং হুকুম-আহকাম সম্পর্কিত জ্ঞান কোন বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য নির্দিষ্ট নয়। বরং, এটা সকলের জন্য উম্মুক্ত একটি বিষয়। প্রকৃত অর্থে, বিজিত ভূমির জনগোষ্ঠীকে ইসলামের আকীদাহ্ ও হুকুম-আহকাম সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া মুসলিমদের জন্য বাধ্যতামূলক, যেন তারা ইসলামী আকীদাহ্ ও জীবনাদর্শের প্রকৃত সৌন্দর্য ও প্রকৃতিকে গভীর ভাবে অনুভব করতে পারে। আল্লাহর রাসুল(সাঃ) ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনস্থ অঞ্চলগুলোর জনগোষ্ঠীকে ইসলাম দিয়ে শাসন করার লক্ষ্যে সে অঞ্চলে গর্ভনর ও বিচারক নিয়োগ করতেন এবং মানুষকে ইসলামের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে শিক্ষা দেবার জন্য শিক্ষক নিয়োগ করতেন। The Muslims who came after him (saw) conquered many countries and set up rulers and teachers who would teach the people fiqh and Qur'an. The people welcomed Islamic education with open arms until their culture became Islamic. This included those who chose not to embrace Islam.

৭. ইসলামী শরীয়াহ্ শ্বাশত ও সার্বজনীন এবং সেইসাথে এর রয়েছে মানবজীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান দেবার ক্ষমতা। এ কারণেই, মুসলিমদেরকে কখনও বিজিত অঞ্চলগুলোর আইন-কানুন সম্পর্কে গবেষনা করতে হয়নি। কিংবা, যে আইন-কানুন দিয়ে তারা জীবনের সব সমস্যার সমাধান করেছে (শরীয়াহ্ আইন), সে আইন-কানুনের সাথে বিজিত অঞ্চলগুলোতে বিদ্যমান আইন-কানুনের কোন রকম সমঝোতাও করতে হয়নি; না তারা এ সকল অঞ্চলে বিদ্যমান আইন হতে কোনরকম আইন গ্রহণ করেছে। কোন অঞ্চল বা দেশ জয় করার সাথে সাথেই তারা সেখানে প্রথমদিন থেকেই ইসলামী শাসনব্যবস্থা এবং শরীয়াহ্ আইনকে পুরোপুরি বা বাস্তবায়ন করেছে। ইসলামী শাসনব্যবস্থা বা শরীয়াহ্ আইন বা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তারা কোনরকম পর্যায়ক্রমিক পদক্ষেপও গ্রহণ করেনি। যেমনঃ এমন কখনও হয়নি যে, তারা বিজিত কোন অঞ্চলে ক, খ ও গ আইন বাস্তবায়ন করেছে, কিন্তু ঘ আইন বাস্তবায়ন করেনি। এই ভেবে যে, ঘ আইনের বাস্তবায়ন হয়তো সে অঞ্চলে ইসলামী শাসনব্যবস্থাকে বিতর্কিত হতে পারে, কিংবা ঘ আইনের বাস্তবায়ন মানুষকে ইসলাম বিমুখ করতে পারে; অথবা, এ আইন মেনে নেয়া জনগণের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর হতে পারে। বস্তুতঃ অতীতে ইসলামকে কখনই এরকম পর্যায়ক্রমিক ভাবে ধীরে ধীরে বাস্তবায়ন করা হয়নি। কিংবা, বিচ্ছিন্ন বা খন্ডিত আকারে এখানে সেখানে শরীয়াহ্ আইন প্রয়োগ করা হয়নি।

আসলে, ইসলামকে পরিপূর্ণ ভাবে প্রয়োগের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় এমন কোন পরিস্থিতি মুসলিমরা কখনও সহ্য করেনি। তারা ইসলামের আহবানকে সমগ্র বিশ্বের দরবারে পৌঁছিয়ে দেয়া র লক্ষ্যেই বিভিন্ন দেশ জয় করেছে এবং সেইসাথে ইসলামী শাসনব্যবস্থাকে পরিপূর্ণ ভাবে বাস্তবায়ন করে বিজিত অঞ্চলগুলোর দূর্নীতিগ্রস্থ, ঘুঁনেধরা ও টলায়মান শাসনব্যবস্থাকে সম্পূর্ন ভাবে বদলে দিয়েছে। এ কাজ করতে গিয়ে তাদের পুরনো ব্যবস্থাকে সমূলে উৎপাটিত করতে হয়েছে এবং সম্পূর্ন নতুন এক ব্যবস্থার দ্বারা সে ব্যবস্থাকে সামগ্রিক ভাবে প্রতিস্থাপন করতে হয়েছে। এ কারণেই বিজিত নতুন নতুন অঞ্চলের জনগণকে প্রথমদিন থেকেই শাসন করা মুসলিমদের জন্য ছিল খুব সহজ একটি ব্যাপার। আর, এ কারণে বিজিত এ অঞ্চলগুলোতে ইসলামী শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ন ও দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শাসন করতে গিয়ে মুসলিমরা কখনও কোন আইনপ্রণয়ন সংক্রান্ত জটিলতার সম্মুখীন হয়নি কিংবা, কুফর ও ইসলামী শাসনব্যবস্থার মাঝামাঝি কোন পর্যায়ও অতিক্রম করেনি। তাদের আহবান ছিল সুস্পষ্ট; আর এর ভিত্তি ছিল ইসলামী আকীদাহ্। তাদের শাসনব্যবস্থা, আইন-কানুন ও সমস্ত বিধিবিধান এ আকীদাহ্ থেকেই উৎসরিত হয়েছিল। বস্তুতঃ মুসলিমদের প্রণীত আইন-কানুন ছিল শরীয়াহ্ আইন, যা যে কোন মানবগোষ্ঠীর জন্য, যে কোন স্থানে এবং যে কোন সময়ে প্রযোজ্য।

## বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে একটি একক জাতিতে পরিণত করাঃ

সমস্ত আরব উপদ্বীপের জনগোষ্ঠী দ্বীন ইসলামে প্রবেশ করার পর এবং আরব ভূখন্ড থেকে মূর্তিপূজা নিশ্চিহ্ন হবার পর আল্লাহর রাসুল(সাঃ) ইন্তিকাল করেন। এ সময় সমস্ত আরব উপদ্বীপ ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের অর্ন্তভূক্ত এবং সম্পূর্ন ভাবে ইসলামের আকীদাহ্ ও শাসনব্যবস্থা থেকে উদ্ভুত আইন-কানুন দিয়ে শাসিত। আল্লাহতায়ালা তাঁর দ্বীনকে পরিপূর্ণ করা, মুসলিমদের উপর তাঁর নিয়ামতকে সম্পূর্ন করা এবং দ্বীন ইসলামকে তাঁর

পছন্দনীয় জীবনব্যবস্থা হিসাবে মনোনীত করার পরই রাসুল(সাঃ) ইন্তিকাল করেন। এর মধ্যে প্রতিবেশী অঞ্চলগুলোর রাজা ও শাসকবৃন্দের কাছে দূত পাঠিয়ে এ অঞ্চলের জনসাধারণকে ইসলামের দিকে আহবান করা এবং মু'তাহ ও তাবুকের প্রান্তরে সৈন্যদল পাঠিয়ে রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ করাও অর্ন্তভূক্ত ছিল।

এরপর খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও এ বিজয় অভিযাত্রা চলতে থাকে। খুলাফায়ে রাশেদীনের সময় সর্বপ্রথম ইরাক জয় করা হয় এবং এ সময় এ অঞ্চলের অধিবাসীরা ছিল পারস্য ও আরব জাতির মিশ্রণ; যারা খ্রিষ্টান, মাযদাকিয়া এবং জরুষ্ট্রিয়ান ধর্মে বিশ্বাস করতো। এরপর, জয় করা হয় পারস্য হয় এবং তারপর আল-শাম অঞ্চল। পারস্য অঞ্চলে জরুষ্ট্রিয়ান, ইহুদী ও খ্রিষ্ট ধর্মে বিশ্বাসী লোকেরা বসবাস করতো এবং পারসিকরা এ অঞ্চল শাসন করতো। অপরদিকে, আল-শাম ছিল রোমানদের উপনিবেশ যেখানে রোমান সংস্কৃতি ও খ্রিষ্ট ধর্মের প্রাবল্য ছিল। এ অঞ্চলে প্রধানত সিরীয়, আর্মেনীয়, ইহুদী, আরব এবং স্বল্প সংখ্যক রোমান বসবাস করতো। এরপর, মুসলিমরা মিশর জয় করে এবং এ অঞ্চলেও কপ্ট, ইহুদী এবং রোমান জাতির লোকেরা মিশ্রিত ভাবে বসবাস করতো। এরপরের পালায় বিজিত হয় উত্তর আফ্রিকা, যেখানে আফ্রিকার বার্বার জাতি রোমানদের শাসন-কর্তৃত্বের নীচে বসবাস করতো। খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগের পরে উমাইয়াদের শাসনামলে সিন্ধ, খাওয়ারিজম এবং সমরকান্দ জয় করে ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে যুক্ত করা হয়। এ সময়েই আল-আন্দালুস জয় করা হয় এবং একে ইসলামী রাষ্ট্রের একটি প্রদেশে পরিণত করা হয়।

এ সমস্ত বিজিত অঞ্চলের মানুষেরা ছিল বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর; তাদের ছিল বিভিন্ন ধরনের ধর্মবিশ্বাস, ভাষা, সংস্কৃতি, রীতিনীতি, প্রথা ও আইনকানুন। স্বাভাবিক ভাবেই তারা মানসিক ও আচরনগত দিক থেকে একে অন্য থেকে ছিল পুরোপুরি ভিন্ন। সুতরাং, এ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও ধর্মবিশ্বাসের মানুষকে একটি নির্দিষ্ট জীবনব্যবস্থা, ভাষা, সংস্কৃতি ও আইনকানুন দিয়ে শাসন করে তাদের একটি একক জাতিতে পরিণত করা ছিল সত্যিকারের একটি ব্যাপক ও দুরূহ কাজ এবং এ কাজে সফলতা অর্জন করা ছিল অসাধারন ও বড় মাপের সাফল্য। কিন্তু, ইসলামী জীবনাদর্শের মাধ্যমে বিরাট এ সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে এবং (পৃথিবীর ইতিহাসে) এ সফলতা অর্জন করেছে শুধু ইসলামী রাষ্ট্র। ইসলামের পতাকাতলে এবং ইসলামী শাসনব্যবস্থার নীচে আসার সাথে সাথেই তারা (বিজিত জনগোষ্ঠী) এক *D¤§n* বা জাতি হিসাবে বিবেচিত হয়েছে; আর তা হল *gmwjg D¤§n*। বস্তুতঃ ইসলামী আকীদাহ্ এবং শাসনব্যবস্থাই ছিল অসাধারন এ সাফল্যের মুলভিত্তি। ভিন্ন ধরনের এই সব জনগোষ্ঠীকে সফলতার সাথে একটি জাতিতে পরিণত করার পেছনে অনেক ধরনের কারণ রয়েছে। কিন্তু, নিম্নবর্ণিত কারণগুলো এগুলোর মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ:

১. ইসলামের শিক্ষা।

২. জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে এবং কাজেকর্মে মুক্ত অঞ্চলের জনসাধারণের সাথে মুসলিমদের স্বাভাবিক ভাবে মেলামেশা করা।

৩. বিজিত অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর দ্রুত ইসলাম গ্রহণ।

৪. ইসলাম গ্রহণকারীদের জীবনাচরণে আমুল পরিবর্তন এবং এর মাধ্যমে অসহনীয় জীবন থেকে সুস্থ ও সুন্দর জীবনে উত্তরণ।

বস্তুতঃ ইসলামের শিক্ষা দ্বীন ইসলামের দিকে মানুষকে আহবান করার বাধ্যবাধকতা অর্পণ করে এবং যখন যেখানে সম্ভব এ আলোকিত বাণীকে ছড়িয়ে দিতে উদ্বুদ্ধ করে। এ কারণেই জিহাদের মাধ্যমে অন্যান্য অঞ্চল বা ভূখন্ড জয় করার প্রয়োজন হয়; যেন সে অঞ্চলের মানুষেরা খুব সহজে ইসলামের আলোকিত আদর্শ এবং এর ন্যায়ভিত্তিক আইনকানুনের যথার্থতা অনুধাবন করতে পারে। ইসলাম আবার যে কোন ব্যক্তি বা জাতিকে ইসলাম গ্রহণ না করে তাদের নিজস্ব ধর্মবিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরার স্বাধীনতাও দেয়। এক্ষেত্রে, তাকে শুধমাত্র ইসলামের লেনদেন ও শাস্তি সংক্রান্ত বিধিবিধানকে মেনে চলতে হয়। শেষোক্ত এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ; কারণ, এই বিষয়টিই মূলতঃ মুসলিম ও অমুসলিম জনসাধারণের কর্মকান্ডের মাঝে একাত্মতা ও বন্ধন তৈরী করে। তারা একই ব্যবস্থা দিয়ে শাসিত হয় এবং জীবনের সমস্যাগুলোকে একই ব্যবস্থা দিয়ে সমাধান করে, যা তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ রাখে। ঐক্যের এ ভিত্তিই অমুসলিমদেরকে মুসলিমদের মতোই সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে বিবেচনা করতে সাহায্য করে। তারা তখন একই জীবনব্যবস্থার অংশীদার হয়ে এবং একই রাষ্ট্রের অভিভাকত্বের নীচে থেকে একই রকম মানসিক সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে।

এছাড়া, ইসলামের শিক্ষা শাসিত জনগোষ্ঠীকে জাতি, গোত্র বা বর্ণের ভিত্তিতে বিবেচনা না করে মানুষ হিসাবে বিবেচনা করতে শেখায়। এ কারণে, ইসলামের সামাজিক ও শাস্তি সম্পর্কিত আইনকানুনগুলো কোন রকম পার্থক্য ছাড়াই মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের উপর কার্যকরী করা হয়।

আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন,

*Ò‡Kvb m¤c`v‡qi kÎ“Zv ev Nbv †hb †Zvgv‡`i b¨vq cwZôv †_‡K wei Z bv iv‡L; †Zvgiv b¨vqwePvi Ki; Avi, GUvB ZvK Iqvi*
*নিকটবর্তী এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই, আল্লাহ তোমাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে খুব ভাল করে জানেন।"*[সুরা মায়িদাহঃ ৮]

ইসলামী রাষ্ট্রে আইনের চোখে সকল মানুষ সমান। রাষ্ট্রের শাসক জনগণের বিষয়াদি দেখাশুনা করবে এবং জনগণকে শাসন করবে। আর, রাষ্ট্রের নিয়োজিত বিচারক (কাজী) কোনরকম পক্ষপাতদুষ্টতা ছাড়া জনগণের মাঝে বিদ্যমান বিবাদসমূহ নিস্পত্তি করবে। এলক্ষ্যে, বিচারক প্রতিটি নাগরিককে মানুষ হিসাবে (মুসলিম বা অমুসলিম হিসাবে নয়) বিবেচনা করে তাদের সমস্যা সমাধান করবে এবং ঝগড়া-বিবাদের ফয়সালা করবে। বস্তুতঃ ইসলামী শাসনব্যবস্থাই রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের মাঝে সত্যিকারের সমতা ও ঐক্য নিশ্চিত করে।

ইসলাম শাসকদের নির্দেশ দিয়েছে যেন রাষ্ট্রীয় কোষাগারের সহায়তায় রাষ্ট্রের সমস্ত উলাইয়াতে (প্রদেশ) বসবাসকারী মানুষের মৌলিক চাহিদার নিশ্চিত করা হয়। প্রদেশের সংগৃহীত রাজস্ব যাই হোক না কেন কিংবা সংগৃহীত সে রাজস্ব জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট হোক বা না হোক। এছাড়া, ইসলাম রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কোষাগারের জন্য বিভিন্ন উলাইয়াত থেকে কর আদায় করে তা একত্রিত করে একটি একক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলনের নির্দেশ দিয়েছে, যেন বিজিত অঞ্চলগুলো উলাইয়াত হিসাবে দৃঢ় ভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে সংযুক্ত হয় এবং তাদেরকে একটি একক ও ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করতে সহায়তা করে। বস্তুতঃ ইসলামী শাসনব্যবস্থা এরকম একটি ব্যবস্থাকে সাফল্যের সাথে নিশ্চিত করেছিল এবং এক্ষেত্রে সফলতা লাভ করেছিল।

এছাড়া, বিজিত অঞ্চলগুলোর বসবাসকারী মানুষের সাথে মুসলিমদের সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে মেলামেশা, এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর ইসলাম গ্রহন করা ও মুসলিমদের সাথে তাদের একীভূত হয়ে যাবার ব্যাপারে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল। কোন অঞ্চল বা ভূখন্ড জয় করার পরপরই সাধারনত মুসলিমরা সেখানে বসবাস করতে আরম্ভ করত এবং সে জনগোষ্ঠীর মানুষকে ইসলাম ও ইসলামের সংস্কৃতি সর্ম্পকে শিক্ষা প্রদান করত। মুসলিমরা তাদের প্রতিবেশী হিসাবে বাস করতো, সকল কর্মকান্ডে তাদের অংশীদার হত এবং একই দেশের নাগরিক হিসাবে একই আইনকানুন দিয়ে শাসিত হত। ইসলামী রাষ্ট্রে কখনই শাসক আর শাসিত কিংবা বিজয়ী আর বিজিত হিসাবে জনসাধারণ বিভাজিত হয়নি; কিংবা, মুসলিম ও আদিবাসীরা আলাদা কোন জনগোষ্ঠী হিসাবে বিচ্ছিন্ন ভাবে বসবাস করেনি। তারা সকলেই ছিল রাষ্ট্রের নাগরিক যারা প্রাত্যহিক কর্মকান্ডে একে অপরকে সবসময় সহযোগিতা করতো। মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর এ ধরনের আচরণ বিজিত জনগোষ্ঠীর কাছে একেবারেই নতুন ছিল। বস্তুতঃ এ শাসকগোষ্ঠী নিজেদেরকে জনগণের কাতারে রেখে তাদেরকে ন্যায় ও সমতার ভিত্তিতে শাসন করেছিল এবং এর ভিত্তিতেই তারা জনগণের সেবা ও তাদের বিষয়াদি দেখাশুনা করেছিল। ফলে, এ অঞ্চলসমূহের জনগোষ্ঠী অবাক বিস্ময়ে শাসকগোষ্ঠীর এমন এক আচরণের সাক্ষী হয়েছিল, যে ব্যাপারে তাদের কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। তারা উন্নত চরিত্রের শাসকদের কাছ থেকে পেয়েছিল অত্যন্ত চমৎকার আচরণ, যা তাদেরকে এই শাসকবর্গ ও ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। শাসক ও সাধারন মুসলিমরা আহলে কিতাবের (ইহুদী ও খ্রিষ্টান) নারীদেরকে বিয়ে করতো, তাদের জবাই করা পশুর মাংস ও খাবার খেত। এ সকল আচরণ মূলতঃ তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে; কারণ, তারা শাসক ও শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের উপর আরোপিত ইসলামী জীবনাদর্শের প্রভাব ও সৌন্দর্য স্বচক্ষে অবলোকন করেছে। ফলশ্রুতিতে, তারা ধীরে ধীরে মুসলিমদের সাথে একীভূত হয়ে একটি একক উম্মাহ্ বা জাতিতে পরিণত হয়েছে।

এছাড়া, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ইসলাম গ্রহণ করা কোন বিশেষ সময় বা দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং, প্রতিটি দেশের মানুষই দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করেছে। আসলে, বিজিত অঞ্চলগুলোতে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে। ফলে, পরবর্তীতে ইসলাম আর বিজয়ী মুসলিমদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করে বিজিত এইসব জনগোষ্ঠী ধীরে ধীরে মুসলিমদের সাথে একীভূত হয়েছে এবং এক উম্মাহ্'তে পরিণত হয়েছে।

এছাড়া, ইসলাম নও মুসলিমদের বুদ্ধিবৃত্তিক ভাবে উন্নততর করে তাদেরকে সামগ্রিক ভাবে পরিবর্তন করেছিল। এর ফলে, তাদের মাঝে ইসলামী আকীদাহ্ দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা কাজ করেছিল তাদের জীবনাদর্শের ভিত্তি হিসাবে। আর, এ জীবনাদর্শ থেকেই উৎসরিত হয়েছিল তাদের জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন রকম ধ্যানধারণা। ইসলাম তাদেরকে অন্ধ ও কুসংস্কাচ্ছন্ন বিশ্বাস থেকে তুলে এনে যৌক্তিক বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এ পরিবর্তন তাদেরকে মূর্তিপূজা, অগ্নিপূজা, ট্রিনিটি তত্ত্ব বা, তিন খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাস, ব্যক্তিপূজা এবং এ জাতীয় বিভিন্ন বস্তুর উপাসনা, যা তাদের চরম বুদ্ধিবৃত্তিক অধঃপতনের মূল কারণ ছিল, এগুলো থেকে এক আল্লাহ'র উপাসনার দিকে ধাবিত করেছিল। আর, এক আল্লাহ'র উপাসনাই তাদের অন্তরসমূহকে ক্রমাগত করেছিল আলোকিত। ইসলাম তাদের মৃত্যু পরবর্তী জীবনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়েছিল এবং তারা কোরআন-সুন্নাহ'র বর্ণনার ভিত্তিতেই বিষয়টি অনুধাবন করেছিল এবং বিশ্বাস করেছিল পরকালের পুরস্কার ও শাস্তির উপরও। মৃত্যু পরবর্তী জীবনের উপর দৃঢ় বিশ্বাস থাকায় তারা বুঝতে পেরেছিল ক্ষণস্থায়ী এ জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। ফলে, তারা ধাবিত হয়েছিল অনন্ত-অসীম ও চিরসুখের জীবনের খোঁজে। একইসাথে, তারা এতটুকু অবহেলা না করে দু'বাহু উম্মুক্ত করে এ জীবনকে যাপন করেছিল। তারা আল্লাহতায়ালা নির্ধারিত সঠিক পন্থা ও নির্দেশনা দিয়ে জীবন যাপনের প্রতিটি সরঞ্জামকে ব্যবহার করেছিল ও উপভোগ করেছিল জীবনের আনন্দ ও প্রাচুর্য্যকে।

ইসলাম আসার পূর্বে, এ সমস্ত জনগোষ্ঠীর মানুষের কর্মকান্ডের মূলভিত্তি ছিল ব্যক্তিগত স্বার্থ; অর্থাৎ, ব্যক্তিস্বার্থই ছিল তাদের সকল কর্মকান্ডের মূল নিয়ামক। কিন্তু, ইসলাম গ্রহনের পর তাদের কাজের ভিত্তি পরিবর্তিত হয়ে হালাল-হারামে পরিণত হয়। মূলতঃ আল্লাহতায়ালা যা কিছু আদেশ করেছেন এবং নিষেধ করেছেন সে সবকিছুর উপর গড়ে উঠা ভিত্তিই তাদের সমস্ত কাজের মূল চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়। তাদের সমস্ত কাজের প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়ে যায় আল্লাহ'র সন্তুষ্টি। আর, কাজের মূল্য নির্ধারিত হয় কাজের পেছনে নিহিত উদ্দেশ্য থেকে। যেমনঃ যদি, কাজটি হয় নামাজ কিংবা জিহাদ, তাহলে এটি হয় আধ্যাত্মিক কাজ; যদি হয় ক্রয় বা বিক্রয় সংক্রান্ত, তাহলে এটি হয় বস্তুগত কাজ; সহমর্মিতা বা বিশ্বস্ত তা হয় নৈতিক কাজ; বিপদে কাউকে সাহায্য করার বিষয়টি হয় মানবিক কাজ ইত্যাদি। মানুষ কাজের পেছনের উদ্দেশ্য এবং কাজের মূল্যের ব্যাপারে পার্থক্য করতে আরম্ভ করে। ফলে, জীবন সম্পর্কে তাদের পূর্বের সকল ধারণা পরিবর্তিত হয়ে যায়। ইসলাম নির্ধারিত কাজের ভিত্তিতেই জীবনকে পরিমাপ করা হয় এবং জীবনের প্রকৃত অর্থ নির্ধারিত হয়।

ইসলাম মানুষকে সুখের প্রকৃত সংজ্ঞা শেখায়। ইসলাম পূর্ব সময়ে, সুখ মানুষের জৈবিক ও প্রবৃত্তিগত চাহিদা পূরণের মধ্যে নিহিত ছিল। পরবর্তীতে তা পরিবর্তিত হয়ে আল্লাহ'র সন্তুষ্টি অর্জন করাতে পরিণত হয়। আসলে, এর মধ্যেই প্রকৃত সুখ নিহিত। কারণ, সুখের প্রকৃত অর্থ হলো, মানবাত্মার চিরস্থায়ী শান্তি। আর, শুধুমাত্র বস্তুগত উপকরণের মাধ্যমে জৈবিক ও প্রবৃত্তিগত চাহিদা পূরণ করে চিরস্থায়ী এ শান্তি লাভ করা কখনও সম্ভব নয়। বস্তুতঃ এ রকম সুখের নাগাল একমাত্র বিশ্বব্রহ্মান্ডের স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব।

এভাবেই ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়া মানুষের জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীকে ইসলাম প্রভাবিত করেছে। জীবন সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী এবং তাদের জীবনের সকল কর্মকান্ডকে আমূল পরিবর্তন করেছে। পরিবর্তন করেছে তাদের কাজের গুরুত্বের ক্রমধারাকে (order of priorities); some went up in value, others came down. গুরুত্ব নির্ধারনের ক্ষেত্রে মানবজাতি সবসময়ই তার নিজের জীবনকে সবচাইতে উপরের অবস্থানে রেখেছে এবং জীবনাদর্শ এসেছে তার পরের অবস্থানে। কিন্তু, ইসলাম পুরো ব্যাপারটিকে একেবারে উল্টিয়ে দিয়েছে; ইসলাম জীবনাদর্শকে রেখেছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে, এমনকি মানুষের নিজের জীবনের চাইতেও আদর্শকে উপরের স্থান দেয়া হয়েছে। এ বিষয়টি বোঝার পর, ইসলামের প্রয়োজনে মুসলিমরা অকাতরে নিজের জীবনকে বিলিয়ে দিতে আরম্ভ করে এবং ইসলামী জীবনাদর্শ যে নিজ জীবনের চাইতে বহুগুণে মূল্যবান তারা এ সত্যকেও সঠিক ভাবে অনুধাবন করতে শুরু করে। একইসাথে, তারা এটাও বুঝতে পারে যে, ইসলামের জন্য কঠিন সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ করা মুসলিমদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এভাবেই, জীবনের বিভিন্ন বিষয়গুলো সঠিক ক্রমধারা অনুযায়ী জায়গা করে নেয়। জীবন হয় সম্মানিত ও মহিমান্বিত। মুসলিমরা অর্জন করে আত্মার চিরস্থায়ী সুখ ও শান্তি; কারণ, তারা বুঝতে পারে যে, আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করাই ক্ষনস্থায়ী এ জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

এভাবে, নও মুসলিমদের জীবনের সর্বোত্তম আদর্শ (ideals) সম্পর্কে ধ্যান-ধারণাও পরিবর্তিত হয়ে যায়। অতীতে এ সমস্ত মানুষের সর্বোত্তম আদর্শের ব্যাপারে ভিন্ন ধরণের এবং প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল ধ্যান-ধারণা ছিল। কিন্তু, ইসলাম গ্রহণ করার পর তারা জীবনের এক ও একমাত্র এবং চুড়ান্ত এক আদর্শের সন্ধান পেল। এর ফলে, জীবনের যে সমস্ত বিষয়গুলো তাদের কাছে খুব অর্থবহ ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সে সবকিছুর মাপকাঠিই একেবারে বদলে গেল; বদলে গেল মূল্যবোধ ও নৈতিকতার অর্থ। পূর্বে তাদের কাছে মূল্যবোধের অর্থ ছিল ব্যক্তির সাহসিকতা, মার্জিত আচরণ ও শ্রদ্ধাবোধ এবং গোত্রীয় সমর্থন, বিত্তবৈভবের অহংকার, উচ্চ বংশমর্যাদা, generosity to the point of extravagance, গোত্র বা সম্প্রদায়ের প্রতি আনুগত্য/বিশ্বস্ততা, দয়ামায়াহীন প্রতিশোধস্পৃহা এবং এই ধরণের অন্যান্য গুনাবলীর উপর ভিত্তি করে নির্ণয় করা হত। কিন্তু, ইসলাম তাদের পুরনো এ সব ধ্যান-ধারণাকে পরিবর্তন করে দিল। বস্তুতঃ ইসলাম এ সবকিছুকে খুবই নগন্য বিষয়ে পরিণত করলো। এ সমস্ত বিষয়ে ইসলামের বক্তব্য ছিল যে, মানুষ শুধুমাত্র আল্লাহ'র নির্দেশ অনুসারে এ সব বিষয় গ্রহণ কিংবা বর্জন করতে পারে; তার ব্যক্তিগত লাভ বা লোকসানের উপর ভিত্তি করে নয়। কিংবা, উচ্চ মর্যাদা লাভ বা অহংকারের বশবর্তী হয়ে নয়। এজন্যও নয় যে, এগুলো বংশপরম্পরায় চলে আসা রসম-রেওয়াজ/রীতিনীতি, প্রথা কিংবা ঐতিহ্য, যাকে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। বরং, ইসলাম এ সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে শুধু আল্লাহ'র নির্দেশের পূর্ণ আনুগত্য করাকে বৈধতা দিয়েছে। ব্যক্তিগত, গোত্রীয়, সামষ্টিক এবং জাতীয় স্বার্থের ক্ষেত্রে শুধু ইসলামের হুকুম-আহকামের কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পনের নির্দেশ দিয়েছে।

এভাবেই, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের মনমানষিকতা ও আচরণকে ইসলাম পুরোপুরি রূপান্তরিত করেছে; বদলে দিয়েছে তাদের ব্যক্তিত্ব এবং জীবন, মানুষ ও মহাবিশ্ব সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী। জীবনের সকল কাজ কোন ভিত্তির উপর সম্পাদিত হবে সে বিষয়ে ধ্যান-ধারণাকেও পুরোপুরি পরিবর্তিত করেছে। ইসলাম মানুষকে বুঝতে শিখিয়েছে যে, এই ক্ষনস্থায়ী জীবনের একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। আর তা হল, নিজেকে প্রতিনিয়ত ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে মুক্ত করে মহৎ গুনাবলীর দিকে ধাবিত করা। এছাড়া, মুসলিমরা আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনকেই সর্বোত্তম আদর্শ হিসাবে হৃদয়ে ধারণ করেছিল এবং সর্বশক্তি দিয়ে এ লক্ষ্য অর্জন করারও চেষ্টা করেছিল। যা তাদেরকে পূর্বাবস্থা থেকে আমূল পরিবর্তন করে পরিণত করেছিল নতুন এক সৃষ্টিতে।

এই চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই মূলতঃ ইসলাম গ্রহণকারীদের তাদের ইসলামপূর্ব অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সাহায্য করেছিল। ইসলাম জীবন সম্পর্কে তাদের বিভিন্ন ধ্যানধারণা ও লক্ষ্যকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি মাত্র ধারণা ও লক্ষ্যে পরিণত করেছিল। ঐক্যবদ্ধ এই ধারণার ভিত্তিতেই

তারা জীবনের সকল বিষয়াদি পরিচালনা করতো। ইসলাম তাদের বিভিন্ন ধরণের স্বার্থকে পরিবর্তন করে একটি মাত্র স্বার্থের নীচে তাদের একত্রিত করেছিল; আর, তা ছিল শুধু ইসলামের স্বার্থ। তাদের জীবনের বিভিন্ন লক্ষ্য পরিবর্তিত হয়ে একটি লক্ষ্যে পরিণত হয়েছিল; আর, তা হল আল্লাহ'র বাণীকে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়া। পরিণতিতে, স্বাভাবিক ভাবেই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষ একটি একক জাতি বা উম্মাহ'তে পরিণত হয়েছিল; আর, তা হল ইসলামিক উম্মাহ্।

## ইসলামী রাষ্ট্রের দূর্বলতার কারণঃ

ইসলামী রাষ্ট্র ইসলামী জীবনাদর্শের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত এবং এই জীবনাদর্শ থেকেই সে তার টিকে থাকার শক্তি আহরণ করে। এই জীবনাদর্শই তার অস্তিত্ব, সমৃদ্ধি ও প্রগতির মূল নিয়ামক। শক্তিশালী ইসলামী জীবনাদর্শের কারণেই এ রাষ্ট্র অস্তিত্বে এসেছিল এবং নিজেকে দাপটের সাথে বিশ্বের দরবারে উপস্থাপন করেছিল। এ রাষ্ট্র একশ' বছরেরও কম সময়ে ব্যাপক ও বিস্তৃত অঞ্চলকে ইসলামের পতাকাতলে নিয়ে এসেছিল, যদিও তখন যাতায়াতের বাহন ছিল শুধুমাত্র ঘোড়া ও উট এবং বিজিত জনগোষ্ঠী ও জাতির লোকেরা খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, যদিও যোগাযোগের মাধ্যম মুখের কথা ও কলমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বস্তুতঃ রাষ্ট্রের পেছনের মূল চালিকা শক্তি হিসাবে ইসলামই এ সমস্ত অসম্ভবকে সম্ভব করেছিল।

ইসলামের শত্রুরা এটা খুব ভালো করেই বুঝতে পেরেছিল যে, ইসলামী রাষ্ট্রকে দূর্বল করা ততদিন পর্যন্ত সম্ভব হবে না, যতদিন পর্যন্ত ইসলামী জীবনাদর্শ গভীর ভাবে মুসলিমদের হৃদয় ও অন্তরে প্রোথিত থাকবে; যতদিন পর্যন্ত মুসলিমদের ভেতর ইসলামের সঠিক উপলব্ধি থাকবে এবং সেইসাথে, যতদিন পর্যন্ত তারা ইসলামকে সঠিক ও সামগ্রিক ভাবে বাস্তবায়ন করবে। তাই, কুফরশক্তি আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে থাকে যে, কিভাবে মুসলিমদের ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা ও এর আইনকানুনের প্রয়োগকে দূর্বল করে ফেলা যায়।

ইসলাম সম্পর্কিত সঠিক ধ্যানধারণাকে দূর্বল করে ফেলার জন্য কাফিররা যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করেছিল, তা ছিল অগণিত। এরমধ্যে, কিছু ছিল লিখিত দলিল সংক্রান্ত আর কিছু ছিল ভাষা সংক্রান্ত, যা কিনা শিক্ষাদান এবং প্রচারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হত; কিছু ছিল বাস্তব জীবনের সাথে ইসলামের সম্পর্কের ক্ষেত্রে। তারা এমন সব বানোয়াট হাদিস তৈরী করতো, যে হাদিস রাসুল(সা.) কখনও বর্ণনা করেননি। জাল হাদিস তৈরী করে তারা এগুলোর মধ্যে ইসলাম বর্হিভূত চিন্তা ও ধ্যানধারণাকে ঢুকিয়ে দিত এই আশায় যে, মুসলিমরা হয়তো এগুলোকে গ্রহণ করবে এবং এর মাধ্যমে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে ইসলাম থেকে দূরে সরে যাবে। শেষ পর্যন্ত তারা এ সমস্ত মিথ্যা রচনাকে মুসলিমদের ভেতরে ছড়িয়ে দিতেও সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু, অবিশ্বাসী জানাদিকাহদের এ কুটিল চক্রান্ত প্রকাশিত হয়ে যাওয়ায়, মুসলিমরা খুব দ্রুত এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করে। পরবর্তীতে, মুসলিমরা এই সব কুচক্রীদের ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে তাদের সকল ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দেয়। পন্ডিত ও হাদিস বিশেষজ্ঞরা একযোগে তাদের এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায় এবং রাসুল(সা.) বর্ণিত হাদিস সমূহকে সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করতে আরম্ভ করে। লিপিবদ্ধ করার সময় তারা হাদিস বর্ণনাকারীর যোগ্যতা এবং কোন সময়ে সে হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে ইত্যাদির ভিত্তিতে হাদিস সমূহকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে। মূলতঃ হাদিস সমূহকে সহীহ(শুদ্ধ) এবং জয়ীফ(দূর্বল) এই দুটি ভাগে ভাগ করে সংরক্ষণ করা হয়। সাহাবাদের পর তিন প্রজন্ম পর্যন্ত বর্ণনাকারীদের গ্রহণ করা হয়। এরপরের যে কোন প্রজন্মের বর্ণনাকে বাতিল বলে গণ্য করা হয়। প্রতিটি হাদিস বর্ণনাকারীকে ব্যক্তিগত ভাবে শনাক্ত করা হয় এবং এ অনুসারেই হাদিসের বইগুলোকে ভাগ করা হয়, যে পর্যন্ত না মুসলিমরা প্রতিটি হাদিসের লিখিত রূপ এবং বিভিন্ন প্রজন্মের বর্ণনাকারীদের সত্যতার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যায়। ইসলামী রাষ্ট্র কঠোর ভাবে জানাদিকাহদেরকে দমন করে। বস্তুতঃ এদের মধ্যে বেশীর ভাগ কুচক্রীদেরকে রাসুল(সা.) এর নামে মিথ্যা ও জাল হাদিস রচনা করার জন্য হত্যা করা হয় এবং সার্বিক ভাবে, এই ষড়যন্ত্র ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের কোন ধরনের ক্ষতি করতে ব্যর্থ হয়।

এরপর ইসলামের শত্রুরা আরবী ভাষার উপর আক্রমণ চালায়। কারণ, এই ভাষাতেই ইসলাম এবং এর হুকুম আহকামকে প্রচার করা হত। তাই, তারা ইসলামের সাথে আরবী ভাষার সম্পর্ককে ছিন্ন করতে ব্যাপক তৎপরতা চালায়। কিন্তু, প্রথমদিকে তারা সফলতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। কারণ, প্রথমদিকে মুসলিমরা যে দেশই জয় করেছে সেখানেই তারা কোরআন, সুন্নাহ ও আরবী ভাষাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে এবং জনগণকে তারা এ তিনটি জিনিসই শিক্ষা দিয়েছে। বিজিত জনগোষ্ঠীর মানুষেরা ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং আরবী ভাষায় সাবলীল ভাবে কথা বলেছে। কিছু কিছু অনারব এ ব্যাপারে এতো পারদর্শীতা অর্জন করেছে যে, তারা ইসলামের প্রখ্যাত মুজতাহিদও হয়েছে। যেমন, ইমাম আবু হানিফা। কেউ কেউ বা হয়েছে অত্যন্ত উচুঁ মাপের কবি, যেমন, বাশার ইবন বুরদ। আবার, কেউ বা হয়েছে প্রখ্যাত লেখক, যেমন, ইবন আল-মুকাফফা'। এভাবেই, মুসলিমরা প্রথমদিকে আরবী ভাষাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছে। ইমাম শাফেয়ী' কোরআনের কোন ধরনের অনুবাদ বা অন্য কোন ভাষায় নামাজ আদায় করাকে অগ্রহণযোগ্য বলেছেন। আবার, যারা কোরআন অনুবাদের অনুমতি দিয়েছেন, যেমন, ইমাম আবু হানিফা, তারা অনুবাদকে কোরআন হিসাবে স্বীকৃতি দিতেও অস্বীকার করেছেন। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে আরবী ভাষা সবসময় মুসলিমদের মনোযোগ ও গুরুত্বের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। বস্তুতঃ এ ভাষা হচ্ছে ইসলামের মৌলিক অংশ এবং ইজতিহাদের জন্য এক অপরিহার্য বিষয়। আরবী ভাষা ব্যতীত উৎস থেকে ইসলামকে বোঝা অসম্ভব এবং এ ভাষা ব্যতীত শরীয়াহ্ থেকে নির্ভুল ভাবে হুকুম-আহকাম বের করাও সম্ভব নয়। কিন্তু,

হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দিকে, আরবী ভাষার গুরুত্ব ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। কারণ, এ সময় এমন সব শাসকেরা ক্ষমতায় আসে যারা আরবী ভাষার প্রকৃত গুরুত্ব ও তাৎপর্য বুঝতে ব্যর্থ হয় এবং এ বিষয়টিকে তারা ক্রমাগত অবহেলা করতে থাকে। ফলশ্রুতিতে, রাষ্ট্রের নাগরিকদের আরবী ভাষার উপর দখল কমে যায় এবং ইজতিহাদের প্রক্রিয়া স্থবির হয়ে যায়। এখানে মনে রাখা দরকার যে, যে কোন বিষয়ে শরীয়াহ্ হুকুম খুঁজে বের করতে হলে, যতগুলো উপাদান অপরিহার্য তার মধ্যে আরবী ভাষা একটি। বস্তুতঃ ইতিহাসের এই পর্যায়ে, আরবী ভাষা ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে, রাষ্ট্রের শরীয়াহ্ সম্পর্কিত ধ্যানধারণাও অস্পষ্ট হয়ে যায় এবং সেইসাথে, অস্পষ্ট হয়ে যায় শরীয়াহ্ আইনকানুন বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া। ইসলামী রাষ্ট্রকে দূর্বল ও রুগ্ন করে ফেলতে এ বিষয়টি ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের পক্ষে নতুন নতুন সমস্যা সমূহকে বোঝা এবং সে সমস্যাগুলোর মুকাবিলা করা কঠিন হতে থাকে। একসময় রাষ্ট্র উদ্ভুত সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয় কিংবা, সমাধানের লক্ষ্যে ভ্রান্ত পদ্ধতির আশ্রয় নেয়। এভাবে, সময়ের সাথে সাথে রাষ্ট্রের সমস্যা ঘনীভূত হতে থাকে এবং ইসলামী রাষ্ট্র একসময় অন্তহীন সমস্যার সাগরে হাবুডুবু খেতে থাকে।

এগুলো হল ইসলামের লিখিত দলিল ও ভাষা সংক্রান্ত সমস্যা। এছাড়া, দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম প্রয়োগের ক্ষেত্রেও মুসলিমরা বিপদজনক এক পথ বেছে নেয়। শুরু হয় ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী দর্শনের সাথে ইসলামকে মিলিয়ে ফেলার এক ভয়ঙ্কর প্রক্রিয়া। ব্রাহ্মণ্যবাদী দর্শনের প্রভাবে পরকালের সাফল্যকে মুসলিমরা বৈরাগ্যবাদ এবং আত্মবঞ্চনার মাধ্যমে সন্ধান করতে থাকে। ফলে, বহু সংখ্যক মানুষ উপভোগ্য ও কর্মচঞ্চল এ জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। বেছে নেয় কর্মহীন স্থবির এক বৈরাগ্যজীবন। তারা অস্বীকার করে সমাজ ও রাষ্ট্রে তাদের করণীয় ভূমিকাকে। এ সবকিছু ইসলামী রাষ্ট্র ও মুসলিম উম্মাহ্'র ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। বৈরাগ্যবাদ ও আত্মবঞ্চনার পরিবর্তে যারা কিনা ইসলামের আলোকিত আহবানকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেবার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারত, ইসলামী রাষ্ট্র ও মুসলিম উম্মাহ্ মেধাবী ও সম্ভাবনাময় সে সব তরুণ থেকে বঞ্চিত হয়।

এরপর শুরু হয় পশ্চিমা বিশ্বের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। পশ্চিমাবিশ্ব ইসলাম বর্হিভূত এক সংস্কৃতি বহন করে নিয়ে আসে এবং এ সংস্কৃতিকে মুসলিমদের সংস্কৃতি বলে দাবী করে তাদের প্রতারিত করে। সেইসাথে, দাবী করে যে, যে ব্যবস্থা তারা বহন করে নিয়ে এসেছে তার আইনকানুন ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। প্রকৃত অর্থে, পশ্চিমারা ইসলামী রাষ্ট্রে যে সব আইনকানুন বয়ে নিয়ে আসে, শরীয়াহ্'র উপর তার প্রভাব হয় ধবংসাত্মক। এ বিষয়টি মুসলিম উম্মাহ্'র ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। ফলে, মুসলিমরা পশ্চিমাদের দ্বারা ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত হয়ে তাদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের অসহায় শিকারে পরিণত হয়। পশ্চিমাদের মতো মুসলিমরাও জীবনকে স্বার্থহাসিলের ভিত্তিতে দেখতে থাকে। উসমানী খিলাফতের সময় পশ্চিমাদের কিছু কিছু আইনকানুন গ্রহণ করা হয়, অর্থনীতিতে ব্যাংক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, সুদকে হালাল করা হয় এবং শাস্তি মূলক আইনগুলো রহিত করে, পশ্চিমা শাস্তিমূলক আইনের মাধ্যমে তা প্রতিস্থাপন করা হয়। যদিও বিভিন্ন ফতোয়া জারী করেই এ সমস্ত ভয়ঙ্কর কর্মকান্ডকে গ্রহণযোগ্য করা হয়, কিন্তু, এ সমস্ত কিছু রাষ্ট্রের জন্য ভয়াবহ পরিণতি বহন করে নিয়ে আসে। যা পরবর্তীতে ইসলামী রাষ্ট্রকে শরীয়াহ্ আইনকানুন থেকে বিচ্যুত করে। এই পথভ্রষ্টতা বা বিচ্যুতি মুসলিমদের অন্তরে প্রজ্জ্বলিত শক্তিশালী ঈমানের আলোকে নিভিয়ে দেয় এবং রাষ্ট্রকে সঠিক পথ থেকে বহুদূরে নিক্ষেপ করে। এটাই ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের দূর্বলতা ও খন্ডবিখন্ড হয়ে যাবার কারণে পরিণত হয়।

এগুলো হচ্ছে ইসলাম সম্পর্কিত সঠিক জ্ঞান ও ধ্যানধারণার অভাবে উদ্ভুত সমস্যা। এছাড়া, ইসলাম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বেশকিছু বিষয় শরীয়াহ্ আইনকানুন অপপ্রয়োগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এদের মধ্যে একটি হল রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা। প্রতিটি দল রাষ্ট্রের উপর তার নিজস্ব মতামত চাপিয়ে দিতে চায়। কোন কোন ক্ষেত্রে, ব্যর্থ হয়ে তারা রাষ্ট্রের শাসনকর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেবার লক্ষ্যে হাতে অস্ত্র তুলে নেয়। পারস্য ও ইরাক দখল করে নেয়ার পর আব্বাসী খলিফারা এই কাজটিই করেছিল এবং ইসলামী রাষ্ট্রের পুরো কর্তৃত্ব তাদের হাতে না আসা পর্যন্ত তারা দখলকৃত এ অঞ্চলসমূহকে শাসনকর্তৃত্বের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করেছিল এবং সেইসাথে, তারা শাসনকার্য পরিচালনাকে শুধু বনু হাশিম গোত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছিল। এরপর ফাতিমী বংশের উত্থান ঘটে। তারা মিশর প্রদেশকে(উলাইয়া) নিয়ন্ত্রনে নিয়ে সেখানে আলাদা একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করে এবং পুরো ইসলামী রাষ্ট্রকে ফাতিমী বংশের [মুহাম্মদ(সা.) এর কন্যা ফাতিমা(রা.) এর বংশধর] নিয়ন্ত্রনে নেবার লক্ষ্যে মিশরকে কেন্দ্র করে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। তাদের এ সমস্ত কর্মকান্ড ইসলামী রাষ্ট্রকে অনেক পেছনে ঠেলে দেয় এবং জিহাদ বন্ধ হয়ে যায়। আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বস্তুতঃ ক্ষমতার আরেকটি কেন্দ্রবিন্দু তৈরী করে, যা কিনা ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনকর্তৃত্ব ছিনিয়ে নিতে ক্ষমতা দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়। যদিও, ইসলামী রাষ্ট্র একতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং মুসলিমদের উপর একই সময়ে একের অধিক খলিফা থাকা নিষিদ্ধ। আল্লাহর রাসুল(সা.) বলেছেন,"যদি দুই খলিফার বাইয়াত নেয়া হয়, তবে দ্বিতীয় জনকে হত্যা কর।"

উপরোল্লিখিত এই প্রতিটি বিষয়ই ইসলামী রাষ্ট্রকে দূর্বল করতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে এবং সেইসাথে, মুসলিমদের বিজয়যাত্রা রহিত হয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে, বিশ্বব্যাপী ইসলামের দাওয়াত বহনের প্রক্রিয়া প্রচন্ড ভাবে অবহেলিত হয়।

আসলে, নিজেদের বংশধরদের হাতে শাসনদন্ড তুলে দিতে গিয়ে খলিফা নির্বাচনে উমাইয়ারা যে নতুন রীতির প্রচলন করেছিল, তার ফলশ্রুতিতেই রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতায় আরোহনের জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল। এ লক্ষ্যে, তারা(উমাইয়া বংশ) প্রথমে নিজেদের বংশধরদের মধ্য হতেই খলিফা নির্বাচিত করতো এবং পরে জনগণের কাছ থেকে বাইয়াত নিত। যার ফলে, বাইয়াত দেবার ব্যাপারটি নিতান্ত

আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয় এবং নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতায় আরোহণের প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। যেমনঃ মুয়া'য়িয়া(রা.) তার পুত্রের কাছে এ প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা হস্তান্তর করেন এবং জনগণের কাছ থেকে পরে তার পক্ষে বাইয়াত নেন। Subsequently, every Khaleefah followed the same trend, taking an oath for their heirs and then asking the people to give them the bay'ah. এর ফলে, জনগণ খলিফার মনোনীত ব্যক্তিকেই বাইয়াত দিতে বাধ্য হয় এবং খুব কমক্ষেত্রেই তারা অন্যকাউকে বাইয়াত দেবার সুযোগ পায়। খলিফা নির্বাচনের এ ভ্রান্ত পদ্ধতিই রাজনৈতিক দলগুলোকে অস্ত্র তুলে নিতে বাধ্য করে। যদিও, আবু বকর(রা.) মৃত্যুর পূর্বে স্বয়ং খলিফা nominate করে গিয়েছিলেন, কিন্তু, উমাইয়া বংশ এ পদ্ধতির অপব্যবহার করে, যা সমস্যার জন্ম দেয়। বস্তুতঃ আবু বকর(রা.) প্রথমে মুসলিমদের সাথে খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারে আলোচনা করেছিলেন। আলোচনার পর এ পদের জন্য ওমর(রা.) ও আলী(রা.) দুজনই সম্ভাব্য প্রার্থী হিসাবে মনোনীত হন। শেষপর্যন্ত, ওমর(রা.) চুড়ান্ত মনোনয়ন লাভ করেন এবং আবু বকর(রা.) এর ইন্তিকালের পর জনগণের বাইয়াতের মাধ্যমে তিনি মুসলিমদের খলিফা নির্বাচিত হন। এ পদ্ধতি অবশ্যই শরীয়াহ্ বর্হিভূত কোন পদ্ধতি নয়। কিন্তু, উমাইয়া বংশের খলিফারা এ পদ্ধতির অপব্যবহার করে তাদের পুত্র, ভ্রাতা ও আত্মীয়স্বজনকে খলিফা হিসাবে মনোনীত করে। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে তারা একের অধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দেয়। হুকুম শরীয়াহ্'র এই অপব্যবহার মুসলিমদেরকে তাদের পছন্দ মতো ব্যক্তিকে বাইয়াত দিতে বাঁধাগ্রস্থ করে এবং পরিণতিতে, ইসলামী রাষ্ট্র দূর্বল হয়ে যায়। প্রথমদিকে, ইসলামী রাষ্ট্র শক্তিশালী থাকায় এ বিষয়গুলো তেমন একটা প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়নি। কিন্তু, পরবর্তীতে রাষ্ট্র যখন ক্রমশ দূর্বল হতে থাকে তখন, ইসলামী রাষ্ট্র টুকরো টুকরো হয়ে যাবার লক্ষনগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠে।

শরীয়াহ্'র অপপ্রয়োগ পরবর্তীতে শুধু রাষ্ট্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং, উলাইয়াত গুলোও একই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। আন্দালুসে 'আবদ আল-রহমান আল-দাখিলের কর্মকান্ডের ব্যাপারে আব্বাসী খলিফাদের নীরবতা এই ব্যাধিকে আরও প্রকট করে তোলে। গভর্ণর হিসাবে আন্দালুস প্রদেশকে যখন সে স্বাধীন ভাবে শাসন করতে আরম্ভ করে, তখনই ইসলামী রাষ্ট্রের বিশাল এক অঞ্চল রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হবার প্রক্রিয়া শুরু হয়। তার পরবর্তী গর্ভণররাও একই প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখে। এমনকি, এদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেকে আমির উল মু'মিনীন উপাধিতে ভূষিত করে। যদিও, আন্দালুস কখনই পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা দাবী করেনি; তারপরেও, এ অঞ্চল আসলে স্বাধীন ভাবেই শাসিত হয়েছে, যা রাষ্ট্রকে কাঠামোগত ভাবে ধীরে ধীরে দূর্বল করেছে।

ইসলামী রাষ্ট্র তার প্রভাব, প্রতিপত্তি ও শক্তিসামর্থ্যের চূড়ায় অবস্থান করা সত্ত্বেও এ সমস্ত ঘটনাবলী ধীরে ধীরে কাফিরদেরকে রাষ্ট্রকে আঘাত হানার সুযোগ তৈরী করে দেয়। আন্দালুসের শাসনব্যবস্থা রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় শাসন থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কারণে, আন্দালুস পতনের সময় ইসলামী রাষ্ট্র এর পতন ঠেকাতে খুব কম ভূমিকাই পালন করতে পারে। এ ঘটনা ঘটে রাষ্ট্রের পশ্চিম সীমান্তে। আবার অপরদিকে, পূর্ব সীমানার গভর্ণরদের(উলা') প্রাদেশিক শাসনের ক্ষেত্রে ব্যাপক-বিস্তৃত ক্ষমতা দেয়া হয়, যা তাদেরকে আত্মগর্বিত/আত্মহংকারী করে তোলে। তারা তাদের অধীনস্থ উলাইয়াত গুলোকে তাদের ইচ্ছানুযায়ী শাসন করতে থাকে এবং খলিফা এ অবস্থাকে মেনে নেয়। খলিফা এই সমস্ত স্বাধীন গর্ভণরদের নিকট হতে খুব সামান্য কিছু প্রাপ্তির মাধ্যমেই সন্তুষ্ট থাকে। যেমনঃ গভর্ণরদের মসনদ হতে প্রাপ্ত প্রশংসাবাণী, প্রচলিত মুদ্রায় খলিফার নাম অঙ্কিত করা, গভর্ণরদের কাছ থেকে রাজস্ব (খারাজ) প্রাপ্তি এবং গভর্ণরদের খলিফার পক্ষ হয়ে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহন করা ইত্যাদি। প্রকৃত অর্থে, এ সমস্ত উলাইয়াতগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন স্বত্ত্বায় পরিণত হয়। যেমনটি ঘটে, সালজুক্বিইন, হামদানীইন এবং অন্যান্য অনেক উলাইয়াতের ক্ষেত্রে। এ সমস্ত কারণগুলোও ইসলামী রাষ্ট্রকে দূর্বল করে ফেলতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

এরপর আসে উসমানী শাসকদের পালা এবং এ পর্যায়ে ক্ষমতা তাদের হাতে হস্তান্তরিত হয়। 'উসমানী খিলাফত তাদের শক্তিশালী নেতৃত্বে মুসলিমদের বেশীর ভাগ ভূখন্ডকে পুণরায় ঐক্যবদ্ধ করতে সমর্থ হয়। তারা সমগ্র ইউরোপ জুড়ে জিহাদ পরিচালনা করে এবং ইসলামের দাওয়াতকে পুণরায় ছড়িয়ে দিতে আরম্ভ করে। কিন্তু, উসমানী শাসকদের অধীনে মুসলিমদের আকস্মিক এই পুণরুত্থানের/পুর্ণজাগরনের পেছনে ছিল প্রথমদিকের 'উসমানী খলিফাদের ইস্পাত কঠিন ঈমানী শক্তি এবং উসমানীদের শক্তিশালী সামরিক বাহিনী। এই জাগরন বস্তুতঃ উসমানীদের ইসলামী ধ্যানধারণার সঠিক উপলব্ধি এবং ইসলামের সামগ্রিক বাস্তবায়নের ভিত্তিতে হয়নি। ফলে, উসমানী শাসকদের এই বিজয়যাত্রা তা অর্জন করতে পারেনি, যা প্রথমদিকের মুসলিমদের বিজয়যাত্রার মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল। শাসকদের এই শক্তিমত্তা ক্রমশঃ দূর্বল হয়ে যাওয়া ইসলামী রাষ্ট্রের সমগ্র অঞ্চলকেও পরিবেষ্টিত করতে পারেনি। ফলে, ইসলামী রাষ্ট্র ক্রমশ নিস্প্রভ হতে হতে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায় এবং একপর্যায়ে এ রাষ্ট্রব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায়। বস্তুতঃ উপরোল্লিখিত কারণগুলোর সাথে সাথে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কৃত ক্রমাগত ষড়যন্ত্র যখন ঘনীভূত হয়, তখনই এ রাষ্ট্র তার কার্যকারীতা হারায়।

আসলে, ইসলামী রাষ্ট্র ধ্বংস হয়ে যাবার কারণগুলো পর্যালোচনা করলে এগুলোকে প্রধানত দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হল, ইসলাম সম্পর্কে দূর্বল এবং লক্ষ্যচ্যুত ধ্যানধারণা। আর, দ্বিতীয়টি হল, এর নিশ্চিত পরিণতি হিসাবে শরীয়াহ্ আইনকানুনের অপপ্রয়োগ। সুতরাং, একথা বলা যেতে পারে যে, একমাত্র ইসলাম সম্পর্কে পরিস্কার ও স্বচ্ছ ধ্যানধারণাই আবার ইসলামী রাষ্ট্রকে পুণঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে। শুধু তাই নয়, ইসলামী রাষ্ট্রকে টিকে থাকতে হলে, স্বচ্ছ এ ধ্যানধারণার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং সেইসাথে নিশ্চিত করতে হবে, ইসলামী রাষ্ট্রে শরীয়াহ্ আইনের সঠিক বাস্তবায়ন এবং বর্হিবিশ্বে সঠিক পন্থায় দাওয়াতী কার্যক্রম।

## ইসলামী রাষ্ট্রের বিখন্ডায়ন (বিভক্তি):

ইসলামী রাষ্ট্রের বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্বলতা শুরু হয়েছিল হিজরী পঞ্চ শতকে। এসময় কিছু পন্ডিত ব্যক্তিবর্গ ইজতিহাদ বন্ধের দাবী তুলেন এবং ঘোষণা করলেন যে ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে এবং মানুষের সকল সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়ে গেছে। এটি ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের পতনের সঙ্কেত। যদিও তখনো কিছু মুজতাহিদীন ছিলেন কিন্তু ইতিমধ্যেই বুদ্ধিবৃত্তিক অবক্ষয় গভীরে প্রোথিত হয়েছিল এবং তা ইসলামী রাষ্ট্রকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করেছিল। যখন ক্রুসেডারগণ তাদের প্রচারণা শুরু করল, ততদিনে ইসলামী রাষ্ট্রের ঐ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার মত অবস্থান ছিল না। ইসলামী রাষ্ট্র ক্রুসেডারদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল যা প্রায় দুই শতাব্দী ধরে চলেছিল। ক্রুসেডারগণ প্রথমে বিজয় লাভ করল এবং ইসলামী রাষ্ট্রের কিছু অংশ দখল করে নিতে সক্ষম হয়েছিল। এরপর ইসলামী রাষ্ট্র ঐ অঞ্চল পূনরুদ্ধার করেছিল এবং ক্রুসেডারদের বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়েছিল। এসময় শাসন ও কর্তৃত্ব চলে গেল মামলুকদের হাতে যারা আরবী ভাষাকে অবহেলা করেছিল এবং ইসলামী শাসনের বুদ্ধিবৃত্তিক ও আইনপ্রণয়নের দিকটি উপেক্ষা করতে শুরু করেছিল। এভাবে ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেল এবং আশঙ্কাজনকহারে ইসলামী ধারণা ও তার উপলব্ধি দূর্বল হয়ে যেতে লাগল। ইসলামী পন্ডিত ও চিন্তাবিদরা কেবল মাত্র তাক্বলীদের (অনুকরণের) মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকায় সন্তুষ্ট হয়ে পড়লেন এবং অবস্থার আরো অবনতি হতে লাগল।

অবশ্য এ ক্ষতি শুধুমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ছিল, কারণ তখনো বাহ্যিকভাবে ইসলামী রাষ্ট্র শক্তিশালী ছিল এবং তার আন্তর্জাতিক অবস্থান অটুট ছিল। ইসলামী রাষ্ট্র তখনো বিশ্বের বৃহত্তম অংশ জুড়ে একটি পরাশক্তি ছিল এবং অন্য জাতিরা তাকে ভয় করত। উসমানী রাষ্ট্র তখনকার জ্ঞাত বিশ্বের অধিকাংশ অঞ্চলই নিয়ন্ত্রণ করত। হিজরী দশম শতকে (১৬শ খৃষ্টাব্দ) এটি আরব ভূখন্ডগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে রেখেছিল এবং বিশাল অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত ছিল। উসমানী রাষ্ট্র এর সামরিক শক্তি ও বিস্তারের দিকে লক্ষ্য রেখেছিল এবং একই সাথে ক্ষমতা ও বাহ্যিক আকর্ষণ বজায় রেখেছিল। এটি যুদ্ধবিজয়ের দিকে তার সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছিল এবং আরবী ভাষাকে অবহেলা করল (যদিও ইসলাম বোঝা এবং ইজতিহাদের জন্য আরবী ভাষায় পান্ডিত্য অবশ্য প্রয়োজনীয়)। উসমানী রাষ্ট্র বুদ্ধিবৃত্তিক ও আইনপ্রনয়ণের দিক থেকে ইসলামের প্রতি খুব একটা মনোযোগ দেয়নি। ফলে এর চিন্তাধারণার মাত্রা ও নতুন ও অকাংখিত পরিস্থিতিতে আইন গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ফাঁক রয়ে যাচ্ছিল। সে সময় এ দূর্বলতা ইসলামী রাষ্ট্রের নজরে আসেনি কারণ সে তখন গৌরব, ক্ষমতা ও সামরিক শক্তির চূড়ায় অবস্থান করছিল। ইউরোপের তূলনায় এর আদর্শ, আইন প্রণয়ন এবং সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্র শ্রেয়তর অবস্থানে ছিল। এ তূলনা ইসলামী রাষ্ট্রকে আশ্বস্ত করে রেখেছিল এবং দূর্বলতাকে অর্বাচীন ও উপেক্ষণীয় বলে প্রতীয়মান করছিল। ইউরোপ তখনো সম্পূর্ণ অন্ধকার, বিশৃংখলা ও অশান্তিতে নিমজ্জিত ছিল। ইউরোপ একটি রেনেসাঁর (পূণর্জাগরণের) চেষ্টা করছিল কিন্তু বার বার তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছিল। সংস্কৃতি ও শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে উসমানী রাষ্ট্র ইউরোপের তূলনায় বেশ ভালো অবস্থানে ছিল বলে তাদের নিজেদের শ্রেষ্ঠ হিসাবে দেখার অভ্যাস গড়ে উঠেছিল। এটি উসমানী রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ত্রুটিগুলো উপেক্ষা করার কারণ হয়ে দাড়িয়েছিল।

উসমানী রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন সমস্যাগুলো থেকে যে বিষয়টি নজর ফিরিয়ে রেখেছিল তা হচ্ছে ইউরোপের বিপক্ষে তার বিশাল বিজয়। ইসলামী রাষ্ট্র ইতিমধ্যে বলকান, এবং দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপ দখল করে নিয়েছিল। এ বিজয় বাকী ইউরোপ জুড়ে একটি কম্পনের ঢেউ ছড়িয়ে দিয়েছিল এবং একটি ধারণা করতে বাধ্য করেছিল যে ইসলামী সেনাবাহিনী অপরাজেয় এবং কেউ মুসলিমদের সফলভাবে মোকাবেলা করার উপযুক্ত নয়। এটি তখনকার সময় যখন প্রথম প্রাচ্যীয় প্রশ্নগুলো ভেসে উঠতে লাগল। অর্থাৎ হিজরী ৯ম শতাব্দীতে (১৫শ খৃষ্টাব্দে) মুহাম্মদ আল ফাতেহ এর নেতৃত্বে উসমানী সাম্রাজ্যের সম্প্রসারমানতা ও অগ্রগামিতার বিপদে পিছু হটার কথা চিন্তা ভাবন শুরু হয়েছিল। সূলাইমান আল কুনুনীর নেতৃত্বে হিজরী ১১ শতাব্দী (১৭শ খৃষ্টাব্দ) পর্যন্ত এ জয়যাত্রা অব্যহত ছিল। The conquests were concentrated up until the middle of the 12th century Hijri (18th Century). এসময় পর্যন্ত জিহাদের ধারবাহিকতাই ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান শক্তির উৎস।

মুসলিমদের আক্বীদার শক্তি ও নির্দিষ্ট ধারণা - যদিও তাদের মনে ধারণাটি স্পষ্ট ছিলনা - ইসলামী রাষ্ট্রে একটি প্রচন্ড নৈতিক আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করেছিল এবং এটিই তাদের সামরিক শক্তি বজায় রাখতে সাহায্য করেছিল। এছাড়াও স্থান ভেদে কিছু অপপ্রয়োগ সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার প্রয়োগ এবং ইউরোপের অবস্থার কারণেও ইসলামী রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় ছিল। এসময় ইসলামী রাষ্ট্র যথাযথভাবে ইসলাম বোঝার চেষ্টা ও আরবী ভাষা শিক্ষা ও ইজতিহাদ উৎসাহিত করার প্রতি মনোযোগ দিতে পারত। রাষ্ট্র বুদ্ধিবৃত্তিক ও আইনপ্রনয়ণ সংক্রান্ত বিষয়গুলোর উপর অধিক মনোযোগ দিতে পারত যা একটি শক্ত ভিত রচনা করত যেখান থেকে বিজয়ের ধারা অব্যহত রাখা যেত। এটি গোটা বিশ্বকে ইসলামের মাধ্যমে মুক্ত করতে ইসলামী রাষ্ট্রকে সক্ষম করে তুলত। এতে ইসলামী রাষ্ট্র এমন এক অবস্থানে পৌঁছে যেত যেখান থেকে তার কাঠামো শক্তিশালী করতে পারত এবং গোটা বিশ্বকে ইসলামী সংস্কৃতির অপ্রতিরোধ্য জোয়ারে প্লাবিত করতে পারত এবং এর মাধ্যমে বিশ্বকে দুর্নীতি ও দুরাচার থেকে রক্ষা করতে পারত। অবশ্য এর কোনটিই হয়নি। আরবী ভাষায় উৎসাহ প্রদান সীমাবদ্ধ ছিল শুটি কতক আরব শিক্ষক ও বিচারবিভাগে ক্ষুদ্র কিছু পদের মধ্যে, ফলে তা আরবী ভাষার জ্ঞান বৃদ্ধিতে খুব কমই প্রভাব রেখেছিল এবং বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণের ক্ষেত্রে কোনই প্রভাব রাখেনি। আরবী ভাষার গুরুত্ব পুনুরুদ্ধারের জন্য রাষ্ট্র একে প্রাতিষ্ঠানিক (official) ভাষায় পরিণত করতে পারত, যা পূর্বে ছিল। কিন্তু এটি হয়নি। ফলে যেহেতু বুদ্ধিবৃত্তিক ও ফিকহি (বিচারসংক্রান্ত বিষয়) বিষয়গুলোতে কোন পদক্ষেপ নেয়া হয় নি, ফলে রাষ্ট্রের দূর্বল ও ভ্রান্ত প্রচেষ্টাগুলো একটি স্থিরাবস্থার সৃষ্টি করল এবং রাষ্ট্রকে একটি ভুল পথে চালিত করতে থাকল।

হিজরী ১২শ শতকের (১৮শ খৃষ্টাব্দ) দ্বিতীয়ার্ধে এ ধারা পশ্চাদমুখী হতে শুরু করল এবং রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ দূর্বলতা গুলো প্রকাশ পেতে শুরু করল। কারণ রাষ্ট্র তখন অপপ্রয়োগকৃত ইসলামের অবশিষ্ট অংশ দিয়ে পরিচালিত হচ্ছিল। সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের শাসন, প্রকৃতার্থে ইসলামী ব্যবস্থার পরিবর্তে হয়ে পড়েছিল ইসলামী ব্যবস্থার একটি পটভূমি মাত্র। এটি হয়েছিল ইসলাম বোঝার দূর্বলতা ও ইজতিহাদ ও মুজতাহিদদের অভাবে ইসলামের অপপ্রয়োগের ফলে। হিজরী ১৩শ শতকে (১৯শ খৃষ্টাব্দে) ইসলামী রাষ্ট্র এবং অনৈসলামিক রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পাল্লা ঘুরে গেল। এসময় ইউরোপের জাগরণ শুরু হয়েছিল এবং তা প্রকাশ পেতে শুরু করেছিল। ইতিমধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক স্থবিরতা ও এর সাথে যুক্ত হওয়া ইসলামী ব্যবস্থার অপপ্রয়োগ মুসলিমদের গ্রাস করে নিয়েছিল।

১৯শ খৃষ্টাব্দে গোটা বিশ্ব ইউরোপে প্রচন্ড এক বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব প্রত্যক্ষ করল। ইউরোপীয় দার্শনিক, লেখক এবং বুদ্ধিজীবিরা ইউরোপীয় জনগণকে একতাবদ্ধ করার লক্ষ্যে ইউরোপীয় চিন্তাধারায় ব্যাপক পরিবর্তন আনার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল। বহু আন্দোলনের উদ্ভব ঘটেছিল এবং এরা জীবন সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টিতে বিরাট ভূমিকা রেখেছিল। কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের মধ্যে একটি ছিল রাজনৈতিক ও আইনসংক্রান্ত ব্যবস্থার পরিবর্তন। ক্ষমতাধর রাজতান্ত্রিক শাসনের অপচ্ছায়া ধীরে ধীরে তিরোহিত হল এবং সেখানে প্রতিনিধিত্বশীল শাসন ও জাতীয় সার্বভৌমত্ব নির্ভর প্রজাতান্ত্রিক (রিপাবলিকান) ব্যবস্থা স্থান করে নিল। এটি ইউরোপের ঘুমন্ত অবস্থা হতে জাগ্রত হতে প্রচন্ড রকমের উদ্দীপক ভূমিকা রেখেছিল। ইউরোপের দৃশ্যপটে শিল্প বিপ্লব একটি দৃশ্যমান প্রভাব বিস্তার করল। ইউরোপীয় মস্তিষ্ক থেকে বহুসংখ্যক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের স্ফুরণ ঘটতে লাগল। এ বিষয়গুলো ইউরোপীয় বুদ্ধিবৃত্তিক ও বস্তুগত উন্নতি ত্বরান্বিত করল। এসকল বস্তুগত ও বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে ক্ষমতার পাল্লা ইসলামী বিশ্ব থেকে ইউরোপের দিকে ঝুঁকে পড়ল।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে প্রাচ্যীয় প্রশ্ন পরিবর্তিত হল এবং এটি শুধুমাত্র ইউরোপের অভ্যন্তরে ইসলামী বিপদের প্রবেশরোধের বিষয় থাকল না, বরং ইসলামী রাষ্ট্রকে ছেড়ে দেয়া হবে না তা বিভক্ত করা হবে, এই প্রশ্নে রূপ নিল। ইউরোপীয় দেশগুলোর ভিন্ন ভিন্ন আগ্রহের কারণে তারা বিভিন্ন মতামত দিল। প্রাচ্যীয় প্রশ্ন ও ইউরোপের ভাগ্যের পরিবর্তন - যা তার বুদ্ধিবৃত্তিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে (যথা শিল্প বিপ্লব) প্রতিফলিত হচ্ছিল - তা ইসলামী রাষ্ট্র ও অবিশ্বাসী রাষ্ট্রগুলোর মাঝে একটি রাজনৈতিক দোদূল্যমানতার সূচনা করল যা ইসলামী রাষ্ট্রকে বিভক্ত করতে সহায়ক হয়েছিল।

ইউরোপের রাজনৈতিক বিপ্লব বুদ্ধিজীবিদের মধ্য থেকে বিস্তৃত হয়েছিল এবং একটি নতুন জীবন ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করল। তারা জীবন সম্পর্কে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গী এবং নতুন মতবাদ গ্রহণ করল। এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর উপর ভিত্তি করে তারা একটি ব্যবস্থার ভিত প্রতিষ্ঠা করল। এটি চিন্তাধারা ও মূল্যবোধের পরিবর্তনের দিকে নিয়ে গেল যা তাদের জীবনে একটি সাধারণ পরিবর্তনের সাথে সাথে শিল্প বিপ্লবকে গতিশীল করতে সাহায্য করল। নিজস্ব আদর্শে গভীর প্রতিফলনের পরিবর্তে, আকীদা থেকে উদ্ভূত নতুন ধারণার উদ্দীপনা ও ইজতিহাদের মাধ্যমে সমস্যা মোকাবেলার পরিবর্তে, শিল্প ও বিজ্ঞানকে গ্রহণ করার পরিবর্তে, অচিরেই ইসলামী রাষ্ট্র ইউরোপের ভাগ্যের পরিবর্তনে সাড়া দিতে গিয়ে দোদূল্যমান ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। এ দ্বন্দ্বের কারণে এটি অলস বসে রইল এবং এটি তাদের শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আরো পশ্চাৎপদতার দিকে ঠেলে দিল। ফলে এটি বস্তুগত উন্নতির ক্ষেত্রে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলো পেছনে পড়ে রইল।

উসমানী রাষ্ট্র একটি ইসলামী রাষ্ট্র ছিল। ইসলামী আকীদা ছিল রাষ্ট্র ও তার ব্যবস্থার ভিত্তি। ইসলামী ধারণা ছিল রাষ্ট্রের ধারণা এবং ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী ছিল রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গী। ইসলামী রাষ্ট্রের উচিৎ ছিল ইউরোপের নতুন ধারণা গুলোর প্রতি ভালমত লক্ষ্য করা ও তার নিজস্ব আকীদার মানদন্ডে তাদের পরিমাপ করা। নতুন সমস্যাগুলোকে তার ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করা উচিৎ ছিল এবং আরো উচিৎ ছিল এসকল ধারণা ও সমস্যার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ইজতিহাদের ভিত্তিতে রায় প্রদান করা। অবশেষে এ ধরণের চিন্তা ধারণার বৈধতা বিচার করা উচিৎ ছিল। কিন্তু এসবের কিছুই করেনি কারণ তাদের চিন্তায় ইসলামের ধারণাটি স্পষ্ট ছিল না। এর কোন সুনির্দিষ্ট/সুসংজ্ঞায়িত ধারণা ছিলনা কারণ তারা ইসলামী আকীদাকে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেনি, যে বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তির উপর নির্ভর করে সকল ধারণা। আকীদা জীবনশুন্য হয়ে পড়ল কারণ এর প্রাণশক্তি, ইজতিহাদ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ইসলামী সংস্কৃতি যা জীবন সম্পর্কে ধারণার সমষ্টি তা মুসলিমদের অন্তরে/মানসে স্ফটিক-স্বচ্ছ আকার ধারণ করেনি। রাষ্ট্রের কার্যকলাপের সাথে সংস্কৃতি যুক্ত ছিল না। এসব কিছুই একটি ঢালু বুদ্ধিবৃত্তিক অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে গেল।

ফলাফল স্বরূপ ইসলামী রাষ্ট্র ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তিক, সংস্কৃতিক ও শিল্প বিপ্লব প্রত্যক্ষ করে স্তম্ভিত হয়ে গেল। অবশ্য তারা কোন প্রতিক্রিয়া দেখায়নি কারণ তারা বুদ্ধিবৃত্তিক ভাবে অবশ হয়ে গিয়েছিল। ফলে তারা ইউরোপের সংস্কৃতিক উন্নতিকে গ্রহণ করবে কি বর্জন করবে সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না। তারা বিজ্ঞান, আবিষ্কার ও শিল্প থেকে কি গ্রহণীয় এবং নির্দিষ্ট সংস্কৃতি থেকে কি বর্জনীয় সে বিষয়ে পার্থক্য করতে পারছিল না। তারা স্থবির হয়ে পড়ল এবং এ স্থবিরতা তাদের আরো পিছিয়ে দিতে লাগল অথচ একই সময়ে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর উন্নতি বেগবান হয়ে উঠছিল।

মুসলিমরা ইসলামী আকীদা ও ইউরোপীয় ধারণার পার্থক্য অনুধাবন করতে ব্যর্থ হল। আরেকটি কারণ ছিল তাদের বিজ্ঞান, শিল্প ও আবিষ্কার, যা ইসলাম উৎসাহিত করে ও সংস্কৃতি, আদর্শের মাঝে পার্থক্য করার ব্যর্থতা। বিজ্ঞান, শিল্প ও আবিষ্কার ইসলাম উৎসাহিত করে এবং এক্ষেত্রে উৎস গুরুত্বপূর্ণ নয়। আর সংস্কৃতি ও আদর্শ শুধুমাত্র ইসলাম থেকেই উদ্ভূত হতে হবে, অন্যথায় তা বর্জনীয়।

উসমানীরা ইসলামকে যথাযথ ভাবে বুঝতে পারেনি। এ ধরণের অন্ধত্ব রাষ্ট্র ও উম্মাহকে বিশৃংখলভাবে জীবন যাপনের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে ইসলামের শত্রুরা একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থায় স্থির ছিল এবং এটিই মেনে চলছিল। ইউরোপ, ভুল হলেও, একটি আদর্শের ধারক হয়ে গিয়েছিল। যদিও তার উৎসগত আকীদা বৈধ নয়, তবুও তা ছিল একটি আদর্শ। পক্ষান্তরে ইসলামী রাষ্ট্রের সঠিক ও বৈধ আকীদা থাকা সত্ত্বেও তা প্রাথমিকভাবে ইউরোপীয় আদর্শের ছায়ায় স্থান করে নিয়েছিল। ইসলামী আকীদা মানুষের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ও অতীত একটি বিষয় হয়ে দাড়িয়েছিল কারণ তারা এমন একটি রাষ্ট্রে বাস করত যা এর অপপ্রয়োগ করছিল। যদিও রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেন, আমি তোমাদের জন্য দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তা আকড়ে ধর, তবে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না, আর এ দুটো বিষয় হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও তার রাসুলের (সঃ) সুন্নাহ।" যদিও রাষ্ট্রটি তখনো ইসলামী ছিল এবং উম্মাহ মুসলিম ছিল, যদিও বিস্তৃত বুদ্ধিবৃত্তিক সঞ্চয় ও ফিকহি জ্ঞানসম্পদ প্রত্যেকের নাগালে ছিল, কিন্তু রাষ্ট্র হাদীসটির অর্থ গ্রহণ করতে এবং ইসলামের মূলে (আকীদা) ফিরে আসতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছিল। রাষ্ট্র এই সম্পদের ব্যবহার করে নি, এটি ছিল এমন এক সম্পদ যা অন্য কোন জাতি কখনো অর্জন করেনি এবং কোন দিন করবেও না।

অবশ্যই ইসলামী রাষ্ট্র এ সম্পদের কোন সুফল ভোগ করে নি। যখনই ইজতিহাদ বন্ধ হয়ে গেছে, বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যক্রম থেমে গেছে এবং মুসলিমদের মনে ইসলামী ধারণা গুলো ঝাপসা হয়ে গেছে ও ইসলামী সচেতনার অবনতি ঘটেছে। বই পুস্তক ও অন্যান্য সংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক হাতিয়ার গুলো তাকে সজ্জিত রাখা ছিল এবং সামান্য সংখ্যক শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি অবশিষ্ট ছিল। শিক্ষা ও গবেষণার আকাংখা বিলীন হয়ে গিয়েছিল। রাষ্ট্র ও সমাজের বিশাল সংখ্যক সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ব্যবহারের কোন উদ্যোগ ছিল না কারণ রাষ্ট্র কখনো এগুলোর ব্যবহারে উৎসাহ যোগায়নি। বুদ্ধিজীবিরা শুধুমাত্র জ্ঞানার্জনের জন্য শিক্ষালাভ করেছিলেন, অথবা তারা একটি জীবিকা নির্বাহের জন্য জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। কদাচিৎ কেউ উম্মাহ বা রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য জ্ঞানার্জন করেছেন। ফলতঃ বিজ্ঞান, সাংস্কৃতিক ও আইনসংক্রান্ত জ্ঞানার্জনে কোন বেগ ছিল না এবং ইসলাম সম্পর্কে অনুধাবন ছিল বিক্ষিপ্ত। মুসলিমরা ইসলামকে বুদ্ধিবৃত্তিক, রাজনৈতিক ও আইনপ্রনয়ণ সংক্রান্ত কাজের পরিবর্তে শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক অনুভূতির জন্য বুঝত।

ইসলামের প্রকৃত ধারণা এবং ধারণা বাস্তবায়নের পদ্ধতি অস্পষ্ট হয়ে পড়েছিল। মুসলিমরা ঠিকমত কুরআন ও সুন্নাহ অনুধাবন করত না এবং ধারণা করত ইসলাম শুধুমাত্র একটি আধ্যাত্মিক ধর্ম। তারা ইসলামকে আকীদা ও সম্পূর্ণ জীবন পদ্ধতি হিসাবে চিন্তা করার পরিবর্তে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যান্য ধর্মের সাথে তুলনা করতে শুরু করেছিল। কাজেই এটি কোন আশ্চর্যের বিষয় ছিল না যে ইউরোপীয় বিপ্লবের সামনে উসমানী রাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন মুসলিম উম্মাহ অলস ও দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে বসে ছিল। এটি দৃশ্যতঃ পিছনে পড়ে ছিল এবং ইউরোপের বহুবিধ আবিষ্কারের মাধ্যমে অর্জিত অর্থনৈতিক অগ্রগতি কিংবা সারা মহাদেশজুড়ে শুরু হওয়া শিল্প বিপ্লবের কোন প্রভাব সম্পর্কে সে উদাসীন ছিল। ইউরোপের এই বস্তুগত অগ্রগতি ইসলামী রাষ্ট্রে খুব সামান্যই প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং এ বিপ্লবের মাধ্যমে সে খুবই কম বস্তুগত অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। অধিকাংশ মুসলিমই ইউরোপের অর্জনকে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক হিসাবে দেখেছিল এবং এ ধরণের অগ্রগতির বিরোধীতা করেছিল।

এর একটি জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছে ছাপাখানার আবিষ্কার এবং যখন রাষ্ট্র কুরআন ছাপানোর সিদ্ধান্ত নিল। কিছু পন্ডিত ব্যক্তি (আলেম) কুরআনের ছাপা নিষিদ্ধ ঘোষণা করল এবং যেকোন নতুন কিছু নিষিদ্ধ করে ফতওয়া দিতে শুরু করল। এবং সাধারণ বিজ্ঞান শিখতে যাওয়া ব্যক্তিকে অবিশ্বাসী (কাফির) হিসাবে দায়ী করতে লাগল। তারা প্রত্যেক বুদ্ধিজীবিকেই কাফির ও জিনদিক হিসাবে দোষী সাব্যস্ত করল।

বিপরীতক্রমে, মুসলিমদের একটি ছোট দল তৈরী হল যারা বিজ্ঞান, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং সভ্যতাসহ পশ্চিমের সব কিছু গ্রহণের স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়ল। এরা হচ্ছে ঐসমস্ত ব্যক্তি যারা ইউরোপে বা ইসলামী বিশ্বে অনুপ্রবেশকারী মিশনারী বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করেছে। প্রথম প্রথম মুসলিমদের এ ক্ষুদ্র দলটি সমাজে খুব কমই প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। উসমানী রাষ্ট্রের শেষের বছরগুলোতে উম্মাহর মধ্যে একটি ধারণা ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ল আর তা হচ্ছে, 'পশ্চিমারা মূলত ইসলাম থেকেই তাদের সংস্কৃতি গ্রহণ করেছে এবং ইসলাম এর সাথে সাংঘর্ষিক নয় এরূপ কোন কিছু গ্রহণ করাকে নিষিদ্ধ করে না।' পশ্চিমা বিশ্ব সফল ভাবে এ ধারণাটি ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল এবং এক সময় অধিকাংশ মুসলিম, বিশেষতঃ শিক্ষিত মুসলিমরা এ ধারণাটি গ্রহণ করে নিল। এধরণের পন্ডিত, চিন্তাবিদ ও বিচারকরা পরবর্তীতে "আধুনিক চিন্তাবিদ" বা "সংস্কারবাদী" হিসাবে পরিচিত হয়েছিল।

অবশ্য পশ্চিমা সংস্কৃতি ও ইসলামী সংস্কৃতির মধ্যে প্রকৃত পার্থক্যের কারণে এবং জীবন সম্পর্কে পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গী ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিষ্কার পার্থক্যের কারণে পশ্চিমা শিক্ষার সাথে ইসলামী শিক্ষার একটি ঐক্যতান সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। সংস্কারবাদীরা ইসলামে তাদের পথ হারিয়ে ফেলে এবং এক সময় তারা ইসলাম থেকে বিচ্যূত হয়ে যায়। তাদের বিভ্রান্তিমূলক পশ্চিমা অভিগমন ব্যর্থ হয়েছিল কারণ তারা পশ্চিমা

ধারণা সঠিক ভাবে অনুধাবন করেনি এবং আবিষ্কার, বিজ্ঞান ও শিল্প সংক্রান্ত বিষয়গুলো উপেক্ষা করেছিল, ফলে ইসলাম থেকে আরো দুরে সরে গিয়েছিল। উম্মাহ দারুণ ভাবে এসকল সংস্কারবাদীদের উপর নির্ভর করেছিল, ফলে ব্যপক দ্বিধা দ্বন্দ্বের জন্ম হল। রাষ্ট্র একটি পরিষ্কার সিদ্ধান্ত প্রসূত অবস্থান গ্রহণ করতে ব্যর্থ হল এবং উম্মাহ বিজ্ঞান, আবিষ্কার থেকে শুরু করে শিল্প পর্যন্ত বস্তুগত অগ্রগতির সব উপায় পরিত্যাগ করল। রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে পড়ল এবং নিজকে রক্ষায় অসমর্থ হয়ে পড়ল। এই দুর্বলতা ইসলামের শত্রুদের ইসলামী রাষ্ট্র ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করতে উৎসাহিত করে তুলল।

মুসলিম ভূখন্ডে বিজ্ঞানের সহায়তার নামে মিশনারী অনুপ্রবেশ ঘটতে শুরু করেছিল। একই সময় বিভিন্ন রকম আন্দোলন শুরু হয়েছিল এবং ইসলামী রাষ্ট্রের কাঠামোকে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হয়েছিল। পশ্চিমাদের প্রত্যক্ষ উৎসাহে জাতীয়তাবাদের ধারণার বীজ বপণ করা হয়েছিল। এ জাতীয়তাবাদের বীজ ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে, যেমন বলকান, তুরস্ক, আরব অঞ্চল, আর্মেনিয়া, কুর্দী অঞ্চল সহ বিভিন্ন অংশে প্রোথিত হতে শুরু করল।

১৯১৪ সালে, ইসলামী রাষ্ট্র পতনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হল। এটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল এবং পরাজিত হল। এরপর অবশেষে ১৯২৪ সালে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। কাজেই ইসলামী রাষ্ট্র খন্ডিত হয়ে পড়ল এবং পশ্চিমাদের শত শত বছরের স্বপ্ন অবশেষে বাস্তবায়িত হল। ইসলামী রাষ্ট্রের বিখন্ডায়নের সাথে সাথে মুসলিম ভূখন্ডের ব্যবস্থা হয়ে পড়ল অনৈসলামিক এবং তখন থেকেই মুসলিমরা অনৈসলামিক পতাকার নীচে জীবন যাপন করছে। তখন থেকেই তারা কুফর শাসনের অধীনে, কুফর আইন দ্বারা জীবন যাপন করছে। তারা অস্থির হয়ে পড়েছে এবং তাদের অবস্থার আরো অবনতি ঘটেছে।

## মিশনারী আক্রমনঃ

ইসলামী রাষ্ট্রে বিজ্ঞানের নাম করে ইউরোপের অনুপ্রবেশ শুরু হয়ে গিয়েছিল। এ কাজের জন্য তাদের মোটা অংকের অর্থ বরাদ্দ ছিল। মূলতঃ এটি ছিল বিজ্ঞান ও মানবতার নামে মিশনারীদের (ধর্মপ্রচার প্রতিষ্ঠান) ছদ্মাবরণে পরোক্ষভাবে ঔপনিবেশিকতার প্রসার। এ আক্রমনের পরিকল্পনা করা হয়েছিল মুসলিম ভূখন্ডে রাজনৈতিক গোয়েন্দা শাখা কার্যকর করতে এবং সাংস্কৃতিক ঔপনিবেশিকতার বিস্তার ঘটাতে, যাতে করে মুসলিম ভূখন্ড গুলো পশ্চিমা কুচক্রীদের অন্যতম প্রধান যজ্ঞক্ষেত্রে পরিণত হতে পারে। এ উপনিবেশবাদের সূচনা হয় যখন মুসলিম বিশ্ব পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল এবং এটি মূলত পরিচালিত হয়েছিল ফরাসী, ইংরেজ ও মার্কিন মিশনারীদের মাধ্যমে।

ফলাফল স্বরূপ এ মিশনারী প্রতিষ্ঠানগুলো মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে ফরাসী ও ইংরেজরা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। এরা মূলত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রধান চালিকা শক্তিতে পরিণত হয়েছিল যারা প্যান আরব ও প্যান তুর্কীবাদকে উৎসাহিত করেছিল। পাশাপাশি শিক্ষিত মুসলিমদের পশ্চিমাভিমুখী করার ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল। এর পিছনে প্রধাণত দুটি লক্ষ্য ছিল। প্রথমতঃ বর্ণবাদকে উস্কে দিয়ে উসমানী রাষ্ট্র তুরস্ক হতে আরবদের বিচ্ছিন্ন করা ও সেই সুবাদে ইসলামী রাষ্ট্রে ফাটল সৃষ্টি করা। দ্বিতীয়তঃ মুসলিমদের অজ্ঞতার সুযোগে তাদের ইসলামের প্রকৃত বন্ধন সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ করে তোলা।

মিশনারী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের সঙ্কল্পনার (স্কীম) মাধ্যমে প্রথম পর্বটি ভালোমত সম্পন্ন করলেও দ্বিতীয় বিষয়টি অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছিল। এ বিষয়টিকে তারা তুরস্ক, আরব, পারস্য এবং অন্যান্য জাতীযতাবাদী আন্দোলনের উপর ছেড়ে দিয়েছিল যা মুসলিমদের ঐক্য বিনষ্ট করতে ও ইসলামের মূলনীতি হতে বিচ্ছিন্ন করতে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল।

মিশনারী প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করেছিল বিভিন্ন পর্যায়ে এবং তার ফলাফল পুরো মুসলিম বিশ্বেই পরিলক্ষিত হয়েছিল। বর্তমানে আমরা যে দূর্বলতা ও অধঃপতন প্রত্যক্ষ করছি তা এই সংগঠনগুলোর প্রচেষ্টার ফলাফল। উপনিবেশবাদী শক্তি গুলোই আমাদের অগ্রযাত্রায় বাঁধার প্রাচীর সৃষ্টিতে প্রথম ইঁটটি স্থাপন করেছিল যা পরবর্তীতে আমাদের ও আমাদের আদর্শের মাঝে একটি দূর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান রচনা করে দিয়েছে।

ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো মুসলিম বিশ্বে তাদের মিশনারী প্রতিষ্ঠানগুলো তৈরী করেছিল কারণ মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের মিথ্যা প্রচারণা (propaganda) কোন কার্যকর ফল বয়ে আনছিল না। ক্রুসেডের বিরুদ্ধে জিহাদে মুসলিমরা তাদের ধৈর্য্য, সাহস এবং শক্তিমত্তার স্বাক্ষর রেখেছিল। যখন যুদ্ধক্ষেত্রে ক্রুসেডারগণ মুসলিমদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হয়েছিল, তখন তারা মূলত দুটি বিষয়ের উপর ভরসা করেছিল। এগুলো ছিল তাদের নিজস্ব হিসাব প্রসূত এবং এক্ষেত্রে তারা সাফল্যের ব্যাপারে ব্যাপক আশাবাদী ছিল। তারা ধারণা করেছিল এ দুটি বিষয় ইসলাম ও মুসলিমদের চিরতরে নিশ্চিহ্ন করতে প্রধান ভূমিকা রাখবে।

প্রথমতঃ তারা মুসলিম বিশ্বে বসবাসরত, বিশেষত আল শাম অঞ্চলের খৃষ্টানদের উপর নির্ভর করেছিল। কারণ তারা সংখ্যায় ছিল অনেক এবং অত্যন্ত ধার্মিক। ইউরোপীয়রা তাদের অভিন্ন বিশ্বাসের ভাই হিসাবে বিবেচনা করত। ইউরোপীয়দের ধারণা ছিল ধর্মীয় যুদ্ধের খাতিরে তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও গুপ্তচরবৃত্তিতে তাদের সহায়তা করবে।

দ্বিতীয়তঃ ইউরোপীয়রা তাদের সংখাধিক্য ও শক্তিমত্তা'র উপর বেশ আস্থাশীল ছিল । তারা জানত যে মুসলিমরা ইতিমধ্যেই বিভক্ত হয়ে পড়েছিল এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে বিবাদে লিপ্ত থাকত। স্পষ্টতঃ তাদের ঐক্যে ফাটল ধরেছিল। ইউরোপীয়রা ধারণা করত, একবার মুসলিমদের পরাজিত করতে পারলে তারা চিরতরে তাদের পদানত হবে ও সমূলে ধ্বংস হবে এবং তাদের দ্বীন কতগুলো আচার সর্বস্ব অনুষ্ঠানে পরিণত হবে। অবশ্য বাস্তবে তাদের এ আশা ভেস্তে গিয়েছিল এবং তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও বিফলে গেল। তারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে লক্ষ্য করল যে রণক্ষেত্রে মুসলিমদের পাশাপাশি আরব খৃষ্টানরা ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ করেছিল। ইউরোপীয়দের যাবতীয় মিথ্যা প্রচারণা তাদের উপর কোন কার্যকর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। ইউরোপীয়রা যে বিষয়টি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল তা হচ্ছে, আরব খৃষ্টানরা মুসলিমদের সাথে একত্রে বসবাস করত, সমঅধিকার ভোগ করত এবং রাষ্ট্রের প্রতি সমান দায়িত্ব পালন করত। মুসলিমরা তাদের নিকট হতে খাবার গ্রহণ করত, খৃষ্টান নারীদের বিয়ে করত, তাদের দৈনন্দিন কাজে অংশীদার ছিল এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণ করত।

খলীফা ও গভর্ণরগণ রাষ্ট্রে আইনের শাসন ন্যায় সম্মতভাবে বাস্তবায়ন করতেন। আল কুরাফী এবং ইবনে হাযাম লিখেছেন,
"যদি আগ্রাসী শক্তি আমাদের ভূখন্ডকে আক্রমন করে তবে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে যিম্মিদের রক্ষা করা আর এজন্য প্রয়োজনে আমরা জীবন দেব। এ দায়িত্ব পালনে সামান্য অবহেলা যিম্মীদের অধিকার লংঘনের শামিল হবে।"

আল কুরাফী আরো বলেছেন,
"যিম্মিদের প্রতি মুসলিমদের দায়িত্ব হচ্ছে ভদ্র ব্যবহার, দুবলদের প্রতি সহমর্মিতা, দরীদ্রদের সাহায্য, ক্ষুধার্তদের আহারের ব্যবস্থা করা, তাদের জন্য পোষাকের ব্যবস্থা করা এবং তাদের সাথে মার্জিতভাবে কথা বলা। মুসলিমদের প্রত্যাঘাত করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাদের প্রতিবেশীদের আঘাতকে ক্ষমার দৃষ্টতে দেখা উচিৎ। যে কোন সৎকর্মশীল ধর্মপরায়ণ মুসলিমের দায়িত্ব হচ্ছে তাদের প্রতি উত্তম উপদেশ দেয়া, তাদের সম্পদ, পরিবার, সম্মান ও অধিকার রক্ষা করা।"

একথা বিবেচনা করলে মুসলিমদের সহযোগী হিসাবে খৃষ্টানদের লড়াই করার বিষয়টি স্বাভাবিক। ইউরোপীয়রা আরো বিস্মিত হল যখন দেখল তাদের দ্বিতীয় কৌশলটিও বাস্তব ফল বয়ে আনতে ব্যর্থ হল। তারা আল শাম দখল করে নিয়েছিল এবং মুসলিমদের সামগ্রিকভাবে পরাজিত করেছিল। তারা নিকৃষ্টতম নৃশংসতার স্বাক্ষর রেখেছিল এবং এ সময় তারা প্রথমবারের মত ব্যাপকহারে মুসলিমদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করেছিল যা আজো অব্যাহত রয়েছে। তারা ধারণা করেছিল, সবকিছুই তাদের পক্ষে গিয়েছে এবং মুসলিমরা আর কোনদিন তাদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাড়াতে পারবে না। অবশ্য মুসলিমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল যে তাদের ভূখন্ড থেকে দখলদার বাহিনীকে অপসারণ করতে হবে। যদিওবা প্রায় দুইশত বছর ক্রুসেডারগণ মুসলিম ভূখন্ড দখল করে রেখেছিল এবং ইতিমধ্যে তারা তাদের সাম্রাজ্য ও principalities স্থাপন করেছিল, কিন্তু মুসলিমরা অবশেষে তাদের বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়েছিল।

ইউরোপীয়রা মুসলিমদের এ অভাবিত সাফল্যের রহস্য উদঘাটনে মনোযোগ দিল। তারা লক্ষ্য করল এর বীজ ইসলামেই নিহিত আছে। মুসলিমদের শক্তির উৎস হচ্ছে তাদের আকীদা এবং তার সাথে যুক্ত হয়েছিল আইনকানুন ও অমুসলিমদের অধিকার সংরক্ষণের অনুপম ব্যবস্থাটি। ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের ঐক্যের পিছনে এটিই ছিল মূল কারণ। তাদের সময়ে অবিশ্বাসী উপনিবেশবাদীরা ইসলামী বিশ্ব দখলের নতুন কৌশল গ্রহণ করল। তারা ইসলামী বিশ্বে অনুপ্রবেশের সর্বোত্তম পথটি বেছে নিয়েছিল এবং তা হচ্ছে মিশনারীদের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। এর লক্ষ্য ছিল খৃষ্টানদের সমর্থন অর্জন ও মুসলিমদের মধ্যে তাদের দ্বীন সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করা।

তারা আশা করেছিল যে এ পদ্ধতিটি মুসলিমদের দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহের উদ্রেক করবে এবং তাদের আকীদা নড়বড়ে হয়ে যাবে। এর মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করা যাবে এবং তা মুসলিমদের দুর্বল করে ফেলবে।

উপনিবেশবাদীরা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সফল হয়েছিল। ১৬শ শতাব্দীর শেষ নাগাদ তারা মাল্টায় মিশনারী কেন্দ্র স্থাপন করতে সমর্থ হল এবং এটি তাদের প্রধান ঘাঁটিতে পরিণত হল যেখান থেকে পরবর্তীতে তারা মুসলিম বিশ্বে মিশনারী কার্যক্রমের মাধ্যমে ধ্বংসযজ্ঞের সূচনা করেছিল। প্রাথমিক অবস্থায় তারা এখান থেকেই তাদের মিশন কার্য পরিচালনা করত। পরবর্তীতে তাদের কার্যক্রম সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে তারা তাদের মূল ঘাঁটি আল শাম এ সরিয়ে নেয় এবং এখান থেকে তাদের মিশনারী আন্দোলনের শুরু করে।
অবশ্য এসময় তাদের কার্যক্রম ছিল সীমিত। তারা কিছু স্কুল স্থাপন ও বই পুস্তক প্রকাশ করা ছাড়া বিশেষ কিছু করতে পারে নি। বস্তুতঃ তারা সবার নিকট থেকে ব্যাপক বাধা ও অসহযোগিতার সম্মূখীন হয়েছিল। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাদের কজ অব্যাহত থাকে এবং এ সময় তাদের ঈসায়ী (jesuits) কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য কিছু কিছু অনুল্লেখযোগ্য কার্যক্রম তখনো চলছিল - যেমন 'আজারীয়' মিশনারী। এদের

কার্যক্রম অব্যহত থাকলেও তাদের অস্তিত্ব প্রায় শূন্যের পর্যায়ে নেমে এসেছিল। ১৮২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাদের কাজ মাল্টায় সীমাবদ্ধ ছিল। এসময় বৈরুতে তাদের একটি কেন্দ্র চালু হয় এবং মিশনারীদের কাজ পুনর্দ্যোমে শুরু হয়। প্রথমদিকে তারা বেশ প্রতিকূলতার শিকার হলেও তাদের কাজ অব্যাহত ছিল। প্রাথমিকভাবে তাদের কাজের ক্ষেত্র ছিল ধর্মবাণী ও ধর্মীয় সংস্কৃতি প্রচার। তাদের শিক্ষা কার্যক্রম ছিল সীমিত ও দুর্বল।

১৮৩৪ সালে মিশনারী তৎপরতা সমগ্র শাম এ ছড়িয়ে পড়ল। লেবাননের আনতুরা গ্রামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হল এবং মার্কিন মিশন তাদের বই পুস্তক প্রকাশনা ও প্রচারের সুবিধার্থে মাল্টা থেকে ছাপাখানা ও দোকান বৈরুতে সরিয়ে নিল।

প্রখ্যাত মার্কিন মিশনারী এলাই স্মিথ এ সময়ে খুবই তৎপর ছিল। সে মাল্টায় স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে মিশনের ছাপাখানার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। ১৮২৭ সালে তিনি বৈরুতে এসেছিল। কিন্তু ভয় এবং একঘেয়েমী তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল বলে সে পুনরায় মাল্টায় ফিরে যায়। অবশেষে পুনরায় ১৮৩৪ সালে তার স্ত্রী সহ সে বৈরুতে আসে এবং মেয়েদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। এ সময় তার কাজের পরিধি বেড়ে গেল এবং আল শাম অঞ্চলে, বিশেষত বৈরুতে তার কাজে আত্মনিয়োগ করল। তার ও তার মত এরূপ আরো অনেকের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে মিশনারী আন্দোলনের পুনর্জন্ম হল। যখন ইব্রাহিম পাশা প্রাথমিক স্কুলের জন্য একটি নতুন পাঠ্যসূচী গ্রহণ করে তা সিরিয়াতে বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত নিলেন তখন মিশনারীদের সামনে এক নতুন সুযোগের দ্বার খুলে গেল। মিশরীয় শিক্ষা ব্যবস্থা হতে উদ্বুদ্ধ হয়ে এ সিলেবাসটি প্রণীত হয়েছিল এবং মিশরীয় ব্যবস্থাটি গৃহীত হয়েছিল ফরাসী শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে। মিশনারীরা এ সুযোগটি গ্রহণ করেছিল এবং তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা আন্দোলনে কার্যকর অবদান রেখেছিল। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তারা তাদের প্রকাশনার কাজ বিস্তৃত করতে সক্ষম হল। সবকিছু ছাড়িয়ে মিশনারী আন্দোলন সাফল্যের মুখ দেখতে শুরু করল। তারা ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের ধর্মের স্বাধীনতার নামে পরস্পরের প্রতি ক্রোধের আগুন প্রজ্জ্বলিত করল এবং মুসলিম, খৃষ্টান ও দ্রুজ ধর্মাবলম্বীদের মাঝে আকীদা সম্পর্কিত বিভিন্ন ধর্মীয় কার্যক্রম পরিচালনা করতে শুরু করল।

ইব্রাহীম পাশা যখন আল শাম থেকে পিছু হটল তখন অস্থিরতা, আতঙ্ক আর নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়েছিল এবং জনগণের মাঝে ব্যপক বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল। বিদেশী প্রতিনিধিবৃন্দ, বিশেষতঃ মিশনারী প্রতিষ্ঠানগুলো এর সুযোগ নিল। আল শামে উসমানী রাষ্ট্রের দুর্বল প্রভাবের সুযোগে তারা নাগরিকদের মাঝে অন্তর্কলহ উস্কে দিতে লাগল। এক বছরের মাথায়, ১৮৪১ সালে লেবাননের পার্বত্য অঞ্চলে খৃষ্টান ও ইসমাইলী দারাজী সম্প্রদায়ের (druze) মাঝে মারাত্মক গোলযোগ ছড়িয়ে পড়ল। অবস্থার আরো অবনতি ঘটলে বিদেশী রাষ্ট্র সমূহের চাপে ও হস্তক্ষেপে উসমানী রাষ্ট্র লেবাননের জন্য পৃথক একটি শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হল। এ ব্যবস্থায় প্রদেশটিকে দুটি পৃথক ভাগে ভাগ করে ফেলা হল এবং এক অংশে খৃষ্টান সম্প্রদায় ও অন্য অংশে দারাজী (druze) সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করা হল। উসমানী রাষ্ট্র উভয় প্রদেশে একজন করে গভর্ণর নিযুক্ত করলেন যাতে উভয় সম্প্রদায়ের মাঝে কোন বিরোধ বা সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হয়। এ ব্যবস্থাটি সফল হয়নি, কারণ এটি ছিল একটি অস্বাভাবিক সমাধান। এসময় বৃটেন ও ফ্রান্স এতে সরাসরি যুক্ত হয়ে পড়ল এবং যেখানেই কর্তৃপক্ষ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছিল সেখানেই তারা নাগরিকদের মাঝে বিবাদ ও সংঘাত উস্কে দিতে লাগল।

বৃটেন ও ফ্রান্স এ সংঘাতের অজুহাতে লেবাননের আভ্যন্তরীন বিষয়গুলোতে হস্তক্ষেপ করা শুরু করল। ফরাসীরা মাওয়ারিন ক্যাথলিক খৃষ্টান সম্প্রদায় (maronites) এবং বৃটিশরা দারাজী সম্প্রদায়ের পক্ষাবলম্বন করল। এর মাধ্যমে ১৮৪৫ সালে নতুন করে গোলযোগ সৃষ্টি হল। এ সময় দৃশ্যপট ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। আক্রমনের নৃশংসতা এত ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল যে গীর্জা, মঠ পর্যন্ত রক্ষা পায়নি। চৌর্যবৃত্তি, হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যপারে পরিণত হয়েছিল। এ পরিস্থিতিতে সমস্যাটির একটি স্থায়ী সমাধানের জন্য উসমানী রাষ্ট্র তার পররাষ্ট্র বিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে লেবাননে পাঠালো। কিন্তু তিনি উত্তেজনার সাময়িক প্রশমন ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোন সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। এ দিকে মিশনারীরা তাদের কার্যক্রম আরো ঘনীভূত করল। ১৮৫৭ সালে মাওয়ারিন খৃষ্টান সম্প্রদায় (maronite) বিপ্লব ও সশস্ত্র সংগ্রামের ঘোষণা দিল। মাওয়ারিন ধর্মগুরুরা কৃষকদের মধ্যে তাদের সামন্ত প্রভূদের বিরুদ্ধে বিষিয়ে তুলল। ফলশ্রুতিতে উত্তরাঞ্চলে তারা এক ভয়াবহ আক্রমনের সূচনা করল। এভাবে এক রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের শুরু হল এবং তা দক্ষিণেও ছড়িয়ে পড়ল। খৃষ্টান কৃষকেরা তাদের দারাজী সামন্তপ্রভুদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াল এবং বৃটিশ ও ফরাসীরা তাদের মিত্রদের সাহায্য করতে লাগল। এর ফলাফলস্বরূপ গোটা লেবাননে গৃহ যুদ্ধ (civil strife) ছড়িয়ে পড়ল। দারাজী সম্প্রদায় নির্বিচারে পাদ্রী, সাধারণ জনগণ নির্বিশেষে খৃষ্টান হত্যা করতে শুরু করল। এ সংঘাতের ফলে হাজার হাজার লোক হতাহত হল কিংবা উদ্বাস্তু ও গৃহহীন হয়ে পড়ল।

আল শাম এর সর্বত্র গোলযোগের ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছিল। দামাস্কাসে মুসলিম ও খৃষ্টান অধিবাসীদের মধ্যে তীব্র ঘৃণার বিষ ছড়ানো হচ্ছিল। অবশেষে ১৮৬০ সালে মুসলিমরা একটি খৃষ্টান জেলা আক্রমন করে বসলে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। এ সংঘর্ষের সাথে যুক্ত হয়েছিল যুগপৎ গণলুণ্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞ। এ সংঘাতের পরিসমাপ্তি ঘটাতে উসমানী রাষ্ট্র সামরিক হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হল। এর ফলে যদিও বা লেবাননে শান্তি স্থাপন করা সম্ভব হল, কিন্তু পশ্চিমা ষড়যন্ত্রকারী রাষ্ট্রগুলো আল শাম এ অনুপ্রবেশের জন্য একে একটি সুযোগ হিসাবে নিল। ফলে তারা উপকূলে তাদের রণতরী সমাবেশ করতে শুরু করল।

একই বছরের অগাস্টে ফ্রান্স বিপ্লব দমন করতে বৈরুতে তাদের পদাতিক বাহিনীর একটি ডিভিশন প্রেরণ করেছিল। এভাবেই লেবানন ও সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে উসমানী রাষ্ট্রে অসন্তোষ ও সংঘাত ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। এর প্রধান কারণ ছিল পশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহ, যারা বহুদিন থেকেই উসমানী রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলোতে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করে আসছিল। তারা এ ব্যাপারে সফল হয়েছিল এবং উসমানী রাষ্ট্রকে বাধ্য করেছিল সিরিয়ার জন্য দুটি প্রদেশে বিভক্ত করে একটি আলাদা শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে এবং লেবাননকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে। এ ঘটনার মাধ্যমেই লেবানন, আল শাম থেকে পৃথক হয়ে গেল। লেবাননের জন্য স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত স্বায়ত্ত শাসন দেয়া হল। এ ব্যবস্থায় সরকার প্রধান হল একজন খৃষ্টান যে স্থানীয় অধিবাসীদের প্রতিনিধিদের একটি কাউন্সিলের সহায়তায় শাসন কার্য পরিচালনা করে।

তখন থেকেই বিদেশী শক্তিগুলো লেবাননের বিষয়গুলো পরিচালনা করে আসছে এবং তাদের কাজের মূল কেন্দ্রে পরিণত করেছে। এভাবে লেবানন একটি সেতু হিসাবে কাজ করেছে যার মাধ্যমে বিদেশী শক্তি উসমানী রাষ্ট্র তথা ইসলামী ভূখন্ডের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে।

এদিকে মিশনারীরা একটি নতুন কর্মপন্থা গ্রহণ করল। মিশনারীরা শুধুমাত্র স্কুল প্রতিষ্ঠা, ছাপাখানা ও ক্লিনিক স্থাপন করেই সন্তুষ্ট ছিলনা, বরং তারা তাদের মধ্যে একটি সংঘ (এসোসিয়েশন) সৃষ্টির পরিকল্পনা গ্রহণ করল। ১৮৪২ সালে মার্কিন মিশনের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি বিজ্ঞান সংঘ স্থাপনের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হল। এ কমিটির কাজ প্রায় পাঁচ বছর স্থায়ী হয়েছিল। এর মধ্যে তারা একটি সংঘ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল যার নাম ছিল "বিজ্ঞান ও শিল্প সংঘ" (Association of Arts and Sciences)। এর সদস্যদের মধ্যে ছিল নাসিফ আল ইয়াযিজী, এবং বুক্রস আল বুস্তানী, (আরবদের উদ্দেশ্যে গঠিত বিধায় লেবানীজ খৃষ্টানদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল) এবং এলাই স্মিথ, কর্ণেলিয়াস ভ্যান ডাইক ও ব্রাইটন কর্ণেল চার্চিল। প্রথমে এ সংঘের উদ্দেশ্য ছিল অস্পষ্ট। তারা বয়স্কদের ও শিশু কিশোরদের স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষা দিত। তারা বয়স্ক ও কিশোরদের পশ্চিমা সংস্কৃতি শেখার ব্যাপারে উৎসাহিত করত এবং এভাবে মিশনারী পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের মন ও চিন্তাধারাকে গড়ে তুলছিল।

অবশ্য সংঘটির নিরলস প্রচেষ্টার পরও দু বছরে তারা গোটা শাম অঞ্চলে মাত্র পঞ্চাশ জন সদস্যকে দলে টানতে সক্ষম হয়েছিল। তারা সকলেই ছিল খৃষ্টান, বিশেষত বৈরুত অঞ্চলের অধিবাসী। কোন মুসলিম কিংবা দারাজী সম্প্রদায় তাদের দলে তখনো যোগ দেয়নি। তাদের কাজ সম্প্রসারিত ও ত্বরান্বিত করতে ব্যপক প্রচেষ্টা সত্তেও খুব একটা সফল হচ্ছিল না। পাঁচ বছরের মাথায় এ সংঘটির অবলুপ্তি ঘটে। এর মাঝে তারা উল্লেখযোগ্য কোন সাফল্য না পেলেও মিশনারীদের মাঝে আরো অনেকগুলো সংঘ তৈরীর আকাংখা সৃষ্টি হয়েছিল। কাজেই ১৮৫০ সালে আরেকটি সংঘ স্থাপিত হল এবং এর নাম দেয়া হয়েছিল "প্রাচ্য সংঘ" (oriental association). ফরাসী ঈসায়ী সঙ্ঘের যাজক হেনরি দেব্রোনিয়ের অভিভাবকত্বে ও সহযোগিতায় খৃষ্টান সদস্যদের নিয়ে ঈসায়ীগণ (Jesuits) এ সংঘটি প্রতিষ্ঠা করেন। এটি তার পূর্ববর্তী "বিজ্ঞান ও শিল্প সংঘের" পথ অনুসরণ করেছিল এবং স্বল্প সময় পর এটিও ভেঙ্গে যায়।

এরপর আরো বেশ কটি সংঘ স্থাপিত হয় কিন্তু তাদের সবকটিই ব্যর্থতার বোঝা মাথায় নিয়ে অপসৃত হয়। ১৮৫৭ সালে একটি নতুন সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় যারা একটু ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল। এর সকল সদস্যই ছিল আরব এবং এতে কোন বিদেশী সদস্যকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। এবার তাদের প্রচেষ্টা সাফল্যের মুখ দেখল এবং কিছু মুসলিম ও দারাজী সম্প্রদায়ের লোকও তাদের সংঘে যোগ দিল। এ সংঘটি তাদের গ্রহন করেছিল, কারণ তারা সবাই ছিল আরব। এর নাম দেয়া হল, "সিরীয় বিজ্ঞান সংঘ" (Syrian Science Association)। সংঘটি তাদের কাজে সাফল্য পেতে শুরু করল এবং বিদেশী সদস্য না থাকায় আরবদের নিকট গ্রহন যোগ্যতা পেল। এর সদস্যরা নতুন সদস্যদের অন্তর্ভূক্ত করতে লাগল, তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমর্থন পেতে লাগল এবং ক্রমে এর সদস্য সংখ্যা একশত পঞ্চাশে উন্নীত হল। এর প্রশাসানিক ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কিছু প্রখ্যাত আরব ব্যক্তিত্ব ছিল, যেমন দারাজী সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে মোহাম্মদ আরসালান, মুসলিমদের মধ্য থেকে হুসাইন বায়হাম। আরব খৃষ্টান সম্পদ্রায় থেকেও অনেকে যোগ দিল। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল বুক্রস বুস্তানীর সন্তান ইব্রাহীম আল ইয়াযিজী। এ সংঘটি অন্যান্য সংঘের চেয়ে বেশী সময় স্থায়ী হয়েছিল। এর কর্মসূচীর পরিকল্পনা করা হয়েছিল আরব জাতীয়তাবাদ কে প্রজ্জ্বলিত করার উদ্দেশ্যে। অবশ্য বিজ্ঞানের মোড়কে এর গুপ্ত উদ্দেশ্যটি ছিল উপনিবেশবাদ ও মিশনারীর প্রসার। এটি পশ্চিমা সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিস্তারের জন্য একটি ছায়া সংগঠন হিসাবে কাজ করছিল।

১৮৭৫ সালে বৈরুতে "গুপ্ত সংঘ" (secret association) নামে একটি সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি মূলত রাজনৈতিক চিন্তা ধারণার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি আরব জাতীয়তাবাদের ধারণাটি উস্কে দিতে শুরু করল। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিল বৈরুত প্রোটেস্ট্যান্ট কলেজের পাঁচজন তরুণ। এরা সকলেই ছিল খৃষ্টান, যাদের মিশনারী সংগঠনগুলো প্রভাবিত করতে পেরেছিল। প্রতিষ্ঠার পর তারা অল্প সংখ্যক সদস্য দলে নিল। এ সংঘটি তাদের লিফলেট ও ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে আরব জাতীয়তাবাদের ডাক দিল এবং তারা আরবদের, বিশেষত সিরীয় ও লেবানীজদের, রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবী তুলল।

অবশ্য এদের প্রকৃত কাজ ও কর্মসূচী একেবারেই ভিন্ন উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হত। এরা মানুষের অন্তরে অদ্ভূত আকাংখা ও মিথ্যা আশার জন্ম দিতে লাগল। তারা আরব জাতীয়তাবাদরে প্রতি আহ্বান করত এবং উসমানী রাষ্ট্রকে তুর্কী রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করে এর বিরোধিতা

কে উৎসাহিত করত। এটি রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করার জন্য কাজ করছিল এবং আরব জাতীয়তাবাদকে জীবনের ভিত্তি হিসাবে প্রচার করতে লাগল। এ সংঘটি সর্বদা আরব জাতীয়তাবাদকে উর্ধ্বে তুলে ধরত। দায়িত্বপ্রাপ্তরা সকলেই তাদের সাহিত্য ও লেখনীতে তুর্কীদের আরবদের নিকট থেকে ইসলামী খিলাফত ছিনিয়ে নেয়া, ইসলামী শরীয়াহ লংঘন ও দ্বীনকে অবমাননা করার জন্য দায়ী করত। এ থেকে সংঘটির প্রকৃত চরিত্র ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় এবং তা হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের বিপক্ষে একধরণের অসন্তোষ সৃষ্টি করা। এরা দ্বীন সম্পর্কে সন্দেহ ও হতাশা সৃষ্টি করত এবং অনৈসলামিক মূলনীতির ভিত্তিতে রাজনৈতিক আন্দোলন প্রতিষ্ঠার সুযোগ খুঁজত। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমা শক্তিরাই এ আন্দোলনগুলো শুরু করেছিল। তারাই এদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তাদের পর্যবেক্ষণ করত ও তাদের পরিচালনা করত। তারা তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে বিবরণী লিখত। উদাহরণ স্বরূপ, ১৮৮০সালের ২৮ জুলাই, বৈরুতে নিযুক্ত বৃটিশ কনসাল, তার সরকারের নিকট একটি টেলিগ্রাম পাঠায় যাতে বলা হয়, "বিপ্লবী লিফলেটের বিতরণ শুরু হয়েছে। উৎস হিসাবে মিজাতকে সন্দেহ করা হচ্ছে। তা সত্ত্বেও অবস্থা শান্ত রয়েছে। ডাকযোগে বিস্তারিত জানান হবে।"

বৈরুতের রাস্তায় একটি লিফলেট বিলি ও দেয়ালে লাগানোর পর এই টেলিগ্রামটি পাঠানো হয়েছিল। এরপর বৈরুত ও দামাস্কাসে নিযুক্ত বৃটিশ কনসালগণ বেশ কিছু চিঠি পাঠায়।

এ চিঠিগুলোর সাথে ছিল সংঘের সদস্যদের বিলিকৃত লিফলেটের কপি। এটি একটি যথার্থ তথ্যপ্রমাণ যা থেকে স্পষ্টত: প্রতীয়মান হয় যে, আল শাম এ তাদের কার্যক্রম শুরু করা প্রোটেস্ট্যান্ট কলেজের আন্দোলনটি তাদের পরিকল্পনা ছিল। আল শাম অঞ্চলেই সংঘের কার্যক্রম বেশী পরিলক্ষিত হত। অবশ্য অন্যান্য আরব অধ্যুষিত অঞ্চলেও এদের কার্যক্রম চলছিল। ১৮৮২ সালে জেদ্দায় নিযুক্ত বৃটিশ কমিশনারের তার সরকারের কাছে লেখা চিঠি থেকে এটি স্পষ্ট হয়ে উঠে। আরব আন্দোলন সম্পর্কে সে লিখে, "আমার কাছে এ খবর পৌঁছেছে যে, এমনকি মক্কায়ও কিছু কিছু বুদ্ধিজীবি স্বাধীনতা নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছে। আমি যা শুনেছি তা থেকে মনে হচ্ছে নাজ্‌দের সাথে দুই নদীর মধ্যবর্তী ভূখন্ড অর্থাৎ দক্ষিণ ইরাককে একত্রিত করার একটি পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে যেখানে মনসুর পাশাকে নিয়োগ দেয়া হবে এবং 'আসীর ও ইয়েমেন কে একত্রিত করে আলী ইবনে আবিদ কে তার শাসক নিযুক্ত করা হবে।"

এ বিষয়গুলোতে শুধুমাত্র বৃটেনই আগ্রহী ছিল না বরং ফ্রান্সও গভীর আগ্রহ প্রকাশ করছিল। ১৮৮২ সালে বৈরুতে নিযুক্ত একজন ফরাসী কর্মকর্তা ফরাসী উদ্বেগের কথা জানায় এই বলে,

"স্বাধীনতার চেতনা ছড়িয়ে পড়েছে এবং আমি বৈরুতে থাকাকালীন সময়ে মুসলিম যুবকদের স্কুল ও ক্লিনিক স্থাপন এবং দেশের পুনর্জাগরণের কাজে একাগ্রতা লক্ষ্য করেছি। এখানে যে বিষয়টি উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হচ্ছে এ আন্দোলনটি যে কোন উপদলীয় প্রভাব থেকে মুক্ত। এ সংঘে খৃষ্টান সদস্যদের স্বাগত জানানো হয় এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তাদের উপর নির্ভর করা হয়।"

বাগদাদ থেকে একজন ফরাসী লিখেছিল,

"আমি যেখানেই গিয়েছি সেখানেই একই মাত্রার একটি সাধারণ অনুভূতি লক্ষ্য করেছি এবং তা হচ্ছে তুর্কীদের প্রতি বিদ্বেষ। এই তীব্র বিদ্বেষপূর্ণ অবস্থা হতে উত্তরণের জন্য সমষ্টিগত কাজ শুরুর জন্য একটি ধারণা প্রণয়নের কাজ চলছে। দিগন্তে একটি আরব জাতীয়তাবাদ আন্দোলন দানা বাঁধছে এবং অচিরেই তা আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। এই জাতি, যারা দীর্ঘকাল যাবৎ শোষিত হয়েছে তারা মুসলিম বিশ্বে তাদের স্বাভাবিক মর্যাদার দাবী তুলতে যাচ্ছে এবং বিশ্বের ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনা দিতে যাচ্ছে।"

ধর্ম ও বিজ্ঞানের নামে এই মিশনারী কার্যক্রম শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও বৃটেনের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং আরো বহুদুর ছড়িয়ে গিয়েছিল এবং অধিকাংশ অনৈসলামীক রাষ্ট্রগুলোতেও তাদের কার্যপরিধি বিস্তৃত করেছিল। এর মধ্যে ছিল জারের শাসনাধীন রাশিয়া কর্তৃক প্রেরিত মিশনারী অভিযান এবং প্রুশিয়া (জার্মানী) কর্তৃক বিভিন্ন মিশনারী কাজে প্রেরিত একদল সেবিকা (ক্যরডের সন্ন্যাসীনি)। বিভিন্ন মিশনারী ও পশ্চিমা প্রতিনিধিবৃন্দের মধ্যে মতভেদ, রাজনৈতিক কার্যক্রমের ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল এক ও অভিন্ন। তা হচ্ছে প্রাচ্যে খৃষ্টধর্মের প্রচার, পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রসার এবং মুসলিমদের মাঝে তাদের দ্বীন সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করা, তিক্ততা ছড়িয়ে দেয়া, তাদের ইতিহাসের প্রতি অবজ্ঞা সূচক দৃষ্টিভঙ্গী তৈরী করা এবং পশ্চিম ও পশ্চিমাদের জীবন যাত্রা সম্পর্কে প্রশংসা করতে প্ররোচিত করা।

মিশনারীরা ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি তীব্র ঘৃণা নিয়ে তাদের ধর্মপ্রচার অব্যহত রেখেছিল। তারা ইসলামী সংস্কৃতি ও ইসলামী জীবনযাত্রাকে অবজ্ঞা করে, মুসলিমদের পশ্চাদপদ ও বর্বর হিসাবে চিহ্নিত করেছে যা প্রায় প্রতিটি ইউরোপীয়ানের অসুস্থ বিবেচনা লব্ধ মতামতে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে আমাদের ভূখন্ডে অবিশ্বাস ও উপনিবেশবাদের ব্যাপক বিস্তৃতি তাদের সাফল্যকেই প্রতিফলিত করে।

## ক্রুসেডারদের বিদ্বেষঃ

১৮৯৬ সালে একজন প্রখ্যাত ফরাসী লেখক, কাউন্ট হেনরি দ্যোকাস্ত্রি তার রচিত "ইসলাম" শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছে,

"আমি কল্পনা করতে পারিনা মুসলিমরা কি ভাববে যদি তারা মধ্যযুগীয় উপকথা গুলো শুনতে পেত এবং জানতে পারত যে, খৃষ্টানরা তাদের নিয়ে কি ধরণের ছড়াগান (স্তোত্রগীত) রচনা করত! আমাদের সকল ছড়াগান, এমনকি ১২শ শতকের পূর্বের ছড়াগানগুলোও একটিমাত্র ধারণা থেকে বিকশিত হয়েছিল এবং ক্রুসেডের পিছনে প্রধান ভূমিকা রেখেছিল। এসকল স্তোত্রগীতগুলো ইসলাম ধর্মের প্রতি সম্পূর্ণ অজ্ঞতা ও মুসলিমদের প্রতি চরম বিদ্বেষে পরিপূর্ণ ছিল। এ সকল ছড়াগানগুলোর সুবাদে ইউরোপের মানুষের অন্তরে ইসলাম ধর্মের প্রতি তীব্র ঘৃণা গেঁথে গিয়েছিল। একধরণের বিধ্বংসী ধারণা তাদের অন্তরের গভীরের প্রোথিত হয়েছিল এবং যা আজো তাদের মাঝে বিদ্যমান। প্রত্যেকেই মুসলিমদের মুশরিক, অবিশ্বাসী, মূর্তিপুজারী ও ধর্মত্যাগকারী (মুরতাদ) হিসাবে বিবেচনা করত।"

এভাবেই খৃষ্টান ধর্মগুরুরা ইউরোপে মুসলিম ও তাদের দ্বীন সম্পর্কে প্রচারণা চালাত। মধ্যযুগের অভিযোগগুলো ছিল ভয়ঙ্কর এবং তা মুসলিমদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও শত্রুতার আগুন প্রজ্জ্বলনে ব্যবহৃত হত। এর প্রভাবে গোটা ইউরোপ আচ্ছন্ন হয়েছিল এবং এর ফলেই ক্রুসেডার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। খৃষ্টানদের হাতে চরমভাবে পরাজিত ও অপদস্থ হবার প্রায় দুইশত বছর পর মুসলিমরা আবার ১৫শ শতাব্দীতে পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে জিততে শুরু করেছিল এবং ইসলামী রাষ্ট্র কন্সটান্টিনোপোল জয় করতে সক্ষম হয়। এরপর ১৬শ শতাব্দীতে মুসলিমরা দক্ষিণ ও পূর্ব ইউরোপ জয় করে নেয় এবং সেখানকার মানুষের কাছে ইসলামকে নিয়ে যায়। আলবেনিয়া, যুগোস্লাভিয়া, বুলগেরিয়া ও অন্যান্য দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ ইসলাম গ্রহন করে। ক্রুসেডারদের বিদ্বেষ ও শত্রুতা পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠে এবং ওরিয়েন্টালিস্ট ধারণা বিকশিত হতে শুরু করে। এর লক্ষ্য ছিল মুসলিম সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করা, ইসলামের অগ্রযাত্রা রহিত করা এবং মুসলিমদের হুমকি খর্ব করা।

ইউরোপীয়ানদের অন্তরের গভীরে প্রোথিত এই শত্রুতা, ইউরোপের সকল খৃষ্টানদের মুসলিম ভূখন্ডে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির নামে মিশনারীদের পাঠানোর ব্যাপারে করিৎকর্মা করে তুলেছিল। এ মিশনগুলো স্কুল, ক্লিনিক, সংঘ ও ক্লাব গঠনের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছিল। ইউরোপীয়ানরা তাদের সমস্ত সম্পদ ও সমগ্র প্রচেষ্টা মিশনারীদের পিছনে ব্যয় করতে শুরু করল। তাদের কর্মপন্থা (পলিসি) ও লক্ষ্যের ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও তারা তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ও কর্মপদ্ধতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল। যেহেতু এগুলো তাদের কনসাল, রাষ্ট্রদূত (এম্বাসাডার), প্রতিনিধি ও মিশনারীদের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছিন তাই মিশনারী কার্যক্রমের পিছনে রাষ্ট্র ও জনগণ এক হয়ে গিয়েছিল।

পশ্চিমাদের অন্তরের ক্রুসেডারদের বিদ্বেষ ও ঘৃণা সযত্নে লালিত হচ্ছিল, বিশেষত ইউরোপ ও বৃটেন বাসীদের অন্তরে। তাদের মনের গভীর লালিত ভয়াবহ শত্রুতা ও নোংরা চিন্তাধারার আমাদের মাতৃভূমিতে আমাদের চরম লাঞ্ছনার মূল কারণ হিসাবে কাজ করেছিল। ১৯১৭ সালে জেনারেল এলেনবি আল-কুদস এ প্রবেশ করে ঘোষণা করল,

"শুধুমাত্র আজই ক্রুসেডের পরিসমাপ্তি ঘটল।"

এটি ছিল তার অনুভূতির এক সাধারণ বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এ থেকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে তার এবং প্রতিটি ইউরোপীয়ানের অন্তরে লালিত ঘৃণা ও দুষ্টবুদ্ধি স্পষ্ট হয়ে যায়। এটি তাদের প্রতিটি যুদ্ধের - সাংস্কৃতিক কিংবা সামরিক- মূল চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করেছে। আল্লাহ সুবহানুওয়াতা'লা বলেছেন,

***ÒZv‡`i g‡L we‡Øl cKvk cvq Ges Zv‡`i ü`q hv †Mvcb iv‡L Zv Av‡iv ¸i"Zi|Ó*** [আলি-ইমরান, ৩:১১৮]

সন্দেহাতীত ভাবেই এলেনবি যা বলেছিল তা দুঃখজনক এবং তার দেশ বৃটেন যা লালন করছিল তা আরো গুরুতর। প্রতিটি ইউরোপীয়ানের জন্যই একথা প্রযোজ্য।

ক্রুসেডের দিনগুলো থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ঘৃণা ও বিদ্বেষ বিরাজ করেছে এবং আজো তাদের চক্রান্ত অব্যহত আছে। আমরা আজ রাজনৈতিক দিকগুলোর সাথে সাথে অত্যাচার, অপমান, উপনিবেশ ও শোষণের যে রূপ প্রত্যক্ষ করছি তা অদ্যাবধি মুসলিমদের প্রতি তাদের নির্মম প্রতিশোধ গ্রহণেরই অংশ। অবশ্যই এটি বিশেষভাবে মুসলিমদের উদ্দেশ্যেই পরিচালিত।

লিওপোল্ড ওয়েইস, "ইসলাম এট দ্য ক্রসরোড্স" বইতে লিখেছে, "নিশ্চয়ই রেনেসাঁ বা বিজ্ঞান ও ইউরোপীয় শিল্পের পূণর্জাগরণ, ইসলাম ও আরব উৎসের নিকট ঋণী। এটি পশ্চিম ও পূর্বের মাঝে একটি বস্তুগত সংযোগ তৈরী করেছিল। বাস্তবিকই ইউরোপ ইসলামী বিশ্বের কাছ থেকে ব্যাপক উপকৃত হয়েছিল, কিন্তু তারা কখনোই এই উপকারের কথা স্মরণ রাখেনি কিংবা স্বীকৃতিও দেয়নি; তারা ইসলামের প্রতি বিদ্বেষের মাত্রা

কমিয়ে কোনরূপ কৃতজ্ঞতাও দেখায়নি। বস্তুত: দিন দিন তাদের এই ঘৃণার মাত্রা গভীর ও তীব্র হয়েছে এবং এক সময় তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। তাদের মধ্যে এই ঘৃণা জনপ্রিয়তা পেয়েছে এবং প্রতিবার মুসলিম শব্দটি উচ্চারণের সাথে সাথে তা তাদের মাঝে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বংশ পরম্পরায় এই ঘৃণা প্রতিটি ইউরোপীয় নারী পুরুষের এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে, এবং তাদের মন ও মগজের গভীরে প্রোথিত হয়ে গেছে। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, সব ধরণের সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের পরও তা তাদের মাঝে আজো জীবিত রয়েছে। এরপর ধর্মীয় সংস্কারের একটি সময় এসেছিল যখন ইউরোপ বিভিন্ন গোত্র ও সম্প্রদায়ে ভাগ হয়ে গেল। তারা থাকত পরস্পরের বিরুদ্ধে রণ সাজে সজ্জিত, লড়াইয়ে উন্মুখ। কিন্তু তখনো প্রতিটি গোত্রের মাঝে ইসলামের প্রতি একই মাত্রার তীব্র বিদ্বেষ ও শত্রুতা পরিলক্ষিত হতে লাগল। সময়ের পরিক্রমায় দ্রুত ধর্মীয় উন্মাদনা ম্লান হয়ে গেল কিন্তু ইসলামের প্রতি তাদের একই রকম তীব্র ঘৃণা বজায় রইল। এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে ফরাসী দার্শনিক ও কবি, ভলটেয়ার। যদিও সে খৃষ্টীয় বিশ্বাস ও গীর্জার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিল, কিন্তু একই সাথে সে ইসলাম ও ইসলামের রাসুলের প্রতি অনুরূপ ঘৃণা ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করত। এর কয়েক দশক পর পশ্চিমা বুদ্ধিজীবিরা বিদেশী সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করতে শুরু করল এবং তাদের মাঝে একধরণের উদারমনস্ক ও সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর জন্ম নিয়েছিল। কিন্তু যখনই ইসলামের কথা আসত তখনই তাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পুরনো ক্ষোভ ও সঙ্কীর্ণতা প্রবেশ করত। ইউরোপ ও ইসলামী বিশ্বের মাঝে ইতিহাসের যে ব্যবধান রচিত হয়েছিল তা আর কখনোই জোড়া লাগেনি এবং ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ ইউরোপীয় চিন্তা চেতনার এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে।"

উপরে উল্লেখিত বিষয়ের উপর ভিত্তি করেই মিশনারী সংগঠনগুলো গঠিত হয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল খৃষ্টধর্মের প্রচার এবং মুসলিমদের মাঝে তাদের দ্বীন সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করা; এর মাধ্যমে তাদের অন্তরে সঙ্কীর্ণতার জন্ম দেয়া ও তাদের ব্যর্থতার জন্য ইসলামকেই দায়ী করা।

অন্যদিকে এসকল সংগঠনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল। উভয়দিক থেকে এর ফলাফল ছিল অসমানুপাতিক ও ভয়াবহ। মিশনারী আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কুৎসা রটনার মাধ্যমে ইসলামকে মুছে ফেলার উদ্দেশ্য নিয়ে। এর সাথে যোগ হয়েছিল সমস্যা সৃষ্টি করে ইসলাম ও ইসলামের বিধান সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার অবতারণা করা, মানুষকে আল্লাহর পথে চলতে বাধার সৃষ্টি করা এবং মুসলিমদের তাদের দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। মিশনারী আন্দোলনের পর এল ওরিয়েন্টালিস্ট আন্দোলন, যাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল এক ও অভিন্ন।

সমগ্র ইউরোপব্যাপী তাদের প্রচেষ্টা ও সম্পদ ঐক্যবদ্ধ করে তারা দ্বিতীয়বারের মত ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণা করেছিল। এটি ছিল একধরণের সাংস্কৃতিক যুদ্ধ। এটি পরিচালিত হয়েছিল ইতিমধ্যেই ইসলামী বিধান, মূল্যবোধ ও মুসলিমদের ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া মুসলিমদের মনকে কলুষিত করার উদ্দেশ্যে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক স্বচ্ছতার দোহাই দিয়ে তারা ইসলাম ও ইসলামের ইতিহাস বিকৃত করে মুসলিম যুবকদের মস্তিষ্ককে বিষাক্ত করে তুলেছিল। প্রকৃতপক্ষে অপসংস্কৃতির এই বিষাক্ত ছোবল ক্রুসেডারদের যুদ্ধের চেয়েও ভয়ঙ্কর ছিল। মিশনারীরা বিজ্ঞান ও মানবতার নামে তাদের বিষাক্ত পুঁতিগন্ধময় আবর্জনা ছড়িয়ে দিতে লাগল। তারা এ কাজগুলো করত ওরিয়েন্টালিজম এর নামে। ওয়েইস বলেছে,

"বাস্তবতা হচ্ছে, আধুনিক যুগের প্রথম ওরিয়েন্টালিস্ট ছিল খৃষ্টান মিশনারী, যারা মুসলিম দেশগুলোতে কাজ করছিল। তারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে ইসলামী শিক্ষা ও ইতিহাসকে বিকৃত করেছিল, দক্ষতার সাথে ইউরোপীয়দের মাঝে মুসলিমদের সম্পর্কে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। তাদের ভাষায় মুসলিমরা ছিল মুর্তিপূজারী। মিশনারীদের প্রভাব থেকে ওরিয়েন্টালিস্ট গবেষণা পরবর্তীতে মুক্ত হয়ে গেলেও তাদের এই বিকৃত ধারণা অব্যহত ছিল। যদিও বা ওরিয়েন্টালিস্ট গবেষণাকে যেকোন ধর্মীয় ও অজ্ঞতার কুসংস্কার থেকে মুক্ত দাবী করা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসলামের প্রতি ওরিয়েন্টালিস্টদের বৈরিতা তাদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সহজাত প্রবৃত্তিরই অংশ এবং এটি উদ্ভূত হয়েছে ক্রুসেডারদের যুদ্ধের প্রভাব থেকে।"

এই উত্তারাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত বৈরিতাই পশ্চিমাদের অন্তরে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ জিইয়ে রেখেছে। এটিই ইসলামকে এমনকি মুসলিম দেশ গুলোতেও মুসলিম বা অমুসলিম সবার নিকট জুজু হিসাবে চিত্রিত করে রেখেছে। তাদের দৃষ্টিতে ইসলাম মানবতার অগ্রযাত্রাকে ধ্বংসকারী এক অশুভ শক্তি। প্রকৃতপক্ষে এটি ইসলাম সম্পর্কে তাদের প্রকৃত আশঙ্কাকে গোপন করার প্রয়াসমাত্র। তারা জানে যে সত্যিই ইসলাম যদি মানুষের অন্তরে ও চিন্তায় গভীরে প্রোথিত হয় তবে তা অবিশ্বাসী উপনিবেশবাদী শক্তির পতনের ডঙ্কা বাজিয়ে দেবে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের প্রত্যাবর্তন পূনরায় বিশ্ববাসীর কাছে ইসলামের দাওয়াত বয়ে নিয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ, অবশ্যই এটি পূনরায় ফিরে আসবে, এবং তা হবে মানবতা ও পশ্চিমের মঙ্গলার্থেই। মিশনারীদের কাজ অবশেষে তাদের দুঃখ ও বেদনার কারণ হয়ে দাড়াবে। আল্লাহ সুবহানুওয়া তা'লা বলেছেন,

*"আল্লাহ'র পথ থেকে লোকদের নিবৃত্ত করার জন্য কাফিররা ধন-m¤ú` e¨q K‡i, Zviv ab-m¤ú` e¨q Ki‡ZB _vK‡e; AZ:ci Zv Zv‡`i gb¯Í‡ci KviY n‡e,Ó* [আল আনফাল: ৮:৩৬]

উত্তারাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বৈরীতা ইসলাম বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম সহায়ক। আপনারা দেখবেন, পশ্চিমা পন্ডিতগণ কোনরূপ বিদ্বেষ ও সঙ্কীর্ণতা ছাড়াই তাওবাদ, হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম কিংবা সমাজতন্ত্র নিয়ে গবেষণা করে। কিন্তু তারা যখন ইসলাম নিয়ে গবেষণা করে, তখন তাদের

মাঝে নোংরামি, ঘৃণা, এবং সঙ্কীর্ণতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। অথচ মুসলিমগণ অবিশ্বাসী উপনিবেশবাদীদের নিকট ইতিমধ্যেই পরাজিত হয়েছে। উপনিবেশবাদীদের সহায়তায়, পশ্চিমা ধর্মযাজকশ্রেণী এখনো সক্রিয়ভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে এবং তারা কখনোই ইসলাম ও মুসলিম সম্পর্কে কুৎসা রটনা, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও তার সাহাবীদের অবমাননা এবং ইসলাম ও মুসলিমদের ইতিহাসকে বিকৃত করা থেকে বিরত হবেনা। নির্মম প্রতিশোধ গ্রহন ও উপনিবেশবাদীদের থাবাকে আরো দৃঢ় করতে তাদের এই নিরলস প্রচেষ্টা অব্যহত থেকেছে এবং থাকবে।

## মিশনারী আক্রমনের প্রভাবঃ

ইসলামী বিশ্বকে প্রথমে সাংস্কৃতিক ও পরবর্তীতে রাজনৈতিক ভাবে পরাভূত করার পিছনে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের সাফল্যের পিছনে মিশনারী আক্রমন অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল। প্রথমে ইস্তাম্বুল ও পরবর্তীতে বলকান বিজয়ের মাধ্যমে মুসলিমরা পশ্চিমের রাষ্ট্রগুলোতে ইসলামী বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বকে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল। যখন এই নেতৃত্বে ঘুণ ধরল, তখন মুসলিম দেশগুলো পশ্চিমাদের সহজ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হল। এরই ফলশ্রুতিতে তারা ক্রমাগত তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল মুসলিম ভুখন্ডগুলোতে যারা ইতিমধ্যেই তাদের সংস্কৃতি ও জীবন সম্পর্কিত ধারণা বিস্তারের উর্বর ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। মুসলিম ভুখন্ডগুলোতে বিজ্ঞান, মানবতা এবং ধর্মীয় বাণী প্রচারের ছদ্মাবরণে এসকল ধ্যান ধারণার বীজ বপন করা হচ্ছিল। পশ্চিমারা শুধুমাত্র এখানেই থেমে থাকেনি, তারা ইসলামী সংস্কৃতি ও জীবনবোধ সম্পর্কে কুৎসা রটনার মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের আক্রমন চালিয়ে যাচ্ছিল। এরূপ প্রচারণা শিক্ষিত শ্রেনী ও রাজনীতিবিদদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। বস্তুত যারা ইসলামী সংস্কৃতি বহন করছিল তাদের উপর এটি গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং ক্রমশ এটি অধিকাংশ মুসলিমের উপরই প্রভাব বিস্তার করেছিল।

শিক্ষিত লোকদের জন্য উপনিবেশবাদীরা দখলের পূর্বেই মিশনারী স্কুলের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। দখলদারিত্ব স্থাপনের পর অন্যান্য স্কুলগুলোতেও তাদের নির্দিষ্ট দর্শন ও সংস্কৃতি এবং জীবন সম্পর্কিত তাদের ধারণা অনুযায়ী পাঠ্যসূচী (সিলেবাস) এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করল। তারা এ সংস্কৃতির ভিত্তি হিসাবে পশ্চিমা ব্যক্তিত্ব এবং পাঠ্যবস্তুর প্রধান উৎস হিসাবে তাদের রেনেসাঁ, ইতিহাস এবং পরিবেশকে গ্রহন করেছিল যা আজো মুসলিমদের মনন ও মগজকে আপ্লুত করে রেখেছে। তারা এখানেই থেমে থাকেনি, বরং আরো গভীরে গিয়ে পাঠ্যকার্যক্রমের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করে নিশ্চিত করেছিল যেন এর কোন একটি আংশিক বিষয়ও তাদের দর্শন ও সংস্কৃতির মূলনীতি বহির্ভুত না হতে পারে। এমনকি এটি ইসলামী দ্বীন ও ইতিহাসের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়েছিল; উভয় পাঠ্যসূচীই পশ্চিমা ভিত্তির উপর নির্ভর করে পশ্চিমা ধারণা অনুযায়ী গঠন করা হয়েছিল।

আজো ইসলামী স্কুল গুলোতে ইসলামী দ্বীনকে একটি আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিষয় হিসাবে শিক্ষা দেয়া হয় যা মূলত ধর্ম সম্পর্কিত পশ্চিমা ধারণারই প্রতিফলন। ধর্মকে বাস্তবতা ও বাস্তব জীবনের তথ্যাদি হতে বিচ্ছিন্ন একটি বিষয় হিসাবে শিক্ষা দেয়া হয়। আমাদের কৈশোরে রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর জীবনী এমনভাবে শিক্ষা দেয়া হয় যেখানে তার নবুওয়্যত ও প্রকৃত শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। নেপোলিয়ন কিংবা বিসমার্কের জীবনীর মতই রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর জীবনী পড়ানো হয়। ফলতঃ এ ধরণের শিক্ষা থেকে শিক্ষার্থীর মনে কোনরূপ আবেগ কিংবা ধারণার সৃষ্টি হয়না। ধর্মীয় পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত ইবাদত ও নৈতিকতাকে ব্যক্তিগত স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে শেখানো হয়। এভাবে ইসলামী দ্বীনের শিক্ষা পশ্চিমা ধারণা প্রসূত ব্যক্তিগত লাভ ও স্বার্থ সম্পর্কিত অনুরূপ ধারণায় পরিণত হয়েছে।

অনুরূপভাবে অসৎ উদ্দেশ্যে ও সঠিক অনুধাবনের ব্যর্থতায় ইসলামের ইতিহাসকেও নোংরা করা করা হয়েছে। ঐতিহাসিক ন্যায়পরায়ণতার ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার নামে ইসলামের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করা হয়েছে। এর উপর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেওয়ার মত ঘটনা ঘটেছে যখন কতিপয় শিক্ষিত মুসলিম ইতিহাসের শিক্ষকতায় আত্মনিবেশ করেছে কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনা সমূহ প্রকাশ করতে গিয়ে মিশনারীদের পদ্ধতি ও পাঠ্যক্রমই অনুসরণ করেছে। ফলতঃ সকল প্রকার শিক্ষাকার্যক্রমের পাঠ্যসূচীই (সিলেবাস) পশ্চিমা দর্শন অনুযায়ী ও তাদের পাঠ্যসূচীর (সিলেবাসের) অনুসরণেই প্রণীত হয়েছে। এর মাধ্যমে অধিকাংশ বুদ্ধিজীবিরই পশ্চিমীকরণ হয়েছে। তারা সম্পূর্ণরূপে পশ্চিমা সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করেছে, এর প্রতি আসক্ত হয়েছে এবং পশ্চিমা ধারণা অনুযায়ী তাদের জীবন পরিচালনা করেছে। অবশেষে তারা ইসলামী সংস্কৃতির প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে শুরু করেছে ও পশ্চিমা সংস্কৃতির সাথে সাংঘর্ষিক যে কোন স্থানে ইসলামের সমালোচকে পরিণত হয়েছে।

এ সকল মুসলিমেরা পশ্চিমা সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছে, যে সংস্কৃতি পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তারা তাদের সংস্কৃতির প্রতি এমনভাবে বিশ্বস্ত যে তারা বিদেশী সংস্কৃতি গ্রহণ ও বিদেশীদের পূজা করতে শুরু করেছে। তাদের মধ্যে অনেকেই পশ্চিমা চরিত্রের অধিকারী হয়েছে এবং পশ্চিমাদের মতই ইসলাম ও ইসলামী সংস্কৃতিকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে। তারা বিশ্বাস করে, ইসলাম এবং ইসলামী সংস্কৃতিই মুসলিমদের পতনের কারণ। মিশনারীদের যাত্রা পথে এটি একটি বিরাট সাফল্য যে তারা শিক্ষিত মুসলিমদের তাদের পক্ষে টানতে পেরেছে যারা পরবর্তীতে ইসলাম ও ইসলামী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে তাদের সাথে কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে।

এ অবস্থা আরো বিস্তৃত হয়ে শুধুমাত্র ইউরোপে ও বিদেশী স্কুলে শিক্ষিতদেরই প্রভাবিত করেনি বরং যারা ইসলামী সংস্কৃতি বহন করছে তাদের উপরও প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। তারা পশ্চিমা ঔপনিবেশিকদের কতৃক তাদের দ্বীনকে কটাক্ষ করার ক্ষমতায় বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে ঔপনিবেশিকদের কটাক্ষের জবাব দিতে শুরু করে। তবে সত্য-মিথ্যা বিচার বিবেচনা না করেই তারা তাদের জবাব দিতে শুরু করে। ইসলামের প্রতি আরোপিত নিন্দা প্রতিরোধ করতে তাদের ব্যতিব্যস্ততায় তারা তাদের জবাবটির যথার্থতা যাচাই করতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা নিশ্চিত ছিল যে, ইসলামকে অন্যায়ভাবে দোষী করা হয়েছে, কিন্তু যথার্থ চিন্তা ভাবনা ছাড়া জবাব দিতে গিয়ে তারা ইসলামী বিধান গুলোকে বিকৃত করে পশ্চিমা ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করতে চেষ্টা করে।

ফলতঃ তাদের জবাব ছিল দুর্বল ও অকার্যকর। আর এটি মিশনারীদের জবাবের পরিবর্তে তাদের আক্রমনের পথ সুগম করেছে। সবচেয়ে মারাত্মক যে ব্যাপারটি ঘটেছে, তা হচ্ছে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক পশ্চিমা সংস্কৃতি তাদের চিন্তা-ধারণার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে, যা ইসলামের প্রতি আরোপিত অন্যায় ও মিথ্যা অপবাদকে স্বীকার করে নিয়েছে। এধরণের অধিকাংশ ব্যক্তিই বলে থাকে পশ্চিমারা তাদের সংস্কৃতি ইসলাম ও মুসলিমদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছে এবং এভাবে তারা ইসলামী বিধানকে পশ্চিমা সংস্কৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করতে গিয়ে বিকৃত করতে শুরু করে দেয়, যদিও বা ইসলামী ও পশ্চিমা সংস্কৃতি পরস্পর স্পষ্টতঃ সাংঘর্ষিক।

এভাবে যখন তারা একবার প্রতিষ্ঠিত করল যে তাদের আকীদাহ ও সংস্কৃতি পশ্চিমা সংস্কৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তখন তারা সম্পূর্ণরূপে পশ্চিমা সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে নিল। এর অর্থ তারা ইসলামী সংস্কৃতিকে পরিত্যাগ করে পশ্চিমা সংস্কৃতি গ্রহণ করল। পশ্চিমা ঔপনিবেশিকরা ঠিক এমনটিই চেয়েছিল এবং মিশনারী কাজে মনোযোগ দেওয়া ও ঔপনিবেশিকতার অগ্রযাত্রার পিছনে এটিই তাদের উদ্দেশ্য ছিল।

বুদ্ধিজীবিদের পশ্চিমা স্কুল ও কলেজে শিক্ষিত করার মাধ্যমে এবং তাদের ইসলাম অনুধাবনের ক্ষেত্রে অজ্ঞতার কারণে মুসলিমরা দলে দলে জীবন সম্পর্কে পশ্চিমা ধ্যান ধারণা গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিল। তাদের দেশ ও সমাজ পশ্চিমা বস্তুবাদী সংস্কৃতির জোয়ারে প্লাবিত হল এবং সমাজ পরিপূর্ণভাবে পশ্চিমা সংস্কৃতি ও ধ্যাণ ধারণা অনুযায়ী পরিচালিত হতে থাকল।

অধিকাংশ মুসলিমই বুঝতে পারেনা যে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা এবং পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উভয়েই কুফর ব্যবস্থা। কোন বিষয়ে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী যখন কোন কিছুর ফয়সালা করা হয়না তখন তারা বিচলিত কিংবা উত্তেজিত হয়না। অথচ তারা নিশ্চিতই জানে যে, আল্লাহ সুবহানুওয়াতা'লা বলেছেন,

*"এবং যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা দ্বারা বিচার ফয়সালা* K‡ibv, Zviv Kwdi|Ó [সুরা আল মায়িদা:৪৪]

এটি সম্ভব হয়েছে কারণ সমাজের সর্বস্তরে পশ্চিমা ধ্যান ধারণার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে এবং পশ্চিমা সংস্কৃতি, যেখানে রাষ্ট্রকে দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে, তা স্পষ্টতই আমাদের সমাজে প্রভাব বিস্তার করে আছে। তারা ধারণা করেছে, যদি তারা শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানুওয়াতা'লার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং ইবাদতের অনুষ্ঠানগুলো পালন করে তবেই তাদের ইসলামী দায়িত্ব সম্পন্ন হয়। একই সাথে তারা ধরে নিয়েছে জীবনের বাকী কাজগুলো তাদের নিকট সর্বাপেক্ষা সঠিক বলে প্রতীয়মান নিজস্ব ইচ্ছা ও খেয়ালখুশী অনুযায়ী পরিচালিত করতে পারে। এটি তাদের বিন্দুমাত্র বিচলিত করেনা, কারণ ইতিমধ্যেই তাদের মাঝে পশ্চিমা ধ্যান ধারণা সংক্রমিত হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে, "সিজার কে সিজারের অংশ দাও এবং ইশ্বর কে ঈশ্বরের অংশ।" বিপরীতক্রমে, তাদের উপর ইসলামী ধ্যান ধারণার কোন প্রভাব পড়েনি, যে ধারণায় সিজার ও তার অধিকারের সকল বিষয়ই আল্লাহ সুবহানুওয়াতা'লার মালিকানাধীন। আল্লাহর আদেশ ইবাদতের সাথে সাথে যাবতীয় সকল কিছুকেই পরিব্যাপ্ত করে আছে। কেনা বেচা, ভাড়া (ব্যবসায়িক লেনদেন), বিচার ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শুরু করে প্রতিটি বিষয়েই আল্লাহর আদেশ ও বিধান রয়েছে। মুসলিমরা এখন আর এ চিন্তা ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়না। অথচ যদি তারা আল্লাহর আদেশ সম্পর্কে পড়ত যেখানে আল্লাহ সুবহানুওয়াতা'লা বলেছেন,

*"অতএব (হে মুহাম্মদ) তাদের মাঝে আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তা দ্বারা* wePvi dqmvjv Ki|Ó [সুরা আল-মায়িদা:৪৯]

তিনি আরো বলেছেন,

ÒhLb †Zvgiv wbw`ó mg‡qi Rb¨ F‡Yi Pv³ Ki, ZLb Zv wjwce× K‡i ivL|Ó [সুরা আল বাকারাহ, ২:২৮২]

তিনি (আল্লাহ) আরো বলেছেন,
ÒGes †h †KD ¯úó †n`v‡qZ cwßi ci ivm‡ji wei"×vPiY Ki‡e Ges gÒwgb‡`i c_ wfb Ab¨ c_ AbmiY Ki‡e, Awg Zv‡K Zvi †e‡Q †bqv c‡_i w`‡K Nwi‡q w`e Ges Rvnvbv‡gi Av¸‡b `» Kie Ges †mwU KZB bv wbKó Avevm¯j|Ó [সুরা নিসা :১১৫]

আল্লাহ সুবহানুওয়াতা'লা আরো বলেছেন,

***Ògȍwgb‡`i mK‡ji GKm‡½ Awfhv‡b †ei nIqv m½Z bq, Zv‡`i c‡Z¨KwU `j †_‡K GKwU As‡ki AMeZx nIqv DwPr, hv‡Z (hviv cðv‡Z Ae¯vb K‡i‡Q) Zviv Øxb m¤ú‡K Mfxi Ávbvbkxjb Ki‡Z cv‡i Ges Zv‡`i m¤c`vq‡K mZK Ki‡Z cv‡i hLb Zviv Zv‡`i wbKU wd‡i Avm‡e hv‡Z Zviv mZK n‡Z cv‡i|Ó*** [সুরা তাওবা, :১২২]

নিশ্চিতভাবেই কুরআন পড়া সত্ত্বেও তারা কুরআনের এই আয়াতগুলোর ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়নি । বরং তারা শুধুমাত্র কুরআনের আয়াত হিসাবে এগুলোকে পড়েছে এবং সেখানেই থেমে গেছে । অথচ প্রতিটি মুসলিম প্রকৃতপক্ষে কুরআন পাঠ করবে এবং জানবে যে এটি জীবন্ত ও তার জীবনে কুরআনের ধারণাকে বাস্তবায়নে সদা সচেষ্ট থাকা উচিৎ । অবশ্য এ আয়াতগুলো পড়া হয় এমন এক পরিবেশে যেখানে পশ্চিমা ধ্যান ধারণাই প্রভাব বিস্তার করে আছে এবং এর ফলে তারা আয়াতগুলোর আধ্যাত্মিক বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেয় । যখন এই আয়াতগুলোর ধারণা ও অর্থের বিষয়টি আসে তখন মানসিক দিক থেকে একটি বাধার প্রাচীর গড়ে উঠে । কারণ পশ্চিমা সংস্কৃতি কার্যকরীভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাদের টলায়মান করে তোলে । এটি অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বিশেষতঃ যারা ইসলামী কিংবা বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে ।

রাজনীতিবিদদের বিষয়টি গভীর হতাশাব্যঞ্জক এবং পরিণতি আরো ভয়াবহ । যখন থেকেই ঔপনিবেশিক শক্তি এ সকল রাজনীতিবিদদের একত্রিত করে উসমানী খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য প্রলুব্ধ করেছে এবং তাদের বড় বড় পুরস্কারের লোভ দেখিয়েছে তখন থেকেই তারা পশ্চিমাদের আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত হয়েছে এবং তাদের পরিকল্পনার সম্পূর্ণ অনুগত হিসাবে কাজ করেছে । উসমানী খিলাফতের সময় তারা পশ্চিমাদের সাথে আঁতাত করে তাদের নিজেদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করেছিল । ইসলামে এধরণের কাজ স্পষ্টতঃ নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও তারা এ ধরণের কাজ করেছে এবং এ কাজের জন্য তারা গর্ব বোধ করে । প্রতিটি অনুষ্ঠান ও বার্ষিকীতে তারা তাদের অর্জন নিয়ে দম্ভ করে এবং তা উদযাপন করতে পছন্দ করে । ঐ সময় রাষ্ট্রের দুঃসময় অতিক্রমে শাসক শ্রেনীর অন্তর্কলহ ও দলাদলি উপশমের পরিবর্তে তারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কাফির শত্রুদের সাথে হাত মিলিয়েছিল । পরিতাপের বিষয় এই যে, কাফিরগণ অবশেষে তাদের রাষ্ট্র দখল করে নিয়েছিল । এসময় তারা অবিশ্বাসী কাফিরদের বিরুদ্ধে জনগণের সাহায্য চাওয়ার পরিবর্তে জনগণের বিরুদ্ধে কাফির শক্তির সাহায্য নিয়েছিল । তারা কাফিরদের দ্বারা এতটাই প্রভাবিত হয়েছিল যে তাদের ইসলামী ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়েছিল । তাদের চিন্তাধারণা নির্দিষ্ট কিছু রাজনৈতিক ও দার্শনিক মতামত দ্বারা কলুষিত হয়ে গিয়েছিল। ক্রমে এটি তাদের জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীকে বিষাক্ত করে ফেলেছিল এবং চূড়ান্তভাবে জিহাদের (যা রাষ্ট্রের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য) বিরুদ্ধে তাদের বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছিল । এটি ক্রমে ইসলামী পরিবেশকে সম্পূর্ণরূপে বিষাক্ত করে ফেলেছিল এবং জীবনের প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে চিন্তা-ধারণাকে বিশৃংখল করে দিয়েছিল ।

এরই ধারাবাহিকতায় সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে আপোষকামিতা জিহাদকে প্রতিস্থাপিত করল । রাজনীতিবিদদের বিশ্বাস ও গৃহীত মূলনীতি ছিল ***ÒLR Iqv ZwjeÓ*** (যা পাও গ্রহণ করো ও বাকীটা পরে চাও) । এটি ঔপনিবেশিকদের জন্য বিশাল সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করার চাইতে অধিক সুবিধাজনক ছিল । এভাবে অবিশ্বাসী কাফির ঔপনিবেশিকদের সাহায্য চাওয়া একটি সাধারণ রীতি ও নিয়মে পরিণত হয়ে গেল । তারা অবলীলায় কাফিরদের নিকট সাহায্য চাইতে ও নির্ভর করতে লাগল অথচ তারা ভুলে গেল যে এটি একটি চরম (কবিরা) গুনাহ এবং রাজনৈতিক আত্মহত্যার নামান্তর । তারা আঞ্চলিকতাবাদের সঙ্কীর্ণতাকে পুঁজি করে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিল এবং এ ধরণের গোত্রবাদকে তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক পরিমন্ডলের অংশে পরিণত করল । তারা এটি অনুধাবনে ব্যর্থ হল যে, এ ধরণের আঞ্চলিকতাবাদ রাজনৈতিক কর্মকান্ডকে ধুলিস্যাৎ করে দেয় । কারণ আঞ্চলিকতাবাদ, তা যত বড় অঞ্চলই হোকনা কেন, একটি সঠিক জীবন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সকল রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক দায়িত্ব পালনে অক্ষম । তারা এখানেই থেমে থাকেনি বরং তারা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ কে তাদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করল এবং বিদেশী রাষ্ট্রগুলোকে সাধারণ মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করল। এ প্রক্রিয়ায় তারা তাদের স্বাভাবিক মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু অর্থাৎ আদর্শ (আইডিওলজি) কে হারাল । এটি হারানোর সাথে সাথে তারা যতই বিশ্বস্ততা ও পরিশ্রম করুক না কেন তাদের অগ্রযাত্রায় সাফল্যের ক্ষীণ সম্ভাবনাও বিলুপ্ত হয়ে গেল ।

কাজেই সকল রাজনৈতিক আন্দোলনই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল এবং উম্মাহর যে কোন জাগরণের প্রচেষ্টাই দ্বন্দ্ব আর বৈপরীত্যেপূর্ণ আন্দোলনে পরিণত হল এবং এর অবস্থা হল এক জবাই করা পশুর মত, যে বশ্যতা স্বীকার করে, হতাশ হয়ে একসময় নিস্তেজ, নিস্পন্দ হয়ে গেল । এরূপ হওয়ার কারণ হচ্ছে রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ তাদের সাধারণ মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হারিয়ে ফেলায় স্বাভাবিকভাবে উম্মাহও তাদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হারিয়ে ফেলেছে । একই সাথে রাজনৈতিক চিন্তা-ধারণাও বিদেশী ও ক্ষয়িষ্ণু ধারণার বদৌলতে বিষাক্ত ও কলুষিত হয়ে গেছে। এর ফলাফল স্বরূপ মুসলিম ভূখন্ডগুলোতে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, আঞ্চলিকতাবাদ, আধ্যাত্মিক দ্বীন, নৈতিকতা, শিক্ষা এবং ধর্মপ্রচারের মত বিভিন্ন আন্দোলনের জন্ম হয়েছে । এসকল আন্দোলন পরিস্থিতির আরো অবণতি ঘটিয়েছে এবং সমাজের দুর্ভোগ আরো বাড়িয়ে দিয়েছে ।

এ জাতীয় সকল আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং কেবলমাত্র তাদের নিজদেরকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে; কারণ তারা পশ্চিমা

চিন্তাধারণা অনুযায়ী পরিচালিত হয়েছে ও মিশনারী দখলদারিত্বের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে এবং তারা উম্মাহকে এমন এক ভ্রান্ত দিকনির্দেশনা দিয়েছে যা কোন ফলাফল বয়ে আনতে পারেনি। তারা সাম্রাজ্যবাদকে আরো শক্তিশালী করেছে এবং স্থায়ী হবার সুযোগ করে দিয়েছে। এভাবেই মিশনারীদের আক্রমনের সাফল্য হয়েছে অভূতপূর্ব ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

## ইসলামী বিশ্বে পশ্চিমাদের রাজনৈতিক দখল:

আন্দালুস আক্রমনের প্রকৃত কারণ ছিল প্রতিশোধ স্পৃহা যা ক্রুসেডের যুদ্ধে অপমানজনক পরাজয়ের পর থেকেই ইউরোপীয়রা লালন করে আসছিল। মুসলিমদের হাতে পরাজিত হবার পর ও মুসলিম ভূখন্ড থেকে বিতাড়িত হবার পর থেকেই পশ্চিমারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা লালন করে আসছিল। মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের অন্তর তীব্র হিংসা ও বিদ্বেষে পরিপূর্ণ হয়েছিল। তারা যদি একথা না জানত যে মুসলিমরা যে কোন আক্রমন নস্যাৎ করতে সক্ষম তবে তারা পূনরায় পূর্বে আক্রমন পরিচালনা করতে পিছপা হতনা। তারা ধারণা করেছিল যে, আন্দালুসে প্রতিশোধ গ্রহণ করা সহজ হবে। যথাসময়ে ইউরোপ আন্দালুস আক্রমন করে একে নির্মমভাবে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলল এবং এর অধিবাসীদের নির্বিচারে গিলোটিনে শিরচ্ছেদ ও শবদাহ করা চুল্লীতে নিক্ষেপ করে হত্যা করল। তাদের কাজটি যে কোন হিংস্র জানোয়ারের চাইতেও অধিক নির্মম এবং পশ্চিমাদের পরিচালিত অগণিত ঘৃণিত ও লজ্জাস্কর কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম। যাই হোক, তারা আন্দালুস রক্ষায় মুসলিমদের অবহেলা থেকে এ ধরণের কাজে আরো বেশী উৎসাহ বোধ করতে লাগল। মুসলিমরা শিথিলতা দেখিয়েছিল এবং আন্দালুসকে একটি সহজ শিকারের উপযুক্ত করে রেখে গিয়েছিল। এটি পশ্চিমাদের প্রতিশোধের চিন্তাকে আরো বিস্তার লাভ করতে সাহায্য করেছিল। উসমানী খিলাফতের ক্ষমতা না থাকলে তখনই তারা অবশিষ্ট মুসলিম ভূখন্ডের উপর শক্ত অভিযান চালাত। তৎকালীন মুসলিমদের শক্তিমত্তা এবং ইউরোপের বহু অংশ উসমানী খিলাফতের দখলে থাকায় তাদের মনে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল এবং ক্রুসেডের অনুরূপ পরাজয়ের আশঙ্কায় তারা তৎক্ষণাৎ মুসলিমদের উপর আরো বড় আকারে হামলা পরিচালনা করতে দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল।

পশ্চিমাদের আক্রমন অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগ পর্যন্ত বিলম্বিত হয়েছিল। তখন ইসলামী বিশ্বে একধরণের স্থবিরতা গ্রাস করে নিয়েছিল। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মুসলিমদের ইসলামের দাওয়াত পরিত্যাগ করা এবং তাদের অন্তরে ইসলামের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা ক্ষীণ হয়ে আসার মাধ্যমে ইসলামের শত্রুদের চোখে ইসলামের শক্তি ও বিশালত্ব হ্রাস পেতে শুরু করল। এরই ধারাবাহিকতায় ইসলামী বিশ্বে সাংস্কৃতিক ও মিশনারী আগ্রাসণ তীব্রতর হয়ে উঠল এবং এর সাথে সাথে রাজনৈতিক আগ্রাসণের মাধ্যমে তারা অধিকাংশ মুসলিম ভূখন্ড গ্রাস করে নিতে সক্ষম হল।

ক্যাথেরিনের শাসনামলে (১৭৬২ - ১৭৯৬), রাশিয়া উসমানীদের সাথে যুদ্ধ করেছিল এবং তাদের পরাভূত করেছিল। এ প্রক্রিয়ায় তাদের ভূখন্ড থেকে বিশাল এক অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। রাশিয়ানরা আজোভ শহর ও আল-কারাম (ক্রিমিয়া) ভূখন্ডের পাশাপাশি কৃষ্ণ সাগরের সমগ্র উত্তর উপকূল দখল করে নিল। তারা সেভাস্তোপোল শহরটিকে উক্ত ভূখন্ডের সামরিক ঘাঁটি হিসাবে স্থাপন করল এবং দক্ষিণ ইউক্রেনে কৃষ্ণ সাগরের তীরে ওডেসা নামক বানিজ্যিক বন্দর স্থাপন করল। এসময় উসমানী খিলাফতের বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে রাশিয়া একটি বড় মাথাব্যাথার কারণ হয়ে উঠল। রোমান আমিরাতের উপর সার্বভৌম ক্ষমতা অধিকারী হবার পর তারা নিজেদেরকে উসমানী খিলাফতের অন্তর্গত খৃষ্টধর্মের রক্ষক হিসাবে ভাবতে শুরু করে দিল।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে রাশিয়া সমগ্র তুর্কিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র (খিলাফত) হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল এবং কাফকাস অঞ্চল সম্পূর্ণরূপে দখল করে নিল। অবশ্য রাশিয়াই উসমানী খিলাফতকে চ্যালেঞ্জ করার মত একমাত্র রাষ্ট্র ছিলনা, বরং অবশিষ্ট পশ্চিমা শক্তিও তাদের সাথে যোগ দিয়েছিল। ১লা জুলাই, ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন মিশর আক্রমন করল এবং দ্রুত তা দখল করে নিল। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সে আল-শাম এর দক্ষিণ বন্দর আক্রমন করেছিল এবং গাজা, আল-রামালাহ এবং ইয়াফা অঞ্চল দখল করে নিয়েছিল। সে আক্কা দুর্গের কাছে পৌছে গিয়েছিল (ক্রুসেডে এটি একর নামে প্রসিদ্ধ), কিন্তু তার হত্যাযজ্ঞ ব্যহত হল এবং সে পূনরায় মিশরে ও সেখান থেকে ফ্রান্সে ফিরে গিয়েছিল। অবশেষে তার অভিযান ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ব্যর্থ হয়। তার অভিযান ব্যর্থ হলেও তা উসমানী খিলাফতের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছিল। এর ফলাফল স্বরূপ ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রই ইসলামী বিশ্বকে আক্রমন করার জন্য সারিবদ্ধ হল এবং এর ভূখন্ডের বিভিন্ন অংশ দখল করে নিতে শুরু করল। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স আলজেরিয়া দখল করে নিল। তিউনিসিয়া দখল করার প্রচেষ্টায় অবশেষে ১৮৮১ সালে তারা সেটি দখল করতে সক্ষম হল। ১৯১২ সালে তারা মারাকেশ দখল করে নিল। ১৯১১ সালে ইতালী ত্রিপোলী দখল করে নিল যা আর উসমানী খিলাফতের অধীনে তথা ইসলামী বিধানের অধীন রইল না। এটি সরাসরি ঔপনিবেশিকদের অধীনে চলে এল এবং কুফর শাসন দ্বারা পরিচালিত হতে শুরু করল। এ ঘটনাটি উত্তর আফ্রিকার বিচ্ছিন্ন করণ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

পশ্চিমারা এখানেই থেমে থাকেনি, বরং তারা খিলাফতের বাদবাকী অংশেও তাদের দখলদারিত্ব আরো সুদৃঢ় করতে লাগল। ১৮৩৯ সালে বৃটেন এডেন দখল করে নিল এবং তার mandate বিস্তার করে লাহাজ এবং দক্ষিণ ইয়েমেন সীমান্ত থেকে পূর্ব ভূখন্ড পর্যন্ত বিস্তৃত বাদবাকী নয়টি আশ্রিত (protectorate) রাজ্যও দখল করে নিল। বৃটিশরা বহুপূর্বেই ভারতবর্ষ দখল করে নিয়েছিল এবং এ প্রক্রিয়ায় সেখানে মুসলিমদের

তাদের কর্তৃত্ব থেকে অপসারণ করেছিল। তারা বিশেষভাবে মুসলিমদের উপরই তাদের অত্যাচার ঘণীভূত করেছিল, যারা ইতিপূর্বে ভারতবর্ষের ক্ষমতার অধিকারী ছিল। বৃটিশরা এ কর্তৃত্ব কেড়ে নিয়েছিল এবং ভারতবর্ষকে তাদের উপনিবেশে পরিণত করেছিল। এরপর তারা সাধারণভাবে মুসলিমদের দুর্বল করার প্রক্রিয়া গ্রহণ করল।

বৃটেন ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে মিশর ও ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে সুদান দখল করে নিল। এদিকে হল্যান্ড পূর্ব ভারত দখল করে নিয়েছিল এবং আফগানিস্তান ও ইরান বৃটেন-রাশিয়ান চাপের সম্মুখীন হয়ে পড়ল। ইসলামী বিশ্বে পশ্চিমা আক্রমন আরো তীব্রতর হল এবং সহসাই স্পষ্ট হয়ে উঠল যে এটি সামগ্রিকভাবে পশ্চিমা নেতৃত্বের পদতলে ভূলুণ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ক্রুসেডারদের অভিযান পূনরায় শুরু হল এবং একের পর এক সাফল্য অর্জিত হতে লাগল। পশ্চিমা আক্রমন প্রতিরোধ ও তার প্রচন্ড চাপ হ্রাস করতে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। আলজেরিয়ায় একটি বিপ্লব দেখা দিল, চায়নাতে সশস্ত্র অভ্যূত্থান দেখা দিল এবং সুদানে মাহদিইয়ূনের উত্থান ঘটল। সানুসিইয়্যাহ বিপ্লবও ঘটেছিল। এ থেকে প্রমাণিত হয় অধঃপতন ও দুর্বলতা সত্ত্বেও তখনো ইসলামী বিশ্বে কিছু শক্তি অবশিষ্ট ছিল। অবশ্য এ সকল প্রচেষ্টাই নস্যাৎ হয়ে গিয়েছিল এবং এরা মুসলিম বিশ্বকে মুক্ত করতে ব্যর্থ হল।

পশ্চিমা বিশ্ব সামরিক আগ্রাসণের সাথে সাথে ইসলামী বিশ্বে সংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিভেদ সৃষ্টি করতে শুরু করেছিল এবং তারা ইসলামী বিশ্বকে ভেঙ্গে খন্ড বিখন্ড করতে লাগল। তারা উসমানী খিলাফত ধ্বংসের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যেতে লাগল। কারণ এই খিলাফতই গোটা বিশ্বে মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব করছিল। এই উদ্দেশ্যে তারা গোত্রীয় ও জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর জন্ম দিল। এর সুচনায় ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে বলকানের জনগণকে বিদ্রোহ করতে উস্কে দিল। পশ্চিমাদের অর্থায়নে সংঘটিত এধরণের বিদ্রোহগুলোর ধারাবাহিকতায় অবশেষে ১৮৭৮ সালে বলকান স্বাধীন হল।

বিদেশী শক্তিগুলো ১৮২১ সালে গ্রীকে বিদ্রোহের আগুন প্রজ্জ্বলিত করল এবং অবশেষে তাদের হস্তক্ষেপে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে গ্রীক উসমানী খিলাফত থেকে স্বাধীন হয়ে গেল। এ ঘটনার অনুসরণে বলকানের ঘটনাটিও সংঘটিত হচ্ছিল। ক্রমাগত এরূপ ঘটনায় একে একে ক্রীট, সাইপ্রাস এবং অধিকাংশ ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপপূঞ্জ উসমানী খিলাফত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এতদঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসীকেই নির্বসান দেয়া হয়েছিল ও দেশ থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল। অবিশ্বাসী কাফিরদের নিষ্ঠুরতায় তাদের অধিকাংশই দেশ থেকে পালাতে বাধ্য হয়েছিল। তারা আরব দেশ গুলোতে আশ্রয় নিয়েছিল যাদের অধিকাংশই ছিল তখনো মুসলিম ভূখন্ড ও ইসলামী খিলাফতের অংশ। সারকাশিয়ান, বুশনাক, চেচেন ও অন্যান্যরা এ সকল বীর সন্তানদের বংশধর যারা তখন অবিশ্বাসী কাফির শাসনের আনুগত্য করতে অস্বীকার করেছিল এবং তাদের দ্বীন নিয়ে নিরাপদে ইসলামী ভূখন্ড ও ইসলামী শাসনের অধীনে পালিয়ে এসেছিল।

পশ্চিমারা আরো বহুদুর অগ্রসর হয়েছিল এবং গোপনে খিলাফতের অধীনে মুসলিমদের মাঝে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন গুলোকে সমর্থন ও উৎসাহ যুগিয়েছিল। যেমন আরব ও তুর্কীদের মাঝের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। তারা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলোকে উৎসাহিত করেছিল এবং ভিন্ন ভিন্ন তুর্কী ও আরব রাজনৈতিক দল গঠন করেছিল। যেমন, "তুর্কীইয়া আল ফাতাহ দল" (ইয়াং টার্ক/তরুণ তুর্কী), "ইউনিয়ন ও প্রগ্রেস পার্টি" (যুক্ত ও অগ্রগামী দল) এবং "আরব স্বাধীনতা দল" (আরব ইন্ডিপেন্ডেন্স পার্টি) এবং "কভনেন্ট পার্টি" (আল-আহদ) ইত্যাদি। এর পরিণতিতে রাষ্ট্রের কাঠামো ভয়ঙ্কর ভাবে নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল এবং বিদেশী আক্রমনের মুখে ভেঙ্গে পড়তে শুরু করেছিল। অবিশ্বাসী কুফর শক্তি ইসলামী বিশ্বের বিরুদ্ধে পরিচালিত তাদের আক্রমনের সাফল্যের উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখতে পেল। তারা অবশিষ্ট মুসলিম ভূখন্ডকে দখল ও ধ্বংস করে ইসলামী খিলাফতের অস্তিত্ব মুছে ফেলতে তৎপর হল। এটি ঘটেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে, যে যুদ্ধে উসমানী রাষ্ট্রকে জোর পূর্বক জড়িয়ে পড়তে বাধ্য করা হয়েছিল। আঁতাতকারী শক্তিরাই এ যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছিল এবং গোটা ইসলামী বিশ্বকে তারা যুদ্ধলব্ধ গণীমতের মাল হিসাবে নিজেদের মাঝে ভাগাভাগি করে নিয়েছিল। ১৯১৮ সালে যুদ্ধ শেষ হবার পর ইসলামী খিলাফতের অবশিষ্ট অংশটি তুর্কী ভূখন্ড হিসাবে টিকে ছিল পরবর্তীতে যার নাম হয় তুরস্ক। পশ্চিমাদের দয়া দাক্ষিণ্যে এটি ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত টিকে ছিল এবং এসময় তারা ইসলামী সরকার ব্যবস্থাকে চিরতরে পরিত্যাগ করার নিশ্চয়তার বিনিময়ে স্বাধীনতা লাভ করে।

## ইসলামী খিলাফতের ধ্বংসঃ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে একটি যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়েছিল এবং মিত্র বাহিনীর বিজয়ের পর উসমানী রাষ্ট্র (খিলাফত) ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। মিত্র বাহিনী মিশর, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, জর্ডান এবং ইরাক সহ সকল আরব ভূখন্ড দখল করে নিয়েছিল এবং ইসলামী রাষ্ট্র থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল। উসমানীদের নিকট শুধুমাত্র তুরস্ক অবশিষ্ট রইল। অবশ্য মিত্র বাহিনী সেখানেও আক্রমন করেছিল। বৃটিশ যুদ্ধবহর বসফরাস দখল করে নিয়েছিল এবং বৃটিশ সেনাবাহিনী রাজধানী ইস্তাম্বুলের কিয়দংশ, ডারডানিল দুর্গ এবং তুরস্কের অধিকাংশ কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিয়েছিল।

এদিকে ফরাসীরাও ইস্তাম্বুলের কিছু অংশ দখল করে নিয়েছিল এবং তাদের সেনেগালী সৈন্যরা রাজপথ দখল করে নিয়েছিল। ইতালীয় সেনাবাহিনী বিরা ও রেলপথ দখল করে নিয়েছিল এবং মিত্র বাহিনী পুলিশ, ন্যাশনাল গার্ড এবং বন্দর দখল করে তাদের কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিল। তারা সকল দুর্গ থেকে সমরাস্ত্র ছিনিয়ে নিয়েছিল এবং তুর্কী সেনাবাহিনীর অংশ বিশেষকে কর্মচ্যুত করেছিল। এসময় "ইউনিয়ন ও প্রগ্রেস পার্টি" ভেঙ্গে দেয়া হয় এবং জামাল পাশা ও আনওয়ার পাশা দেশ ছেড়ে চলে যায়। এদের বাকী সদস্যরা গা ঢাকা দিয়েছিল। একটি দখলদার বাহিনীর আদেশ পালন করতে একটি পুতুল সরকার গঠন করা হল যার প্রধান ছিল তৌফিক পাশা।

তৎকালীন সময়ে খলীফা ছিলেন ওয়াহিদ আল-দ্বীন। তিনি কঠিন বাস্তবতা অনুধাবন করলেন এবং এ অবস্থা থেকে উত্তরণের একটি বুদ্ধিদীপ্ত উপায় অন্বেষণ করছিলেন। তিনি সংসদ ভেঙ্গে দিলেন এবং প্রধানমন্ত্রীর পদটিতে তার অত্যন্ত বিশ্বস্ত বন্ধু ফরিদ পাশাকে নিযুক্ত করলেন। ফরিদ পাশা মিত্র বাহিনীর প্রতি তার সদয় নীতি সমর্থন করতেন। তাদের আশঙ্কা ছিল যুদ্ধ শেষে নাজুক পরিস্থিতিতে মিত্র বাহিনী যে কোন সময় দেশটিকে ধ্বংস করে দিতে পারে। মিত্র বাহিনীর কর্তৃত্ব বজায় থাকা অবস্থায় তিনি তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করলেন এবং কিছু সময়ের জন্য তুরস্ক শান্ত থাকল। ১৯১৯ সাল পর্যন্ত এ অবস্থা বজায় ছিল। এসময় অবস্থার পরিবর্তন হতে লাগল এবং মিত্র বাহিনীর অবস্থান দুর্বল হতে শুরু করল। ইতালী, ফ্রান্স ও বৃটেনে ধারাবাহিক বিপর্যয় দেখা দিল এবং এটি তাদের আভ্যন্তরীন স্থিতিশীলতার জন্য যথেষ্ট হুমকির কারণ হয়ে উঠল। তাদের মধ্যে শীঘ্রই মতবিরোধ দেখা দিল। ইস্তাম্বুলে যুদ্ধলব্ধ মালামালের জন্য নিজেদের মধ্যে বচসা থেকে এটি স্পষ্ট হয়ে গেল। তারা প্রত্যেকেই সেনাবাহিনী ও অর্থনৈতিক সুবিধার বৃহৎ অংশ দাবী করছিল। এসময় তুরস্ক তার অস্তিত্ব রক্ষার শেষ সুযোগটা গ্রহণ করতে সচেষ্ট হল। এমন এক সময়ে যখন মিত্র বাহিনীর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তখন তারা একে অন্যের বিরুদ্ধে তুর্কীদের উস্কে দিতে লাগল। এ প্রক্রিয়ায় তারা তুরস্ককে সাহায্য করতে লাগল।

পরিকল্পনাধীন শান্তি সম্মেলন তখনো অনুষ্ঠিত হয়নি এবং এ ব্যাপারে শর্তাবলী ঠিক করা হচ্ছিল। এসময় দিগন্তে এক চিলতে আশার আলো উঁকি দিল এবং জনগণ একটি গুরুতর প্রতিরোধ আন্দোলনের বাস্তবতায় বিষয়ে বিশ্বাস করতে শুরু করল। এসময় ইস্তাম্বুলে দশটিরও বেশী গুপ্ত সংগঠন তৈরী করা হয়েছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল শত্রুদের অধিকৃত অস্ত্র ও রসদ সংগ্রহ করা, দেশের গুপ্ত সংগঠন গুলোর নিকট তা পৌঁছে দেয়া। কতিপয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা এ কাজে জড়িত ছিল। সমর মন্ত্রনালয়ের ডেপুটি ইসমত, সেনাবাহিনীর প্রধান ফাউজী, আভ্যন্তরীন মন্ত্রী ফাতহী, নৌবাহিনীর মন্ত্রী রউফ প্রমুখ এ আন্দোলনে সাহায্য করেছিল। এভাবে বহু সংগঠন গোপনে শত্রু প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সংগঠিত হল। এসময় "ইউনিয়ন এন্ড প্রোগ্রেস পার্টি" পূনরায় সক্রিয় হল। এ আন্দোলনে বেশ কিছু সেনাসদস্যও যোগ দিয়েছিল। অবশেষে তারা মুস্তফা কামালের নেতৃত্বে অভিন্ন এক আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ হল। সে মিত্রবাহিনীর বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করল, এবং দেশ হতে বিতাড়িত করতে তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। সে ঘোষণা করল তার পথে বাধা হয়ে দাড়ালে খলীফার সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করবে।

এ যাত্রায় মুস্তফা কামালের সাফল্য ছিল অভূতপূর্ব। ইস্তাম্বুলের কেন্দ্রীয় সরকার ও কর্তৃত্ব মিত্রবাহিনীর অধীনে বুঝতে পেরে সে আনাতোলিয়ায় জাতীয় সরকার গঠন করল। সে সিওয়াস অঞ্চলে একটি জাতীয় সম্মেলন আয়োজন করেছিল যেখানে তুরস্কের স্বাধীনতা সংরক্ষণের বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। এ সম্মেলনে কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং মুস্তফা কামালের নেতৃত্বে একটি কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। এ সম্মেলন থেকে সুলতানের প্রতি হুঁশিয়ারী দিয়ে প্রধানমন্ত্রী ফরিদ পাশাকে অপসারণ ও অবিলম্বে সংসদীয় নির্বাচন দাবী করা হয়। এরূপ চাপের মুখে সুলতান সম্মেলনের দাবী মেনে নেন এবং ফরিদ পাশাকে বরখাস্ত করে আলী রেজাকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ দেন। তিনি নির্বাচনের ঘোষণা দেন। সম্মেলন থেকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে নির্বাচনে অংশ নেয়া হয় এবং নির্বাচনী ইশতেহারে দেশ রক্ষার কিছু পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়। নতুন সংসদে তারা ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল।

এ সাফল্যের পর তারা আঙ্কারায় সরে গেল এবং সেখানে তাদের প্রধান কার্যালয় স্থাপন করল। এখানে তাদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এখান থেকে তারা প্রস্তাব উত্থাপন করল যে, ইস্তাম্বুলে সংসদ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে হবে এবং তাদের প্রতিনিধিত্বকারী কাউন্সিলকে অবলুপ্ত করতে হবে; কারণ তাদের সদস্যরা ইতিমধ্যেই সরকারী প্রতিনিধিতে (অফিশিয়াল ডেপুটি) পরিণত হয়েছে। অবশ্য মুস্তফা কামাল এ দুটি প্রস্তাবেরই তীব্র বিরোধিতা করতে লাগল। তার বক্তব্য ছিল, "নবগঠিত সংসদের প্রতিশ্রুতি, সততা ও নীতিমালা স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত প্রতিনিধিত্বকারী কাউন্সিলকে অব্যহত রাখা প্রয়োজন। আর রাজধানীতে স্থানান্তরিত হবার বিষয়টি নিরেট পাগলামী ছাড়া আর কিছু নয়, কারণ এটি করার অর্থ হবে নিজেদেরকে শত্রুর করুণার উপর সমর্পণ করা। বৃটিশরা এখনো দেশকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং নিশ্চিতভাবেই কর্তৃপক্ষ তোমাদের বিষয়গুলোতে হস্তক্ষেপ করবে এবং তোমাদের গ্রেফতার করবে। কাজেই এখানে অর্থাৎ আঙ্কারাতেই সংসদ বসা উচিৎ যাতে এটি স্বাধীন থাকতে পারে।" মুস্তফা কামাল তার বক্তব্যে স্থির ছিল এবং শক্তভাবে তার মতামতকে রক্ষা করতে লাগল। কিন্তু তা সত্তেও প্রতিনিধিদেরকে আঙ্কারায় সংসদ অধিবেশন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে রাজী করতে ব্যর্থ হল। ডেপুটি (প্রতিনিধিরা) রাজধানীতে গেল, খলীফাহর প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করল এবং তাদের কাজ করে যেতে লাগল। এটি ছিল ১৯২০ সালের জানুয়ারী মাসের ঘটনা।

খলীফাহ ডেপুটিদের উপর তার ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করলেও তারা এর প্রতিবাদ করল এবং রাষ্ট্রের অধিকার রক্ষার ইচ্ছা ব্যক্ত করল। যখন মিত্রবাহিনীর পক্ষ থেকে তাদের উপর চাপ বাড়তে লাগল তখন তারা চুক্তির (covenant) জন্য জনগণের মতামত চেয়ে সম্মেলন করল।

সাইওয়াস সম্মেলনে এব্যাপারে তারা সম্মত হয়েছিল। এই চূক্তিতে তাদের শান্তির প্রস্তাব মেনে নেয়ার ব্যাপারে কিছু শর্তাবলী আরোপ করা হয়েছিল। এ সকল শর্তাবলীর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল, নির্দিষ্ট সীমান্তরেখার মধ্যে তুরস্ককে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র ঘোষণা করতে হবে। বৃটিশরা এতে উল্লসিত হয়ে উঠল কারণ এটিই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। সর্বোপরি তারা চেয়েছিল প্রস্তাবটি তুর্কীদের মধ্য থেকেই আসুক।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উসমানী খিলাফতের অধীনে তার উলাইয়াত হিসাবে যত রাষ্ট্র ছিল তাদের প্রত্যেককেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মিত্রবাহিনী একটি চূক্তি বেঁধে দিয়েছিল। মিত্রবাহিনী যে সকল অংশকে খিলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন করে চাইছিল, এ চূক্তিতে তাদের স্বাধীনতার দাবী তোলা হয়েছিল। ফলে ইরাক, তার স্বাধীনতার দাবী অনুযায়ী একটি চূক্তি উত্থাপন করল। অনুরূপভাবে সিরিয়া, ফিলিস্তিন, মিশর এবং এরূপ আরো অনেক অঞ্চল তাদের স্বাধীনতার দাবী তুলল। ফলে তুরস্কের এই জাতীয়তাবাদী চূক্তির দাবী বৃটিশদের স্বাভাবিকভাবেই উল্লসিত করে তুলেছিল। কারণ ঠিক এটিই তাদের উদ্দেশ্য ছিল, আর তা হচ্ছে উসমানী খিলাফতকে দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন করে, ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে বিভিন্ন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে পরিণত করা। এর ফলে তারা আর কোনদিনই একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে আবির্ভূত হতে পারবেনা। এভাবেই ইসলামী খিলাফত রাষ্ট্রকে নিশ্চিহ্ন করার তাদের লালিত স্বপ্ন অবশেষে সফল হল।

প্রতিটি অঞ্চলের জন্য মিত্রবাহিনীর বেঁধে দেয়া চূক্তি না থাকলে অবস্থা ভিন্ন দিকে মোড় নিত। এর কারণ হচ্ছে উসমানী খিলাফত ছিল একটি একক শক্তি যেখানে তার প্রতিটি উলাইয়াত কে অবিচ্ছিন্ন অংশ হিসাবে বিবেচনা করা হত। এটি একটি ঐক্যবদ্ধ ব্যবস্থা ছিল যা ছিল, এটি কোন ইউনিয়ন বা কনফেডারেশন ছিলনা। কাজেই তুরস্ক বা হিজাজ কিংবা আল-কুদস ও ইস্কান্দারোনা ভেদে কোন অংশের জন্যই রাষ্ট্রের কোন ভিন্ন পন্থা বা নীতি ছিলনা, এটি ছিল সবার জন্যই এক ও অভিন্ন। এরা প্রত্যেকেই একটি অভিন্ন রাষ্ট্রের অংশ ছিল।

এছাড়াও যুদ্ধে পরাজিত শক্তির উপর চাপিয়ে দেয়া শর্তাবলী অবস্থাকে আরো জটিল করে তুলত। কারণ পরাজিত তুরস্কের অবস্থা ছিল পরাজিত জার্মানীর মত এবং এরা যুদ্ধে পরস্পর মিত্র ছিল। কাজেই একটি দেশের জন্য প্রয়োগ করা শান্তির শর্তাবলী অপর দেশটির জন্যও প্রযোজ্য হত। কাজেই যদি জার্মানরা তাদের একহাত ভূখন্ড রক্ষায় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে ও তাদের দেশকে বিভক্ত করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে তবে তা উসমানী খিলাফত রাষ্ট্রের জন্যও প্রযোজ্য। এবং তাকেও বিভক্ত করার কোন যৌক্তিক কারণ থাকতে পারেনা। মিত্র বাহিনী এ বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতন ছিল এবং সে ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করছিল। কিন্তু যখন উসমানীরা নিজেরাই তাদের রাষ্ট্রকে বিভক্ত করার দাবী তুলল, এবং আরব ও তুর্কীদের পক্ষ থেকে একই ধরণের অনুরোধ উত্থাপিত হল, তখন তারা এ সুবর্ণ সুযোগ লুফে নিল এবং সানন্দে এ ধরণের আন্দোলনকে উৎসাহিত করতে লাগল। বিশেষতঃ এটি যখন ছিল রাষ্ট্রের কেন্দ্রস্থল (তুরস্ক) যেখান থেকে রাষ্ট্র পরিচালিত হত এবং রাষ্ট্রের প্রতিনিধি করা হত।

কাজেই মিত্রবাহিনী এ চূক্তিকে তাদের চূড়ান্ত বিজয় হিসাবে বিবেচনা করল। তুর্কীদের প্রতিরোধ করার স্বাধীনতা দেয়া হল এবং এটি প্রকাশিত হওয়ার পর বৃটিশরা বিভিন্ন স্থান থেকে তাদের সৈন্য প্রত্যাহার করতে শুরু করল। বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্যদের দেশ থেকে প্রত্যাহার করা হল। একই সাথে তুর্কীরা শক্তি অর্জন করতে শুরু করল। একটি প্রতিরোধ আন্দোলন দানা বেঁধে উঠল যা পরবর্তীতে খলিফাহ'র বিরুদ্ধে বিপ্লবে রূপ নিল। ফলে খলিফাহ এ আন্দোলন দমন করতে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করতে বাধ্য হলেন। অধিকাংশ জনগণ খলিফাহর পক্ষ নেয়ায় এ আন্দোলন প্রায় নিয়ন্ত্রনে আনার সুযোগ দেখা দিল। শুধুমাত্র আঙ্কারায় শক্ত প্রতিরোধ দেখা দিল যা মূলত বিপ্লবীদের শক্ত ঘাঁটি হিসাবে বিবেচিত হত। ঘটনাক্রমে আঙ্কারা প্রায় পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হল। খলীফাহর সেনাবাহিনীর কাছে গ্রামের পর গ্রাম পরাভূত হল এবং পরবর্তীতে সেনাবাহিনীর সাথে তারা যোগ দিল। মুস্তফা কামাল ও তার সহযোগীরা বেকায়দায় পড়ে গেলেও, সে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল এবং জাতীয়তাবাদীদের উস্কে দিতে লাগল। তারা সাড়া দিল এবং শক্তি সঞ্চয় করল। তুরস্কের বিভিন্ন প্রদেশে এই গুজব ছড়িয়ে দেয়া হল যে বৃটিশ সেনাবাহিনী রাজধানী দখল করে নিচ্ছে, জাতীয়তাবাদীদের গ্রেফতার করছে এবং বলপ্রয়োগে সংসদ ভবন বন্ধ করে দিয়েছে।

খলিফা ও তার সরকারের দখলদার বাহিনীকে সমর্থনের গুজবও ছড়িয়ে পড়ল। এতে দ্রুত ঘটনা পাল্টে গেল। জনগণ দলে দলে খলিফা'র পক্ষ ত্যাগ করতে লাগল এবং জনমত আঙ্কারার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পক্ষে ঘুরে গেল। নারী পুরুষ নির্বিশেষে দলে দলে তুরস্ককে রক্ষার জন্য আঙ্কারার দিকে ছুটতে লাগল। বহু সৈন্য খলিফার সেনাবাহিনী ছেড়ে মুস্তাফা কামালের সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে লাগল। ইতিমধ্যে তুর্কীদের নিকট সে নায়ক এবং আশার প্রতীক হয়ে উঠেছিল। এ অবস্থা তাকে শক্তিশালী করে তুলল এবং প্রায় গোটা সেনাবাহিনীই তার নিয়ন্ত্রনে চলে এসেছিল। সে জাতীয় কাউন্সিলের প্রতিনিধিদের নির্বাচনের দাবী সম্বলিত একটি লিফলেট প্রচার করতে শুরু করল। এ কাউন্সিলের প্রধান কার্যালয় আঙ্কারায় স্থাপন করার প্রস্তাব ছিল। এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল এবং নতুন নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নিজেদের আইন সম্মত সরকার হিসাবে বিবেচনা করতে শুরু করল। তারা মুস্তাফা কামালকে তাদের কাউন্সিল প্রতিনিধিদের প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচন করল। আঙ্কারা জাতীয় সরকারের কেন্দ্র হিসাবে বিবেচিত হতে লাগল এবং সকল তুর্কী এতে সম্মত হয়েছিল। মুস্তাফা কামাল এর পর খলিফা'র সেনাবাহিনীর অবশিষ্টাংশও ধ্বংস করে দেবার মাধ্যমে গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটাল। এর পর সে গ্রীকদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হল এবং বেশ কটি রক্তাক্ত যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল। গ্রীকরা প্রথমে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকলেও শীঘ্রই বিজয়ের পাল্লা মুস্তাফা কামালের পক্ষে ঝুঁকে গেল।

১৯২১ সালের আগস্ট নাগাদ, সে গ্রীকদের বিরুদ্ধে একটি দ্রুত ও সফল আক্রমন পরিচালনা করল এবং ইজমির এবং তুরস্কের অন্যান্য উপকূলীয় অঞ্চল দখল করে নিল। সেপ্টেম্বরের শুরুতে সে হ্যরিংটনের সাথে সাক্ষাত ও পরিকল্পনার খুটিনাটি বিষয় ঠিক করতে ইসমাতের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করল। এ আলোচনায়, মিত্রবাহিনী গ্রীকদের বহিস্কার করতে এবং নিজদের ইস্তাম্বুল ও সমগ্র তুরস্ক হতে সরিয়ে নিতে সম্মত হল। আমরা যদি মুস্তফা কামালের পদক্ষেপ গুলো মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করি তবে দেখব, মিত্রবাহিনী তখনই তার সাথে একমত হয়েছিল যখন সে ইসলামী শাসনব্যবস্থাকে পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেবার অঙ্গীকার করেছিল। এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যখন জাতীয় সংসদ তার সাথে তুরস্কের বিজয়ের পর তার ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনা করছিল তখন সে ঘোষণা করে, "আমি ইসলামী রাষ্ট্র সমূহের কিংবা উসমানী জনগনের লীগে বিশ্বাস করিনা, প্রত্যেকেই যে কোন মতবাদ গ্রহণে স্বাধীন। অবশ্য সরকারের একটি বাস্তবতার নিরীখে উদ্ভূত স্থির ও পরিকল্পিত নীতিতে অটল থাকতে হবে। এ নীতির একটি মাত্র উদ্দেশ্য রয়েছে, আর তা হচ্ছে নিজেদের স্বাভাবিক সীমান্তের মধ্যে এর সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা। আবেগ ও অলীক কল্পনা আমাদের নীতিতে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনা। এবং অতীতে যে কল্পকথা আমাদের কঠিন মূল্য দিতে বাধ্য করেছে তা সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।"

এটি ছিল তুরস্কের স্বাধীনতাকে ইসলামী উম্মাহ'র পরিবর্তে শুধুমাত্র তুর্কী জনগণের জন্য একটি জাতিগত রাষ্ট্রে পরিণত করার দুরভিসন্ধিমূলক একটি ঘোষণা। কিছু ডেপুটি ও রাজনীতিবিদ তার নিকট জিজ্ঞাসা করেছিল কিভাবে নতুন তুরস্ক রাষ্ট্রে সরকার পরিচালিত হবে। কারণ তখন দুটি সরকার দ্বারা তুরস্ক পরিচালনার বিষয়টি দুর্বোধ্য প্রতীয়মান হচ্ছিল। তাদের মধ্যে একটি ছিল চরম ক্ষমতাধর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যার প্রধান কার্যালয় ছিল আঙ্কারায় এবং অপরটি ছিল তৎকালীন রাজধানী অবস্থিত বৈধ কিন্তু নামমাত্র সরকার যার প্রধান ছিল খলিফাহ এবং তার মন্ত্রীপরিষদ। রাজনীতিবিদরা কামাল কে এ ব্যাপারে তার একটি স্পষ্ট মত প্রকাশের জন্য ক্রমাগত অনুরোধ করতে লাগল। কিন্তু এর পরিবর্তে সে তৎকালীন খলিফাহ ওয়াহিদ উদদীনকে বৃটেন ও গ্রীকদের দোসর হিসাবে আখ্যায়িত করে তার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে লাগল। জনগণ খলিফাহর বিরুদ্ধে আক্রোশে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। জনগণের অলীক মোহের সুযোগ নিয়ে মুস্তাফা কামাল সুলতান ও তার সরকারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে একটি জাতীয় সংসদের সভা আহ্বান করল। সে প্রথম থেকেই জানত যে ওয়াহিদ উদদীনকে অপসারণ ও খলিফাহর অধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন করার ব্যাপারে সে তার ডেপুটিদের বোঝানোর ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ছিল। কিন্তু তবুও সে খলিফাহর প্রতি প্রত্যক্ষ আক্রমনের ঝুঁকি নিতে চাইল না। কারণ তাতে জনগণের মাঝে ইসলামী আবেগের সূত্রপাত ঘটাতে পারত। কাজেই সে তখন খিলাফাহ অবলুপ্ত করার পরিবর্তে ধূর্ততার সাথে খলিফাহকে সকল ক্ষমতা থেকে অব্যহতি দেয়ার প্রস্তাব করল।

এভাবেই সালতানাতের অবলোপন সম্ভব হবে এবং ওয়াহিদ উদদীন কে অপসারণ করা হবে। যখনই ডেপুটিগণ একথা শুনল তারা নির্বাক হয়ে গেল। খুবশীঘ্রই তারা এ প্রস্তাবের বাস্তবায়নের বিপদ অনুধাবন করতে পারল। তারা প্রথমে এ বিষয়ে একটি বিতর্ক করতে চাইল। মুস্তাফা কামাল এ ধরণের বিতর্কের পরিণতি সম্পর্কে পুরোমাত্রায় সজাগ ও ভীত ছিল। কাজেই সে এর পরিবর্তে একটি ইশারা ভোটের প্রস্তাব দিল। সে ডেপুটিদের মধ্যথেকে ৮০ জনের সমর্থন পেল যারা ছিল তার ব্যক্তিগত সমর্থক।

এদিকে জাতীয় সংসদ তার ইচ্ছা পূরনে অসম্মত হল এবং বিকল্প হিসাবে প্রস্তাবটি লিগ্যাল কমিটি'র (আইন বিষয়ক কমিটি) নিকট প্রেরণ করল। পরদিন যখন কমিটি সভায় বসল, মুস্তাফা কামাল সেখানে উপস্থিত থেকে ঘটনাটি খুব নিকটে থেকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। আইনজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি কয়েক ঘন্টা ব্যাপী বিষয়টির উপর বিতর্ক করল এবং বুঝতে পারল যে এ প্রস্তাবটি শরীয়াহকে লংঘন করছে। কারণ ইসলামে আলাদাভাবে প্রশাসনিক কর্তৃত্ব ও ধর্মীয় কর্তৃত্ব বলে কিছু নেই। সালতানাত এবং খিলাফাত সমার্থক। দ্বীনকে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করার ধারণাটি ইসলামে নেই এবং গোটা ইসলামের ইতিহাসে কখনোই ছিলনা। যা ছিল, তা হচ্ছে ইসলামী ব্যবস্থা যা রাষ্ট্র কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। অবধারিতভাবেই আইন পরিষদ এ ধরণের পৃথকীকরণের কোন যৌক্তিকতা খুঁজে পেলনা এবং এ বিষয়ে বিতর্ক করার ও কোন যুক্তি খুঁজে পেলনা। কারণ এ ব্যাপারে ইসলামী বিধান ও বক্তব্য গুলো পরিষ্কার এবং সুনির্দিষ্ট। এগুলোর ভিন্ন অর্থ করার কোন অবকাশ নেই। স্বাভাবিকভাবেই কমিটি এ প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করল।

অবশ্য মুস্তাফা কামাল সালতানাত থেকে খিলাফতকে বিচ্ছিন্ন করার মাধ্যমে রাষ্ট্র থেকে দ্বীন কে আলাদা করার ব্যাপারে বদ্ধ পরিকর ছিল। আর এটি ছিল মিত্রবাহিনীরও লক্ষ্য। অর্থাৎ নিজ লোকের হাতেই খিলাফতের অবশিষ্ট অংশ ধ্বংস করা। তার ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি পশ্চিমাদের অনুকরণে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ও আধ্যাত্মিক কর্তৃপক্ষ পৃথকের শিক্ষাই দিয়েছিল। ফলে সে পশ্চিমাদের অনুকরণে চার্চ থেকে রাষ্ট্রকে আলাদা করার আদলে সালতানাত ও খিলাফত পৃথক করতে ব্যতিব্যস্ত ছিল। যখন মুস্তাফা কামাল বুঝতে পারল কমিটির বিতর্ক যেদিকে অগ্রসর হচ্ছে তাতে তার অভিলাষ বাস্তবায়িত হবেনা, তখন সে মেজাজ হারিয়ে, তীব্র আক্রোশে চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠে বিতর্ককে বাধা দিয়ে কমিটির উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলতে লাগল, "ভদ্রমহোদয়বর্গ! উসমানী সুলতান জোর করে জনগণের উপর শাসন করার অধিকার নিয়েছে, আর জনগণ এখন জোর করেই তাকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। খলিফাহর নিকট থেকে সালতানাতকে পৃথক করতে হবে এবং বিলুপ্ত করতে হবে, এবং আপনারা পছন্দ করেন বা না করেন এটি অবশ্যই ঘটবে। এবং এ প্রক্রিয়ায় আপনাদের কয়েকজনের ধড় থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হবে।" সে একটি স্বৈরাচারের মত কথা বলছিল এবং এরপরই সভার পরিসমাপ্তি ঘটে। তাৎক্ষণিক ভাবে প্রস্তাবটির বিষয়ে আলোচনার জন্য জাতীয় সংসদের সভা আহ্বান করা হয়।

বিতর্কের পুরো সময়টিতে মুস্তাফা কামাল বুঝতে পেরেছিল যে, অধিকাংশ ডেপুটিরাই প্রস্তাবের বিপক্ষে। কাজেই সে তার পাশে তার সমর্থকদের জড়ো করে হাত তুলে ভোটাভুটির প্রস্তাব দিল। ডেপুটিরা প্রতিবাদ করে বলল, "যদি ভোটাভুটি একান্তই প্রয়োজন হয় তবে তা প্রত্যেক ডেপুটির নাম ডেকে হতে হবে।" মুস্তাফা কামাল তা প্রত্যাখ্যান করে গর্জে উঠে বলল "আমি নিশ্চিত যে জাতীয় সংসদ একটি ঐকমত্যের মাধ্যমে প্রস্তাবটি পাশ করবে এবং এটি শুধুমাত্র হাত তুলে ভোটের মাধ্যমেই সম্পন্ন হবে।" যখন প্রস্তাবটিকে ভোটের জন্য উত্থাপন করা হয়, তখন গুটি কতক হাত এর সমর্থনে উঠেছিল। কিন্তু ফলাফল ঘোষণার সময় বলা হ'ল জাতীয় সংসদ পরিষ্কার সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছে। ডেপুটিরা অনেকেই হতভম্ব হয়ে গেলেন এবং এটি প্রতিবাদ করে আসন ছেড়ে উঠে দাড়িয়ে বলতে লাগলেন, "এটি সত্য নয়, আমরা মেনে নিইনি।" মুস্তাফা কামালের সমর্থকগণ পাল্টা চিৎকার করে তাদের নিবৃত্ত করতে লাগল। পারস্পরিক তিরস্কারের মাঝে জাতীয় সংসদের প্রেসিডেন্ট পুনরায় ঘোষণা করলেন যে সংসদ পরিষ্কার সংখ্যা গরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সালতানাতের অবলুপ্তি অনুমোদন করেছে। সভা এখানেই মুলতুবী হয়ে গেল। মুস্তাফা কামাল তার সমর্থক পরিবেষ্টিত অবস্থায় সভাকক্ষ ত্যাগ করল। যখন খলিফা ওয়াহিদ উদদীন এ সংবাদ পেলেন তখন তিনি দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন এবং অচিরেই তার ভাতিজা আব্দুল মজিদ শাসন অধিকার বঞ্চিত অবস্থায় মুসলিমদের খলিফাহ হিসাবে মনোনীত হলেন। রাষ্ট্র একটি আইনসম্মত শাসক বিহীন অবস্থায় রয়ে গেল।

যদি খিলাফাহ থেকে সালতানাতকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়, তবে কে ছিলেন আইনসম্মত ভাবে রাষ্ট্রের প্রধান? মুস্তাফা কামাল সালতানাত থেকে খিলাফাত কে বিচ্ছিন্ন করার ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত ছিল কিন্তু এসময় তুরষ্ক কি ধরণের রাষ্ট্রীয় সরকার কাঠামো অবলম্বন করতে যাচ্ছে তা সম্পর্কে সে কোন তথ্য প্রকাশ করেনি। সালতানাত অবলুপ্ত হবার পর নতুন সরকারের রূপরেখা নির্ধারণ করা জরুরী হয়ে পড়ল। মুস্তাফা কামাল কি সরকার গঠন করবে এবং খলিফাহকে কর্তৃত্বের প্রতীক রেখে সাংবিধানিক সরকারের প্রেসিডেন্ট হবে? যদি তাই হয় তবে সালতানাত অবলোপনের সিদ্ধান্ত কি প্রথম থেকেই অকার্যকর হয়ে পড়েনি?

মুস্তাফা কামাল সরকার গঠনে অস্বীকৃতি জানাল এবং তার উদ্দেশ্য গোপন রাখল। যার মাধ্যমে সে জনগণের উপর প্রভাব বিস্তার করছিল সেই কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা ব্যবহার করে সে একটি নতুন দল গঠন করল, যার নাম দিল "পিপল্‌স পার্টি" বা "জনতার দল"। তার উদ্দেশ্য ছিল জনগণের সমর্থন অর্জন করা কারণ তার ক্ষমতা সত্ত্বেও এবং সালতানাত থেকে খিলাফাহ'র পৃথকীকরণের ঘোষণার পরও প্রতিনিধিদের কাউন্সিলের (কাউন্সিল অব রিপ্রেসেন্টিটিভ) অধিকাংশই তার বিপক্ষে ছিল। ফলে সে নতুন সরকারের রূপ প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিল। সে তখন তুরস্ককে রিপাবলিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা দিয়ে নিজেকে তার প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করল। সে এটি শুরু করেছিল জাতীয় সংসদের বিরুদ্ধে একটি নোংরা প্রচারণার মাধ্যমে। যার ফলে একটি বিব্রতকর রাজনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি করল যা সরকারের পদত্যাগে বাধ্য করেছিল। সরকারের জাতীয় সংসদে পদত্যাগ পত্র দাখিলের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় একটি শুন্যতা সৃষ্টি হ'ল। সঙ্কট যখন ঘণীভূত হচ্ছিল তখন কিছু ডেপুটি প্রতিনিধিবর্গের কাউন্সিলের নিকট প্রস্তাব দিল যেন তারা মুস্তাফা কামালকে তাদের সরকার প্রধান হিসাবে নিয়োগ দেয়। প্রথমে সে ভান করল যেন তার এ কাজের কোন উদ্দেশ্য নেই, কিন্তু পরে সে সম্মত হ'ল এবং জাতীয় সংসদে বক্তব্য দিতে উপস্থিত হল।

তার বক্তব্যে সে তার ডেপুটিদের উদ্দেশ্য করে বলল, "আপনারা আমাকে এই সঙ্কটাপন্ন মুহূর্তে উদ্ধারকর্তা হিসাবে ডেকে পাঠিয়েছেন। যদিও এই সঙ্কটময় অবস্থার জন্য আপনারাই দায়ী। কাজেই রাষ্ট্রের এ বিষয়টি একটি ক্ষণস্থায়ী ঘটনা নয় বরং আমাদের সরকার ব্যবস্থার একটি মৌলিক ত্রুটি। জাতীয় সংসদের এ মুহূর্তে দুটি কাজ রয়েছে, একটি হচ্ছে আইনপ্রনয়ন সংক্রান্ত, অন্যটি হচ্ছে নির্বাহী (শাসনকার্য) সংক্রান্ত। প্রত্যেক ডেপুটি সকল মন্ত্রনালয়ের সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ করতে চায় ও সরকারের প্রতিটি বিভাগে এবং মন্ত্রীর প্রতিটি সিদ্ধান্তে নাক গলায়। ভদ্রমহোদয়গণ, এ অবস্থায় কোন মন্ত্রীই তার কাজ এবং দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন না এবং এরূপ একটি পদ গ্রহণ করতে পারেনা। আপনাদের বুঝতে হবে যে, এর ভিত্তিতে কোন সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে তা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়, আর যদি এটি বাস্তবায়িত হয় তবে তা কোন স্থিতিশীল সরকার হয়না, বরং হয় টলমান একটি ব্যবস্থা। কাজেই আমি আমাকে প্রেসিডেন্ট করে তুরস্ককে একটি রিপাবলিকে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।" তার বক্তব্য শেষ করার সাথে সাথেই বোঝা গেল যে তুরস্ককে রিপাবলিক ও নিজেকে তার প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসাবে ঘোষণা দিয়ে ইতিমধ্যে সে একটি অধ্যাদেশ তৈরী করে ফেলেছে। সে নিজেকে তুরস্কের আইনসম্মত প্রেসিডেন্টে পরিণত করল।

অবশ্য সবকিছুই মুস্তাফা কামালের পরিকল্পনা মাফিক নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হ'লনা। যেমন, তুরস্কের জনগণ ছিল মুসলিম এবং মুস্তাফা কামাল যা করল তা ইসলামিক ছিলনা। 'কামালের উদ্দেশ্য ইসলামকে ধ্বংস করা' এরূপ একটি ধারণা জনগণের মাঝে ছড়িয়ে পড়ল এবং এর সাথে যোগ হ'ল কামালের ব্যক্তিগত কিছু কার্যকলাপ। ব্যক্তিগত জীবনে সে ইসলামকে ঘৃণা করত, সকল শরীয়াহ আইনকে ভঙ্গ করত এবং মুসলিমদের পবিত্র কাজ গুলোকে উপহাস করত। জনগণ অচিরেই বুঝতে পারল আঙ্কারার নতুন সরকার চরমভাবে কাফির। এবং তারা খলিফাহ আব্দুল মজিদের পক্ষে সমবেত হতে শুরু করল। তারা তাকে কর্তৃত্ব ফিরিয়ে দিতে চাইল এবং তাকে তাদের কার্যকর শাসক হিসাবে নিযুক্ত করতে চাইল যাতে তিনি এসব মুরতাদদের কবল থেকে মুক্ত করতে পারেন। মুস্তাফা কামাল ঘনায়মান বিপদ সম্পর্কে সচেতন ছিল এবং বুঝতে পারছিল অধিকাংশ লোকই তাকে জিনদিক ও কাফির বিবেচনায় ঘৃণা করে। সে বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে খিলাফাহ ও খলিফাহর বিরুদ্ধে নোংরা প্রচারণা শুরু করে। এ ব্যপারে সে সংসদকে আগ্রহী করে তুলল এবং অবশেষে তারা একটি আইন পাশ করল যে, কেউ রিপাবলিকানের বিরুদ্ধতা করলে কিংবা সুলতানের পক্ষাবলম্বন করলে তা রাষ্ট্রদ্রোহিতা হিসাবে বিবেচিত হবে যার শাস্তি মৃত্যুদন্ড। এসময় মুস্তাফা কামাল প্রতিটি সভায়, বিশেষ

করে সংসদে খিলাফতের ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে কথা বলতে লাগল। সে খিলাফত অবলুপ্তির একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে লাগল। এ বিষয়টি বুঝতে পেরে কোন কোন ডেপুটি তার পরোক্ষ বিরোধীতা করে খিলাফতের কুটনৈতিক সুবিধার কথা বলতে লাগল। তারা প্রত্যেকেই মুস্তাফা কামালের আক্রমনের শিকার হলেন। সে সংসদে বলল, "খিলাফত আর তার ধর্মযাজকদের জন্যই কি তুরস্কের কৃষকেরা পাঁচ শতাব্দী ধরে লড়াই করে মরে নি? এখনই উপযুক্ত সময় যখন তুরস্কের নিজের বিষয়ে লক্ষ্য করা উচিৎ এবং ভারতীয় ও আরবদের কথা উপেক্ষা করা উচিৎ। তুরস্কের নিজকে মুসলিমদের নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে নেয়া উচিৎ।"

মুস্তাফা কামাল তুরস্কের জনগণের নিকট খিলাফাহ'র বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যূতির কথা বলে এর বিরুদ্ধে নোংরা প্রচারণা অব্যাহত রাখল। সে খলিফাহ ও তার সমর্থকদের বিরুদ্ধেও নোংরা প্রচারণা চালাতে লাগল এই বলে যে তারাই প্রকৃত ষড়যন্ত্রকারী এবং বৃটিশদের তাঁবেদার। মুস্তাফা কামাল এখানেই থেমে থাকেনি, বরং যারা খিলাফতের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে একটি সন্ত্রাসী প্রচারণা শুরু করেছিল। এরূপ একজন ডেপুটি যিনি দ্বীনের প্রতিরক্ষা ও খিলাফত আকড়ে ধরার বাধ্যবাধকতার কথা প্রাকাশ্যে ঘোষনা করেছিলেন তাকে সে রাতেই ভাড়া করা খুনীর মাধ্যমে হত্যা করা হয়। তারই এক অনুসারী ঐ রাতে যখন তিনি সংসদ থেকে ফিরছিলেন, তখন তাকে হত্যা করে। অপর এক ডেপুটি একটি ইসলামী বক্তব্য দেয়ায় মুস্তাফা কামাল তাকে ডেকে নিয়ে ফাঁসিতে ঝুলানোর হুমকি দেয়।

মুস্তাফা কামাল সর্বত্র আতঙ্ক ছড়িয়ে দিল। ইতিমধ্যে সে ইস্তাম্বুলের সরকারকে আদেশ দিল সালাতুল জুমায় খলিফাহ খলিফা সংক্রান্ত আদব কায়দা ও রীতিনীতিতে কাট ছাট করতে। সে খলিফাহ'র বেতন কেটে সর্বনিম্ন মাত্রায় নির্ধারণ করল এবং তার অনুসারীদের তাকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য করল। যখন মুস্তাফা কামালের কিছু মধ্যপন্থী সমর্থক বিষয়টি লক্ষ্য করল, তখন তাদের মাঝে পুনরায় ইসলামী অনুভূতি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল এবং তারা খিলাফতের নিশ্চিহ্নতার ব্যাপারে শংকিত হয়ে উঠল। তারা মুস্তাফা কামালকে মুসলিমদের খলিফা হিসাবে ঘোষণা দেয়ার অনুরোধ করল। সে তা অস্বীকার করল। এরপর মিশর ও ভারত থেকে দুজন প্রতিনিধি তার সাথে সাক্ষাত করে অনুরোধ করেছিল সে যেন নিজেকে খলিফাহ হিসাবে নিযুক্ত করে। তাদের বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও সে তাতে কর্ণপাত করল না। ততদিনে মুস্তাফা কামাল খিলাফতের চূড়ান্ত মৃত্যু ঘন্টা বাজানোর প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে।

বিদেশীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা, বিদেশী শত্রু এবং তাদের মিত্র খিলাফাহ - এ ধারণাটি মুস্তাফা কামাল জনগণ, সেনাবাহিনী ও সংসদের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছিল। বস্তুতঃ বিদেশীদের বিরুদ্ধে ঘৃণার বীজ বপন ছিল একটি ছলনা, প্রকৃতপক্ষে এর মাধ্যমে খলিফাহকে বিদেশীদের বন্ধু হিসাবে পরিচিত করে তাকে দায়ী করা হচ্ছিল। যখন তার দিকে জনমত ঝুঁকে গেল, এবং খলিফাহর বিরুদ্ধে মনোভাব চরমে উঠল, তেমনি এক সময়ে ১৯২৪ সালের ৩রা মার্চ মুস্তাফা কামাল সংসদে খিলাফতের অবলুপ্তি, খলিফাহর অপসারণ ও নির্বাসন ঘোষণা করল। এভাবেই আনুষ্ঠানিক ভাবে রাষ্ট্র থেকে দ্বীনকে পৃথক করে ফেলা হ'ল।

তার বক্তব্যে ব্যবহার করা শব্দগুলোর মধ্যে ছিল, "কিসের মূল্যে বিপদাপন্ন রিপাবলিকের রক্ষা হবে ও তা একটি শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে? খলিফাহ এবং উসমানীদের চলে যেতে হবে। মান্ধাতার আমলের ধর্মীয় আইন ও আদালত প্রতিস্থাপিত হবে, আধুনিক আইন ও আদালতের মাধ্যমে। ধর্মীয় শিক্ষার স্কুল গুলোকে ধর্মনিরপেক্ষ সরকারী স্কুলের মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত করা হবে।" এরপর সে দ্বীন ও তার ভাষায় ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের আক্রমন করল। সে তার প্রকৃত স্বৈরাচারী কর্তৃত্ব দেখাল এবং কোনরূপ বিতর্ক ছাড়াই সংসদে তার প্রস্তাবটি উত্থাপিত ও পাশ হল। তারপর সে ইস্তাম্বুলের ওয়ালিকে আদেশ দিল যেন পরদিন ভোর হবার পূর্বেই খলিফাহ আব্দুল মজিদ তুরস্ক ত্যাগ করে। ওয়ালি স্বয়ং একদল পুলিশ নিয়ে মধ্যরাতে খলিফাহর প্রাসাদে উপস্থিত হ'ল। তারা তাকে একটি সুটকেসে কিছু কাপড় ও সামান্য অর্থ দিয়ে একটি ঘোড়ার গাড়ীতে করে সীমান্ত পার করতে বাধ্য করল।

এভাবেই মুস্তাফা কামাল ইসলামী খিলাফত ও ইসলামী ব্যবস্থা ধ্বংস করেছিল। এর পরিবর্তে সে প্রতিষ্ঠিত করল একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। ইসলামী খিলাফত ধ্বংসের মাধ্যমে সে অবিশ্বাসীদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেছিল যা তারা ক্রুসেডের সময় থেকে দীর্ঘ সময় ধরে লালন করে আসছিল।

## ইসলামী খিলাফতের পূনঃপ্রতিষ্ঠায় বাধাঃ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মিত্রবাহিনী ইসলামী খিলাফতের সকল ভূখন্ড দখল করে নিয়েছিল। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল চিরতরে ইসলামী খিলাফত ধ্বংস করে দেয়া এবং এটি নিশ্চিত করা যেন আর কখনোই ইসলামী রাষ্ট্র মাথা তুলে দাড়াতে না পারে। ইসলামী রাষ্ট্র ধ্বংস করে দেয়ার পর তারা নিশ্চিত করল যাতে পূনরায় এর কোন ভূখন্ডে যাতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে। ইসলামী রাষ্ট্র যাতে আর কখনোই প্রত্যাবর্তিত হতে না পারে তা নিশ্চিত করার জন্য তারা বিভিন্ন পরিকল্পনা ও পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল এবং এ লক্ষ্যে তারা এখনো কাজ করে যাচ্ছে।

একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী মুসলিম ভূখন্ড অধিকারের প্রথম দিন থেকেই অবিশ্বাসী ঔপনিবেশিক শক্তি মুসলিম বিশ্বে তাদের মুঠি শক্ত করছিল। ১৯১৮ সালে তারা উসমানী খিলাফতের অন্তর্গত বেশ কিছু ভূখন্ড দখল করে নিয়েছিল এবং ১৯২২ সাল নাগাদ সেসব স্থানে সামরিক আইন বলবৎ করেছিল। তারা বাধ্যতামূলক শাসন বা স্বায়ত্ব শাসনের মাধ্যমে তাদের দখলদারিত্ব শক্ত করার দিকে মনযোগ দিয়েছিল। অবশেষে এল ১৯২৪ সাল। এ বছর শত্রুপক্ষ বিশেষত বৃটেন, ইসলামী রাষ্ট্রের পুনর্জাগরণের পক্ষে যে কোন প্রকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আন্দোলন দমন করতে বহু পদক্ষেপ নিয়েছিল।

এ বছর মুস্তাফা কামাল ঔপনিবেশিক অবিশ্বাসী শক্তির চাপে উসমানী খিলাফত ব্যবস্থা অবলুপ্ত করে তুরস্ককে একটি 'গণতান্ত্রিক' প্রজাতান্ত্রিক (রিপাবলিক) রাষ্ট্রে পরিণত করল। এভাবে সে খিলাফত ধ্বংস করল এবং খিলাফত পুনরাবির্ভাবের অবশিষ্ট ক্ষীণ আশাটিও তিরোহিত হয়ে গেল। একই বছর আল হুসাইন বিন আলীকে হিজাজ থেকে বহিষ্কার করা হল এবং যেহেতু তিনি খিলাফতের প্রতি লক্ষ্য করছিলেন, ফলে তাকে সাইপ্রাসে বন্দী করা হল। একই বছর বৃটিশরা তাদের ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে নিয়ে কায়রোতে অনুষ্ঠিতব্য খিলাফাহ কনফারেন্সের আয়োজন স্থগিত করে এ প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিল। আবার ঐ একই বছর বৃটিশরা ভারতীয় উপমহাদেশে দানা বেঁধে ওঠা খিলাফাহ আন্দোলন দমন করতে সচেষ্ট হল। তারা এ আন্দোলনের লক্ষ্যচ্যুত হওয়া নিশ্চিত করল এবং আন্দোলনটিকে জাতীয়তাবাদী ও গোত্রীয় আন্দোলনে পরিণত করল। ঐ একই বছর ঔপনিবেশিক অবিশ্বাসীদের চাপে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আলেমগণ রাষ্ট্র থেকে দ্বীন পৃথক করার আহ্বান সম্বলিত কিছু প্রবন্ধ রচনা করল। তারা এসব প্রবন্ধে দাবী করল ইসলামে রাষ্ট্র পরিচালনা বা বিচারকার্যের জন্য কোন মূলনীতি নেই, এতে এরূপ কোন শিক্ষাও নেই এবং ইসলাম শুধুমাত্র একটি থিওলজিকাল ধর্ম। এ বছর ও তার পরবর্তী বছর, কিছু কূট-তার্কিক আরব রাষ্ট্রগুলোতে দুটি বিষয়ে ক্রমাগত বিতর্কের অবতারণা করে সকলের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করল। এ দুটি বিষয় হচ্ছে, দুটি লীগের মধ্যে কোনটি উত্তম 'আরব লীগ' না 'ইসলামী লীগ'? পত্রপত্রিকা ম্যগাজিন সমূহ এই বিষয়ের প্রতিই সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করতে লাগল যদিও বা এ দুটি লীগের ধারণার বিপজ্জনক কুফল ছিল এবং এরা উভয়ের অস্তিত্বই ইসলামী রাষ্ট্র পুন:প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ছিল মূর্তিমান প্রতিবন্ধতা। অবিশ্বাসী ঔপনিবেশিকরা প্রকৃত বিষয় অর্থাৎ ইসলামী খিলাফত থেকে নজর সরাবার জন্যই এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছিল। এই পদক্ষেপ সমূহ মুসলিম ভূখন্ডের জনগণের মনোযোগ খিলাফত ও ইসলামী রাষ্ট্র হতে অন্যত্র সরাবার জন্যই নেয়া হয়েছিল।

তাদের দখলদারিত্ব ছাড়াও ঔপনিবেশিক শক্তি তুর্কী তরুণদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের শ্লোগান ছড়িয়ে দিতে শুরু করল। তারা দাবী করল তুরস্কের উপর বিদেশীদের (অ-তুর্কীয়) বিষয়গুলো বোঝার মত চেপে আছে। এটিই হচ্ছে উপযুক্ত সময় যখন তুরস্কের উচিৎ ঐ সব লোকদের ভার নিজেদের উপর ছেড়ে দেয়া। রাজনৈতিক দলগুলোও তুর্কী জাতীয়তাবাদ ছড়িয়ে দেয়ার জন্য কাজ করতে লাগল এবং অ-তুর্কী রাষ্ট্র গুলো থেকে তুরস্কের স্বাধীনতা দাবী করল। অবিশ্বাসীরা একই ধরণের ধারণা আরব তরুণদের মাঝে ছড়িয়ে দিল এবং তাদের মাঝে আরব জাতীয়তাবাদ উস্কে দিল। তারা তুরস্ককে একটি দখলদার বাহিনী হিসাবে আখ্যা দিয়ে আরবদের তাদের হাত থেকে মুক্ত হবার দাবী তুলল। অনুরূপভাবে রাজনৈতিক দলগুলোও আরবদের মাঝে ঐক্য ও আরব স্বাধীনতার দাবীতে সোচ্চার হল। তারা শীঘ্রই ইসলামী ধ্যান ধারণায় যে শুন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল সেখানে স্থান করে নিল। ফলত: তুর্কীরা জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে তাদের স্বাধীনতা লাভ করল এবং আরবরা জাতীয়তাবাদী ভৌগলিক অবস্থানের ভিত্তিতে স্বায়ত্ত শাসনের জন্য কাজ করতে লাগল। জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের ধারণা খুব দ্রুত সমগ্র মুসলিমদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল এবং তারা একসময় এ বিষয়গুলো নিয়ে গর্ব করতে শুরু করল।

ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো এখানেই থেমে থাকেনি। বরং তারা ইসলাম ও ইসলামী শাসন সম্পর্কেও ভ্রান্তিমূলক ধারণা ছড়িয়ে দিতে শুরু করল। তারা খিলাফত কে পোপ ও যাজকীয় শাসন হিসাবে চিহ্নিত করতে লাগল। এটি এমন এক অবস্থায় পৌঁছাল যখন মুসলিমরা খিলাফত ধারণাটি প্রকাশ করতে বা শব্দটি উচ্চারণ করতেই বিব্রতবোধ করতে লাগল। এসময় মুসলিমদের মাঝে অধিকাংশেরই একটি ধারণা জন্মাল যে খিলাফত শব্দটির উচ্চারণ একটি পশ্চাৎপদ বিষয় ও কূপমন্ডুকতা। কাজেই এটি কোন শিক্ষিত মানুষের উচ্চারণ করা শোভা পায়না।

এমনই তীব্র এক জাতীয়তাবাদী অনুভূতির মাঝে অবিশ্বাসীরা (কাফিররা) ইসলামী রাষ্ট্রকে অকার্যকর করেছিল। এটিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত করে স্থানীয় অধিবাসীদের এ বিভক্তি জোরদার করার ব্যাপারে উৎসাহিত করছিল। উসমানী খিলাফত রাষ্ট্র ছোট ছোট কতগুলো রাষ্ট্রে পরিণত হল। এরা হচ্ছে তুরস্ক, মিশর, ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, ফিলিস্তিন, পূর্ব জর্দান, হিজাজ, নজদ এবং ইয়েমেন। এ সকল অঞ্চলের ষড়যন্ত্রকারী কিংবা সদিচ্ছা সম্পন্ন উভয় রাজনীতিবিদগণ প্রতিটি রাষ্ট্রে তাদের স্বাধীনতা দাবী করে কনফারেন্স করতে লাগল। এগুলো ছিল অবিশ্বাসীদের নির্ধারন করে দেয়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর স্বাধীনতার দাবী। এরই ভিত্তিতে তুরস্ক, ইরাক, মিশর, সিরিয়া ইত্যাদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ফিলিস্তিনে ইহুদীদের জন্য একটি জাতীয় মাতৃভূমি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি পরবর্তীতে একটি স্বাধীন পরিচয় প্রাপ্ত হয়। এটি ছিল অবিশ্বাসীদের সৃষ্ট মুসলিম বিশ্বে প্রবেশের একটি রাজনৈতিক সেতুমুখ। এর মাধ্যমে অবিশ্বাসী ঔপনিবেশিকরা তাদের অর্থাৎ ফ্রান্স, বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে মুসলিমদের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে দিতে সক্ষম হল। এটি আজো খিলাফত পূন:প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি বিশাল প্রতিবন্ধকতা হয়ে আছে। এই ভৌগলিক অবস্থান ও সাধারণ দৃশ্যপট এ জন্য সৃষ্টি করা হয় যেন মুসলিমরা কখনোই নিজেদের প্রকৃতার্থে স্বাধীন করতে না পারে।

অবিশ্বাসীরা অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পুঁজিবাদ এবং সরকারী ব্যবস্থায় গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হল। তারা তাদের প্রশাসনিক ও বিচার ব্যবস্থায় পশ্চিমা আইন চালু করল। তারা তাদের সংস্কৃতি ও জীবন সম্পর্কিত ধারনা ছড়িয়ে দিতে লাগল এবং প্রবলভাবে জীবন সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করতে লাগল। ফলে মুসলিমরা পশ্চিমা জীবন পদ্ধতি গ্রহণ করল এবং তা অনুসরণ করতে লাগল। তারা তাদের এ প্রচেষ্টায় সফল হল। তারা মিশরকে সালতানাতে পরিণত করল এবং সংসদীয় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করল। তারা ইরাকেও একটি সংসদীয় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করল। সিরিয়া ও লেবাননকে প্রজাতন্ত্র (রিপাবলিক) এবং পূর্ব জর্দানকে একটি আমিরাত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল এবং ফিলিস্তিনকে বাধ্যতামূলক এমন এক শাসনের অধীনস্থ করা হল যা পরবর্তীতে একটি ইহুদী সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছিল। ফিলিস্তিনের অবশিষ্ট অংশ পূর্ব জর্দানের সাথে যুক্ত করে একটি সংসদীয় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হল। হিজাজ এবং ইয়েমেনে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা হল এবং তুরস্কে রাষ্ট্রপতি শাসিত প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করা হল। আফগানিস্তানে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। ঔপনিবেশিক কাফিররা (অবিশ্বাসীরা) ইরানে তার সাম্রাজ্য ব্যবস্থা বজায় রাখতে উৎসাহিত করল এবং ভারতে তাদের ঔপনিবেশিক শাসন বজায় রাখল। পরবর্তীতে ভারত ভেঙ্গে দুটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ঔপনিবেশিক অবিশ্বাসীরা মুসলিমদের উপর তাদের ব্যবস্থা চাপিয়ে দিতে সক্ষম হল এবং এর মাধ্যমে খিলাফত পূণঃপ্রতিষ্ঠার ধারণাটি ধীরে ধীরে জনগণের মন থেকে মুছে ফেলা হল।

এছাড়াও, প্রতিটি স্থানীয় সম্প্রদায়কে অবিশ্বাসীদের ব্যবস্থা আকড়ে ধরতে উৎসাহিত করা হল। তারা মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্র সমূহ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কাজ করতে লাগল। এভাবে একজন ইরাকী মিশরে এসে হয়ে গেল একজন বিদেশী। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার জনকদের চাইতে এসকল ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের শাসকবৃন্দ পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রক্ষায় বেশী আগ্রহী হয়ে উঠল। তারা হয়ে গেল ঔপনিবেশিক কাফিরদের প্রতিনিধি, তাদের দেয়া ব্যবস্থার দেখাশোনা করা ও তা সংরক্ষণ করাই হয়ে উঠল তাদের প্রধান কাজ।

ঔপনিবেশিক কাফির শক্তি মুসলিম ভূখন্ডগুলোতে প্রত্যক্ষভাবে পশ্চিমা আইন কানুন প্রয়োগ করতে লাগল। অতীতে তারা এসকল আইন মুসলিম বিশ্বে তাদের সহযোগীদের মাধ্যমে করা চেষ্টা করেছিল। অবিশ্বাসীরা ১৯শ শতকের প্রথমভাগে পশ্চিমা আইন বাস্তবায়নের চেষ্টা নিয়েছিল। তারা মিশরের জনগণকে ফরাসী দেওয়ানী আইন প্রয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করতে লাগল, যাতে করে তারা শরীয়াহ আইনকে প্রতিস্থাপিত করতে পারে। এ বিষয়ে সফল হবার পর তারা ১৮৮৩ সালে মিশরে ফরাসী বিচার ব্যবস্থা চালু করতে শুরু করল। পুরনো ফরাসী দেওয়ানী আইনগুলো অনুবাদ করে কার্যকর করা হল। এটি হল মিশরের নতুন ব্যবস্থা যা আদালত থেকে শরীয়াহকে প্রতিস্থাপিত করল। উসমানী খিলাফত রাষ্ট্রে ১৮৫৬ সালে পশ্চিমা আইন প্রবেশ করবার লক্ষ্যে একই ধরণের একটি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। অবশ্য এ কাজটি মিশরের মত সহজে হলনা, কারণ খিলাফত ব্যবস্থার ভিত্তি তখনো উসমানী রাষ্ট্রগুলোতে ছিল।

অবিশ্বাসীদের ক্রমাগত প্রচেষ্টার ফলে এবং তাদের দোসরদের সহযোগিতায় ফৌজদারী আইন ও নব্য অনৈসলামিক বিধি ও বানিজ্যিক আইন প্রবর্তন করতে সক্ষম হল। এটি করা হয়েছিল একটি ফতোয়ার মাধ্যমে যেখানে বলা হয়েছিল এধরনের কুফর আইন ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। আইন লিপিবদ্ধকরণের ধারণাটি শিকড় বিস্তার করতে শুরু করে এবং আল মাজাল্লা code আইন হিসাবে গ্রহণ করে। আল মাজাল্লা হচ্ছে ১৮৬৮ সালে জারিকৃত বিধি যা বহু মাজহাবের দুর্বল মতানুসারে আইন হিসাবে গৃহীত হয় যেখানে পারিপার্শ্বিকতা যুক্তিগ্রাহ্য করার চেষ্টা করা হয়েছে। আল মাজাল্লাকে আইন হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হ'ল। আদালত ব্যবস্থাকে দুটি ভাগে ভাগ করা হ'ল, ১. শরীয়াহ আদালত যেখানে শরীয়াহ আইন অনুসরণ করা হবে, এবং ২. দেওয়ানী আদালত যা প্রথমত পশ্চিমা আইন দ্বারা পরিচালিত হবে, যে পশ্চিমা আইনগুলো আবার একটি ফতোয়ার মাধ্যমে বৈধ করা হবে এবং দ্বিতীয়ত শরীয়াহ আইন, যেগুলো পশ্চিমা প্রক্রিয়ার অনুকরণে আইন হিসাবে গৃহীত হবে। এ সব পদক্ষেপ ছিল আইনের ক্ষেত্রে। অনুরূপভাবে সংবিধানের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের জন্য নতুন একটি সংবিধান রচনার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হল। এক্ষেত্রে ফরাসী সংবিধানকে উৎস হিসাবে গ্রহণ করা হল। এ প্রচেষ্টাটি নতুন আইন প্রবর্তনের পদক্ষেপ গুলোর সাথে জুড়ে দেয়া হল। ১৮৭৮ সালে এ পদক্ষেপ প্রায় সফল হতে চলেছিল কিন্তু মুসলিমদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে তা স্থগিত হয়ে যায়। অবশ্য ঔপনিবেশিক অবিশ্বাসীদের অব্যহত প্রচেষ্টায় এবং তাদের সহযোগী ও তাদের সংস্কৃতিতে মুগ্ধ হওয়া ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় তারা পুনরায় নতুন সংবিধান রচনার আন্দোলনটি শুরু করল এবং এবার তাতে সফল হল। ১৯০৮ সালে এ সংবিধান ও তার নতুন আইন বাস্তবায়িত হল। আরব ব-দ্বীপ ও আফগানিস্তান* ছাড়া প্রতিটি মুসলিম ভূখন্ড সরাসরি পশ্চিমা আইন দ্বারা পরিচালিত হতে থাকল। (*এটি মূল বই প্রকাশিত হবার সময় অর্থাৎ ১৯৫২ সাল পর্যন্ত সত্য ছিল, কিন্তু বর্তমানে প্রতিটি মুসলিম ভূখন্ডই পশ্চিমা আইন দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে - অনুবাদক)। এভাবে শরীয়াহ আইনকে বর্জন করা হল যার অর্থ হচ্ছে কুফর শাসন বলবৎ হল ও ইসলামী শাসন বর্জিত হল।

মুসলিমদের উপর কুফর শাসনকে শক্তিশালী করার পেছনে যে বিষয়টি কাজ করেছে তা হচ্ছে ঔপনিবেশিকদের চাতুর্যের সাথে গৃহীত ইসলামী রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থাকে পরিবর্তন করার পদক্ষেপটি। তারা মুসলিমদের জন্য একটি নতুন শিক্ষা কার্যক্রম পরিকল্পনা করেছিল। এ শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ্যসূচীর মূল লক্ষ্য ছিল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে এক একটি পশ্চিমা ব্যক্তিত্বে পরিণত করা। অর্থাৎ এমন এক ব্যক্তিত্বে পরিণত করা যার জীবনের প্রতি থাকবে পুঁজিবাদী ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী। এ কার্যক্রম এখন পর্যন্ত সকল মুসলিম ভূখন্ড এবং এমন কি তাদের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতেও কার্যকর রয়েছে। যার ফলে আমরা বহু শিক্ষক পাই যারা এ শিক্ষা কার্যক্রমকে রক্ষা করতে ব্যস্ত। তারা প্রভাবশালী পদগুলো গ্রহণ করে এবং কাফিরদের ইচ্ছা বাস্তবায়ন করে। শিক্ষা নীতিটি মূলত দুটি মূলনীতির ভিত্তিতে তৈরী করা হয়েছিল।

প্রথম মূলনীতিটি হচ্ছে, শাসন কার্য থেকে দ্বীনকে পৃথক করে দেয়া যার পরিণতিতে স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্র থেকে দ্বীনকে পৃথক হবে। এ পদক্ষেপটি আরো একটি বিষয় নিশ্চিত করে, তা হচ্ছে তরুণ মুসলিমরা ভবিষ্যতে ইসলামী রাষ্ট্র পূনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করবেনা। কারণ এটি (ইসলামী রাষ্ট্র পূনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই), সে যে শিক্ষা লাভ করেছে তার মৌলিক বিষয়ের সাথেই সাংঘর্ষিক।

দ্বিতীয় মূলনীতি হচ্ছে ঔপনিবেশিক কাফিরদের ব্যক্তিত্বকে তরুণ মুসলিমদের জন্য অনুকরণীয় করা। এটি তাদের মনকে কুফর সংস্কৃতি ও তথ্য দ্বারা পূর্ণ করে রাখতে সহায়ক হবে। এ ধরণের পদক্ষেপ কাফির প্রতি সম্মান জানাতে শেখাবে। এটি তাকে, ঔপনিবেশিক কাফির হওয়া সত্ত্বেও তাদের মহিমামন্ডিত করতে, অনুকরণ করতে ও বন্ধু হতে উদ্বুদ্ধ করবে। এটি তাদের মুসলিমদের অশ্রদ্ধা ও হেয় করতে শেখাবে এবং তাদের থেকে দুরে থাকতে সাহায্য করবে। এ ধরণের অনুভূতি তাদের পক্ষ থেকে কিছু শিখতে বা গ্রহণ করতে নিরূৎসাহিত করবে এবং স্বাভাবিকভাবেই ইসলামী রাষ্ট্র পূনঃপ্রতিষ্ঠার লড়াই থেকে দুরে ঠেলে দেবে।

ঔপনিবেশিকরা বুঝতে পেরেছিল যে তাদের পরিকল্পিত ও নিবিড় তত্ত্বাবধানে প্রণীত স্কুলের পাঠ্যসূচীই যথেষ্ট নয়। তারা আরো অগ্রসর হয়ে ঔপনিবেশিক মূলনীতির উপর ভিত্তি করে মিশনারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করল। এর সাথে যোগ হল সংস্কৃতিক কেন্দ্র সমূহ যাদের প্রধান কাজ ছিল বিভ্রান্তিকর রাজনৈতিক ধারণা ছড়িয়ে দেয়া। ফলাফল স্বরূপ এধরণের শিক্ষা কেন্দ্রসমূহের শিক্ষার পরিবেশ উম্মাহকে এমন এক সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত করে তুলল যা তাদের ইসলামী রাষ্ট্র পূনঃপ্রতিষ্ঠার চিন্তা হতে দুরে সরিয়ে দিল এবং একাজে নিয়োজিত হওয়ায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল।

জীবন থেকে দ্বীনকে পৃথক করার ধারণাটি বুদ্ধিজীবিদের মাঝে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ল। সমাজের বাকীদের নিকট এটিকে প্রচার করা হল এভাবে যে এটি হচ্ছে রাজনীতি কিংবা দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কাজগুলো থেকে ধর্মের পৃথকীকরণ। ফলাফল স্বরূপ কিছু বুদ্ধিজীবি দাবী করল যে মুসলিমদের অবনতির কারণ হচ্ছে দ্বীনের সাথে তাদের সম্পৃক্ততা এবং জাতীয়তাবাদই হচ্ছে পূনর্জাগরণের একমাত্র পথ। অন্য একদল বুদ্ধিজীবির মতে মুসলিমদের অধঃপতনের জন্য তাদের নৈতিক অবক্ষয় দায়ী। প্রথম দলের ধারণা অনুযায়ী জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল গঠিত হল এবং দাবী করা হল তাদের ইসলামী ভিত্তি রয়েছে। এটি আসলে ছিল ঔপনিবেশিকদের একটি চাল মাত্র। অপরদিকে নৈতিকতার ভিত্তিতে বেশ কিছু দল গঠিত হ'ল যারা ধর্ম প্রচার করা ও আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনা নিয়ে ব্যস্ত থাকল। এরা স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের নৈতিকতার উৎকর্ষতা নিয়ে কাজ করতে লাগল কিন্তু রাজনীতিতে জড়ানো থেকে বিরত থাকল। এ ধরণের দলগুলোই ইসলামী রাষ্ট্র পূর্ণপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসাবে কার্যকর ভূমিকা রাখল। তারা মুসলিমদের মনকে অন্যত্র সরিয়ে দিল। এছাড়াও এ দলগুলো তৈরী করা হয়েছিল ঔপনিবেশিক ভিত্তির উপর দাড় করিয়ে যা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। এবং একারণেই তারা ইসলামী রাষ্ট্রের পূণঃপ্রতিষ্ঠায় সবসময় বাঁধা সৃষ্টি করে এসেছে।

গৃহীত নতুন রাজনৈতিক কার্যক্রম রক্ষা করতে নতুন নতুন আইন পাশ করা হতে লাগল। কিছু আইন করা হল যার মাধ্যমে ইসলামী দল গঠন ও আন্দোলন নিষিদ্ধ করা হল। আর কিছু আইন ও উপধারা তৈরী করা হল যেখানে দলগুলোর উপর তথাকথিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়া হল এবং বলা হল তাদের দলের সদস্যপদ কোন বিশেষ ধর্মাবলম্বী বা গোত্রের জন্য সীমাবদ্ধ রাখতে পারবেনা। এর অর্থ হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র পূনর্জন্মের জন্য মুসলিম ভূখন্ডে ইসলামী দল গঠন আইনের পরিপন্থী। মুসলিমদের দাতব্য সংস্থা ও অনুরূপ সংগঠন ছাড়া আর কোন দল গঠনের অধিকার থাকল না। ইসলামের ভিত্তিতে রাজনীতি করা তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হল। কোন কোন আইন করে বলা হল ইসলামী দল গঠন হচ্ছে মারাত্মক শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ বিধিমালার অধীনে মুসলিম বিশ্বে যে রাজনৈতিক কার্যক্রম গৃহীত হল তার মূল লক্ষ্য হল ইসলামী রাষ্ট্রের (খিলাফত) পূণর্গঠনকে প্রতিহত করা।

ঔপনিবেশিকরা এখানেই থেমে থাকল না। বরং তারা ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কে চিন্তা থেকে মনোযোগ বিচ্ছিন্ন করে রাখার লক্ষ্যে মুসলিমদের ক্ষুদ্র ও গুরুত্বহীন বিষয়ে ব্যস্ত করে রাখল। তারা এমন ইসলামী কনফারেন্স আয়োজন করতে উৎসাহিত করতে লাগল যা প্রকৃত কাজ অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে ইসলামী জীবন যাপন করার আহ্বান থেকে মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে রাখে। এধরণের কনফারেন্স মুসলিমদের হতাশা ও ইসলামী আবেগকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার একটি নিরাপদ রাস্তা হিসাবে কাজ করতে লাগল। এসকল কনফারেন্সে সিদ্ধান্ত হবে, পত্র পত্রিকায় ছাপা হবে, রেডিও টিভিতে প্রচারিত হবে, কিন্তু কখনোই তা বাস্তবায়িত হবেনা।

লেখক ও বক্তাদের উৎসাহিত করা হল ইসলামী রাষ্ট্রকে (খিলাফত) একটি হুমকি হিসাবে জনসমক্ষে প্রচার করার জন্য। তারা এ ধারণা প্রচার করতে লাগল যে ইসলামে কোন বিচার ব্যবস্থা নেই। ভাড়া করা মুসলিমদের দিয়ে ঔপনিবেশিকদের এ সকল মতবাদ সম্বলিত বহু বই পুস্তক, প্রবন্ধ, রচনা লেখা হল। এর লক্ষ্য ছিল মুসলিমদের আরো বিপথগামী করা এবং তাদের দ্বীন থেকে আরো দুরে সরিয়ে দেয়া এবং দ্বীন অনুযায়ী ইসলামী জীবন যাপন করার আহ্বানে সাড়া দিয়ে কাজ করা থেকে বিরত রাখা।

ইসলামী রাষ্ট্রকে (খিলাফত) ধ্বংস করার পর থেকে ঔপনিবেশিকরা ইসলামী রাষ্ট্র পূণর্গঠনের প্রতিটি পদক্ষেপে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে এবং করছে। তারা পৃথিবীর বুক থেকে ইসলামী রাষ্ট্র ধ্বংস করে দেয়ার পর এর পূনঃপ্রতিষ্ঠার সকল প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করার জন্য তাদের প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করেছে।

## উপেক্ষিত দায়িত্বঃ

ইসলামী রাষ্ট্র (খিলাফত) এর কাঠামো সাতটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিতঃ খলিফাহ, তার সহকারী, জিহাদের অধিনায়ক (আমিরুল জিহাদ), বিচার ব্যবস্থা, উলা, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, এবং মজলিস উল উম্মাহ। ইসলামী রাষ্ট্রের কাঠামো সম্পূর্ণ হয় যদি এ সাতটি উপাদান বিদ্যমান থাকে। এ উপাদান গুলোর কোন একটি অনুপস্থিত থাকলে রাষ্ট্রীয় কাঠামোটি অসম্পূর্ণ থাকে কিন্তু রাষ্ট্রটি ইসলামী রাষ্ট্র হিসাবে কার্যকর থাকে। এ উপাদান গুলোতে কোন ত্রুটি কিংবা কমতি এর অবস্থানকে পাল্টে দেয়না, যদি বাস্তব সম্মত একজন খলিফা থাকে, কারণ তিনিই রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি। ইসলামী শাসন ব্যবস্থার চারটি মূলনীতি রয়েছে। এগুলো হচ্ছে,

১. সার্বভৌমত্ব শরীয়াহ'র।
২. কর্তৃত্ব উম্মাহর।
৩. একজন খলিফার নিয়োগ।
৪. খলিফার শরিয়াহ আইন গ্রহন করা ও তা আইন হিসাবে প্রয়োগের অধিকার।

যদি এ মূলনীতি গুলোর কোন একটি অনুপস্থিত থাকে তবে সেই শাসন ব্যবস্থাটি অনৈসলামিক হয়ে পড়ে। কাজে এ চারটি মূলনীতি বলবৎ রাখা আবশ্যক। ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি হচ্ছে খলিফা, এবং অন্যান্যরা তার সহকারী বা উপদেষ্টা, ইসলামী রাষ্ট্র হচ্ছে খলিফা যিনি ইসলাম বাস্তবায়ন করেন এবং খলিফাহর কার্যালয় বা ইমামাহ হচ্ছে মুসলিমদের সকল বিষয়ের মীমাংসা করার অধিকার সংরক্ষণ করা। এ বিষয়গুলো ইসলামের মূলবিশ্বাস (আক্বীদা) এর অংশ নয় বরং শরীয়াহ আইনের অংশ, কারণ এটি মানব আচরণের শাখা বিশেষ।

খলিফাহর নিয়োগদান মুসলিমদের উপর একটি বাধ্যবাধকতা। মুসলিমদের দুই রাতের অধিক বাইয়াত ছাড়া থাকার অনুমতি নেই। যদি তারা তিন দিনের মধ্যে এক খলিফার নিয়োগ দিতে না পারে তবে খলিফা নিয়োগপ্রাপ্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত তারা সকলেই গুনাহগার হবে। অবশ্য যদি তারা খলিফা নিয়োগ দেবার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করে ও অব্যহত ভাবে সে লক্ষ্যে কাজ করে যেতে থাকে তবে তারা গুনাহের অংশীদার হবেনা ।

খলিফাহ নিয়োগের বাধ্যবাধকতার বিষয়টি কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবাদের ঐকমত্য থেকে প্রমাণিত।

আল্লাহ সুবহানুওয়াতা'লা রাসুল (সঃ) কে সন্দেহাতীতভাবে আদেশ করেছেন যাতে করে তিনি মুসলিমদের আল্লাহ যা কিছু নাযিল করেছেন তার দ্বারা শাসন করেন।

***"অতএব আল্লাহ যা কিছু নাযিল করেছেন তার মাধ্যমে আপনি তাদের মধ্যে বিচার ফয়সাj¨v K‡ib Ges Zv‡`i Amvi †LqvjLkxi AbmiY Ki‡eb bv|Ó (Avj gwq `v 5:48)***

***"এবং আল্লাহ যা কিছু নাযিল করেছেন তার মাধ্যমে আপনি তাদের মধ্যে বিচার ফয়সালা করেন এবং তাদের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করবেন না।" (Avj gwq `v 5:49)***

রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর প্রতি যে কোন প্রত্যক্ষ আদেশ, যদি অন্য কোন প্রত্যক্ষ দলীলের মাধ্যমে শুধুমাত্র তার জন্য সীমাবদ্ধ করার প্রমাণ না পাওয়া যায়, তবে তা সমগ্র উম্মাহর প্রতি আদেশ হিসাবে পরিগণিত হয়। যেহেতু উপরোক্ত আয়াতগুলো শুধুমাত্র রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর জন্য সীমাবদ্ধ করার কোন প্রত্যক্ষ দলীল পাওয়া যায়না, কাজেই ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করা প্রতিটি মুসলিমের জন্য অত্যাবশ্যক। আর খিলাফত প্রতিষ্ঠা করাই ইসলামী শাসনের প্রতিষ্ঠা।

সুন্নাহ থেকে আমরা পাই যে রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "যে কেউ তার সময়ের ইমামকে জানা ব্যতিরেকে মৃত্যু বরণ করল, সে যেন জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু বরণ করল।" আহমাদ এবং আত তাবারানী, মুওয়াবিয়া (রাঃ) সূত্রে প্রাপ্ত একটি হাদীস থেকে বর্ণনা করেন, 'রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "যে কেউ বাইয়াত ছাড়া মৃত্যু বরণ করল, সে যেন জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু বরণ করল।" ইমাম মুসলিম তার সহীহ গ্রন্থে ইবনে উমার এর সূত্রে বলেন, "যে কেউ আল্লাহর প্রতি আনুগত্য থেকে তার হাত সরিয়ে নিল, আল্লাহ পুনরুত্থান দিবসে তার সাথে (ঈমানের) কোন প্রমাণ ব্যতিরেকে সাক্ষাৎ করবেন, এবং যে কেউ বাইয়াত ছাড়া মৃত্যু বরণ করল, সে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু বরণ করল।" আবুহুরায়রা (রাঃ) থেকে আবু সালিহ থেকে উরওয়া সূত্রে হিশাম বর্ণনা করেছেন, 'রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "আমার পর তোমাদের দায়িত্ব নেবেন সত্যাশ্রয়ী নেতৃবৃন্দ, যেখানে মুত্তাকীরা তার তাক্বওয়ার মাধ্যমে নেতৃত্ব দেবেন, এবং ফাসিক ব্যক্তি তাদের ফাসিকীর মাধ্যমে তোমাদের নেতৃত্ব দেবে, কাজেই তোমরা তাদের কথা শুনবে এবং যা সত্য তা মেনে চলবে। যদি তারা সঠিক কাজ করে থাকে তবে তোমরা লাভবান হবে আর যদি ভুল করে তবে তা তোমাদের পক্ষে ও তাদের বিরুদ্ধে যাবে।"

সাহাবাদের ইজমা এর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, রাসুলুল্লাহ (স:) এর ইন্তেকালের পর তারা খলিফা নিয়োগ দেয়ার ব্যাপারটি সর্বাগ্রে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বনু সায়দার আঙিনায় সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কিত দুটি সহীহ হাদীস ও পরবর্তী প্রতিটি খলিফার মৃত্যুর পর সাহাবাদের সিদ্ধান্ত ও কাজের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়। খলিফা নিয়োগের বাধ্যবাধকতার বিষয়ে সাহাবাদের ঐকমত্যের বিষয়টি খবর মুতাওয়াতির (ধারাবাহিক বর্ণনা) হিসাবে প্রচারিত হয়েছে। সাহাবাগণ ঐকমত্যে পৌঁছেছিলেন যে এটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফরজ। এটি একটি সুনির্দিষ্ট প্রমাণ হিসাবে বিবেচিত হয়। তাওয়াতুরের (ধারাবাহিক বিবরণী) মাধ্যমে এটিও প্রমাণিত হয় যে উম্মাহ'র কখনোই খলিফা বিহীন অবস্থায় থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। গোটা উম্মাহ'র উপর একজন খলিফা নিয়োগ করা অর্থাৎ তার কর্মক্ষেত্র (কার্যালয়) প্রতিষ্ঠা অথবা রাষ্ট্রপরিচালনার ব্যবস্থা করা বাধ্যতামূলক। এ আদেশটি পুরো উম্মাহর জন্য প্রযোজ্য। এটি রাসুলুল্লাহ (স:) এর ইন্তেকালের পরমূহুর্ত থেকে শুরু হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত অব্যহত থাকবে।

সাহাবাদের নিকট খলিফা নির্বাচনের গুরুত্ব ও এ সম্পর্কে সচেতনতা কতটুকু মাত্রায় ছিল তা রাসুলুল্লাহ (স:) এর ইন্তিকালের পর তাদের কাজের মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তারা একজন খলিফা নিয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত রাসুলুল্লাহ (স:) এর দাফন বিলম্বিত করেছেন। পরবর্তীতে যখন খলিফা উমার বিন খাত্তাব (রা:) ছুরিকাহত হন এবং মৃত্য যন্ত্রনায় ছটফট করছিলেন তখন তার নিকট মুসলিমরা পরবর্তী খলিফা মনোনীত করে দেবার অনুরোধ করেন। প্রথমে তিনি এটি অস্বীকার করেন, কিন্তু যখন তারা এব্যাপারে অব্যাহত ভাবে অনুরোধ করতে লাগল, তখন ছয়জন প্রার্থীকে মনোনীত করেন যাদের মধ্য থেকে পরবর্তী খলিফাহ নির্বাচিত হবে। তিনি তাদের জন্য তিন দিনের একটি সময়সীমা বেঁধে দিলেন। তিনি আরো বললেন যদি তারা তিন দিনের মধ্যে কোন সিদ্ধান্তে আসতে না পারে, তবে যে ব্যক্তি এর বিরুদ্ধাচারণ করবে তাকে যেন হত্যা করে ফেলা হয়। বস্তুত তিনি ঐ ছয় জনের মধ্য থেকে বিরুদ্ধাচারী যে কাউকে হত্যা করার আদেশ দেন যাদের প্রত্যেকেই ছিল শুরার সদস্য এবং বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবা। এ ছয় ব্যক্তি ছিলেন যথাক্রমে, আলী (রা:), উসমান (রা:), আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা:), আল যুবায়র বিন আল আউয়াম (রা:), তালহা বিন উবায়দুল্লাহ (রা:) এবং সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা:)। যদি তারা নির্ধারিত সময়ে একজন খলিফা নির্বাচন করতে না পারতেন এ সাহাবীদের মধ্য থেকে যে কেউ একজন নিহত হতেন। এ বিষয়টি থেকে বিস্ময়কর ভাবে স্পষ্ট হয়ে যায় যে খলিফা নিয়োগ করা বাধ্যতামূলক।

এছাড়াও বহু শরঈ দায়িত্ব খলিফার উপস্থিতির উপর নির্ভরশীল। যেমন ইসলামী শাসন বাস্তবায়ন, দন্ডবিধির বাস্তবায়ন, সীমানা প্রতিরক্ষা, সমাজকে শিক্ষিত করা, সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সজ্জিত করা, বিতর্ক মীমাংসা করা, আইন শৃংখলা বজায় রাখা, অন্যান্য বিষয়ে লক্ষ্য রাখা এবং ব্যক্তিগত কিংবা সমষ্টিগত অর্থনৈতিক ও সামাজিক লেনদেনের বিষয় সমূহ ইত্যাদি। এভাবেই একজন খলিফা নিয়োগ করা বাধ্যতামূলক।

খলিফার পদ গ্রহন করতে চাওয়ার ইচ্ছা এবং এর জন্য প্রতিদ্বন্দ্বীতা করা অবাঞ্ছিত কোন বিষয় নয়। বনু সাকিফায় পদের জন্য সাহাবাগণ ও শুরার সদস্যগণ খলিফা হবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেছেন। Nobody condemned or disowned this action. On the contrary the general ijma of the Sahabah regarding the competition for the post of Khaleefah is clearly established. এথেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে খলিফা'র পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বীতা করা আইন সম্মত ও গ্রহনযোগ্য।

মুসলিমদের জন্য একাধিক খলিফা নির্বাচন নিষিদ্ধ। আবু সাঈদ আল খুদরী (রা:) এর সূত্রে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন, 'রাসুলুল্লাহ (স:) বলেন, "যদি দুজন খলিফার জন্য বাইয়াত নেয়া হয় তবে পরবর্তী জনকে হত্যা করে ফেল।" অপর একটি হাদীসে রাসুলুল্লাহ (স:) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ইমামকে হাতের উপর হাত রেখে এবং আন্তরিক ভাবে বাইয়াত দিয়েছে, সে তাকে অনুসরণ করবে যতক্ষণ সম্ভব, যদি অপর কোন ব্যক্তি এ বিষয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করতে আসে তবে সে ব্যক্তির ধড় থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেল।" অন্য একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, "...সে যেই হোক তরবারীর আঘাতে তার মস্তক ছিন্ন করে দাও... ।" তাকে হত্যার বিষয়টি তখনই বাস্তবায়ন করা যেতে পারে যখন সে এথেকে বিরত না হয় কিংবা মানতে অস্বীকার করে। যদি এমন একটি গোষ্ঠী পাওয়া যায় যাদের সকলেই খলিফা হবার ও বাইয়াত গ্রহনের উপযুক্ত তবে যার পক্ষে অধিকাংশ মুসলিম মত দেবেন, তিনিই হবেন খলিফা। যে ব্যক্তি সংখ্যাগরিষ্ঠতা কে অস্বীকার করবে সে বিদ্রোহী হিসাবে পরিগণিত হবে। এটি বলবৎ হবে যদি মনোনীত ব্যক্তিবর্গ সশরীরে একত্রিত হ'ন। কিন্তু যদি এমন এক ব্যক্তি খলিফা নির্বাচিত হন যার খলিফা হবার সকল গুনাবলী বিদ্যমান এবং অধিকাংশ মুসলিম অন্য কোন ব্যক্তিকে বাইয়াত দেয় তবে প্রথম ব্যক্তি খলিফা হবেন এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রত্যাখ্যাত হবেন।

খলিফা হবার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা হচ্ছে, ইসলাম, পুরুষত্ব, স্বাধীন, যোগ্য, পরিণত, সুস্থ এবং ন্যায়পরায়ন। অর্থাৎ প্রার্থীকে হতে হবে মুসলিম, পুরুষ, পরিণত, সুস্থ প্রকৃতস্থ, স্বাধীন, যোগ্য এবং ন্যয়পরায়ণ। মুসলিম হবার শর্ত বাধ্যবাধকতার পক্ষে আল্লাহ সুবহানুওয়াতা'লা বলেছেন, *0এবং কখনোই আল্লাহ একজন অবিশ্বাসী কে বিশ্বাসীদের উপর বিজয় দেবেন না।" (আন নিসা ৪:১৪১)*

খলিফা একজন পুরুষ হবার শর্তটি রাসুলুল্লাহ (স:) এর হাদীস থেকে প্রমাণিত। তিনি (সা:) বলেন, "একটি জাতি কখনোই সফল হতে পারেনা যদি তাদের নেতা একজন মহিলা হয়।" পরিণত ও প্রকৃতস্থ হবার শর্তটি অবশ্যই পুরণ করতে হবে কারণ একজন অপ্রকৃতস্থ ও অপ্রাপ্ত বয়স্কের দেখা শোনা ও পরিচর্যার জন্য একজন অভিভাবকের প্রয়োজন হয়। কাজেই কেউ যদি তার নিজের বিষয়গুলোই যথার্থ ভাবে সম্পন্ন করতে না

পারে, সে অবশ্যই অন্যের বিষয়গুলো সঠিক ভাবে পরিচালনা করতে পারবেনা। তাকে ন্যয়পরায়ন হতে হবে, কারণ খলিফা'র কাজ হচ্ছে দ্বীনের বিধান বাস্তবায়ন করা। সে যদি নিজের উপর তা প্রয়োগ করতে না পারে তবে তার অন্যের উপর তা প্রয়োগ করার ব্যাপারে খুব একটা আস্থাশীল হওয়া যায়না। কারণ একজনের কাছে যা নেই তা সে কখনোই অন্যকে দিতে পারেনা। ন্যয়পরায়ণতা এমন এক শর্ত যা অবশ্যই পূরণ করতে হবে অন্যথায় সে একজন ফাসিক হয়ে যাবে। এবং অবশ্যই একজন ফাসিক ব্যক্তি খলিফা হবার ক্ষেত্রে অযোগ্য বিবেচিত হবেন এবং সে তার পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেননা। বিশ্বস্ততা একটি শর্ত যা চুক্তিতে লিপিবদ্ধ থাকবে এবং যা সর্বদা পালন করতে হবে।

স্বাধীন হবার শর্তের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি লক্ষ্যণীয় তা হচ্ছে একজন দাসের নিজের উপরই কর্তৃত্ব বা অধিকার নেই, কাজেই তার অন্যের উপর কর্তৃত্ব থাকার প্রশ্নই উঠেনা। যোগ্য হবার বিষয়টিও প্রয়োজনীয় শর্তের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত কারণ কোন ব্যক্তিকে তার যোগ্যতার অধিক কোন কাজ করতে বলার বিষয়টিই অবাস্তব ও অবান্তর। এর মাধ্যমে আইন প্রনয়নের বিষয়টি উপেক্ষিত হয় এবং জনগণকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। কাজেই এটি অনুমোদিত নয়।

এসকল শর্তাবলী খলিফা পদের জন্য নির্ধারিত এছাড়াও অন্যান্য যে সকল শর্তাবলীর কথা আলেমগণ উল্লেখ করেছেন তা হচ্ছে সাহসিকতা, জ্ঞান এবং কুরাইশ বংশীয় হওয়া কিংবা ফাতিমা (রাঃ) এর বংশদ্ভূত হওয়া। এগুলো খিলাফতের জন্য অত্যাবশ্যকীয় শর্ত নয়। এবং এ দাবীগুলো কোন জোরালো প্রমান বা দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়নি। কাজেই এগুলো অত্যাবশ্যকীয় শর্ত হিসাবে পরিগণিত নয়। যে কোন মুসলিম পুরুষ যে পরিণত, প্রকৃতস্থ, বিশ্বস্ত, স্বাধীন এবং যোগ্য, তিনি খলিফা হবার জন্য অন্য মুসলিমদের বাইয়াত প্রদানের উপযুক্ত। এছাড়া অন্য কোন শর্ত জরুরী নয় কিংবা নতুন করে ধার্য করারও প্রয়োজন নেই।

ইসলামী রাষ্ট্র (খিলাফত) পূনঃপ্রতিষ্ঠা সকল মুসলিমের জন্য একটি আবশ্যকীয় কর্তব্য, কারণ এটি সুন্নাহ এবং সাহাবাদের ঐকমত্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। মুসলিমদের জন্য ইসলামী মাতৃভূমিতে বসবাস করা ও ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকত্ব গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে তা অর্জন করা সম্ভব নয়। কাজেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োজিত না করা পর্যন্ত মুসলিমরা গুনাহগার হতে থাকবে। কারণ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই তারা একজন খলিফা নির্বাচন করতে পারবে যিনি ইসলাম বাস্তবায়ন করবেন এবং ইসলামের বার্তা গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে থাকবেন।

## ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতাঃ

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কোনভাবেই একটি সহজ ও সরল কাজ নয়। ইসলামী রাষ্ট্র পূনঃপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কতগুলো বিশাল প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যেগুলোকে প্রথমে ভাঙ্গতে ও অপসারণ করতে হবে। ইসলামী জীবনধারা পুনঃগ্রহণের পথে কতগুলো প্রধান সমস্যা রয়েছে যেগুলো সমাধান করতে হবে। কারণ এটি শুধুমাত্র একটি রাষ্ট্রের অস্তিত্বের প্রশ্ন কিংবা নামে মাত্র কোন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা নয়, বরং এটি হচ্ছে এমন একটি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা যা ইসলামকে একটি ব্যবস্থা হিসাবে বাস্তবায়ন করবে যে ব্যবস্থাটি ইসলামী আকীদা হতে উদ্ভূত। এটি এমন একটি রাষ্ট্র যা ইসলামকে শরীয়াহ আইন অনুযায়ী বাস্তবায়িত করবে কারণ এ আইন আল্লাহ সুবহানুওয়াতা'লা কর্তৃক প্রদত্ত। এভাবে ইসলামী জীবনধারা প্রাথমিক ভাবে নিজরাষ্ট্রে পুনঃগৃহীত হবে এবং পরবর্তীতে সমগ্র বিশ্বের মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছে দেয়া হবে।

ইসলামী রাষ্ট্র ইসলামী আকীদার ভিত্তিতে উদ্ভূত ধারণা ও আবেগের ভিত্তিতে গঠিত হওয়া প্রয়োজন। ইসলামী চিন্তা ও যৌক্তিকতায় লালিত এবং ইসলামী আদর্শ ও পদ্ধতি দ্বারা গঠিত ইসলামী মানসিকতা সমাজের নাগরিকদের মাঝে বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন। শরীয়াহ আকড়ে থাকার উৎসাহ আসতে হবে নিজের ভেতর থেকে। এ ইসলামী আচরণ মানুষের দ্বারা স্বেচ্ছায়, উৎসাহী ও শান্তিপ্রিয় মনে ইসলামী ব্যবস্থা ও এর আইন বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

ইসলামী রাষ্ট্রের উম্মাহ ও শাসকবর্গ উভয় ক্ষেত্রেই ইসলামিক হতে হবে। এটি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামীক হবে যা ইসলামী জীবনধারার পূনঃগ্রহনকে এমনভাবে নিশ্চিত করবে যেন সে সমগ্র বিশ্বে ইসলামের দাওয়াত পৌছে দিতে সক্ষম হয়। এতে পর্যায়ক্রমে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিম নাগরিকগণ ইসলামী আলোকছটা অবলোকন করতে পারবে এবং দলে দলে আল্লাহ সুবহানুওয়াতালা'র দ্বীনে প্রবেশ করতে পারবে।

এ কারণেই ইসলামী জীবনধারা পূণঃগ্রহনের ক্ষেত্রে যে সকল সমস্যা রয়েছে তা সংখ্যায় অগণিত। এ সমস্যাগুলোকে নিরীক্ষা করা ও তার সমাধানে স্পষ্ট একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

এসকল প্রতিবন্ধকতার মধ্যে সর্বাপেক্ষা মারাত্মকগুলো নিম্নরূপঃ

***1. Bmj vgx we‡k A%bmj wgK wPšÍvaviYvi Dcw¯'wZ|*** এর কারণ হচ্ছে ইসলামী বিশ্ব একটি অধ:পতনের যুগ অতিক্রম করছে যেখানে সাধারণভাবে রয়েছে চিন্তার অগভীরতা, জ্ঞানের অভাব, এবং যুক্তি উপাস্থাপনায় দুর্বলতা ইত্যাদি। যেখানে অনৈসলামিক ধারণাগুলো প্রতিনিয়ত ইসলামী ধারণার সাথে শক্ত বিরোধ তৈরী করছে। এ ধরণের সাংঘর্ষিক অনৈসলামিক ধারণাগুলো গড়ে উঠেছে বর্তমান জীবন, এ জীবনের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে ইসলাম বহির্ভূত এক বিভ্রান্তিকর উপলব্ধি থেকে। এধরণের ধারণাগুলো বাধাহীনভাবে বিকশিত হবার জন্য মুসলিমদের মন একটি উপযুক্ত ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ফলে অনায়াসেই এ ধরণের ভ্রান্ত ধারণাগুলো গভীরে শিকড় বিস্তার করছে। ফলে মুসলিমদের মানসিকতা, বিশেষত শিক্ষিত মুসলিমদের মানসিকতায় এ ধরণের ভ্রান্ত ধারণার প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ প্রক্রিয়ায় অনুকরণপ্রিয় একটি মানসিকতা তৈরী হয় যার মাঝে কোনরকম সৃষ্টিশীলতার লেশ মাত্র নেই। এ ধরণের মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি ইসলামী আদর্শ গ্রহণে অপ্রস্তুত এবং ইসলামী আদর্শের নির্যাসটুকু অনুধাবনে, বিশেষত ইসলামের রাজনৈতিক স্বরূপ বুঝতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়।

ইসলামের দাওয়াতের অর্থ হচ্ছে ইসলামী জীবনধারা পূণরায় গ্রহন করার আহ্বান। অমুসলিমদের ইসলামের প্রতি আহ্বান করা হয় ইসলামী ধারণার সঠিক উপস্থাপনের মাধ্যমে। মুসলিমদের নিকট ইসলামকে যথার্থভাবে ব্যখ্যা করার পর ইসলামের পূন:গ্রহণের জন্য কাজ করার আহ্বানের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়। এর মাধ্যমে অনৈসলামিক ধারণাগুলোর দুর্বলতা ও তাদের ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা প্রকাশ করা সম্ভব হয় এবং এভাবে দাওয়াহ একটি রাজনৈতিক রূপ লাভ করে যেখানে উম্মাহকে সম্পৃক্ত করার সাথে সাথে তাদের জীবন সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী, অর্থাৎ এ জীবন, জীবনের পূর্বে ও পরের বাস্তবতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেয়া হয়। এটি করতে গিয়ে জীবনের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি হয়। এভাবেই ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রতিবন্ধকতার মোকাবেলা করা যায়।

***2. ¯‹j I wekwe`¨vjq¸‡jv‡Z ev¯‍বায়িত ঔপনিবেশিকদের প্রবর্তিত শিক্ষা কার্যক্রম এবং পদ্ধতি।*** যে সকল ব্যক্তিবর্গ সরকার, প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত এবং যারা এধরণের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর শিক্ষা লাভ করেছে, তারা ঔপনিবেশিকদের সাজানো পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা ও তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের একটি স্পষ্ট মানসিকতা গ্রহণ করে থাকে। ঔপনিবেশিকদের প্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য করলে এটি পরিষ্কার হয়ে যায়। আমরা দেখতে পাই যে, ঔপনিবেশিক চাকরদের স্থানে বর্তমানে মুসলিমরা স্থান করে নেয়ার পরও তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অভিন্ন রয়েছে আর তা হচ্ছে একই ভাবে ঔপনিবেশিক আইন, সংস্কৃতি, নীতিমালা এবং ব্যবস্থার সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে বর্তমান মুসলিমরা বরং ঔপনিবেশিক প্রভূদের চাইতে কঠোর অবস্থান গ্রহন করেছে। এ ধরণের প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলার উপায় হচ্ছে এসকল শাসকবৃন্দের ও সরকারী কর্মকর্তার মুখোশ উন্মোচন করে দেয়া, তাদের কার্যকলাপ প্রকাশ করে দেয়া যাতে জনসমক্ষে ঔপনিবেশিকতার কদর্য রূপটি প্রকাশ হয়ে যায়। এর মাধ্যমে এধরণের নীতিমালা ও ব্যবস্থা সংরক্ষণের প্রক্রিয়া ব্যহত হবে এবং দাওয়াহ মুসলিমদের নিকট সঠিক সমাধান বা পথ তুলে ধরবে।

***3. Awekvmx Jcwb‡ewkK‡`i cewZZ cvV¨mPxi Ae¨nZ ev¯evqb, AwaKvsk mvZ‡KvËi wk¶v_xi AbmZ Jcwb‡ewkK c×wZ Ges wk¶v প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অনৈসলামিক পথে অগ্রসরমানতা।*** আমরা এখানে শিক্ষা কার্যক্রমের বিজ্ঞান ও শিল্প সংক্রান্ত বিষয়গুলোর কথা বলছিনা, কারণ এগুলো একটি সার্বজনীন বিষয় যা কোন বিশেষ উম্মাহ'র সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। আমরা এখানে ঐ সংস্কৃতির কথা বলছি যা জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রভাবিত করে। কারণ জীবনের প্রতি এ ধরণের অনৈসলামিক দৃষ্টিভঙ্গী এমন সব শিক্ষা কার্যক্রম ও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে বাধ্য করে যা ইসলামী জীবন পদ্ধতি পূণ:গ্রহণের পথে অন্তরায় বা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এসকল বিষয়ের মধ্যে রয়েছে ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন এবং আইনশাস্ত্র। ইতিহাস জীবনের কার্যকর প্রতিফলন, সাহিত্য মানুষের আবেগ-উদ্দীপনাকে প্রতিফলিত করে, দর্শন হচ্ছে সেই ধারণার মূল যার উপর ভিত্তি করে মানুষের জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী গঠিত হয় এবং আইন শাস্ত্র হচ্ছে মানুষের জীবনের বাস্তব সমস্যা গুলোর সমাধান নিয়ে নাড়াচাড়া করে এবং একজন স্বতন্ত্র কিংবা গোষ্ঠীর মধ্যকার লেনদেন ও এ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। সার্বিকভাবে এ বিষয়গুলোর সমন্বয়ে তৈরী হয়েছে ঔপনিবেশিকদের সংস্কৃতি যার মাধ্যমে তারা মুসলিমদের চিন্তা চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। একারণেই কিছু মুসলিম মনে করেছে, তাদের ও উম্মাহ'র জীবনে ইসলাম একটি অপ্রয়োজনীয় বিষয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ইসলামের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন বা শত্রুভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে এবং জীবনের সমস্যাগুলোর সমাধানে ইসলামের পারদর্শীতাকে অস্বীকার করেছে। কাজেই এধরণের মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন। এটি করা সম্ভব বর্তমান সময়ের তরুণ প্রজন্মকে প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বাইরে সঠিক সংস্কৃতির মাধ্যমে পরিচর্যার মাধ্যমে। এ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজন নিবিড় ও প্রগাঢ় শিক্ষা, ইসলামী চিন্তা, ধারণা ও আইন সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু আলোচনার সূত্রপাত করা।

***4. ms¯'wZ wfwËK welq, †hgb mgvRweÁvb, g‡bweÁvb, Ges wk¶v weÁvb BZ¨w` welq¸‡jv‡K Ac‡qvRbxq m¤§vb c`vb I weåwš— gjK fv‡e G‡`i †K weÁvb wnmv‡e AvL¨wqZ Kiv|*** অধিকাংশ লোকই এসকল বিভাগকে বিজ্ঞানের অংশ হিসাবে জানে এবং ধারণা করে এ সকল বিষয়ে যা কিছু পড়ানো হয় তা বাস্তব পরীক্ষা নির্ভর তথ্যের ভিত্তিতে প্রাপ্ত। ফলে তারা এ বিষয়গুলোকে খুব সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে থাকে এবং মনে করে এ বিষয় গুলোর রায় বা সিদ্ধান্ত সমূহ সবরকম বিতর্কের উর্ধে। এ কাজটি করতে গিয়ে তারা তাদের জীবনের সকল সমস্যার সমাধানের জন্য এ বিষয়গুলোর দ্বারস্থ হয় এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে এ বিষয়গুলোকে বিজ্ঞান হিসাবে পড়ানো হয়। ফলাফল স্বরূপ, মনোবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদদের বক্তব্য গুলোকে তর্কাতীত সর্বোচ্চ দিক নির্দেশনা (রেফারেন্স) হিসাবে গ্রহণ করা হয়

এবং তাদের কুরআন ও হাদীসের চাইতেও অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। অথবা এ বিষয়গুলোকে ইসলামের বক্তব্যের সাথে মিশিয়ে বিভ্রান্তিমূলক ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গীর জন্ম দেয়া হয়।

এভাবে জনমানুষের পক্ষে এ বিষয়গুলোর সাথে বিপরীতধর্মী ও সাংঘর্ষিক কোন বিষয়কে গ্রহন করা কঠিন হয়ে পড়ে। এটি সুনিশ্চিতভাবে ব্যক্তি বা জন জীবনের সকল কাজ থেকে দ্বীনকে পৃথক করার দিকে নিয়ে যায় এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাড়ায়। বাস্তব সত্য হচ্ছে এ বিষয়গুলোকে বৈজ্ঞানিক বিষয় হিসাবে বিবেচনা করা যাবেনা, কারণ এসকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত সমূহ শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণ ও অনুসিদ্ধান্ত (অনুমিত সিদ্ধান্ত) থেকে গৃহীত হয়, বাস্তব পরীক্ষা (এক্সপেরিমেন্ট) এর উপর ভিত্তি করে নয়। মানুষের উপর এদের প্রয়োগ কে বাস্তব পরীক্ষা হিসাবে দেখা যাবেনা, কারণ এক্ষেত্রে সেটি হবে পরিবেশ ও অবস্থা ভেদে মানুষের বিভিন্ন আচরণের পর্যবেক্ষণ মাত্র। কাজেই এগুলো শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণ এবং অনুমিত ধারণা মাত্র, এবং কোনক্রমেই পরীক্ষাগারে সম্পাদিত বাস্তব পরীক্ষা নয়। এজন্যই এদেরকে সংস্কৃতি ভিত্তিক শিক্ষা বলা হয়, এবং এরা প্রকৃতার্থে বিজ্ঞান ভিত্তি শিক্ষা নয়। এসব ক্ষেত্রে লব্ধ সিদ্ধান্ত সর্বদাই সন্দেহপূর্ণ ও বিভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ হবার উপযুক্ত। সর্বোপরি এ শিক্ষাগুলো একটি মিথ্যা ক্ষেত্রের উপর ভিত্তি করে সৃষ্ট কারণ তারা সমাজকে ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোন থেকে দেখে থাকে।

তাদের সংজ্ঞায় সমাজ হচ্ছে ব্যক্তির সমষ্টি। কাজেই তাদের দৃষ্টিভঙ্গী, ব্যক্তি থেকে পরিবার-পরিবার থেকে গোষ্ঠী-গোষ্ঠী থেকে সমাজ; এ ধারণার উপর ভিত্তি করে প্রাপ্ত কারণ তাদের সংজ্ঞায় সমাজ হচ্ছে ব্যক্তির সমষ্টি । এধারণাটি যে উপলব্ধির জন্ম দেয় তা হচ্ছে সমাজগুলো স্বাধীন এবং যা এক সমাজের জন্য প্রযোজ্য তা অন্য সমাজের জন্য প্রযোজ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে সমাজ হচ্ছে, মানুষ (ব্যক্তি), ধারণা, আবেগ এবং ব্যবস্থার সমন্বিত রূপ এবং ধারণা ও সমাধান সম্পর্কিত যা কিছু এক স্থানের মানুষের জন্য প্রযোজ্য তা সব স্থানের মানুষের জন্যও প্রযোজ্য। এ ধারণা ও সমাধান একাধিক সমাজকে একটি অভিন্ন সমাজে পরিণত করে যার ক্ষেত্রে একই ধরণের ধারণা, আবেগ ও ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে। শিক্ষা ও সমাজ বিজ্ঞানের দুর্বলতা হচ্ছে এ দুটি বিষয়ই সমাজ সম্পর্কিত একটি ভ্রান্ত ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

এছাড়াও মনোবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানকে প্রভাবিত করে। দুটি কারণে মনোবিজ্ঞান একটি বিভ্রান্তিকর শিক্ষা। প্রথমত: এটি মস্তিষ্ককে ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভাগে বিভক্ত করে। এবং দাবী করে ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন কার্যকলাপ, প্রবণতা বা স্বাভাবিক যোগ্যতা (aptitude) এর জন্য দায়ী। ফলে কোন কোন মস্তিষ্কের কোন কোন বিশেষ বিষয়ের শেখার স্বাভাবিক যোগ্যতা অন্য মস্তিষ্কের চাইতে বেশী। কিন্তু বাস্তব সত্য হচ্ছে মস্তিষ্ক একটি একক এবং মানুষের চিন্তা ধারণার বৈষম্য একটি স্বাভাবিক বিষয় কারণ তার পারিপার্শ্বিকতা ও মস্তিষ্কে পূর্বলব্ধ তথ্য ভিন্ন। এমন কোন ঝোঁক বা স্বাভাবিক যোগ্যতা নেই যা একটি মস্তিষ্কে উপস্থিত কিন্তু অন্য মস্তিষ্কে অনুপস্থিত। বরং প্রত্যেকটি মস্তিষ্কেরই কোন বস্তু সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করার ক্ষমতা রয়েছে যখন স্পর্শযোগ্য বাস্তবতা, ঈন্দ্রিয় ও পুর্বলব্ধ জ্ঞান, তার কাছে সহজ প্রাপ্য করা হয়। (অর্থাৎ বস্তুটিকে যখন সে দেখতে, স্পর্শ ও অনুভব করতে পারে এবং এসম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান তাকে দেয়া হয় তখন সে বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করার ক্ষমতা প্রতিটি মস্তিষ্কেরই রয়েছে।) পার্থক্য হয় মস্তিষ্কের মূল্যায়ন করা ও পূর্ববর্তী তথ্যের সাথে যথাযথ সম্পর্ক সৃষ্টি ও ঈন্দ্রিয়গত অনুভব করার যোগ্যতায়। ঠিক যেমনটি তারতম্য হয় স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তির ক্ষেত্রে। কাজেই যে কোন ব্যক্তিকে যে কোন ধরণের তথ্য দেয়া যায় এবং সে ঐ তথ্যাবলীকে আত্মস্থ করতে সক্ষম হয়। কাজেই মনোবিজ্ঞানীরা প্রবণতা বা স্বাভাবিক যোগ্যতার যে দাবীটি করেন তা ভিত্তিহীন।

মনোবিজ্ঞানের ধারণায় প্রবৃত্তি হচ্ছে অসংখ্য, তাদের কোনটি আবিস্কৃত হয়েছে আর কোন কোনটি এখনো অনাবিস্কৃত। কিছু কিছু তাত্ত্বিক প্রবৃত্তি সম্পর্কে এধরণের মিথ্যা ধারণার উপর ভিত্তি করে কিছু তত্ত্ব দিয়েছেন। বাস্তবে যদি আমরা মানুষের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করি তবে বুঝতে পারি যে তাদের সকল অনুভূতির দুটি দিক রয়েছে, একটি হচ্ছে তুষ্ট/তৃপ্ত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা, তুষ্ট না হলে সে মারা যাবে । দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে তুষ্ট না হলেও মানুষের জীবন চলে যাবে, কিন্তু সে হয়ে পড়বে উদ্বিগ্ন ও বিকারগ্রস্থ। প্রথমটি জৈবিক চাহিদার প্রতিনিধিত্ব করে, যেমন; ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার বিষয়গুলো।

দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে প্রবৃত্তি যার মধ্যে রয়েছে, ধর্মীয়, প্রজনন ও বেঁচে থাকার প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তিগুলো থেকে দূর্বলতা, প্রজাতি রক্ষার প্রবণতা ও বেঁচে থাকার প্রবৃত্তির জন্ম নেয়। এই তিনটি প্রবৃত্তি ছাড়া আর কোন প্রবৃত্তি নেই। এ তিনটি প্রবৃত্তি ছাড়া যে কোন প্রবৃত্তি মূলত: এ তিন প্রবৃত্তির ই উদ্ভূত রূপ। উদাহরণ স্বরূপ, ভয়, আধিপত্য এবং মালিকানা, এ তিনটি উদ্ভূত হয়েছে বেঁচে থাকার প্রবৃত্তি থেকে, গৌরবান্বিত করা বা উপাসনা করার প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়েছে আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তি থেকে এবং পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব ও ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি হচ্ছে প্রজনন প্রবৃত্তির বিভিন্ন শাখা প্রশাখা বিশেষ। স্পষ্টতই, মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের প্রবৃত্তির ধারণাটি মিথ্যা/ভ্রান্ত এবং মস্তিষ্ক সম্পর্কে তাদের দাবীটিও ভুল। আর এ ভ্রান্ত ধারণা থেকে উদ্ভূত তত্ত্ব স্পষ্টতই আরো বড় বিভ্রান্তিকর মতবাদ ও শিক্ষার দিকে নিয়ে যায়।

সমাজ বিজ্ঞান, শিক্ষাবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান হচ্ছে পশ্চিমাদের পঠিত ও প্রচারিত সাংস্কৃতিক বিভাগ যা ইসলামী চিন্তা'র (আকীদা'র) সাথে সাংঘর্ষিক। এসব বিষয় সম্পর্কে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করা এবং এদের মূল্যবান সূত্র হিসাবে গ্রহণ করা ইসলামী রাষ্ট্র পূণ:প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি বড় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। আমরা দেখাতে চাচ্ছি যে, এই সাংস্কৃতিক বিষয়গুলো বিশুদ্ধ বিজ্ঞান নয় এবং এগুলো বিতর্কিত বিষয় এবং এদের ফলাফলগুলো অমীমাংসিত। এরা মিথ্যা ক্ষেত্রের উপর ভিত্তি করে চলছে এবং আমাদের জীবন পরিচালনায় এদের কোন ভূমিকা থাকা উচিৎ নয়।

৫. ***Bmjvgx we‡k mgvR A‰bmjwgK Rxeb c×wZ Øviv w`Kåvš|*** এর কারণ হচ্ছে সমাজে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা, সমষ্টিগতভাবে সমাজ যে মূলনীতির উপর ভিত্তি করে দাড়িয়ে আছে এবং মুসলিমরা যে আবেগ অনুভূতির ধারা অনুসরণ করে ও জীবন সম্পর্কে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাধারা, সবকিছুই এমন সব ধ্যান ধারণার উপর ভিত্তিকরে দাড়িয়ে আছে যা ইসলাম বহির্ভূত ও ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। যতক্ষণ পর্যন্ত এই মৌলিক বিষয়গুলো অপরিবর্তিত থাকবে, এবং এই ভ্রান্ত ধারণাগুলোর মূলোৎপাটিত হচ্ছে না, ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজে মুসলিমদের জীবন পদ্ধতি, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, সামাজিক শৃংখলা, আবেগ-অনুভূতি ও যৌক্তিক ধারা পরিবর্তন করা দুরূহ।

***6. gmwjg D¤§vn I Bmjvgx kvm‡bi, (we‡kIZ: kvmb e¨e¯v I A_©‰bwZK e¨e¯vÕi) মাঝে ক্রমবর্ধgvb `iZ|*** এর ফলে মুসলিমদের মাঝে ইসলামী জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে দূরদর্শীতা (ভিশন) কে সুদূর পরাহত হিসাবে উপস্থাপিত হয়। একই সাথে এটি দীর্ঘদিন মুসলিমদের মাঝে ইসলামের অপপ্রয়োগের সুযোগে অবিশ্বাসীদের ইসলামকে নেতিবাচক ভাবে উপস্থাপনার সুযোগ করে দিচ্ছে। ১৯২৪ সাল থেকে মুসলিমরা তাদের শত্রুদের দ্বারা শাসিত হচ্ছে এমন এক ব্যবস্থার মাধ্যমে যা প্রতিটি বিভাগে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক, বিশেষত শাসন-বিচার কার্য ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে। কাজেই মানুষের এটি বোঝা প্রয়োজন যে, ইসলামী জীবন পদ্ধতি গ্রহণ হতে হবে পরিপূর্ণ, আংশিক নয়; ইসলামের বাস্তবায়ন হতে হবে যুগপৎ এবং সম্পূর্ণ; ধীরে ধীরে, আংশিক কিংবা বিক্ষিপ্ত ভাবে নয়।

***7. gmwjg †`k¸‡jv‡Z agwbi‡c¶Zvi wfwË‡Z MwVZ miKv‡ii Dcw¯wZ, hviv cwRev`x Av`k I MYZwšK e¨e¯v ev¯evqb Ki‡Q*** *having strong ties with Western countries* ***Ges hv RvZxqZvev‡`i Dci wfwË K‡i cwZwôZ|*** এ বিষয়টি ইসলামী জীবন পদ্ধতি পূন:প্রতিষ্ঠায় সাফল্যর পথে একটি বড় সমস্যা হিসাবে বিরাজ করছে, কারণ এটি সম্পূর্ণ ও ব্যাপক না হলে সম্ভব নয়। ইসলাম, মুসলিম ভূখন্ডগুলোর ছোট ছোট জাতি রাষ্ট্রে বিভক্তি অনুমোদন করেনা। বরং ইসলাম ভূখন্ডগুলোকে একত্রিত হয়ে একটি অভিন্ন শাসনের অধীনে থাকার বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করে। এটি দাওয়াহর কাজে সামগ্রিকতা আনার বিষয়টি বাধ্য করে, যা শাসকবর্গের প্রতিনিধিদের শক্ত প্রতিরোধের শিকার হয় যদিও এসকল প্রতিনিধি নিজেদেরকে মুসলিম হিসাবে দাবী করে। কাজেই প্রতিটি ভূখন্ডে এ দাওয়াহর কাজ অব্যহত রাখা প্রয়োজন, যদিও বা মুসলিম ভূখন্ডের শাসকদের প্রতিরোধের মুখে কাজটি সমস্যাসঙ্কুল ও কষ্টদায়ক।

৮. ***RvZxqZvev`, †`k‡cg Ges mgvRZ‡ši c‡¶ k³ RbgZ I G mKj avi Yvi wfwË‡Z ivR‰bwZK Av‡›`vj‡bi DÌvb|*** এটি হয়েছে মুলত মুসলিম ভূখন্ডগুলো পশ্চিমাদের দখলে চলে যাওয়ার ফলে এবং এদের ক্ষমতাসীন হওয়া ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে। আর এসবের মাধ্যমে মুসলিমদের মাঝে আত্মরক্ষার একটি প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে জাতীয়তাবাদী আবেগ যার উদ্ভব অপরিপক্ক গোত্রবাদিতা ও বর্ণবাদিতার মাধ্যমে যা মূলত পরিবার এবং গোত্র প্রতিরক্ষার ঝোক থেকে উদ্ভূত এবং যা মানুষকে পরস্পরের মাঝে ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত রাখে। এর ফলে ভূখন্ড থেকে শত্রু মুক্ত করতে জাতীয়তাবাদ কিংবা দেশপ্রেম নামক পতাকার নীচে কিছু রাজনৈতিক আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছে যা তাদের লোকজনদের মাঝেই শাসন কে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। এরপর পুঁজিবাদের দুর্নীতি ও দুর্বলতা অবধারিত হয়ে উঠায় সমাজতন্ত্রের বিস্তার ঘটে। ফলাফল স্বরূপ, পুঁজিবাদের মোকাবেলায় সমাজতন্ত্রের ঝান্ডা বহনকারী কিছু দলের সৃষ্টি হয়েছে। এসব আন্দোলনের জীবন সম্পর্কে পরিষ্কার কোন দৃষ্টিভঙ্গী বা দুরদর্শিতা (ভিশন) নেই। তাদের কৌশলের পরিষ্কার কোন লক্ষ্য ছিলনা এবং তারা ইসলামের সার্বজনীন আদর্শ থেকে বিচ্যূত হয়ে পড়েছে।

## ইসলামী রাষ্ট্রের উত্থানের প্রক্রিয়াঃ

ইসলামী রাষ্ট্রের শক্তি হচ্ছে ইসলামী চিন্তা (আকীদা) যা পদ্ধতির (তরিকাহ) সাথে জড়িত। এবং এটিই ইসলামী রাষ্ট্র পূন:প্রতিষ্ঠা ও জীবন পদ্ধতি পূন:গ্রহণের জন্য যথেষ্ট। অবশ্য এ প্রক্রিয়া সফল হতে হলে, ইসলামী চিন্তা (আকীদা) মুসলিমদের অন্তরে এবং হৃদয়ে গভীর ভাবে প্রোথিত থাকতে হবে এবং মুসলিমদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর বাস্তব রূপায়ন থাকতে হবে। এছাড়াও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে একটি বিশাল কাজ করে যেতে হবে, এবং ইসলামী জীবন পদ্ধতি ফিরিয়ে আনার জন্য অসাধারণ প্রচেষ্টা থাকতে হবে। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আকাংখা ও আশাবাদিতা যথেষ্ট নয়, কিংবা ইসলামী জীবন পদ্ধতি পূন:গ্রহণের জন্য শুধুমাত্র আশা ও উৎসাহ উদ্দীপনাও যথেষ্ট নয়। সকল কাজের পূর্বে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে এই প্রকান্ড প্রতিবন্ধকতাকে অপসারণের জন্য একে সঠিকমাত্রায় মুল্যায়ন করা।

আরো একটি গুরুত্বপুর্ণ কাজ হচ্ছে যে সব মুসলিম এ কাজের জন্য সাড়া দেবে, তাদের অনাগত গুরু দায়িত্ব সম্পর্কে সতর্ক করা এবং জনগণকে বিশেষত মেধাবী ও বুদ্ধিমান জনগোষ্ঠীকে এব্যপারে সচেতন করা। এই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে যে কোন মতামত ও তার প্রতিফল বিবেচনা করে সতর্কতা, দৃঢ়সংকল্প, তেজস্বীতা, এবং সাহসিকতার সাথে বক্তব্য প্রদান ও কাজ করা উচিৎ। যারা ইসলামী রাষ্ট্র (খিলাফত) প্রতিষ্ঠার কাজে পদক্ষেপ রাখবে তাদের স্মরণ রাখা উচিৎ যে তারা একটি নিরেট কঠিন পাথরের গায়ে খোদাই করতে যাচ্ছে কিন্তু দৃঢ়সংকল্প এবং একাগ্রতার মাধ্যমে এ শক্ত পাথর ভাঙ্গা সম্ভব। একই সাথে তাদের মাথায় রাখা উচিৎ যে তারা একটি অতি সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে নাড়া চাড়া করছে।

অবশ্য তাদের সদয়ভাব এটিকে নিখুঁত ভাবে নাড়াচাড়া করতে সাহায্য করবে। তাদের সচেতন থাকতে হবে যে, তাদের বড় বড় সমস্যার মোকাবেলা করতে হবে, কিন্তু তারা সে সমস্যা অতিক্রম করতে সক্ষম হবে। তাদের পথ থেকে বিচ্যূত হওয়া অনুচিত কারণ তাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে এই পথটিতেই রা সুলুল্লাহ (সঃ) চলেছিলেন। যদি এই পথ চলাটি সঠিক হয়, তবে অবশ্যই ফলাফল আসবে এবং সুনিশ্চিত বিজয়ের ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই। এটি সেই পথ, যে পথে মুসলিমদের সতর্কতার সাথে পদক্ষেপ রাখতে হবে। এক্ষেত্রে অবশ্যই রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর উদাহরণ এবং তার পদক্ষেপ গুলো খুব সতর্ক ও সঠিকভাবে অনুসরণ করতে হবে যাতে করে সে যেন কোনরূপ হোঁচট না খায়। কারণ প্রতিটি ভুল কিংবা বিচ্যূতি দাওয়াহকে পিছিয়ে দেবে। অতএব, শুধুমাত্র খিলাফাহ কনফারেন্সের আয়োজনের মাধ্যমে খিলাফত প্রতিষ্ঠা হবেনা, কিংবা মুসলিম জনগণের উপর কিছু রাষ্ট্রের federation শাসন খিলাফত প্রতিষ্ঠার যথার্থ পদ্ধতি হবেনা বা মুসলিম জনগণের একটি কংগ্রেস ইসলামী জীবন পদ্ধতি পূনঃগ্রহনে সহায়ক হবেনা। এগুলোর কোনটি কিংবা এদের মত কোন ব্যবস্থাই সঠিক হিসাবে গ্রহণ করা যাবেনা। বরং এগুলো হবে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন কার্যকলাপ যা মুসলিমদের ক্রোধ ও আবেগকে দমন করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এ সকল পদক্ষেপ মুসলিমদের অনুভূতিকে দমন করতে ও তাদের উদ্দীপনাকে নিষ্ক্রিয় করে দেবে এবং ফলত তারা প্রকৃত লক্ষ্য থেকে বিচ্যূত হয়ে পড়বে।

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় হচ্ছে ইসলামের বার্তা বয়ে নিয়ে যাওয়া এবং ইসলামী জীবন পদ্ধতি ফিরিয়ে আনার জন্য কাজ করা যেখানে মুসলিম দেশগুলোকে একটি একক বা উম্মাহ হিসাবে ঐক্যবদ্ধ করার বাধ্যবাধকতা থাকে যারা একটি আকীদার বন্ধনে আবদ্ধ; যে আকীদা থেকে একটি ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। কাজেই যে কোন মুসলিম ভুখন্ডে গৃহীত কোন কাজ সর্বত্র মুসলিমদের আবেগ ও ধারণাকে স্পর্শ করবে। কাজেই মুসলিম দেশগুলোকে একটি দেশ হিসাবে বিবেচনা করা উচিৎ এবং প্রতিটি দেশেই দাওয়াহর কাজ পরিচালনা করা উচিৎ যাতে করে তা সেখানকার সমাজকে প্রভাবিত করতে পারে। কারণ উম্মাহর প্রতিনিধিত্বকারী সমাজ হবে একটি পাত্রে রাখা পানির মত, কাজেই যদি এর কোন অংশে তাপ দেয়া হয়, তবে তা সমগ্র পানিকেই স্ফুটনাঙ্কে (ফুটন্ত তাপমাত্রায়) নিয়ে যাবে। এই ফুটন্ত সমাজ সকলকে কাজ করতে ও আন্দোলন করতে বাধ্য করবে। কাজেই দাওয়াহর লক্ষ্য হওয়া উচিৎ ইসলামী ভূখন্ডগুলো যাতে করে সেখানে ইসলামী জীবন পদ্ধতি ফিরিয়ে আনার কাজ শুরু করা যায়। আর এটি করা যায় বই প্রকাশনা, লিফলেট বিলি ও যোগাযোগের মাধ্যমকে ব্যবহার করে এবং সকল সম্ভাব্য জনসংযোগের মাধ্যমে বিশেষত পরিচিতজন ও আলোচনার মাধ্যমে কারণ এগুলো হচ্ছে দাওয়াহ'র জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ও সফল পদ্ধতি।

অবশ্য এভাবে উস্মুক্ত ভাবে দাওয়াহ শুরু করা সমাজের জন্য একটি জ্বালানীশক্তি মাত্র যা শীতলতাকে তেজশক্তিকে পরিণত করবে। এটি কখনো স্ফুটনাঙ্কে নিতে পারবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত না দাওয়াহ কোন একটি রাষ্ট্রে বাস্তব রাজনৈতিক রূপ লাভ করে। এখান থেকে দাওয়াহ শুরু হবে এবং মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপকহারে বিস্তৃত হতে থাকবে। এই রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র সমষ্টি ইসলামী রাষ্ট্র স্থাপনের সহায়ক বিন্দু হিসাবে কাজ করবে। এখান থেকে বৃহত্তর একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও প্রসারণের কাজ শুরু যা পর্যায়ক্রমে সমগ্র বিশ্বে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে যাবে।

রাসুলুল্লাহ (সঃ) এ কাজটিই করেছিলেন। তিনি তার দাওয়াহ সকল মানুষের কাছে পৌঁছেছিলেন এবং দাওয়াহ একটি বাস্তব পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। তিনি (সাঃ) মক্কার জনগণকে এবং হজ্জের সময় সবাইকে আহবান করেছিলেন। তার দাওয়াহ সমগ্র আরব ব-দ্বীপে ছড়িয়ে পড়েছিল, যেন তিনি ঐ সমাজে একটি আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছেন যে আগুনের উদ্দেশ্য ছিল আরবদের মাঝে একটি শক্তির জোয়ার বইয়ে দেয়া। The Messenger of Allah (saw) called the Arabs to Islam by directly contacting them and inviting them to Islam during the Hajj season and by visiting the tribes in their homes and calling them to Islam. সকল আরবদের মাঝে এই দাওয়াহ পৌঁছেছিল রাসুলুল্লাহ (সঃ) এবং কুরায়শদের মধ্যে প্রকাশ্য সংঘর্ষের ফলাফল স্বরূপ যার প্রতিধ্বনি এবং প্রভাব সমগ্র আরবদের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং ইসলাম সম্পর্কে তাদের কৌতুহলকে জাগিয়ে তুলেছিল। এসময় যদিও দাওয়াহ আরবদের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজটি শুধুমাত্র মক্কায় সীমাবদ্ধ ছিল; তা পরবর্তীতে মদিনায় বিস্তৃত হয়েছিল এবং যার ফলাফল স্বরূপ হিজাজে প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শুধুমাত্র তখনই দাওয়াহর উত্তাপ ও রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর বিজয় আরবদের মাঝে একটি প্রকৃত কাজের স্ফুটনাঙ্কে উপনীত হয়েছিল, ফলে সকলে বিশ্বাস স্থাপন করল এবং ইসলামী রাষ্ট্র বিস্তৃত হতে লাগল যতক্ষণ পর্যন্ত না তা পুরো আরব বদ্বীপে ছড়িয়ে পড়ল। এবং সেখান থেকে তা সমগ্র বিশ্বে ইসলামের বাণী বয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি হিসাবে আমাদের অবশ্যই দাওয়াহ করা এবং ইসলামী জীবন ফিরিয়ে আনার জন্য কাজ করতে হবে। আমাদের মুসলিম দেশগুলোকে একটি অবিচ্ছিন্ন সমাজ ও দাওয়াহর লক্ষ্য বস্তু হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। তবে আমাদের অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট প্রদেশে বা স্থানে দাওয়াহকে ঘণীভূত করতে হবে যেখান থেকে আমরা জনগণকে ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষিত করে তুলতে পারব যাতে করে তা তাদের জীবনে প্রতিফলিত হতে পারে এবং তারা ইসলাম দিয়ে তাদের জীবন পরিচালনা করতে পারে। এবং আমাদের ইসলামের মাধ্যমে ইসলামের জন্য জনমত তৈরী করার কাজ করে যেতে হবে যাতে করে দাওয়াহকারী ও সমাজের মধ্যে একটি ফলদায়ক, কার্যকরী এবং গতিশীল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় যা দাওয়াহকে একটি সফল মিথস্ক্রিয়তায় (interaction) পরিণত করবে। এধরণের মিথস্ক্রিয়তা ঐ অঞ্চলের উম্মাহর মধ্যে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে পরিণত হবে। এভাবে দাওয়াহ শুধুমাত্র একটি ধারণা থেকে সমাজে বিরাজমান একটি বাস্তবতায় পরিণত হবে এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একটি জনপ্রিয় আন্দোলনে পরিণত হবে। এ অবস্থায় এটি এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে পরিবর্তিত হবে এবং প্রারম্ভিক বিন্দু থেকে

উৎক্ষেপন বিন্দুতে পরিণত হবে। এবং সেখান থেকে তা পরিণত হবে একটি সহায়ক বিন্দুতে যা দাওয়াহ ও রাষ্ট্রের সকল উপাদান পরিপূর্ণ করবে। এভাবেই বাস্তব কাজের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও মুসলিমদের জন্য শরঈ দায়িত্ব পালনের কাজ শুরু হবে।

ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহ যা কিছু নাযিল করেছেন তার দ্বারা শাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন নীতির অংশ হিসাবে অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোকে এর সাথে একীভূত করার কাজ শুরু করা। কাজেই এটি অন্যান্য দেশগুলোতেও দাওয়াহ ও ইসলামী জীবন পূনঃগ্রহণের আহ্বান নিয়ে যাবে। এটি ঐ সকল ঔপনিবেশিকদের রচিত কল্পিত রাজনৈতিক সীমানা তুলে দেবে যে ঔপনিবেশিকরা তাদের অনুগত সীমানা রক্ষী শাসকগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছিল। যদি অন্যান্য দেশ এতে অসম্মত হয় তবুও এরপর ইসলামী রাষ্ট্র কল্পিত সীমানা অপসারণ করবে। ভিসা প্রথা ও কাস্টম চেকিং বাতিল করে দেয়া হবে যাতে এক দেশের লোকের অন্য দেশে যেতে পারে। এতে করে অন্য দেশের মুসলিমরা বুঝতে সক্ষম হবে যে বাস্তবিকই এটি একটি ইসলামী রাষ্ট্র। এরপর তারা ইসলামী রাষ্ট্রের ইসলামী শাসনের বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হবে।

মুসলিমদের কর্তব্যের মধ্যে রয়েছে তাদের ভূখন্ড যেখানে এখনো ইসলাম বাস্তবায়িত হয়নি অর্থাৎ দারুল কুফরকে দারুল ইসলাম এ পরিণত করার প্রতি মনোযোগ দেয়া। দাওয়াহ ও জনসংযোগের মাধ্যমে তাদের ভূখন্ডগুলোকে ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে একীভূত করার প্রক্রিয়ার প্রতি মনোযোগ দেয়া । এটি নিশ্চিত করবে যে, ইসলামী বিশ্বের পুরো সমাজ স্ফুটনাঙ্কে উপনীত হয়েছে যা তাদের সঠিক কাজ করতে তাড়িত করবে এবং এক ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করার কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করবে। এভাবেই the greater Islamic state would be established and ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বজনীন বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা বাস্তব হবে। এ সময়ের মধ্যে এটি বিশ্বকে শয়তানী শক্তির হাত থেকে রক্ষা করা ও ইসলামের বার্তা বহন করার মত যথেষ্ট যোগ্যতা ও শক্তিমত্তা অর্জন করবে।

যদি অতীতে মুসলিম উম্মাহ যা ছিল আরব ভূখন্ডের মাঝে সীমাবদ্ধ এবং সংখ্যায় কয়েক লক্ষ, ইসলাম গ্রহণের পর তৎকালীন দুটি পরাশক্তির নিকট ইসলামের দাওয়াত নিয়ে যেতে পারে এবং তাদের একই সময়ে পরাজিত করে তৎকালীন সময়ের অধিকাংশ বসতিপূর্ণ এলাকায় ইসলামকে ছড়িয়ে দিতে পারে, তবে বর্তমানের কয়েকশ কোটি মুসলিম, যারা ভৌগলিক দিক দিয়ে সংযুক্ত একটি রাষ্ট্রের অধীনে আসে যার বিস্তৃতি হবে স্পেন থেকে চায়না পর্যন্ত এবং তুরস্ক থেকে মালয়েশিয়া পর্যন্ত, এবং যা খনিজ সম্পদের বিচারে বিশ্বের উৎকৃষ্ট অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত তার সম্ভাবনা ও শক্তি সম্পর্কে আমাদের কি ধারণা হওয়া উচিৎ? নিঃসন্দেহে সেই রাষ্ট্রটি পৃথিবীর বর্তমানের নেতৃত্বদানকারী সকল পরাশক্তির চাইতে যেকোন দিক থেকে অধিকমাত্রায় শক্তিশালী হবে।

কাজেই ঠিক এ মূহুর্ত থেকে প্রতিটি মুসলিমের ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা উচিৎ। এ কাজটি শুরু হওয়া উচিৎ ইসলামী দাওয়াহ বহন করার মাধ্যমে যার লক্ষ্য হবে সমস্ত মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী জীবন পদ্ধতি ফিরিয়ে আনা। দাওয়াহর সুযোগ্য ক্ষেত্র হওয়া উচিৎ একটি কিংবা কয়েকটি রাষ্ট্রে মধ্যে সীমাবদ্ধ যাতে করে সহায়ক বিন্দু তৈরী করা সম্ভব হয়, এবং যেখান থেকে আরো গুরুত্বপূর্ণ কাজ হাতে নেয়া সম্ভব হবে। এ সূউচ্চ লক্ষ্য অর্জনে মুসলিমদের বাস্তব ও পরিষ্কার পথে পদক্ষেপ ফেলতে হবে যেখানে সকল প্রতিবন্ধকতার অতিক্রম করার লক্ষ্যে চূড়ান্ত প্রচেষ্টা অব্যহত রাখতে হবে। অবশ্যই একাজের জন্য তাকে আল্লাহ সুবহানুওয়াতা'লার উপর নির্ভর করতে হবে এবং একমাত্র তাঁকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্য নিয়েই কাজটি করতে হবে।

## ইসলামী রাষ্ট্রের খসড়া সংবিধানঃ

### সাধারণ নিয়মাবলী

ধারা ১ - ইসলামী 'আকীদা'ই হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি। কাজেই ইসলামী আকীদা বহির্ভূত কোন কাঠামো, ব্যবস্থা, দায়দায়িত্ব, অথবা অন্য যে কোন বিষয়ই ইসলামী রাষ্ট্রে বিরাজ করতে পারবেনা। ইসলামী আকীদা রাষ্ট্রের সংবিধান এবং আইনেরও উৎস। কাজেই ইসলামী আকীদা থেকে উদ্ভূত নয় এমন কোন কিছুই ইসলামী রাষ্ট্রে বিরাজ করার অনুমোদন পাবেনা।

ধারা২ - দারুল ইসলাম হচ্ছে সেই সীমানা যেখানে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলাম বলবৎ আছে এবং যার নিরাপত্তা ইসলামের সার্বভৌমত্বের মাধ্যমে নিশ্চিত। দারুল কুফর হচ্ছে সেই সীমানা যেখানে কুফর আইন বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং যার নিরাপত্তা মুসলিমদের দ্বারা রক্ষিত হচ্ছেনা।

ধারা ৩ - খলিফা আহকাম শরীয়াহ গ্রহণ করে থাকেন এবং একে সংবিধান ও কানুন হিসাবে বাস্তবায়ন করে থাকেন। যখন খলিফা কোন হুকুম শরঈ গ্রহণ করে থাকেন তখন সেই হুকুম শরঈ মানা ও বাস্তবায়ন করা বাধ্যতামূলক। প্রতিটি নাগরিকের ব্যক্তিগত ও জনজীবনে উক্ত হুকুম শরঈ মেনে চলা বাধ্যতামূলক।

ধারা ৪ - খলিফা, যাকাত ও জিহাদ ব্যতীত ইবাদাত সংক্রান্ত কোন বিষয়ে আহকাম শরীয়াহ নির্ধারণ করেন না। তিনি আকীদা সংক্রান্ত কোন নির্দিষ্ট মতামত (মাযহাব) অথবা ধারণাকে নির্ধারণ বা বাধ্যতামূলক করেন না।

ধারা ৫ - ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক শরঈ অধিকার ও দায়িত্ব ভোগ করে থাকেন।

ধারা ৬ - প্রতিটি নাগরিকের প্রতি তাদের ধর্ম, বর্ণ, জাতি, অথবা অন্য কোন বিষয় নির্বিশেষে সমান আচরণ করা হয়। রাষ্ট্র নাগরিকদের মধ্যে কোন বিষয়ে বিশেষতঃ শাসন, বিচার কিংবা সেবামূলক কাজে বৈষম্য করেনা।

ধারা ৭ - ইসলামী রাষ্ট্র সকল মুসলিম কিংবা অমুসলিম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের উপর নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে ইসলামী শরীয়াহ বাস্তবায়ন করবেঃ

ক. সকল ইসলামী আইন, কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই সকল মুসলিমের উপর প্রযোজ্য।

খ. অমুসলিমদের জন্য তাদের নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস ও উপাসনা করার অনুমতি রয়েছে।

গ. মুরতাদগণ নিজেদের ইচ্ছায় ইসলামকে পরিত্যাগ করলে তাদের উপর মুরতাদের হুকুম (আইন) বলবৎ হবে। যদি তাদের পূর্ব পুরুষ মুরতাদ হয়ে থাকে এবং তারা অমুসলিম হিসাবে জন্ম গ্রহণ করে থাকে, তবে তারা অমুসলিম হিসাবে বিবেচিত হবে এবং বাস্তবতা ভেদে তাদের স্থান হবে মুশরিক অথবা কিতাবের অনুসারী হিসাবে।

ঘ. খাদ্য ও পোষাকের ক্ষেত্রে অমুসলিমরা ইসলামের বেঁধে দেয়া সীমানার মধ্যে তাদের ধর্ম অনুসরণ করতে পারবে।

ঙ. অমুসলিমদের মাঝে বৈবাহিক বিষয়, তালাক ইত্যাদি বিষয়গুলো তাদের ধর্ম অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। অবশ্য অমুসলিম এবং মুসলিমের মাঝে এসকল বিষয় ইসলামের আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে।

চ. বাদবাকী সকল শরীয়াহ বিষয় এবং আইন যেমন লেনদেন, আইন সম্বন্ধীয়, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রাষ্ট্রের মাধ্যমে সবার উপর বাস্তবায়িত হবে। এটি মুসলিম এবং অমুসলিম উভয়ের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। এর মাঝে মুওয়াহিদ, আল মুসতা'মিন এবং বাকী সবাই যারা ইসলামের সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়েছে সবাই অংশীদার। এসকল লোকের উপর বাস্তবায়ন রাষ্ট্রের নাগরিকদের উপর বাস্তবায়নের সমান। কূটনৈতিকদের জন্য কূটনৈতিক প্রতিরক্ষা দেয়া হবে।

ধারা ৮ - ইসলামের ভাষা হচ্ছে আরবী। এটিই রাষ্ট্রের সার্বজনীন ভাষা হবে।

ধারা ৯ - ইজতিহাদ ফরজ কিফায়া। প্রতিটি মুসলিমের ইজতিহাদ করার অধিকার আছে যদি তার ইজতিহাদ করার প্রয়োজনীয় গুনাবলী ও যোগ্যতা থাকে।

ধারা ১০ - ইসলামে কোন পুরোহিততন্ত্র নেই। সকল মুসলিমেরই ইসলামের জন্য দায়িত্ব রয়েছে। কাজেই ইসলামী রাষ্ট্র মুসলিমদের মাঝে পুরোহিততন্ত্রের অনুরূপ বা সমার্থক যে কোন বিষয়কে প্রতিহত করবে।

ধারা ১১ - ইসলামী রাষ্ট্রের প্রাথমিক কাজ হচ্ছে ইসলামের দাওয়াহ প্রচার (বহন) করা।

ধারা ১২ - কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা আস সাহাবা (সাহাবাদের ঐকমত্য), এবং ক্বিয়াস হচ্ছে আহকাম শরীয়াহ নির্ধারণের একমাত্র উৎস।

ধারা ১৩ - প্রতিটি ব্যক্তি নিরপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা অপরাধী হিসাবে প্রমাণিত হয়। আদালতে যথাযথ বিচার ছাড়া কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হবে না। অত্যাচার করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। যে কেউ কারো উপর অত্যাচার করলে তাকে শাস্তি পেতে হবে।

ধারা ১৪ - প্রতিটি কাজই (action) আহকাম শরীয়াহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে, এবং সকল বস্তু (things) অনুমিত যতক্ষণ পর্যন্ত নিষিদ্ধতার প্রমাণ পাওয়া যায়। কাজেই হুকুম জানা ব্যতীত কোন কাজই (action) করা যাবে না।

ধারা ১৫ - কোন কাজ শরীয়াহ অনুযায়ী হারাম হলে তা হারাম। যে মাধ্যম হারামের দিকে নিয়ে যায়, কিংবা বেশীর ভাগক্ষেত্রেই ব্যক্তিকে হারামের দিকে নিয়ে যায়, তা নিষিদ্ধ। এছাড়া ঐ মাধ্যম অনুমিত।

শাসন ব্যবস্থা

ধারা ১৬ - শাসন ব্যবস্থা একক (unitary); সংঘীয় (federation) নয়।

ধারা ১৭ - সরকার ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় ।প্রশাসন বিকেন্দ্রীক ।

ধারা ১৮ - শাসনের ক্ষেত্রে চারটি পদ রয়েছে ।

ক. খলিফা
খ. মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ
গ. ওয়ালী (গভর্ণর)
ঘ. আ'মিল (সাব গভর্ণর)

রাষ্ট্রের বাকী সকল পদ হচ্ছে কর্মচারীর পদ, শাসকের পদ নয় ।

ধারা ১৯ - শাসক কিংবা শাসকের পদে আসীন কোন ব্যক্তিকে ন্যায়পরায়ণ, স্বাধীন (দাস নয়) এবং পুরুষ । তাকে অবশ্যই একজন মুসলিম হতে হবে ।

ধারা ২০ - মুসলিমদের শাসককে প্রশ্ন করার অধিকার রয়েছে এবং এ দায়িত্বটি উম্মাহর জন্য একটি ফরজ কিফায়া । অমুসলিমদের উপর যে কোন অবিচার বা ইসলামী আইনের অপব্যবহারের বিরূদ্ধে তাদের অভিযোগ করার অধিকার রয়েছে ।

ধারা ২১ - মুসলিমদের রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার রয়েছে । এ দলগুলোর দায়িত্ব হচ্ছে উম্মাহর পক্ষ থেকে শাসকদের জবাবদিহী করা বা প্রশ্ন করা এবং উম্মাহর মাধ্যমে শাসন কর্তৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করা । এ দলগুলোর গঠনের মূলভিত্তি হবে ইসলামী আকীদা । তাদের বিধি বিধান হতে হবে আহকাম শরীয়াহর উপর ভিত্তি করে । এ ধরণের দল গঠন করার জন্য রাষ্ট্র থেকে কোনরূপ লাইসেন্স বা ছাড়পত্র নিতে হবে না । ইসলাম বহির্ভূত অন্য কোন কিছুর উপর ভিত্তি করে দল গঠন নিষিদ্ধ ।

ধারা ২২ - শাসন ব্যবস্থা চারটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত । এগুলো হচ্ছেঃ

ক. সার্বভৌম ক্ষমতা শরীয়াহর, জনগণের নয় ।
খ. কর্তৃত্ব উম্মাহর
গ. একজন খলিফার নিয়োগদান সকল মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক ।
ঘ. শুধুমাত্র খলিফার আহকাম শরীয়াহ গ্রহণের অধিকার রয়েছে । কাজেই তিনিই সংবিধান ও আইন বাস্তবায়ন করবেন ।

ধারা ২৩ - রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আটটি প্রতিষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত । তারা হচ্ছে,

ক. খলিফা
খ. মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ (দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী)
গ. মুওয়াউয়িন তানফিজ (নির্বাহী সহকারী)
ঘ. আমির উল জিহাদ (জিহাদের অধিনায়ক)
ঙ. আল ক্বাদা (বিচার ব্যবস্থা)
চ. উলাহ (গভর্ণর)
ছ. মাসালিহুদ দাওয়াহ (প্রশাসনিক ব্যবস্থা)
জ. মাজলিস উল উম্মাহ

খলিফা

ধারা ২৪ - উম্মাহর পক্ষ থেকে খলিফা উম্মাহর কর্তৃত্ব পালন করবেন এবং শরীয়াহ বাস্তবায়ন করবেন ।

ধারা ২৫ - খিলাফাহ হচ্ছে পারস্পরিক একটি চুক্তি । কাউকে এটি গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়না এবং কোন বিশেষ ব্যক্তিকে বেছে নেয়ার জন্য কাউকে শক্তি প্রয়োগ করা যাবে না ।

ধারা ২৬ - প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক (বালেগ) প্রকৃতস্থ মুসলিম নারী বা পুরুষের খলিফা নির্বাচন ও তাকে বাইয়াত দেবার অধিকার রয়েছে । অ-মুসলিমদের এ বিষয়ে কোন অধিকার নেই ।

ধারা ২৭ - খিলাফাহ'র চুক্তি যখন যোগ্য ব্যক্তিবর্গের বাইয়াতের মাধ্যমে সম্পাদিত হবে, বাকী লোকদের বাইয়াত হবে আনুগত্যের বাইয়াত, চুক্তিমূলক বাইয়াত নয়। ফলত কারো মধ্যে বিরুদ্ধাচারণের প্রবণতা লক্ষ্য করা গেলে তাকে অবশ্যই এই আনুগত্যের বাইয়াত প্রদানে বাধ্য করা হবে।

ধারা ২৮ - মুসলিমদের নিয়োগ ব্যতীত কেউ খলিফা হতে পারবে না। কেউ খিলাফাহর কর্তৃত্ব দাবী করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তা শরীয়াহ অনুযায়ী হয়, যেমনটি ইসলামের অন্যান্য চুক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

ধারা ২৯ - যে রাষ্ট্র খলিফাহকে চুক্তিমূলক বাইয়াত দেবে তার নিম্নলিখিত শর্ত পূরণ করতে হবে,

ক. রাষ্ট্রটি স্বাধীন হতে হবে এবং এর কর্তৃত্ব সম্পূর্ণভাবে মুসলিমদের উপর নির্ভরশীল হতে হবে, কোন কুফর রাষ্ট্রের উপর নয়।

খ. রাষ্ট্রের মুসলিমদের নিরাপত্তা, internally & externally, সম্পূর্ণরূপে ইসলামের সার্বভৌমত্বের মাধ্যমে নির্ধারিত হতে হবে, কুফর শক্তির মাধ্যমে নয়।

পক্ষান্তরে আনুগত্যের বাইয়াত যে কোন দেশের নিকট হতে নেয়া যেতে পারে যাদের জন্য উপরোক্ত শর্তাবলী আবশ্যকীয় নয়।

ধারা ৩০ - খলিফা হিসাবে বাইয়াত গ্রহণের জন্য কোন ব্যক্তিকে ধারা ৩১ এ বর্ণিত মৌলিক শর্তাবলী পূরণ করতে হবে। তার জন্য বিশেষ কোন শর্তপূরণ বাধ্যতামূলক নয়।

ধারা ৩১ - খলিফা হবার জন্য একজন ব্যক্তির নিম্নোক্ত মৌলিক শর্তাবলী পূরণ করতে হবেঃ পুরুষ, মুসলিম, স্বাধীন, বালেগ, সুস্থ মস্তিষ্ক এবং ন্যায়পরায়ণ।

ধারা ৩২ - যদি মৃত্যু, পদত্যাগ কিংবা বরখাস্ত করার কারণে খলিফা'র পদ শুন্য হয় তবে তা শুন্য হবার তিন দিনের মধ্যে ঐ পদে নতুন খলিফার নিয়োগ দেয়া বাধ্যতামূলক।

ধারা ৩৩ - নিম্নোক্ত প্রক্রিয়ায় খলিফা নির্বাচিত হবেন।

ক. মজলিস উল উম্মাহর মুসলিম সদস্যগণ প্রার্থীদের মনোনয়ন দেবেন। এই মনোনীত প্রার্থীদের নাম জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে। মুসলিমদের এ প্রার্থীদের তালিকা থেকে একজন ব্যক্তিকে নির্বাচিত করার আহ্বান জানানো হবে।

খ. নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করতে হবে। যে ব্যক্তি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পাবেন, তার নাম জনগণের নিকট প্রকাশ করা হবে।

গ. মুসলিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের ভিত্তিতে মনোনীত প্রার্থীকে খলিফা হিসাবে বাইয়াত দিতে হবে যিনি আল্লাহর কিতাব ও রসুলুল্লাহ (সঃ) এর সুন্নাহ প্রয়োগ করবেন।

ঘ. বাইয়াত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে, খলিফার নাম ঘোষিত হবে যাতে করে তার নিয়োগের সংবাদ গোটা উম্মাহর নিকট পৌঁছায়। তার নামের সাথে সাথে একটি বক্তব্য জারি করতে হবে যেখানে তার যোগ্যতার সকল শর্তাবলী পূরণের প্রমাণ থাকবে। এভাবে তিনি রাষ্ট্রের প্রধান হবার উপযুক্ত হবেন।

ধারা ৩৪ - যদিও উম্মাহ খলিফাকে নিয়োগ দেবে কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী বাইয়াত সংঘটিত হবার পর খলিফাকে বরখাস্ত করার কোন অধিকার তার থাকবে না।

ধারা ৩৫ - খলিফা হচ্ছেন রাষ্ট্র। তিনিই রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা অধিকার করেন। কাজেই তার নিম্নোক্ত নির্বাহী ক্ষমতাগুলো রয়েছে।

ক. খলিফা আহকামে শারী'আহ বা শারী'আহ আইন গ্রহণ করবেন । তিনি যখন তা গ্রহণ করেন ও বাস্তবায়ন করেন, তখন তা আইনে পরিণত হয়। এগুলো বাধ্যতামূলক আইন হবে এবং কেউ অমান্য করতে পারবে না।

খ. রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক নীতির জন্য খলিফা দায়িত্বশীল হবেন; তিনি প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হবেন এবং যে কোন যুদ্ধ ঘোষণা, শান্তি চুক্তি সম্পাদন, যুদ্ধ বিরতি চুক্তি ইত্যাদি বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদনের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হবেন।

গ. খলিফা'র বিদেশী দূত গ্রহণ ও প্রত্যাখানের ক্ষমতা থাকবে। তিনি মুসলিম রাষ্ট্রদূতদের নিয়োগ দেন ও বরখাস্ত করেন।

ঘ. খলিফা তার সহকারীগণ ও ওয়ালীগণকে নিয়োগ ও প্রত্যাহার করতে পারবেন। তারা সবাই খলিফা ও মজলিসে উম্মাহর কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।

ঙ. খলিফা কাদী আল কুদা (সর্বোচ্চ/প্রধান বিচারক), সরকারী বিভাগগুলোর পরিচালক, সশস্ত্র বাহিনীর কম্যান্ডার ও জেনারেল ইত্যাদি নিয়োগ দেন কিংবা বরখাস্ত করেন। তাদের সবার দায়বদ্ধতা খলিফার প্রতি, মজলিসে উম্মাহর প্রতি নয়।

চ. খলিফা শারী'আহ্‌র আলোকে রাষ্ট্রের বাজেট প্রণয়ন করবেন এবং প্রত্যেক খাতের রাজস্ব ও ব্যয় নির্ধারণ করেন।

ধারা ৩৬ - আহকাম শরীয়াহ গ্রহণের প্রক্রিয়ায়, খলিফা নিজেও আহকাম শরীয়াহ'র অধীন ও শরীয়াহ দ্বারা সীমাবদ্ধ। কাজেই খলিফা এমন কোন আইন গ্রহণ করতে পারেন না, যা যথাযথ ভাবে শরীয়াহ'র উৎস থেকে গৃহীত হয়নি। তিনি যে আইন গ্রহন করেন এবং আইন গ্রহণের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি ব্যবহার করেন, তার দ্বারা সীমাবদ্ধ। ফলতঃ তিনি তার গৃহীত পদ্ধতি বহির্ভূত বা এর সাথে সাংঘর্ষিক অন্য কোন পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারেন না। তিনি তার গৃহীত কোন আইনের সাথে সাংঘর্ষিক কোন নির্দেশনা দিতে পারেন না।

ধারা ৩৭ - নাগরিকদের বিষয়গুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে খলিফার নিজস্ব মতামত ও ইজতিহাদ অনুসরণ করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। তিনি রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য মুবাহ কাজগুলো গ্রহণ করতে পারেন। তিনি জনগণের মঙ্গলের দোহাই দিয়ে কোন শরীয়াহ আইন ভঙ্গ করতে পারেন না। উদাহরণ স্বরূপ তিনি রাষ্ট্রে শিল্প রক্ষার দোহাই দিয়ে রাষ্ট্রের নাগরিকদের কোন পণ্য আমদানীতে বাধা দিতে পারেন না। ঠকানো রোধ করার দোহাই দিয়ে তিনি মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে দিতে পারেন না। তিনি সম্পদের সীমাবদ্ধতার কথা চিন্তা করে জন্ম নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারেন না। এছাড়াও খলিফা লাভের কথা চিন্তা করে কোন নারী বা অমুসলিম গভর্ণর নিয়োগ দিতে পারেন না। খলিফা কোন হালাল কে নিষিদ্ধ কিংবা কোন হারাম কে আইনসিদ্ধ করতে পারেন না।

ধারা ৩৮ - খলিফার জন্য কোন সময়সীমা নির্ধারিত নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি আহকাম শরীয়াহ মেনে চলছেন এবং তা বাস্তবায়ন করছেন এবং রাষ্ট্রের বিষয়াদি পরিচালনার যোগ্যতা রাখছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি খলিফা থাকার উপযুক্ত। যদি প্রয়োজনীয় শর্তাবলী বা এসকল অবস্থা এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যে তিনি আর খলিফা থাকতে পারেন না, তৎক্ষণাৎ তাকে খলিফার পদ থেকে অপসারণ করা হবে।

ধারা ৩৯ - তিনটি ক্ষেত্র/পরিস্থিতি রয়েছে যা খলিফার অবস্থা পরিবর্তন করতে পারে যা তাকে অযোগ্য হিসাবে প্রমাণিত করবে। এগুলো হচ্ছে,

ক. যদি খলিফা'র কোন একটি মৌলিক বিষয় পরিবর্তিত হয়, যেমন যদি তিনি ইসলাম থেকে বের হয়ে যান, অপ্রকৃতস্থ হয়ে যান কিংবা ফিসক করেন (ফাসিক হয়ে যান) ইত্যাদি। এগুলো খলিফা'র চুক্তি ও তা বলবৎ রাখার জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত।

খ. যদি তিনি কোন কারণে খলিফা'র দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়ে পড়েন।

গ. কোন ঘটনায় অক্ষম প্রমাণিত হলে, যেখানে খলিফা শরীয়াহ মোতাবেক উম্মাহর বিষয়গুলো সমাধান করার ক্ষেত্রে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করতে অক্ষম। যদি খলিফা কোন শক্তির কাছে এমনভাবে নতি স্বীকার করেন যে, জনগণের বিষয়গুলো শরীয়াহ অনুযায়ী সমাধানের জন্য নিজের মতামত প্রকাশ করতে না পারেন, তবে তিনি যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তা পালনে অক্ষম বলে বিবেচিত হবেন। কাজেই তিনি আর খলিফা থাকবেন না। দুটি পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরণের অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে,

১. যদি খলিফার কোন সহকারী, খলিফার ব্যবস্থাপনার বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন। যদি খলিফার তাদের প্রভাব থেকে নিজকে মুক্ত করার সুযোগ থেকে থাকে তবে তাকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সতর্ক করা হবে। উক্ত সময়ের মধ্যে যদি তিনি তাদের প্রভাব থেকে মুক্ত করতে ব্যর্থ হন তবে তাকে বরখাস্ত করা হবে। যদি শুরু থেকে দেখা যায়, তাদের প্রভাব থেকে খলিফার নিজেকে মুক্ত করার কোন সুযোগ নেই তবে তৎক্ষণাৎ তাকে বরখাস্ত করা হবে।

২. যখন খলিফা শত্রুপক্ষের হাতে বন্দী হন, সেটা প্রকৃতার্থে শত্রুর হাতে বন্দী হওয়া কিংবা তাদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া যাই হোক না কেন। এরূপ অবস্থাকে যথাযথভাবে পরীক্ষা করা হবে। যদি এটি প্রতীয়মান হয় যে, তাকে উদ্ধার করার সুযোগ থেকে থাকে তবে তাকে নির্দিষ্ট সময় দেয়া হবে। আর যদি অবস্থা এমন হয় যে, তাকে উদ্ধারের কোন আশা নেই, তবে তাকে বরখাস্ত করা হবে। যদি শুরু থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, তাকে উদ্ধারের কোন আশা নেই তবে তাকে তৎক্ষণাৎ বরখাস্ত করা হবে।

ধারা ৪০ - শুধুমাত্র মাজালিমের আদালত এধরণের অবস্থা বিচার করে খলিফাকে বরখাস্তের আদেশ দিতে পারে। কেবলমাত্র মাজালিম আদালত খলিফাকে বরখাস্ত কিংবা সতর্ক করার কর্তৃত্ব সংরক্ষণ করে।

## প্রতিনিধিত্বমূলক সহকারী (মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ)

ধারা ৪১ - খলিফা মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ নিয়োগ করেন যিনি শাসনের ক্ষেত্রে তাকে সাহায্য করার কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হন। খলিফা তাকে বিভিন্ন বিষয়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেন (নিজস্ব মতামত এবং ইজতিহাদ সহ)।

ধারা ৪২ - মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ হবার জন্য খলিফা হবার অনুরূপ যোগ্যতা প্রয়োজন। এগুলো হচ্ছে, পুরুষ, মুসলিম, পরিণত, প্রকৃতস্থ, স্বাধীন (মুক্ত) এবং ন্যায়পরায়ণ। এর সাথে তাকে প্রদত্ত কাজ পালনের যোগ্যতাও থাকতে হবে।

ধারা ৪৩ - মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ নিয়োগের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন; যথাঃ খলিফার প্রতিনিধিত্ব করা ও শাসন সংক্রান্ত বিষয় পরিচালনা করা। কাজেই একজন সহকারী নিয়োগের ক্ষেত্রে খলিফাকে একটি বক্তব্য দিতে হবে যেখানে তিনি বলবেন "আমার পক্ষে আমি আপনাকে সহকারী হিসাবে নিযুক্ত করছি" অথবা অন্য কোন বক্তব্য যেখানে তার প্রতিনিধিত্ব ও শাসন সংক্রান্ত সাধারণ দায়িত্ব সম্পর্কে পরিষ্কার

করা হবে। কোন ব্যক্তি যদি এ প্রক্রিয়ায় ডেপুটি হিসাবে নিযুক্ত হয়ে না থাকেন তবে তিনি ডেপুটি হিসাবে বিবেচিত হবেন না এবং তার অনুরূপ কোন কর্তৃত্বও থাকবেনা।

ধারা ৪৪ - মুওয়াউয়িন তাফউয়িদের কাজ হচ্ছে খলিফাকে তার কাজ ও তার ক্ষমতার মধ্যে সম্পাদিত বিষয়গুলো সম্পর্কে অবহিত করা। তার এটা করা উচিৎ কারণ তিনি দায়িত্বের দিক থেকে খলিফার সমান নন। কাজেই তার কাজ হচ্ছে খলিফার নিকট বিবরণী পেশ করা (রিপোর্ট করা) এবং তার প্রতি দেয়া আদেশ গুলো কার্যকর করা।

ধারা ৪৫ - মুওয়াউয়িন তাফউয়িদের কাজ ও সিদ্ধান্ত গুলোর প্রতি খলিফার লক্ষ্য রাখা উচিৎ। খলিফা সঠিক কাজগুলোর অনুমোদন দেবেন এবং ভূলগুলো শুধরে দেবেন। এ কাজগুলো করা প্রয়োজন কারণ উম্মাহ'র ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব খলিফার উপর অর্পিত এবং এটি ইজতিহাদের সাথে সম্পর্কিত।

ধারা ৪৬ - যখন মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ খলিফা'র জ্ঞাতসারে কোন বিষয় পরিচালনা করবেন, তখন পরবর্তীতে সংশোধন ছাড়াই তিনি ঐ কাজ করতে পারবেন। যদি মুওয়াউয়িন তাফউয়িদের কোন কৃত কাজকে খলিফা সংশোধন/পুনর্বিবেচনা করেন তখন নিম্নোক্ত শর্ত প্রযোজ্য হবে।

ক. যদি খলিফা কোন কাজে বা খরচে আপত্তি জানান এমন অবস্থায় যখন কাজটির ক্ষেত্রে আইন সঠিক ভাবে প্রয়োগ হয়েছে কিংবা খরচটি ন্যয়সঙ্গত হয়েছে বলে তিনি স্বীকার করেন, তখন ডেপুটি গৃহীত সিদ্ধান্তই বাস্তবায়িত হবে। কারণ কাজটি খলিফার প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে সাযূজ্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে ডেপুটি সহকারীর তার প্রয়োগকৃত আইন কিংবা খরচকে শোধরানোর প্রয়োজন নেই।

খ. যদি ডেপুটি সহকারী অন্য কোন কিছু বাস্তবায়ন করে থাকেন যেমন কোন ওয়ালি নিয়োগ বা কোন স্থানে সেনা মোতায়েন, তখন খলিফা'র উক্ত সিদ্ধান্তকে বাতিল করা বা রদ করার অধিকার রয়েছে। কারণ এ সিদ্ধান্তসমূহ ঐ শ্রেণীতে পরে যেগুলো খলিফার তার নিজস্ব সিদ্ধান্তকেও পূনর্বিবেচনা বা সংশোধন করার অধিকার রয়েছে।

ধারা ৪৭ - মুওয়াউয়িন তাফউয়িদের সাধারণ দায়িত্ব রয়েছে। কাজেই তাকে কোন বিশেষ বিভাগ বা বিশেষ কোন কাজের দায়িত্ব দেয়া উচিৎ নয়। তার প্রশাসনিক কাজে নিজেকে সরাসরি যুক্ত করা ছাড়াই তত্ত্বাবধান করা উচিৎ।

## নির্বাহী সহকারী (মুওয়াউয়িন তানফিজ)

ধারা ৪৮ - খলিফা মুওয়াউয়িন তানফিজ নিযুক্ত করেন। তার কাজ হচ্ছে কার্যনির্বাহ করা, শাসন নয়। তিনি রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন ও বিদেশী বিষয়গুলোতে খলিফার নির্দেশ বাস্তবায়ন করবেন। এ বিষয়গুলোতে তিনি খলিফার কাছে এবং খলিফার কাছ থেকে বার্তা বহনের দায়িত্ব পালন করেন। এ প্রশাসনিক কার্যালয় খলিফা ও অন্যদের মাঝে একটি যোগাযোগ মাধ্যম হিসাবে কাজ করবে।

ধারা ৪৯ - মুওয়াউয়িন তানফিজ-কে অবশ্যই একজন মুসলিম হতে হবে কারণ তিনি খলিফার একজন সহকারী।

ধারা ৫০ - মুওয়াউয়িন তানফিজকেও মুওয়াউয়িন তাফউয়িদের অনুরূপ অবশ্যই খলিফার সরাসরি যোগাযোগের মধ্যে থাকতে হবে। অবশ্য মুওয়াউয়িন তানফিজ শুধুমাত্র নির্বাহী কার্যকলাপে সহকারী হিসাবে কাজ করবেন, শাসনে নয়।

## আমির উল জিহাদ

ধারা ৫১ - আমির উল জিহাদের কার্যালয় চারটি বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত। এগুলো হচ্ছে পররাষ্ট্র বিষয়ক বিভাগ, সেনাবাহিনী ও সশস্ত্র বাহিনী, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ, এবং শিল্প। আমির উল জিহাদ এ চারটি বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক এবং পরিচালক।

ধারা ৫২ - পররাষ্ট্র বিষয়ক বিভাগ সকল পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনা করবেন যা খিলাফত রাষ্ট্র ও অপরাপর রাষ্ট্র গুলোর সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করবে।

ধারা ৫৩ - সেনাবাহিনী ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ সশস্ত্র বাহিনীর সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন পুলিশ, যন্ত্রপাতি, যুদ্ধোপকরণ, সরবরাহ, মিশন এবং অন্যান্য সঙ্গতিপূর্ণ কার্যকলাপ। এর সাথে আরো অন্তর্ভূক্ত থাকবে সামরিক প্রশিক্ষণকেন্দ্র, সামরিক বিশন এবং সশস্ত্র বাহিনীর ইসলামী ও সাধারণ শিক্ষা সংক্রান্ত যে কোন বিষয়। এটি যুদ্ধ ও এর প্রস্তুতি সংক্রান্ত যে কোন বিষয় দেখা শোনা করবে।

ধারা ৫৪ - আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করবে। সশস্ত্র বাহিনী এ কাজের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত এবং তারা পুলিশ বাহিনী কে একাজের জন্য ব্যবহার করবেন।

ধারা ৫৫ - শিল্প বিভাগ শিল্প কারখানা সংক্রান্ত যে কোন নির্দেশনা প্রদান করবে। এ শিল্পের মাঝে ভারী শিল্প যেমন মোটর, ইঞ্জিন এবং গাড়ীর চেসিস নির্মাণ, ধাতব শিল্প, তড়িৎ শিল্প, ইলেক্ট্রনিক্স এবং ব্যবহারযোগ্য শিল্প অন্তর্ভুক্ত। এটি যে সকল ব্যক্তি মালিকানাধীন কারখানা সামরিক নির্ভর পণ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত তাদেরও কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করবে। যে কোন শিল্প কারখানা সামরিক নীতিমালার ভিত্তিতে স্থাপিত হবে।

সশস্ত্র বাহিনী

ধারা ৫৬ - জিহাদ সকল মুসলিমের জন্য ফরজ। সামরিক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক। পনেরো বছর বয়স্ক বা তদোর্ধ প্রতিটি মুসলিম পুরুষের জন্য জিহাদের প্রস্তুতি মূলক সামরিক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক। সেনাবাহিনীতে সক্রিয় ভূমিকা রাখা ফরজ কিফায়া।

ধারা ৫৭ - সশস্ত্র বাহিনীর দু ধরণের সদস্য থাকবে। প্রথমতঃ যারা রাষ্ট্রের বাজেট থেকে বেতনভূক্ত এবং সক্রিয় ভাবে কার্যরত (on active duty), অর্থাৎ অন্যান্য কর্মচারীর অনুরূপ। এবং দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধে সক্ষম সকল মুসলিম নাগরিক অর্থাৎ the Reserves।

ধারা ৫৮ - সেনাবাহিনী একটি একক বাহিনী। পুলিশ বিভাগ এর একটি শাখা যারা বিশেষ শিক্ষার অধীনে বিশেষ উপায়ে প্রশিক্ষিত একটি সংগঠন।

ধারা ৫৯ - পুলিশ বাহিনী রাষ্ট্রের শৃংখলা বজায় রাখা, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা তত্ত্বাবধান এবং আইন প্রয়োগ করার কাজে নিয়োজিত থাকবে।

ধারা ৬০ - সশস্ত্র বাহিনীর নিজস্ব পতাকা ও ব্যনার থাকবে। খলিফা যাকে বাহিনীর অধিনায়ক (চীফ অফ স্টাফ) হিসাবে নিয়োগ দেন তার নিকট পতাকা প্রদান করবেন। ব্যানার সমূহ অন্যান্য বিভাগের অধিনায়কদের নিকট প্রদান করা হবে।

ধারা ৬১ - খলিফা সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক (কম্যান্ডার ইন চীফ)। তিনি বাহিনীর অধিনায়ক, প্রতিটি কর্পের জন্য জেনারেল ও ডিভিশনের জন্য লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়োগ দেবেন। ব্রিগ্রেডিয়ার ও মেজর জেনারেল বাকী পদসমুহে নিয়োগ দেবেন। কমিশন্ড অফিসারগণ তাদের স্বীয় যোগ্যতা অনুযায়ী, বাহিনীর প্রধানদের দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।

ধারা ৬২ - সশস্ত্র বাহিনী একটি একক স্বত্তা। নির্দিষ্ট সামরিক ঘাঁটিতে তার বিভিন্ন ইউনিট অবস্থিত থাকবে। এদের মধ্যে কিছু ঘাঁটি বিভিন্ন উয়িলায়াত (প্রদেশ) এ অবস্থিত থাকবে। কিছু ঘাঁটি কৌশলগত অবস্থানে এবং কিছু আক্রমন কারী শক্তি হিসাবে ভ্রাম্যমান থাকবে। এসব ঘাঁটি বিভিন্ন কাঠামোয় (formations) গঠিত হবে। প্রতিটির একটি বিশেষ নাম্বার ও তার বিপরীতে নাম থাকবে, যেমন প্রথম বাহিনী, দ্বিতীয় বাহিনী ইত্যাদি। কোন কোন বাহিনীর নাম সংশ্লিষ্ট উয়িলায়াত বা 'ইমালা (জিলা) এর নামে হতে পারে।

ধারা ৬৩ - সশস্ত্র বাহিনীকে সম্ভাব্য সর্বোচ্চমাত্রায় প্রশিক্ষিত করার সুযোগ করে দেয়া প্রয়োজন। এ বাহিনীর বুদ্ধিমত্তার মাত্রা যতোটা সম্ভব উচ্চমাত্রায় উন্নীত করা প্রয়োজন। সশস্ত্রবাহিনীর প্রতিটি সদস্যকে ইসলামী শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন যেন তারা প্রত্যেকেই ইসলাম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখেন।

ধারা ৬৪ - প্রতিটি ঘাঁটির যথেষ্ট পরিমাণ কমিশন্ড অফিসার থাকা প্রয়োজন যারা সর্বোচ্চ মাত্রার সামরিক জ্ঞানের অধিকারী এবং পরিকল্পনা প্রনয়ন ও যুদ্ধ পরিচালনায় অভিজ্ঞ। সামগ্রিক ভাবে সশস্ত্র বাহিনীর যত বেশী সম্ভব কমিশন্ড অফিসার থাকা প্রয়োজন।

ধারা ৬৫ - ইসলামী রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী হিসাবে সশস্ত্র বাহিনীকে দক্ষতার সাথে কাজ করতে হলে তাকে যথেষ্ট পরিমাণ যুদ্ধোপকরণ, সরবরাহ এবং যন্ত্রপাতি প্রদান করা প্রয়োজন।

বিচার বিভাগ

ধারা ৬৬ - বিচারকদের দেয়া রায়ই বিচার ক্ষমতা গঠন করে। এটি মানুষের মাঝে বিতর্ক অবসান করে, জনগোষ্ঠীর অধিকার হরণ কারী কোন প্রক্রিয়াকে প্রতিহত করে এবং জনগণ ও সরকারের মাঝে কোন বিবাদকে নির্মূল করে। এক্ষেত্রে বিচার বিভাগ, সরকারী ব্যক্তি, শাসক বা কর্মচারী যেই হোক না কেন, অর্থাৎ সে খলিফা ও তার অধীনস্থ যে কোন ব্যক্তিই হোন না কেন, জনগণের সাথে যে কোন বিবাদ-বিসম্বাদের ফয়সালা করবে।

ধারা ৬৭ - খলিফা প্রধান বিচারপতির নিয়োগ দেন। এই বিচারককে অবশ্যই একজন মুসলিম, পুরুষ, পরিণত, মুক্ত, এবং ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। তাকে অবশ্যই একজন বিচারক হতে হবে। প্রশাসনিক নিয়মের মধ্য থেকে তার একজন বিচারককে নিয়োগদান, বরখাস্ত করা কিংবা নিয়মানুবর্তী করার অধিকার রয়েছে। বাকী কর্মচারীগণ বিচার বিভাগের বিভিন্ন শাখা বা বিভাগের কার্যকলাপে অধীনে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।

ধারা ৬৮ - ইসলামী রাষ্ট্রে তিন ধরণের বিচারক রয়েছে। কাদী আল খুসুমাত (যিনি জনগণের মাঝে লেনদেন ও শাস্তি সংক্রান্ত বিষয় মীমাংসা করেন); কাদী আল হিসবা (মুহতাসিব, যিনি জনসাধারণ্যে আইনভঙ্গের বিচার করেন); কাদী আল মুহকামাত আল মাজালিম (মাজালিম আদালতের বিচারক যিনি জনগণ ও সরকারী ব্যক্তিবর্গের মাঝে বিবাদ মীমাংসা করেন)।

ধারা ৬৯ - প্রতিটি বিচারককে অবশ্যই মুসলিম, পরিণত, স্বাধীন (মুক্ত), প্রকৃতস্থ, ন্যায়পরায়ণ এবং বিচারক হতে হবে। তাদের অবশ্যই বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ও পরিপ্রেক্ষিতে আইন বাস্তবায়ন সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। মাজালিম আদালতের বিচারকদের আরেকটি অতিরিক্ত গুণ থাকতে হবে, তা হচ্ছে তাকে একজন পুরুষ মুজতাহিদ হতে হবে।

ধারা ৭০ - কাদী আল খুসুমাত এবং মুহতাসিবকে গোটা রাষ্ট্র জুড়ে বিচারের রায় প্রদানের জন্য সাধারণ নিয়োগ দেয়া যেতে পারে অথবা তাদের নিয়োগদান যেকোন একটি নির্দিষ্ট স্থান বা মামলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। মাজালিম আদালতের বিচারকদের নিয়োগদান কোন নির্দিষ্ট মামলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারবে না, তবে তাদের নিয়োগ গোটা রাষ্ট্র জুড়ে বা একটি নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে।

ধারা ৭১ - প্রতিটি আদালতে একজন আবাসিক বিচারক থাকা প্রয়োজন যার বিচার করার ক্ষমতা থাকবে। এক বা একাধিক বিচারক তাকে সহায়তা করা কিংবা পরামর্শ দেয়ার জন্য তার সঙ্গী হতে পারেন। তাদের রায় ঘোষণার অধিকার থাকবে না এবং তাদের মতামত অনুসরণ করা আবাসিক বিচারকের জন্য বাধ্যতামূলক নয়।

ধারা ৭২ - আদালতের সেশন ছাড়া একজন বিচারক রায় ঘোষণা করতে পারেন না। স্বাক্ষী ও স্বাক্ষ্যপ্রমাণ কেবল মাত্র যথাযথ আদালতের সেশনের মাধ্যমেই বিবেচনা করা যাবে।

ধারা ৭৩ - মামলার ভিন্নতার ক্ষেত্রে আদালতের মাত্রার (levels of courts) ভিন্নতা থাকতে পারে। কিছু বিচারক কোন এক নির্দিষ্ট মাত্রায় বিশেষ কিছু মামলার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হতে পারেন এবং অন্য আদালতের বিচারকগণ অন্যান্য মামলা বিচার করতে পারেন।

ধারা ৭৪ - আপিল বা খারিজ এর জন্য কোন আদালত থাকবে না। প্রতিটি বিচারই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। যখন কোন বিচারক রায় ঘোষণা করবেন, ততক্ষণাৎ এটি বাস্তবায়ন যোগ্য। অন্য কোন বিচারকের রায় এ সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করতে পারবে না।

ধারা ৭৫ - মুহতাসিব হচ্ছে এমন একজন বিচারক যিনি জনসাধারণ্যে আইনভঙ্গের বিচার করেন এবং যেখানে কোন বাদী (আবেদনকারী) নেই। লক্ষ্য রাখতে হবে যে এই মামলাটি মারাত্মক (felonies) বা হুদুদ সম্পর্কিত নয়।

ধারা ৭৬ - যখন এবং যেখানেই আইন লংঘন হবে ততক্ষণাৎ মুহতাসিব এর তা বিচারের ক্ষমতা রয়েছে। তার রায় ঘোষণার জন্য কোন আদালতের প্রয়োজন নেই। মুহতাসিবের অধিকারে কিছু সংখ্যক পুলিশ থাকবে যারা তার নির্দেশ বাস্তবায়ন করবেন এবং ততক্ষণাৎ বিচারের রায় কার্যকর করবেন।

ধারা ৭৭ - মুহতাসিবের তার সহকারী নিয়োগদানের ক্ষমতা রয়েছে। এ সহকারীর মুহতাসিবের অনুরূপ যোগ্যতা থাকতে হবে। তিনি তাদের বিভিন্ন স্থানে নিয়োগ দিতে পারেন। এ সকল সহকারীর তাদের জন্য নির্ধারিত মামলা ও স্থানে মুহতাসিবের সমান অধিকার থাকবে। (তাদের সীমার মধ্যে)

ধারা ৭৮ - মাজালিম আদালতের বিচারক খলিফা বা সরকারী কর্মচারীদের যে কোন অন্যায় কাজ প্রতিকার/বিচার করার দায়িত্বে নিয়োগপ্রাপ্ত। খলিফা কিংবা যে কোন সরকারী কর্মচারীর রাষ্ট্রের অধিবাসী নাগরিক কিংবা অনাগরিক, যে কোন ব্যক্তির প্রতি যে কোন প্রকার অন্যায়ের বিচার করার দায়িত্ব মাজালিম আদালতের বিচারকের।

ধারা ৭৯ - মাজালিম আদালতের বিচারকবর্গ খলিফা কিংবা প্রধান বিচারক কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন। খলিফা তার কাজের মূল্যায়ন করেন এবং তাকে নিয়মানুবর্তী করেন। যদি প্রয়োজন হয় এবং খলিফা যদি যথাযথ কর্তৃত্ব দিয়ে থাকেন, তবে এটি মাজালিম আদালতের দ্বারাও হতে পারে।

অবশ্য যদি কোন মামলায় খলিফা, তার সহকারী কিংবা প্রধান বিচারপতি জড়িত থাকেন তবে তারা ঐ সময় মাজালিম আদালতের বিচারককে বরখাস্ত করতে পারবেন না।

ধারা ৮০ - মাজালিম আদালতে নিয়োগের ক্ষেত্রে বিচারকের সংখ্যার কোন সীমাবদ্ধতা নেই। খলিফা অন্যায় প্রতিকার করার জন্য যত সংখ্যক বিচারক প্রয়োজন, তত জন বিচারকের নিয়োগ দিতে পারেন। যদিও কোন বিচারিক সেশনে একাধিক বিচারক উপস্থিত থাকতে পারেন, কিন্তু একজন বিচারকেরই রায় দেবার অধিকার থাকবে। বাকী বিচারকগণ আলোচনা বা পরামর্শ দিতে পারেন মাত্র। তাদের পরামর্শ বিচারকের রায়ের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা আরোপ করবে না।

ধারা ৮১ - মাজালিম আদালতের খলিফাসহ যে কোন শাসক, গভর্ণর অথবা সরকারী কর্মচারীকে বরখাস্ত করার অধিকার রয়েছে।

ধারা ৮২ - মাজালিম আদালতের সরকারী কর্মচারীর সাথে সম্পর্কিত যে কোন মামলা কিংবা খলিফার আহকাম শরীয়াহ লংঘনের বিষয়ে তদন্ত করার অধিকার রয়েছে। এছাড়াও তার খলিফার কোন শরীয়াহর বক্তব্যের ব্যখ্যা, সংবিধানে আইন সংক্রান্ত লিপি কিংবা কানুনের বিষয়ে তদন্ত করার অধিকার রয়েছে। The court also oversees situations involving levying of a tax.

ধারা ৮৩ - মাজালিম আদালতের বিচারকের একটি আদালত সেশনের প্রয়োজন নেই। বিবাদীকে আদালতে উপস্থিত করার বাধ্যবাধকতা নেই বিধায় মামলার কোন বাদীরও প্রয়োজন নেই। মাজালিম আদালতের যে কোন অবিচারের প্রতি লক্ষ্য করা ও বিচারের অধিকার রয়েছে যদিও কোন ব্যক্তি এ বিষয়টি আদালতে না এনে থাকেন।

ধারা ৮৪ - প্রতিটি বিবাদী এবং বাদীর একজন প্রতিনিধি নিয়োগের অধিকার রয়েছে। এ প্রতিনিধি একজন পুরুষ বা নারী , মুসলিম কিংবা অমুসলিম হতে পারেন। তার এবং তার প্রতিনিধির মাঝে কোন পার্থক্য থাকবে না। The proxy can be appointed with a wage agreed upon between the person and his/her proxy.

ধারা ৮৫ - কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে ব্যক্তিগত দায়িত্বপ্রাপ্ত (private assignment) হলে, যেমন কার্যনির্বাহক (executor), রক্ষণাবেক্ষণকারী (custodian) বা অভিভাবক (guardian); অথবা কোন বিষয়ে পাবলিক দায়িত্বপ্রাপ্ত (public assignment) হলে, যেমন খলিফা, শাসক বা সরকারী কর্মচারী, একজন মাজালিম বিচারক অথবা মুহতাসিব - তিনি তার পক্ষে একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারবেন। তবে তাকে অবশ্যই উল্লেখিত ক্ষমতার গন্ডীর ভিতর থাকতে হবে - অর্থাৎ তিনি একজন কার্যনির্বাহক, রক্ষণাবেক্ষণকারী, অভিভাবক, রাষ্ট্রের প্রধান, শাসক, কর্মচারী, মাজালিম বিচারক অথবা একজন মুহতাসিব হিসাবে তার পক্ষে একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারবেন। বাদী বা বিবাদী উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রতিনিধি নিয়োগের সুযোগ রয়েছে।

প্রাদেশিক গভর্ণর

ধারা ৮৬ - ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্গত অঞ্চল কতগুলো এককে (units) বিভক্ত, এগুলো হচ্ছে উয়িলায়াত বা প্রদেশ।প্রতিটি উয়িলায়াহ আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত, যথা: 'ইমালাত (জেলা)। যিনি উয়িলায়াত পরিচালনা করেন, তিনি ওয়ালি বা আমির। এবং যিনি 'ইমালাহ পরিচালনা করেন তিনি 'আমিল (সাব-গভর্ণর)।

ধারা ৮৭ - খলিফা ওয়ালি এবং 'আমিল নিয়োগ দেন। ওয়ালি যদি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন, তবে তিনি 'আমিল নিয়োগ দিতে পারেন। ওয়ালি এবং 'আমিল হবার জন্য খলিফার অনুরূপ যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। তাদের অবশ্যই মুসলিম, পুরুষ, মুক্ত (স্বাধীন), প্রকৃতস্থ, ন্যায়পরায়ণ এবং প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে। স্ব স্ব দায়িত্বে অবশ্যই তাদের দায়িত্বশীল হতে হবে। তাদেরকে পরহেজগার ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে নিয়োগ করতে হবে এবং তা হতে হবে চূড়ান্ত।

ধারা ৮৮ - ওয়ালিগণ খলিফার প্রতিনিধি হিসাবে তাদের অধীনস্থ প্রদেশের বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রমের মুল্যায়ন, শাসন ও তত্ত্বাবধান করার কর্তৃত্ব রয়েছে।প্রদেশের ওয়ালিগণের রাষ্ট্রের নিয়োগপ্রাপ্ত মুওয়াউয়িন তাফউয়িদের (ডেপুটি সহকারীদের) অনুরূপ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব রয়েছে। অর্থ, বিচার বিভাগ এবং সশস্ত্র বাহিনী ছাড়া, প্রদেশের জনগণের উপর তার আদেশ দেবার অধিকার ও বিভিন্ন বিষয় নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রয়েছে। অবশ্য তার পুলিশের উপর নির্বাহী ক্ষমতা রয়েছে, প্রশাসনিক ক্ষমতা নয়।

ধারা ৮৯ - ওয়ালি তার ক্ষমতার মধ্যে থেকে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন তা খলিফাকে জানাতে বাধ্য নন।অবশ্য তিনি ইচ্ছা করলে তা করতে পারেন। কিন্তু যদি কোন নতুন ও অসাধারণ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তবে তার পূর্বেই খলিফাকে জানানো উচিৎ। এরপর তিনি খলিফার নির্দেশনা

অনুযায়ী সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হতে পারেন। যদি অপেক্ষার ফলে কোন ক্ষতির আশংকা থাকে তবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার পর তিনি খলিফাকে অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করবেন এবং তার গৃহীত পদক্ষেপ ও পূর্বে না জানানোর কারণ ব্যখ্যা করবেন।

ধারা ৯০ - প্রতিটি প্রদেশের তার জনগণের দ্বারা নির্বাচিত একটি সংসদ থাকবে যার শীর্ষে থাকবেন উক্ত প্রদেশের ওয়ালি। এ সংসদের প্রশাসনিক বিষয়ে মতামত দেয়ার অধিকার থাকবে, কিন্তু শাসন সম্পর্কিত বিষয়ে নয়। সংসদের এসকল মতামত ওয়ালি মানতে বাধ্য নন।

ধারা ৯১ - কোন একটি নির্দিষ্ট প্রদেশে ওয়ালির কার্যালয়ে তার উপস্থিতির সময়সীমা খুব দীর্ঘ হবে না। যখনই তার অবস্থান শক্ত হবে কিংবা জনগণ তাকে প্রশংসা করতে থাকবে, তখনই উক্ত স্থান থেকে তাকে অপসারিত করা হবে।

ধারা ৯২ - ওয়ালির নিয়োগ একটি নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ ও সাধারণ দায়িত্বের অন্তর্গত। ওয়ালি এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে স্থানান্তরিত হবেন না। তাকে প্রথমে দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দেয়া হবে এবং তারপর প্রয়োজন বোধে তাকে অন্যত্র পূণ:নিয়োগ দেয়া যেতে পারে।

ধারা ৯৩ - খলিফা ইচ্ছা করলে কিংবা মজলিস উল উম্মাহ অসন্তোষ প্রকাশ করলে, খলিফা ওয়ালিকে দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দিতে পারেন। এক্ষেত্রে তা যথাযথ কিনা অথবা অধিকাংশ লোক তার প্রতি অসন্তুষ্ট কি না, তা বিবেচ্য নয়। যেকোন ঘটনায়ই অব্যহতি বা বরখাস্তের আদেশ খলিফার নিকট থেকে আসতে হবে।

ধারা ৯৪ - খলিফার ওয়ালিদের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা উচিৎ। খলিফার পর্যায়ক্রমে তাদের (ওয়ালিদের) সাফল্য/ কৃতিত্ব মূল্যায়ন করা উচিৎ এবং assign people to periodically check on them। তার ব্যক্তিগত কিংবা সমষ্টিগতভাবে ওয়ালিদের সাথে সাক্ষাৎ করা উচিৎ। খলিফার ওয়ালিদের বিরুদ্ধে জনগণের কোন অভিযোগ বা মতামত থাকলে তা নিয়মিত শোনা উচিৎ।

## প্রশাসনিক ব্যবস্থা

ধারা ৯৫ - সরকারের বিভিন্ন বিষয়ের ব্যবস্থাপনা এবং জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো প্রশাসন, দপ্তর (ব্যুরো) ও বিভাগ সমূহ সম্পাদন করবে। এসকল প্রতিষ্ঠান সরকারের দায়িত্ব পালন করেন এবং জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ করেন।

ধারা ৯৬ - প্রশাসনিক নীতিমালা প্রণীত হবে জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সারল্য, দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতার উপর ভিত্তি করে এবং যারা এ কাজটি বাস্তবায়ন করবেন তাদের যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে।

ধারা ৯৭ - যে কোন যোগ্য নাগরিক, পুরুষ বা নারী, মুসলিম বা অমুসলিম, যে কোন প্রশাসন, ব্যুরো বা বিভাগের সচিব নিযুক্ত হতে পারেন।

ধারা ৯৮ - সকল প্রশাসনের একজন পরিচালক থাকবেন। প্রতিটি ব্যুরো ও বিভাগের একজন বিভাগীয় প্রধান থাকবেন। বিভাগীয় প্রধানগণ প্রশাসনিক বিষয়ের পরিচালকের নিকট তথ্য বিবরণী (রিপোর্ট) পেশ করবেন। এরা আবার প্রত্যেকেই প্রশাসনিক অধ্যাদেশ বা জন আদেশ ভেদে ওয়ালি বা 'আমিল এর নিকট দায়বদ্ধ।

ধারা ৯৯ - পরিচালকবৃন্দ, কার্যালয় সমূহ, এবং বিভাগীয় প্রধানগণ প্রশাসনিক নিয়মকানুন সংক্রান্ত বিষয়ের কারণে বরখাস্ত হতে পারেন। তাদের একস্থান থেকে অন্যত্র স্থানান্তর করা বা সাময়িক বরখাস্ত করার অনুমতি রয়েছে। প্রতিটি প্রশাসনের, ব্যুরো অথবা বিভাগের প্রধান হিসাবে যার চূড়ান্ত ক্ষমতা রয়েছে তিনি এসকল পরিচালকবৃন্দের নিয়োগ, বরখাস্ত, স্থানান্তর, সাময়িক বরখাস্ত এবং নিয়মানুবর্তী করার অধিকার রয়েছে।

ধারা ১০০ - প্রশাসন বা ব্যুরো প্রধান ব্যতীত সরকারী চাকুরীজীবিদের (সিভিল সার্ভেন্টস) নিয়োগ, স্থানান্তর, সাময়িক বরখাস্ত, প্রশ্নবিদ্ধ করণ, নিয়মানুবর্তী অথবা বরখাস্ত করার অধিকার রয়েছে প্রশাসনিক বা বিভাগীয় পরিচালকবৃন্দের।

## মাজলিস উল উম্মাহ

ধারা ১০১ - মজলিস উল উম্মাহ এমন সব ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত হবে যারা যখন জিজ্ঞাসিত হবেন, তখন মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গী খলিফার নিকট প্রকাশ করবেন। অমুসলিমগণও মজলিস উল উম্মাহর সদস্য হতে পারবেন; ফলে তারা তাদের উপর সংঘটিত কোন অবিচার কিংবা ইসলামী আইনের কোন অপব্যবহার সম্পর্কে তাদের বক্তব্য পেশ করতে পারবেন।

ধারা ১০২ - মজলিস উল উম্মাহর সদস্যগণ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন।

ধারা ১০৩ - প্রতিটি নাগরিকের মজলিস উল উম্মাহ সদস্য হবার যোগ্যতা রয়েছে। এক্ষেত্রে তাকে পরিণত, প্রকৃতস্থ হতে হবে। এটি মুসলিম - অমুসলিম, পুরুষ-নারী নির্বিশেষে প্রযোজ্য। অবশ্য অমুসলিমদের সদস্যপদ তাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত কোন অবিচার বা ইসলামী আইনের অপপ্রয়োগ সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

ধারা ১০৪ - শুরা হচ্ছে যে কোন মতমত প্রকাশের অনুরোধ মাত্র। মাশুরা একটি বাধ্যতামূলক মতামতের অনুরোধ। আইনপ্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়, সংজ্ঞা, বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয় যেমন তথ্যের পরীক্ষণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মাশুরা'র অন্তর্ভুক্ত নয়। বাকী সকল বিষয় মাশুরার অন্তর্গত।

ধারা ১০৫ - মুসলিম, অমুসলিম নির্বিশেষে সকল নাগরিক তাদের মতামত/দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু শুরা কেবলমাত্র মুসলিমদের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

ধারা ১০৬ - মাশুরার অন্তর্গত প্রতিটি ইস্যুই সঠিক বা ভ্রান্ত যাই হোক না কেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত হবে। শুরার সকল বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ বা লঘিষ্ঠ যাই হোক না কেন, সঠিক মতামতটি খোঁজার চেষ্টা করা হবে।

ধারা ১০৭ - মাজলিস উল উম্মাহ চারটি বিষয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত। এগুলো হচ্ছেঃ

১. ক. মাশুরার অন্তর্গত বিষয়, যথা শাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে মাজলিসের মতামত অনুসরণ করতে হবে। অন্যান্য বিষয় যেমন পররাষ্ট্র নীতি, অর্থসংস্থান (ফিনান্স) এবং সশস্ত্র বাহিনীর ক্ষেত্রে মজলিস উল উম্মাহর মতামত অনুসরণ বাধ্যতামূলক নয়।

খ. সরকারের গৃহীত সকল পদক্ষেপ বিষয়ে প্রশ্ন করা, তা আভ্যন্তরীন কিংবা বহিস্থ ব্যাপার হোক বা অর্থসংস্থান বা সামরিক বিষয়ই হোক না কেন। যে সকল বিষয়ের সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে হয়ে থাকে, সে সব স্থানে মজলিস উল উম্মাহর মতামত গ্রহণ বাধ্যতামূলক। যে সকল স্থানে সংখ্যা গরিষ্ঠ মতামত চাওয়া হয়না, সে সকল স্থানে মজলিসের দৃষ্টিভঙ্গী বাধ্যতামূলক নয়। কোন বিষয়ে শরীয়াহ দৃষ্টিকোণ থেকে মজলিস উল উম্মাহ ও শাসকবৃন্দ মতানৈক্যে উপনীত হলে, মাহকামাতুল মাজালিম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

২. মজলিস উল উম্মাহ খলিফার নিকট তাদের গভর্ণর ও সহকারীদের ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে মজলিসের মতামত গ্রহণ বাধ্যতামূলক। খলিফা তৎক্ষণাৎ তাদের বরখাস্ত করবেন।

৩. খলিফার গৃহীত আইন, সংবিধান ও নির্দেশনা সংক্রান্ত বিষয়গুলো আলোচনা ও প্রকাশ করার জন্য খলিফা মজলিসের সাথে আলোচনা করতে পারেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে তাদের মতামত গ্রহণ বাধ্যতামূলক নয়। অবশ্য শুধুমাত্র মুসলিম সদস্যদেরই এ বিষয়ে মতামত প্রকাশের অধিকার থাকবে।

৪. মজলিসের মুসলিম সদস্যদের খলিফাপদে প্রার্থী মনোনয়ন দেয়ার বিশেষ ক্ষমতা থাকবে। কোন প্রার্থীই মজলিসের মনোনয়ন ব্যতীত দাড়াতে পারবে না। এক্ষেত্রে মজলিসের সিদ্ধান্ত অনুসরন করা বাধ্যতামূলক।

## সামাজিক ব্যবস্থা

ধারা ১০৮ - একজন নারী প্রধানত একজন মা ও গৃহবধু। তিনি একজন মর্যাদার পাত্র এবং তাকে অবশ্যই সুরক্ষিত রাখা বাধ্যতামূলক।

ধারা ১০৯ - পুরুষ এবং নারীকে মৌলিকভাবে পৃথক রাখা উচিৎ। শরীয়াহ অনুমোদিত প্রয়োজন ব্যতীরেকে তাদের মেলামেশা করা অনুচিত। মেলামেশার ক্ষেত্রে শরীয়াহ অনুমোদিত কারণ থাকতে হবে, যেমন ক্রয়-বিক্রয় এবং হজ্জ।

ধারা ১১০ - নারী ও পুরুষকে পৃথকভাবে প্রদত্ত কিছু ব্যতিক্রমী বিশেষ অধিকার ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের অধিকার ও দায়িত্ব সমান। এ ধরণের ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে শরীয়াহর প্রমাণ থাকতে হবে। নারীর ব্যবসা, খামার, শিল্প, চুক্তি করা, ব্যবসায়িক লেনদেন চুক্তি করা, সকল প্রকার ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তি অর্জন করা, তার কিংবা তার প্রতিনিধির মাধ্যমে নিজস্ব অর্থ লগ্নীকরণ এবং জীবনের সকল বিষয় চালনা করার অধিকার রয়েছে।

ধারা ১১১ - নারীরা খলিফাকে বাইয়াত দেবার মাধ্যমে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারে। তারা মজলিস উল উম্মাহর সদস্য হতে পারে। তারা রাষ্ট্রের কর্মচারীও নিযুক্ত হতে পারে।

ধারা ১১২ - একজন নারীর জন্য শাসন দায়িত্ব গ্রহণ করার অনুমতি নেই। একজন নারী খলিফা, ওয়ালি, 'আমিল এর পদ গ্রহণ করতে পারবেন না এবং তিনি শাসন কাজ কিংবা অনুরূপ কোন কাজ করতে পারবেন না।

ধারা ১১৩ - জনসমক্ষে ও ব্যক্তিগত জীবনের উভয়ক্ষেত্রেই নারীর কার্যক্রম রয়েছে। জনসমক্ষে নারীরা অন্য নারী, মাহরিম পুরুষ এবং অন্য পুরুষদের সামনে উপস্থিত হতে পাওে; উল্লেখ্য যে, তাদের মুখমন্ডল ও হাত ব্যতীত শরীরের কোন অংশই প্রকাশিত হবে না। প্ররোচণা সূলভ আচরণ বা পোষাক অনুমিত নয়। ব্যক্তিগত জীবনে নারীরা অন্য নারী কিংবা মাহরিম পুরুষের সাথে বসবাস করতে পারে। উভয়ক্ষেত্রেই শরীয়াহ আইন মেনে চলতে হবে।

ধারা ১১৪ - একজন গাইর-মাহরিম পুরুষ ও একজন নারীর কোন মাহরিম ব্যতীত নির্জনে (খুলওয়া) থাকা অনুমিত নয়। (তাবারুজ), মেকআপ (সাজ সজ্জা) এবং পোষাক যা অন্য পুরুষকে আকর্ষণ করে কিংবা শরীরের অংশ প্রকাশ করে তা গাইর-মাহরিম পুরুষের সামনে পরিধান করার অনুমতি নেই।

ধারা ১১৫ - পুরুষ ও নারীর একত্রে এমন কোন কাজ বা পেশা গ্রহণ করা উচিৎ নয় যা সমাজের মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে কিংবা সমাজে অবক্ষয় সৃষ্টি করে।

ধারা ১১৬ - বিবাহ হচ্ছে প্রশান্তি ও সাহচর্যীয় জীবন। কাজেই স্ত্রীর প্রতি একজন স্বামীর দায়িত্ব হচ্ছে দেখা-শোনা করা ও যত্ন করা (take care), শাসন নয়। স্ত্রীকে অনুগত হওয়া ও স্বামীকে রিজিকের ব্যবস্থা করার (provide) দায়িত্ব পালন করতে হবে।

ধারা ১১৭ - স্বামী ও স্ত্রীর সাংসারিক কাজ সম্পন্নের ক্ষেত্রে একে অপরের প্রতি সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করা আবশ্যক। স্বামী গৃহের বাইরের সকল কাজ করবেন। স্ত্রী সাধারণত তার সাধ্যমত গৃহাভ্যন্তরে সম্পাদিত কাজগুলোর দায়িত্ব নেবেন। স্ত্রীর জন্য দুরূহ কাজে তাকে সাহায্যের স্বামীকে প্রয়োজন অনুসারে একজন দাসীর ব্যবস্থা করতে হবে।

ধারা ১১৮ - শিশুদের সংরক্ষণ (custody), মুসলিম বা অমুসলিম নির্বিশেষে, একটি মায়ের অধিকার ও দায়িত্ব। এবং এটি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রযোজ্য যতক্ষণ পর্যন্ত শিশুটির তার মাকে প্রয়োজন। যখন শিশুর (ছেলে বা মেয়ে) যত্নের প্রয়োজন হবেনা, তখন তারা তাদের পছন্দ অনুযায়ী অভিভাবকের সাথে বসবাস করতে পারে। এটি তখনই প্রযোজ্য হবে যখন উভয় অভিভাবকই মুসলিম। যদি অভিভাবকদের একজন মুসলিম ও অপরজন অমুসলিম হয়, তবে শিশুটিকে মুসলিম অভিভাবকের সাথে বসবাস করতে হবে এবং এক্ষেত্রে অন্য কোন সুযোগ নেই।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

ধারা ১১৯ - Economic policy is the view of what the society ought to be when addressing the satisfaction of its needs. Therefore what the society ought to be is taken as the basis for satisfying the needs.

ধারা ১২০ - অর্থনৈতিক সমস্যা হচ্ছে সকল নাগরিকের নিকট সম্পদ (ফান্ড) ও লাভের বন্টন; যাতে করে তারা এগুলো অর্জন করতে পারে এবং যার জন্য তারা কাজ করে।

ধারা ১২১ - রাষ্ট্রের অবশ্যই প্রতিটি ব্যক্তির মৌলিক চাহিদার সামগ্রিক পরিপূর্ণতার নিশ্চয়তা দিতে হবে। রাষ্ট্রকে প্রতিটি ব্যক্তির বিলাসের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মাত্রায় তুষ্টির সুযোগ করে দিতে হবে।

ধারা ১২২ - সম্পদের মালিক আল্লাহ। তিনি মানুষকে এটি ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছেন। তার অনুমতিক্রমে মানুষের সম্পদ অর্জনের অধিকার রয়েছে। আল্লাহ প্রতিটি ব্যক্তিকে সম্পদ অর্জন করার অনুমতি দিয়েছেন। এই বিশেষ অনুমতির সুযোগে ব্যক্তি সম্পদ অর্জন করতে পারে।

ধারা ১২৩ - তিন ধরণের মালিকানা রয়েছে। যথা: ব্যক্তি মালিকানা, জন মালিকানা ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা।

ধারা ১২৪ - ব্যক্তিগত মালিকানার ব্যাপারে হুকুম শরঈ রয়েছে, যা নিশ্চিত করে যে, ব্যক্তি তার অধিগৃহীত বস্তু বা লাভ সুবিধাজনক যে কোন উপায়ে তা বিক্রী বা ব্যবহার করতে পারে।

ধারা ১২৫ - জন মালিকানাধীন সম্পদ হচ্ছে জনগোষ্ঠী কর্তৃক অধিকৃত বস্তুর সুফল ভোগ ও ব্যবহারের শরঈ অনুমতি।

ধারা ১২৬ - প্রতিটি সম্পদ যার ব্যাপারে শুধুমাত্র খলিফার ইজতিহাদের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় তা রাষ্ট্রের সম্পদ হিসাবে বিবেচিত। যথা সাধারণ কর, খারাজ এবং জিযিয়া লব্ধ সম্পদ।

ধারা ১২৭ - ব্যক্তি মালিকানাধীন তরল (liquid) ও নির্দিষ্ট (fixed) সম্পদ অর্জন নিম্নলিখিত শরীয়াহ কারণ দ্বারা সীমিতঃ

ক. কাজ
খ. উত্তরাধিকার
গ. অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান
ঘ. রাষ্ট্রের নিজস্ব সম্পদ থেকে নাগরিকের প্রতি অনুদান
ঙ. কোন প্রচেষ্টা ছাড়া ব্যক্তির অর্জিত সম্পত্তি

ধারা ১২৮ - সম্পদের ব্যবহার শরীয়াহর অনুমতি দ্বারা সীমিত। এটি খরচ ও লগ্নীকরণ উভয়ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অপচয়, অপব্যয় এবং কৃপণতা নিষিদ্ধ। পুঁজিবাদী কোম্পানী, কো অপারেটিভ এবং সকল প্রকার অনৈতিক লেনদেন যথা রিবা (সুদ), জালিয়াত, একচ্ছত্র অধিপতি (মনোপলি), জুয়া এবং অনুরূপ লেনদেন নিষিদ্ধ।

ধারা ১২৯ - আল উশরিয়াহ ভূমি হচ্ছে আরব বদ্বীপ ও যেসকল ভূমির অধিবাসীগণ ইসলাম গ্রহণ করেছে। আল খারাইজ ভূমি হচ্ছে আরব বদ্বীপ ব্যাতিত অন্যান্য ভূমি যা রাষ্ট্র জিহাদ বা শান্তি চুক্তির মাধ্যমে অধিগ্রহণ করেছে। আল উশরিয়াহ ভূমি ও তার লাভ ব্যক্তির মালিকানার অন্তর্ভূক্ত। আল খারাইজ ভূমি রাষ্ট্রের মালিকানাধীন। ব্যক্তি এর সুফল ভোগ করে থাকে। প্রতিটি ব্যক্তির শরীয়াহ চুক্তির মাধ্যমে আল উশরিয়াহ ভূমি ও আল খারাইজ ভূমির সুফল বিনিময় করার অধিকার রয়েছে। অন্যান্য সম্পত্তির মত এ সকল সম্পত্তিরও উত্তরাধিকার রয়েছে।

ধারা ১৩০ - যে কোন ব্যক্তি সীমানা প্রাচীর বা চিহ্নিতকরণের ঘোষণার মাধ্যমে পতিত ভূমির পূণঃমালিকানা দাবী করতে পারে। অন্যান্য ভূমিগুলো কেবলমাত্র শরীয়াহ অনুযায়ী অধিগ্রহণ করা যায়, যেমন উত্তরাধিকার, ক্রয় বিক্রয় অথবা রাষ্ট্র থেকে অনুদান প্রাপ্ত সূত্রে।

ধারা ১৩১ - আল উশরিয়াহ কিংবা আল খারাইজ ভূমি, চাষাবাদের জন্য বর্গা দেয়া নিষিদ্ধ। গাছ বপন করা জমির share cropping অনুমতি রয়েছে। অন্য কোন ভূমির share cropping অনুমতি নেই।

ধারা ১৩২
প্রতিটি জমির মালিকের তার জমির যথার্থ ব্যবহার বাধ্যতামূলক। এ কাজের জন্য অভাবী ব্যক্তিদের বাইতুল মাল থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দেয়া হয়। কেউ যদি তার জমি তিনবছরের অধিক অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে রাখে তবে তার নিকট হতে তা নিয়ে অন্য ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়া হয়।

ধারা ১৩৩ - নিম্নলিখিত তিনটি বিষয় জনমালিকানা নিশ্চিত করেঃ
ক. সর্ব সাধারণের সেবামূলক স্থান, যথা শহরের উন্মুক্ত স্থান (স্কয়ার), রাস্তা ঘাট ও সেতু (ব্রীজ)
খ. খনিজ সম্পদ, যেমন তৈল ক্ষেত্র
গ. যে সকল বস্তু প্রকৃতিগতভাবেই ব্যক্তিমালিকানাধীন হবার অনুপযুক্ত, যথা নদী

ধারা ১৩৪ - কারখানা গুলো সাধারণভাবে ব্যাক্তি মালিকানধীন। অবশ্য প্রতিটি কারখানা পণ্য উৎপাদনের নীতিমালা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যদি উৎপাদিত পণ্যগুলো হয় ব্যক্তি মালিকানাধীন, তবে কারখানাটি ব্যক্তি মালিকানধীন বলে বিবেচিত হবে, যথাঃ একটি বস্ত্র/সুতা কারখানা। যদি উৎপাদিত পণ্যগুলো জনমালিকানাধীন হয়, যেমন লৌহ নিষ্কাশন শিল্প, তবে তা জনমালিকানাধীন হিসাবে বিবেচিত হবে।

ধারা ১৩৫ - রাষ্ট্রের ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পদকে জনমালিকানাধীন সম্পদে পরিণত করার কোন অধিকার নেই। কারণ, জনমালিকানাধীন সম্পদ তার প্রকৃতি ও গুণাবলীর মাধ্যমে নির্ধারিত হয়, রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে নয়।

ধারা ১৩৬ - জনমালিকাধীন সম্পদ থেকে প্রতিটি ব্যক্তির সুফল ভোগ করার অধিকার রয়েছে। রাষ্ট্রের অন্যান্য নাগরিককে বাদ দিয়ে কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা ব্যাক্তিবর্গকে জনমালিকানাধীন সম্পদ ব্যবহার কিংবা অধিকার করার অনুমতি দেয়ার অধিকার নেই।

ধারা ১৩৭ - জনগণের স্বার্থ রক্ষার্থে রাষ্ট্র যে কোন মালিকানাহীন জমিকে নিজের বলে দাবী করতে পারে। যেমন পতিত জমি অথবা অন্য কোন জনমালিকানাধীন সম্পত্তি।

ধারা ১৩৮ - সম্পদের পুঞ্জীভূত করণ নিষিদ্ধ, যদিও বা তার উপর যাকাত দেয়া হয়।

ধারা ১৩৯ - শরীয়াহ নির্ধারিত উপায়ে মুসলিমদের সম্পদের উপর থেকে যাকাত আদায় করা হয়। (যথাঃ অর্থ, মালপত্র, প্রাণীজ সম্পদ এবং শস্য) শরীয়াহ কর্তৃক নির্ধারিত নয় এমন কোন বিষয়ের উপর যাকাত নেয়া হয় না। যাকাত প্রতিটি মালিকের কাছ থেকে আদায় করা হয়, সে আইনত দায়বদ্ধ (পরিণত ও প্রকৃতস্থ) হোক কিংবা না হোক (অপরিণত ও অপ্রকৃতস্থ)। এটি বাইতুল মালের একটি বিশেষ একাউন্টে জমা করা হয়। যাকাত শুধুমাত্র কুরআনে বর্ণিত আটটি খাতগুলোর একটি বা একাধিক খাতে ব্যয় করা যায়।

ধারা ১৪০ - জিযিয়া আদায় করা হয় জিম্মিদের নিকট থেকে। এটি পরিণত পুরুষদের নিকট থেকে নেয়া হয় যদি তারা অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম হয়। এটি নারী কিংবা শিশুদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

ধারা ১৪১ - খারাজ (ভূমি-কর) আল খারাইজ ভূমি থেকে এর শস্য উৎপাদনের সম্ভাবনা অনুযায়ী সংগ্রহ করা হয়। আল উশরিয়া জমির উৎপাদনের উপর যাকাত দেয়া হয়।

ধারা ১৪২ - মুসলিমরা শরীয়াহ অনুমোদিত কর দিয়ে থাকে যা বাইতুল মালের খরচ মিটানোর জন্য ব্যয় হয়। এটি শুধুমাত্র ব্যক্তির প্রয়োজনের চাইতে অতিরিক্ত সম্পদের উপর আরোপ করা হয়। এ করের মাত্রা রাষ্ট্রের চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট হতে হবে। অমুসলিমগণ জিযিয়া ছাড়া অন্য কোনরূপ কর দেয় না।

ধারা ১৪৩ - যদি শরীয়াহ'র দৃষ্টিকোণ থেকে কোন নির্দিষ্ট কাজ উম্মাহর উপর দায়িত্ব হয়ে পড়ে এবং উক্ত কাজ করার জন্য বাইতুল মালে অর্থ না থাকে তবে শরীয়াহর দৃষ্টিতে এ অর্থের যোগান দেয়ার দায়িত্ব উম্মাহর উপর বর্তায়। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রের উম্মাহর উপর বিশেষ কর ধার্য করার অধিকার রয়েছে। যদি উম্মাহর এ কাজ করার আইনগত দায়িত্ব না থাকে তবে রাষ্ট্রের উম্মাহর উপর কর আরোপ করার কোন অধিকার নেই। কাজেই রাষ্ট্রের আদালত কিংবা প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগ কিংবা সরকারী কোন কাজের খরচ মেটানোর জন্য উম্মাহর নিকট কর ধার্য করতে পারে না।

ধারা ১৪৪ - রাষ্ট্রের বাজেটের জন্য আহকাম শরীয়াহ নির্ধারিত কতগুলো স্থায়ী উৎস রয়েছে। বাজেট আবার various বিভাগে বিভক্ত। প্রতিটি বিভাগের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ এবং প্রতিটি কাজের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট, উভয়ই খলিফার মতামত ও ইজতিহাদের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়।

ধারা ১৪৫ - বাইতুল মালের স্থায়ী রাজস্ব গুলো হচ্ছে, ফায়, লব্ধ মাল, জিযিয়া, খারাজ, রিকাজের এক পঞ্চমাংশ (ভূগর্ভস্থ সম্পদ), এবং যাকাত। প্রয়োজন থাক বা না থাক, এসকল উৎস থেকে নিয়মিত ভাবে অর্থ সংগ্রহ করা হয়।

ধারা ১৪৬ - যদি বাইতুল মালের স্থায়ী রাজস্ব রাষ্ট্রের খরচ মিটানোর ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত হয় তবে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে কর ধার্যের অনুমতি রয়েছেঃ

ক. দরিদ্র, অভাবী, অসহায় পর্যটকের প্রয়োজন মিটাতে এবং জিহাদের বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে।

খ. পারিতোষিকঃ যেমন কর্মচারীদের বেতন, শাসকের ক্ষতিপূরণ, সৈনিকদের খাদ্য ইত্যাদি।

গ. জন কল্যাণ ও সেবা প্রদানমূলক কাজের জন্যঃ যেমন রাস্তাঘাট নির্মাণ, পানি আহরণ, মসজিদ, বিদ্যালয় ও হাসপাতাল নির্মাণ ইত্যাদি।

ঘ. জরুরী অবস্থার প্রয়োজনে, যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ, বন্যা কিংবা ভূমিকম্প ইত্যাদি।

ধারা ১৪৭ - জন ও রাষ্ট্র মালিকানাধীন বিষয় থেকে আয়, উত্তারিধকারহীন সম্পদ, সীমান্তে আরোপিত শুল্ক ইত্যাদি বাইতুল মালের রাজস্ব হিসাবে বিবেচিত হয়।

ধারা ১৪৮ - বাইতুল মালের খরচ নিম্নোক্ত ছয় প্রকার ব্যক্তির মাঝে বিতরণ করা হয়ঃ

ক. যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত আট প্রকার ব্যক্তি। যদি এ খাত থেকে কোন অর্থ আয় না হয় তবে তাদের কোন অর্থ দেয়া হয় না।

খ. যদি যাকাতের অর্থ অপর্যাপ্ত হয় তবে দরিদ্র, অভাবী, অসহায় পর্যটক, ঋণগ্রস্থ এবং জিহাদের অর্থ স্থায়ী রাজস্বের উৎস থেকে প্রদান করা হয়। যদি স্থায়ী রাজস্ব উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ অপর্যাপ্ত হয়, তবে ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি কোন সাহায্য পান না। দরিদ্র, অভাবী, অসহায় পর্যটক এবং জিহাদের অর্থ উক্ত খাতে আরোপিত বিশেষ কর থেকে সংগৃহীত হয়। যদি প্রয়োজন হয়, এবং বিশৃংখলা এড়াতে রাষ্ট্র এ খাতে ঋণ নিয়ে প্রয়োজন মিটাতে পারে।

গ. রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনরত ব্যক্তিবর্গের প্রয়োজন মিটাতে বাইতুল মাল অর্থের যোগান দেয়। যেমন কর্মচারী, শাসকবৃন্দ এবং সৈনিক। যদি এ সংক্রান্ত অর্থ বরাদ্দ অপর্যাপ্ত হয়, তবে রাষ্ট্র বিশেষ কর আরোপ করে উক্ত অর্থ সংগ্রহ করে। বিশৃংখলার আশঙ্কা দেখা দেলে ঋণ গ্রহণ করা হয়।

ঘ. বাইতুল মাল নিত্যপ্রয়োজনীয় সেবার জন্য অর্থ যোগান দেয়, যথাঃ রাস্তাঘাট, মসজিদ, হাসপাতাল এবং বিদ্যালয়। যদি এ সংক্রান্ত অর্থ বরাদ্ধ অপ্রতুল হয়, তবে রাষ্ট্র বিশেষ কর আরোপ করে এ খরচের অর্থ সংগ্রহ করে।

ঙ. অন্যান্য কম গুরুত্বপূর্ণ সেবার ক্ষেত্রেও বাইতুল মাল অর্থ যোগান দেয়। যদি অর্থ বরাদ্দ অপ্রতুল হয় তবে ততক্ষণাৎ এ বিষয়ে কোন খরচ করা হয় না এবং এ সংক্রান্ত অর্থ সংস্থান বিলম্বিত হয়।

চ. বিপর্যয়/দুর্যোগ যেমন ভূমিকম্প এবং বন্যার ক্ষেত্রে বাইতুল মাল থেকে অর্থ বরাদ্দ করা হয়। যদি অর্থ বরাদ্দ অপ্রতুল হয় তবে ঋণগ্রহণ করা হবে এবং পরবর্তীতে কর থেকে তা পরিশোধ করা হয়।

ধারা ১৪৯ - রাষ্ট্র সকল নাগরিকের জন্য কর্মসংস্থান নিশ্চিত করে।

ধারা ১৫০ - ব্যক্তি বা কোম্পানী কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীগণ রাষ্ট্রের কর্মচারীদের সমান অধিকারও দায়িত্ব ভোগ করে। প্রত্যেকেই, যিনি তার কাজের বিনিময় হিসাবে সম্মানী পান, তিনি কর্মচারী হিসাবে বিবেচিত হন, এক্ষেত্রে তার কাজের ধরণ বিবেচ্য নয়। কর্মদাতা ও কর্মচারীর মধ্যে বেতনের মাত্রা নিয়ে কোন বিতর্ক হলে, বাজার দর অনুযায়ী বেতন মূল্যায়িত হয়। যদি অন্য কোন বিষয় নিকে বিতর্ক সৃষ্টি হয় তবে শরীয়াহর দৃষ্টিকোণ থেকে চাকরীরর চুক্তিনামা মূল্যায়ন করা হয়।

ধারা ১৫১ - কর্মচারীর নিকট প্রত্যাশিত কাজের বা সেবার মূল্যের ভিত্তিতে বেতন নির্ধারিত হয়। এটি কর্মচারীর জ্ঞান কিংবা যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় না। এক্ষেত্রে কোন বাধ্যতামূলক বা স্বয়ংক্রিয় বেতন বৃদ্ধির অবকাশ নেই। বরং তারা যে কাজ করেন তার জন্য তাদের প্রাপ্য পূর্ণ মূল্যের সমমানের বেতন দেয়া হয়।

ধারা ১৫২ - রাষ্ট্র অর্থহীন, কর্মহীন ও রুযীহীন ব্যক্তিদের পর্যাপ্ত পরিমাণ সহায়তা দেয়। পঙ্গু ও বিকলাঙ্গদের গৃহায়ন ও প্রতিপালনের দায়িত্ব রাষ্ট্রের।

ধারা ১৫৩ - রাষ্ট্র সকল নাগরিকের মধ্যে সম্পদের আবর্তন নিশ্চিত করে এবং শুধুমাত্র কিছু লোকের মাঝে সম্পদের আবর্তন নিষিদ্ধ করে।

ধারা ১৫৪ - নিম্নোক্ত উপায়ে রাষ্ট্র প্রতিটি নাগরিকের চাহিদা অনুযায়ী বিলাস দ্রব্যের প্রয়োজন মিটাতে সাহায্য করে এবং সমাজে একটি ভারসাম্য স্থাপনের চেষ্টা করেঃ

ক. রাষ্ট্র বাইতুল মালের অর্থ বরাদ্দ থেকে নাগরিকদের জন্য তরল ও স্থির সম্পদ প্রদানের ব্যবস্থা করে।

খ. রাষ্ট্র অপর্যাপ্ত জমির মালিকদের ফসলী জমি প্রদানের ব্যবস্থা করে। যাদের জমি আছে কিন্তু তারা তা ব্যবহার করেনা, তাদের কোন জমি দেয়া হবে না। যারা তাদের জমি ব্যবহার করতে পারছে না, তাদের জমি ব্যবহারের জন্য সহায়তা দেয়া হয়।

গ. যারা তাদের ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হচ্ছে, রাষ্ট্র যাকাত ও বাইতুল মালের অন্যান্য খাত থেকে তাদের অর্থ সাহায্য দেয়।

ধারা ১৫৫ - রাষ্ট্র কৃষিকাজ ও তার উৎপাদন সংক্রান্ত বিষয়গুলো কৃষিনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে তত্ত্বধান করবে। এতে করে সম্ভাব্য সকল ভূমির পরিপূর্ণ ব্যবহার ও ভূমির পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার নিশ্চিত হবে।

ধারা ১৫৬ - রাষ্ট্র শিল্প সংক্রান্ত বিষয়াদি তত্ত্বাবধান করে থাকে। এটি জনমালিকানাধীন শিল্পগুলোর সরাসরি দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে।

ধারা ১৫৭ - আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল্যায়ন হয় বণিকের নাগরিকত্বের উপর ভিত্তি করে, পণ্যের উৎসের উপর ভিত্তি করে নয়। রাষ্ট্র যাদের সাথে যুদ্ধাবস্থায় রয়েছে সে সকল দেশের বণিকদের রাষ্ট্রে বাণিজ্য করতে বাধা দেয়, যদি না এক্ষেত্রে যদি উক্ত বণিকের বা পণ্যের বিশেষ অনুমতি থাকে। যেসকল রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি রয়েছে তাদের চুক্তি অনুযায়ী বণিকদের সাথে আচরণ করা হয়। রাষ্ট্রের নাগরিকদের কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ বস্তু ও প্রয়োজনীয় বস্তু রপ্তানী করতে বাধা দেয়া হয়। তাদের অধিকৃত কোন পণ্য আমদানী করতে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। এর মধ্যে যেসকল রাষ্ট্র আমাদের সাথে যুদ্ধাবস্থায় আছে তারা অন্তর্ভুক্ত নয়, যথাঃ ইসরাইল। এক্ষেত্রে যুদ্ধাবস্থার আইন প্রযোজ্য হবে।

ধারা ১৫৮ - প্রতিটি নাগরিকের জীবন ঘনিষ্ঠ বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক পরীক্ষাগার স্থাপনের অধিকার রয়েছে। রাষ্ট্রেরও অনুরূপ গবেষণাগার স্থাপন করা উচিৎ।

ধারা ১৫৯ - ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকারক বিষয়ে পরীক্ষাগার স্থাপন ও অধিকার করার ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে রাষ্ট্র নিবৃত্ত করবে।

ধারা ১৬০ - রাষ্ট্র সকলের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সুবিধা দেয়। অবশ্য এটি ব্যক্তিগত চিকিৎসা অনুশীলন কিংবা ঔষধ বিক্রীকে বাধা দেয় না।

ধারা ১৬১ - রাষ্ট্রে বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ নিষিদ্ধ। বিদেশীদের বিশেষ অর্থনৈতিক সুবিধা বা বিবেচনার অধিকার দেওয়াও নিষিদ্ধ।

ধারা ১৬২ - রাষ্ট্রের নিজস্ব মুদ্রা থাকা আবশ্যক। অন্য কোন দেশের মুদ্রার সাথে সংযুক্ত থাকা অনুমিত নয়।

ধারা ১৬৩ - রাষ্ট্রের মুদ্রা হয় স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য, whether minted or not। অন্য কোন ধরণের মুদ্রার ব্যবহার অনুমিত নয়। রাষ্ট্র প্রয়োজনবোধে স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্তে অন্য কোন ধরণের মুদ্রা প্রস্তুত করতে পারে তবে শর্ত থাকে যে, সমপরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্য রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা থাকতে হবে। অর্থাৎ উদাহরণ স্বরূপ রাষ্ট্র তার নাম খচিত তামা কিংবা পিতলের মুদ্রা প্রচলন করতে পারে যদি তা রাষ্ট্রের মজুদ স্বর্ণ বা রৌপ্যের সমপরিমাণ হয়।

ধারা ১৬৪ - রাষ্ট্রের মুদ্রা ও বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনের অনুমতি রয়েছে। অবশ্য এধরণের লেন দেন নগদে হতে হবে এবং কোনরূপ বিলম্ব করা যাবেনা। দুটি রাষ্ট্রের মুদ্রা ভিন্ন হলে, তাদের মধ্যে বিনিময় হারের তারতম্য হতে পারে। নাগরিকরা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী রাষ্ট্রের মধ্য থেকে কিংবা বাহির থেকে মুদ্রা ক্রয় করতে পারে এবং এধরণের ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পূর্বলব্ধ কোন অনুমতির প্রয়োজন নেই।

শিক্ষা নীতি

ধারা ১৬৫ - ইসলামী আকীদা সকল পাঠ্যক্রমের ভিত্তি গঠন করে। পাঠ্যসূচী এবং শিক্ষার পদ্ধতি এমন ভাবে পরিকল্পিত হওয়া উচিৎ যাতে মূল ভিত্তি থেকে বিচ্যূত হবার কোন সুযোগ না থাকে।

ধারা ১৬৬ - শিক্ষানীতি ইসলামী চিন্তা ও চরিত্রকে সঠিক রূপ বা আকৃতি প্রদান করে। পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত সকল বিষয়েরই এ ভিত্তির উপর গভীর ভাবে প্রোথিত থাকা আবশ্যক।

ধারা ১৬৭ - শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামী ব্যক্তিত্ব গঠন করা এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের সাথে জনগণের জীবনকে সম্পৃক্ত করে। শিক্ষার পদ্ধতি এ লক্ষ্য পূরণের জন্য পরিকল্পিত এবং এ লক্ষ্য থেকে কোনরূপ বিচ্যূতিকে প্রতিহত করে।

ধারা ১৬৮ - ইসলামী সংস্কৃতি ও আরবী ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে সপ্তাহে ব্যয়কৃত সময় অন্য বিষয়গুলো শিক্ষার পিছনে ব্যয়কৃত সময়ের সমান হওয়া আবশ্যক।

ধারা ১৬৯ - পরীক্ষালব্ধ বিজ্ঞান, এবং এসংক্রান্ত যে কোন বিষয় যেমন গণিত ও সাংস্কৃতিক বিভাগের মধ্যে সুস্পষ্ট বিভাজন থাকা আবশ্যক। পরীক্ষালব্ধ বিজ্ঞান এবং এর সাথে সম্পর্কিত যে কোন বিষয় প্রয়োজন অনুসারে শেখানো উচিৎ এবং কোন নির্দিষ্ট স্তরে সীমাবদ্ধ থাকা উচিৎ নয়। সাংস্কৃতিক বিষয়গুলো সুনির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী, উচ্চতর স্তরের পূর্বে, প্রাথমিক স্তরে শিখানো উচিৎ যাতে করে তা ইসলামী ধারণা ও বিধি বিধান এর সাথে সাযুজ্যপূর্ণ হতে পারে। উচ্চতর শিক্ষার স্তরে এ বিষয়গুলো একটি নির্দিষ্ট বিষয়রূপে শেখা যেতে পারে, তবে লক্ষ্য রাখতে হবে তা যেন কোনক্রমেই শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যূত করতে না পারে।

ধারা ১৭০ - শিক্ষার সকল স্তরে ইসলামী সংস্কৃতি শিক্ষা দেয়া উচিৎ। উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে চিকিৎসা, প্রকৌশল, পদার্থবিদ্যা এবং অন্যান্য বিষয়ের মত বিভিন্ন ইসলামী বিভাগ প্রবর্তন করা উচিৎ।

ধারা ১৭১ - একদিকে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার মত বিষয়গুলো বিজ্ঞান, ব্যবসা প্রশাসন, নৌবিদ্যা ও কৃষিবিদ্যার মত বিষয়গুলোর সম্পৃক্ত থাকতে পারে । এধরণের বিষয়গুলো কোনরূপ সীমাবদ্ধতা বা শর্ত ছাড়াই শেখা উচিৎ। অপরদিকে যে বিষয়গুলো একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা প্রভাবিত হয়, যেমন চারুশিল্প (অঙ্কন শিল্প) ও ভাস্কর্য। এসকল ক্ষেত্রে যদি এগুলো ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে সাংঘর্ষিক হয় তবে এ বিষয়গুলো শেখা উচিৎ নয়।

ধারা ১৭২ - রাষ্ট্রের শিক্ষা পাঠ্যক্রমই শুধুমাত্র শেখানো উচিৎ। ব্যক্তিগত/বেসরকারী বিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি রয়েছে তবে তাদের অবশ্যই রাষ্ট্রের বেঁধে দেয়া শিক্ষা পাঠ্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক শ্রেনীর ব্যবস্থা থাকতে হবে। এছাড়াও অন্য

কোন ধর্ম, গোত্র বা বর্ণের ভিত্তিতে কোন বিদ্যালয় থাকতে পারবেনা। প্রতিটি বিদ্যালয়ের রাষ্ট্রের প্রণীত পাঠ্যক্রম অনুসরণ করতে হবে এবং রাষ্ট্রের নির্ধারিত লক্ষ্য ও নীতিমালা অনুসরণে তাদের নিজেদের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

ধারা ১৭৩ - নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি ব্যক্তিকে জীবন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা দান রাষ্ট্রের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব। অন্ততঃ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত এটি সবার জন্য বিনামূল্যে প্রদান করা উচিৎ। রাষ্ট্রের সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিৎ ও সবাইকে সুযোগ সুবিধা দেয়া উচিৎ যাতে করে কোন ব্যক্তি বিনামূল্যে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ ও অব্যহত রাখতে পারে।

ধারা ১৭৪ - বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে রাষ্ট্রের যথেষ্ট পরিমাণ পাঠাগার, পরীক্ষাগার এবং অন্যান্য শিক্ষা সুবিধা দেয়া উচিৎ যাতে করে কোন ব্যক্তি জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করতে ও অব্যহত পারে। যেমনঃ ফিক্‌হ, হাদীস, কুরআনের তাফসীর, চিকিৎসা, প্রকৌশল, রসায়নবিদ্যা ইত্যাদি। এর মাধ্যমে উম্মাহর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে মুজতাহিদিন, চমৎকার বিজ্ঞানী এবং সৃষ্টিশীল চিন্তাবিদ তৈরী হবে।

ধারা ১৭৫ - শিক্ষার কোন স্তরেই প্রকাশনার স্বত্ত্বকে ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না এবং তাকে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। কোন ব্যক্তিরই, এমন কি লেখক বা প্রকাশক, কারোই পূণঃমুদ্রণ স্বত্ত্বাধিকার (কপিরাইট) সীমাবদ্ধ থাকতে পারবে না। অবশ্য যদি বইটি ইতিমধ্যে প্রকাশিত বা মুদ্রিত হয়ে না থাকে তবে তা ধারণা হিসাবে রয়েছে এবং লেখকের এ ধারণা জনগণের নিকট স্থানান্তরের বিনিময়ে সম্মানী গ্রহণের অনুমতি রয়েছে ঠিক যেমন তিনি শিখানোর বিনিময়ে পারিতোষিক নিয়ে থাকেন।

পররাষ্ট্র নীতি

ধারা ১৭৬ - রাজনীতি হচ্ছে আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় উভয় ক্ষেত্রেই উম্মাহর বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা। রাষ্ট্র এবং উম্মাহ উভয় কর্তৃক এ দায়িত্ব পালন করা হয়। রাষ্ট্র এ ব্যবস্থাপনা বাস্তবে প্রয়োগ করে এবং উম্মাহ সঠিক ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে রাষ্ট্রকে দায়বদ্ধ করে।

ধারা ১৭৭ - যেকোন ব্যক্তি, দল, গোষ্ঠী অথবা সংগঠনের বিদেশী কোন রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক থাকা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের বিষয়টি কেবলমাত্র রাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কারণ রাষ্ট্রেরই সম্পূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে উম্মাহর বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য রাখা ও দেখা শোনা করা। উম্মাহ এবং বিভিন্ন গোষ্ঠী রাষ্ট্রকে পররাষ্ট্রীয় সম্পর্কের বিষয়ে দায়বদ্ধ করে।

ধারা ১৭৮ - যে কোন উপায়ে লক্ষ্য অর্জন করা যাবে না, কারণ পদ্ধতি (তরিকা) ধারণা (ফিকরা) থেকে উদ্ভূত। কাজেই হারাম উপায়ে ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক) এবং মুবাহ (অনুমিত) বিষয়গুলো অর্জন করা যাবে না। রাজনৈতিক উপায় (political means), রাজনৈতিক পদ্ধতির (political method) সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারবে না।

ধারা ১৭৯ - পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক চাল আবশ্যক। এ চালের কার্যকারিতা ও সফলতা নির্ভর করে লক্ষ্য গোপন করা ও কার্যকলাপ প্রকাশ করার মাধ্যমে।

ধারা ১৮০ - সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক উপায় হচ্ছে অপর রাষ্ট্রের অন্যায় অপরাধ কে প্রকাশ করে দেয়া। ভ্রান্ত নীতির কুফল ব্যাখ্যা করা, ক্ষতিকর ষড়যন্ত্র প্রকাশ করে দেয়া এবং প্রতারণাকারী/প্রবঞ্চক ব্যক্তিত্বদের পতন ঘটানোও এসকল উপায়ের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।

ধারা ১৮১ - একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কৌশল হচ্ছে ব্যক্তি, জাতি ও রাষ্ট্রের বিষয়াদির দেখা-শোনার ক্ষেত্রে ইসলামী চিন্তাধারণার মহত্ত্বের প্রকাশ ঘটানো।

ধারা ১৮২ - The political cause of the Ummah depends on Islam and ইসলামী রাষ্ট্রের শক্তি, ইসলাম এর আইন কানুন ও শাসনের সঠিক বাস্তবায়ন এবং মানবজাতির প্রতি অবিরাম দাওয়াহ বহন করে নিয়ে যাওয়া।

ধারা ১৮৩ - ইসলামী দাওয়াহ বহন করা হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের মূল অক্ষ যার উপর ভিত্তি করে পররাষ্ট্রনীতি প্রণীত ও বিকশিত হয় এবং এটি হচ্ছে মূল ভিত্তি যার উপর নির্ভর করে ইসলামী রাষ্ট্র ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক গড়ে উঠে।

ধারা ১৮৪ - অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে ইসলামীর রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ভর করে চারটি বিবেচনার উপর। এগুলো হচ্ছেঃ

১. বর্তমান ইসলামী বিশ্বে রাষ্ট্রগুলোকে একটি অভিন্ন রাষ্ট্র হিসাবে বিবেচনা করা হয়, কাজেই তারা পররাষ্ট্র নীতির অধীনে পড়ে না। তাদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে পররাষ্ট্র নীতির বাস্তবতা হিসাবে বিবেচিত হয় না, এবং এদের ঐক্যবদ্ধ করে একটি রাষ্ট্রে পরিণত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করে যেতে হবে।

২. যে সকল রাষ্ট্র অর্থনৈতিক, বাণিজ্য, সংস্কৃতিক অথবা বন্ধুত্বের চুক্তিতে চুক্তিবদ্ধ আছে তাদের প্রতি চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ঐ সকল রাষ্ট্রের নাগরিকদের শুধুমাত্র পরিচয়পত্র দেখিয়েই আমাদের দেশে প্রবেশের অধিকার আছে, এক্ষেত্রে তাদের পাসপোর্টের প্রয়োজন নেই; যদি চুক্তিতে এটি উল্লেখিত থাকে এবং এ শর্তে যে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকগণও ঐ রাষ্ট্রে অনুরূপ প্রবেশের অধিকার রাখে। ঐ রাষ্ট্রগুলোর সাথে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক শুধুমাত্র কিছু নির্দিষ্ট পণ্য সামগ্রীর মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে; তবে শর্ত থাকে যে ঐ বস্তুগুলো আমাদের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় এবং ঐ সকল রাষ্ট্রগুলোকে শক্তিশালী করে না।

৩. যে সকল রাষ্ট্রের সাথে আমাদের কোন চুক্তি নেই, এবং ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র, যেমন বৃটেন, আমেরিকা এবং ফ্রান্স, এবং ঐ সকল রাষ্ট্র যারা আমাদের ভূখন্ড গুলোর উপর দখলদারিত্বের আকাংখা পোষণ করে, যেমন রাশিয়া ইত্যাদি, ঐ সকল রাষ্ট্রগুলোর সাথে আমাদের সম্পর্ক সম্ভাব্য যুদ্ধাবস্থা হিসাবে বিবেচিত হবে। তাদের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সকল সতর্কতা গ্রহণ করতে হবে এবং তাদের সাথে আমাদের কোনরূপ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের অনুমতি নেই। তাদের নাগরিকগণ আমাদের রাষ্ট্রে পাসপোর্ট ও ভিসার মাধ্যমে প্রবেশ করতে পারবে যা প্রতিটি ব্যক্তির প্রতিটি ভ্রমণের জন্য সীমাবদ্ধ থাকবে।

৪. যে সকল রাষ্ট্র ইতিমধ্যেই আমাদের সাথে যুদ্ধরত অবস্থায় আছে, যেমন ইসরাইল, তাদের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে হবে। তাদের বিরুদ্ধে এমন ব্যবস্থা নিতে হবে যেন তারা আমাদের সাথে প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধরত অবস্থায় আছে, সেটি যুদ্ধবিরতিই হোক কিংবা অন্য কোন অবস্থাই হোক না কেন। ঐ সকল রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের আমাদের রাষ্ট্রে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

ধারা ১৮৫ - সকল সেনা চুক্তি এবং সন্ধি সম্পূণরূপে নিষিদ্ধ। এর মাঝে অন্তর্ভূক্ত রাজনৈতিক চুক্তি ও সমঝোতা যেখানে সেনা ঘাটি ও বিমানক্ষেত্র ধার (lease) দেয়ার বিষয় সংক্রান্ত ইত্যাদি। বন্ধুত্ব, অর্থনৈতিক, বানিজ্যিক, অর্থব্যবস্থাপনা, সাংস্কৃতিক এবং যুদ্ধবিরতি চুক্তির অনুমতি রয়েছে।

ধারা ১৮৬ - ইসলামী ভিত্তির উপর গঠিত নয় কিংবা অনৈসলামিক বিধিবিধান সম্বলিত কোন সংগঠনে যোগ দেয়া ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। এর মাঝে আন্তর্জাতিক সংগঠন যেমন জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক বিচারিক আদালত, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আই এম এফ), বিশ্বব্যঙ্ক এবং আঞ্চলিক সংগঠন যেমন আরব লীগ ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত যাদের সাথে ইসলামী রাষ্ট্র কোনরূপ সংশ্লিষ্টতায় যাবে না।